বিষয়সূচী

মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক প্রসঙ্গে / ধনঞ্জয় দাশ

বাংলা সাহিত্যের কয়েকটি ধারা / বীরেন পাল ১

[বীরেন পাল প্রয়াত কমিউনিস্ট নেতা ভবানী সেন-এর ছদ্মনাম]

সাহিত্য বিচারের মার্কসীয় পদ্ধতি / উর্মিলা গুহ ২৭

[উর্মিলা গুহ বিশিষ্ট সাহিত্যিক-সাংবাদিক প্রদ্যোৎ গুহ-র ছদ্মনাম]

বাংলা প্রগতি সাহিত্যের আত্মসমালোচনা / প্রকাশ রায় ৭৪

[প্রকাশ রায় বিশিষ্ট সাহিত্যিক-সাংবাদিক প্রদ্যোৎ গুহ-র ছদ্মনাম]

"বাংলা প্রগতি সাহিত্যের আত্মসমালোচনা" / রবীন্দ্র গুপ্ত ৭৮

[রবীন্দ্র গুপ্ত প্রয়াত কমিউনিস্ট নেতা ভবানী সেন-এর ছদ্মনাম]

ঊনবিংশ শতকের বাঙলায় বঙ্কিম সাহিত্যের ভূমিকা / নবগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ১২৬

[নবগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় 'দৈনিক বসুমতী'-র প্রাক্তন সহযোগী সম্পাদক গণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর ছদ্মনাম]

পরিশিষ্ট

মতবাদের সংগ্রাম ১৪৮

[মার্কসবাদী, প্রথম সংকলন-এর সম্পাদকীয়]

প্রকাশকের বক্তব্য ১৫২

[মার্কসবাদী, অষ্টম তথা শেষ সংকলন-এর ঘোষণাপত্র]

একজন মনস্বী ও একটি শতাব্দী / ভবানী সেন ১৫৪

মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক প্রসঙ্গে

মার্কসবাদ বিজ্ঞান-ভিত্তিক বিশ্ববীক্ষা। ভাববাদী দর্শন আর বুর্জোয়া মতাদর্শের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেই মার্কসীয় যুক্তি-বিজ্ঞান বারংবার তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছে। বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ আজ তাই মার্কসবাদী জীবনদর্শনের অনুসারী। মার্কসবাদী বিশ্ববীক্ষার সাহায্যে বৈষয়িক জীবন ও জগৎকে যেমন বিচার-বিশ্লেষণ করা যায় তেমনি তার আর্থনীতিক বনিয়াদের উপর গড়ে ওঠা উপরি কাঠামো (Super-Structure), অর্থাৎ রাজনীতি, আইন, দর্শন, ধর্ম, সাহিত্য, নন্দনতত্ত্ব ইত্যাদির বিকাশধারাও আমরা বিচার-বিশ্লেষণ করতে পারি।

একথা সত্য, মার্কস-এঙ্গেলস কিংবা লেনিন শিল্প-সাহিত্য ও নন্দনতত্ত্বের কোনো সুসংবদ্ধ ধারাবাহিক স্বতন্ত্র ইতিহাস বা গ্রন্থ রচনা করে যান নি। কিন্তু এই তিন যুগন্ধর পুরুষ বিভিন্ন সময়ে, নানা উপলক্ষে, শিল্প-সাহিত্য তথা মানস-সংস্কৃতি সম্পর্কে যেসব আলোচনা ও মন্তব্য করেছেন তার পরিমাণ বিপুল না হলেও পর্যাপ্ত। আর এই সব পর্যালোচনা একত্র করে এবং এর সারাৎসারের মধ্য দিয়ে মার্কসীয় নন্দনতত্ত্বের ধ্যান-ধারণায় উপনীত হওয়া এমন কিছু অসম্ভব ঘটনা নয়।

এই পরিপ্রেক্ষিতে, মার্কসীয় দৃষ্টিতে শিল্প-সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য-বিচারের ক্ষেত্রে বাঙলাদেশের মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবী এবং তাত্ত্বিক নেতারা যেসব বিতর্ক উত্থাপন করেছিলেন আমি সেগুলি সংকলন করার কাজে অগ্রসর হয়েছি। সুতরাং আমার অনুসন্ধানের পরিধি সুনির্দিষ্ট এবং তা শিল্প-সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য-বিচারের বিতর্কমূলক রচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

এ-প্রসঙ্গে একটা কথা বিশেষ করে বলার প্রয়োজন অনুভব করছি। আমার অনুসন্ধানের ক্ষেত্র নির্দিষ্ট হলেও কাজটি একক মানুষের পক্ষে সহজসাধ্য নয়। কারণ, ১৯১৭ সালের অক্টোবর বিপ্লবের পর আটান্ন বছর অতিক্রান্ত এবং অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির সিদ্ধান্ত অনুসারে ১৯২৫ সালের ডিসেম্বর মাসে কানপুরে অনুষ্ঠিত সম্মেলনকে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা-বছর ধরলে, এবার এই ১৯৭৫ সালে, আমরা ভারতের মাটিতে কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠার অর্ধশতাব্দী পূর্তি-উৎসবের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছেছি। অর্থাৎ, এ-দেশে মার্কসবাদী

চিন্তাচর্চার ইতিহাস অন্তত অর্ধশতাব্দীকাল জুড়ে পরিব্যাপ্ত। অতএব, ঐতিহাসিক সত্যনিষ্ঠার প্রয়োজনে বিগত এই পঞ্চাশ বছরে বাঙলাদেশের মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবীরা শিল্প-সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য-বিচারে কিভাবে কোন্ অবদান রেখেছেন তা অনুসন্ধান করা একান্ত কর্তব্য।

আমি একক প্রচেষ্টায়, প্রবীণতম মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবীদের কয়েকজনের সঙ্গে আলোচনায় এবং দুষ্প্রাপ্য বেশ কিছু পত্র-পত্রিকা আর গবেষণা-গ্রন্থাদি পাঠ করে যা বুঝেছি এবং জেনেছি, এবার তা সংক্ষিপ্তাকারে তুলে ধরছি।

১৯১৭ সালের অক্টোবর বিপ্লব এবং তার মহান নেতা লেনিন সম্পর্কে বাঙলাদেশের বুদ্ধিজীবীরা নানা সচেতন মনোভাবের পরিচয় দিলেও বিশের দশকে একান্তভাবে তা ছিল রাজনৈতিক ইতিকথা এবং জীবনীমূলক রচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ। সে সব রচনার অনেকগুলি বলশেভিকবাদের পক্ষে সোচ্চার হলেও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদ কিংবা ঐতিহাসিক ও দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী দর্শনের আলোচনায় বেশি দূর অগ্রসর হতে পারে নি।

তবু, বিশের দশকেই অক্টোবর বিপ্লবের প্রকৃত তথ্য ও লেনিনের জীবনী পরিবেশনে, বলশেভিকবাদ-প্রসঙ্গে এবং আমাদের জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনে অক্টোবর বিপ্লবের শিক্ষাকে প্রয়োগ করে শ্রমিক-কৃষককে সংগঠিত করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা নানাবিধ রচনা প্রকাশের মাধ্যমে যে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে নিঃসন্দেহে তা গুরুত্বপূর্ণ। অমৃতবাজার পত্রিকা, দৈনিক বসুমতী, আনন্দবাজার পত্রিকা, বাঙ্গলার কথা, দৈনিক বঙ্গবাণী, মডার্ন রিভিয়্যু, প্রবাসী, আত্মশক্তি, বিজলী, সংহতি, শঙ্খ, সৎসঙ্গী, লাঙ্গল, গণবাণী, নবশক্তি প্রভৃতি দৈনিক ও সাময়িক পত্রিকার নাম এ-প্রসঙ্গে অবশ্যই স্মরণীয়।১

এই বিশের দশকে এসব পত্র-পত্রিকায় শিল্প-সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য-বিচারে কোনো মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবী মার্কসীয় নন্দনতত্ত্ব প্রয়োগ করেছেন কিংবা নির্দিষ্ট যুগের সামাজিক-রাজনৈতিক ও আর্থনীতিক প্রেক্ষাপটে সেই যুগের ভাবাদর্শ বিচার-বিশ্লেষণে অগ্রসর হয়েছেন, এমন কোনো দৃষ্টান্ত এখনও পর্যন্ত আমার দৃষ্টির অগোচর।

১ দ্র. অবিনাশ দাশগুপ্ত, 'লেনিন, রুশ মহাবিপ্লব ও বাংলা সংবাদ-সাহিত্য', ক্যালকাটা বুক হাউস, কলিকাতা-১২।

এই সময় যাঁরা মার্কসবাদী জীবন-দর্শন গ্রহণ করেছেন অথবা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছেন, তাঁরা ছিলেন অসংগঠিত। আর বাঙলা দেশে তখন পর্যন্ত (বিশের দশকে) 'যুগান্তর', 'অনুশীলন' প্রভৃতি বিপ্লববাদী দলের প্রতিই ছিল যুব-মানসের প্রবল আসক্তি। মার্কসবাদে বিশ্বাসী গোষ্ঠী বা চক্রগুলির তখন প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছিল শ্রমিকশ্রেণীকে ট্রেড ইউনিয়নের মধ্যে সংগঠিত করা। প্রকৃতপক্ষে, মার্কসবাদী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে শিল্প-সাহিত্য তথা সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে সংগঠিত করার ক্ষেত্র সে-সময় প্রস্তুত হয় নি এবং মার্কসবাদে দীক্ষিত মুষ্টিমেয় ব্যক্তির পক্ষে সকল দিক সামলানোও ছিল দুঃসাধ্য ব্যাপার।

এসব সত্ত্বেও বিশের দশকে বাঙালী সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীদের একাংশ গোর্কি-চর্চায় মেতে উঠলেন।[১] ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ-এর সঙ্গে আদর্শগতভাবে মিলিত হয়ে সদ্য-যুদ্ধফেরৎ হাবিলদার নজরুল ইসলাম সান্ধ্য দৈনিক 'নবযুগ'-এর পৃষ্ঠায় নিপীড়িত মানুষের বেদনা আর বিক্ষোভকে নতুন ভাষায় প্রকাশ করলেন। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, মণীন্দ্রলাল বসু, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, নারায়ণ ভট্টাচার্য, জগদীশ গুপ্ত, শিবরাম চক্রবর্তী, হেমন্তকুমার সরকার, প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রমুখ নতুন যুগের লেখকেরা 'সংহতি' 'আত্মশক্তি', 'বিজলী', 'কল্লোল', 'কালিকলম', 'লাঙ্গল', 'গণবাণী', 'নবশক্তি', 'বঙ্গবাণী' প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় তাঁদের সৃজনশীল রচনায় তুলে ধরলেন সমাজের নীচুতলার মানুষের জীবন-যন্ত্রণা এবং রুশ-বিপ্লবের সদর্থক ভূমিকা। আর, ঠিক একই সময়ে 'বলশেভিকবাদ'কে হেয় প্রতিপন্ন করার কাজে সচেষ্ট হলেন পণ্ডিচেরীর নলিনীকান্ত গুপ্ত, অনিলবরণ রায়, সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক 'বাণী-মন্দির'-প্রণেতা শশাঙ্কমোহন সেন-এর দল।

এই বিতর্কগুলির ঐতিহাসিক গুরুত্ব সম্পর্কে আমি সচেতন। কিন্তু যেহেতু এগুলি ছিল অস্পষ্ট মার্কসীয় ধ্যান-ধারণায় আপ্লুত এবং মূলত শিল্প-সাহিত্য বহির্ভূত বিষয়কে কেন্দ্র করে আবর্তিত, সেইহেতু এগুলিকে আমি এই সংকলনে স্থান দিতে অনিচ্ছুক।

রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ধ্বজা উড়িয়ে 'কল্লোল' এবং 'শনিবারের

চিঠি'-র যে তরুণ সাহিত্যিকগোষ্ঠী সাহিত্যের হাটে এ-সময় প্রচণ্ড হট্টগোল শুরু করেন তাঁরাও কিন্তু মার্কসীয় চিন্তা-চৈতন্যের অনুগামী ছিলেন না। 'কল্লোল-যুগ'-এর অন্যতম নায়ক অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত-র ভাষায় তাঁরা ছিলেন, "উদ্ধত যৌবনের ফেনিল উদ্দামতা, সমস্ত বাধাবন্ধনের বিরুদ্ধে নির্বারিত বিদ্রোহ, স্থবির সমাজের পচা ভিত্তিকে উৎখাত করার আলোড়ন"-এর অংশীদার এবং "ভাবনৈতিক সন্ত্রাসবাদী"। প্রগতিসাহিত্য ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের প্রবীণ নেতা গোপাল হালদার তাঁর সাহিত্য-জীবনে অনুপ্রবেশের স্মৃতিচারণায় তাই যথার্থই লিখেছেন, "'কল্লোল-যুগ' অচিন্ত্যবাবুর রম্য রচনার রটনা—ইতিহাসের ঘটনা নয়। …সজনী যদি হয় 'গরঠিকানা কল্লোলী,' কল্লোল-যুগটাও কিন্তু 'যুগ' নয়, হুজুগ।" [দ্র. 'সাহিত্য-সৈকতে', নতুন পরিবেশ, শারদীয় ১৩৮১, পৃ. ১২৩]

ফলত, সৃষ্টিশীল গল্প-কবিতায় 'কল্লোল-গোষ্ঠী'র অবদান কিছুটা স্বীকৃত হলেও উপন্যাস কিংবা সাহিত্য-সমালোচনায় তাঁদের দান প্রায় অকিঞ্চিৎকর। আর, মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গির কোনো প্রশ্নই ওঠে না। কারণ, 'ভাবনৈতিক সন্ত্রাসবাদ' তথা নৈরাজ্যবাদী অবস্থান থেকে মার্কসবাদের বৈজ্ঞানিক যুক্তি-শৃঙ্খলায় উপনীত হওয়া যায় না। এর ফলেই তৎকালীন 'আধুনিক' সাহিত্য-অভিযানের আর এক নায়ক—প্রেমেন্দ্র মিত্র ১৯৩৩ সালে 'কালিকলম'-এ একটি চিঠি পাঠিয়ে জানান, "জীবনকে দেখবার পাঠ নিতে যদি হামসুন-গোর্কির পাঠশালায় গিয়ে থাকি তাতে দোষ কি!" প্রেমেন্দ্র মিত্র-র এই চিঠি পড়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় গোর্কির সঙ্গে পরিচয় করতে গিয়েছিলেন। এবং 'মাদার' পাঠের পর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্গত ভাবেই প্রশ্ন তুলেছিলেন, "হামসুন আর গোর্কিকে প্রেমেনবাবু মেলাবেন কি করে?…ভাবের আকাশের ঝড় আর মাটির পৃথিবীতে জীবনের বন্যার পার্থক্য কি ধরা না পড়ে পারে?" [মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, 'লেখকের কথা,' পৃ. ২৮-২৯]

এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়, 'ভাবনৈতিক সন্ত্রাসবাদী'দের বিরুদ্ধে 'ভাবনৈতিক স্থিতিবাদী'রা রবীন্দ্রনাথের আদালতে মামলা দায়ের করার পর কবিগুরু ১৩৩৪-এর শ্রাবণ মাসে 'বিচিত্রা' পত্রিকায় 'সাহিত্যের ধর্ম' নামে যে-রায় প্রকাশ করেন এবং 'কল্লোল-গোষ্ঠী'র কেউ না হয়েও নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত ১৩৩৪-এর ভাদ্র মাসের 'বিচিত্রা'-য় সেই রায়ের বিরুদ্ধে 'সাহিত্যধর্মের সীমানা' নামে যে-আপীল পেশ

করেন সেই ঐতিহাসিক বিতর্কটির কথা। এই বাদানুবাদ বহুমূল্য সাহিত্য-ভাবনার ঐতিহাসিক দলিল রূপে স্বীকৃত হলেও তার মধ্যেও ছিলনা মার্কসীয় ধ্যান-ধারণার কোনো মৌল সূত্র।

আমার এত কথা বলার উদ্দেশ্য, এদেশের বুদ্ধিজীবী ও অগ্রগণ্য সাহিত্যিক-দের একাংশের চিন্তা-জগতে অক্টোবর বিপ্লবের প্রভাব পড়লেও পরবর্তী একটি দশকে শিল্প-সাহিত্য বিচারে কিন্তু মার্কসবাদী বিশ্ববীক্ষার আলোক আদৌ বিচ্ছুরিত হয় নি।

এটাই স্বাভাবিক। প্রকৃতপক্ষে, ১৯২৯ সালে মীরাট-ষড়যন্ত্র মামলার পূর্ব পর্যন্ত, আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হওয়া সত্ত্বেও, মার্কসবাদে দীক্ষিত ও পরিশীলিত বুদ্ধিজীবীর সংখ্যা ছিল অঙ্গুলিমেয়। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির তাত্ত্বিক কিংবা মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবীরূপে পরবর্তীকালে প্রখ্যাত প্রায় সকল ব্যক্তিই মার্কসবাদী জীবন-দর্শন গ্রহণ করতে অগ্রসর হয়েছেন তিরিশ আর চল্লিশের দশকে।

আমি পূর্বেই বলেছি, বিশ আর ত্রিশের দশকের প্রারম্ভকাল পর্যন্ত বাংলা দেশের শিক্ষিত আদর্শবাদী তরুণ সমাজের উপর ছিল 'যুগান্তর,' 'অনুশীলন' প্রভৃতি বিপ্লববাদী দলের প্রচণ্ড প্রভাব। রুশ-বিপ্লব, তলস্তয়-গোর্কি-তুর্গেনিভ হয়তো কোনো কোনো তরুণের মনে কিছুটা ঢেউ তুলেছিল কিন্তু সে-ঢেউ মিলিয়ে যেতেও দেরী হয়নি ম্যাকসুইনি, কলিন্স, আইরিশ-বিদ্রোহ সম্পর্কে প্রবল আগ্রহ আর কৌতূহলের জোয়ারে। সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের ব্যর্থতার পর, বিশেষ করে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পরবর্তী বছরগুলিতেই বাংলা ও ভারতের অন্যান্য রাজ্যে অবস্থিত জেলখানায়, বন্দীশিবিরে আর আন্দামানে নির্বাসিত এই সব তরুণ বিপ্লববাদীদের এক বড় অংশ মার্কসবাদের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং তিরিশের দশকের শেষভাগে বন্দী-জীবনের অবসানে যোগ দেন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে। গোপাল হালদার, রেবতী বর্মন, ভবানী সেন, সরোজ আচার্য প্রমুখ রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অগ্রগণ্য নেতাদের আমরা এই ভাবেই পেয়েছিলাম।

অক্টোবর বিপ্লবের পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে সরোজ আচার্য ও গোপাল হালদার যে স্মৃতিচারণ করেছিলেন তার থেকেও আমরা উপর্যুক্ত সিদ্ধান্তে পৌছতে পারি। সরোজ আচার্য স্পষ্টই বলেছেন, "...বলশেভিজম, বলশেভিক

বিপ্লব, কম্যুনিজম, এ সব বিষয় নিয়ে পড়াশোনা ভাবনা ১৯২১-২২ সন পর্যন্ত করিনি, করবার তাগিদ বোধ করিনি। রাজনৈতিক স্বাধীনতার ভাবনা উচ্ছ্বাস আবেগে তখন প্রাণমন ভরপুর।" ['অক্টোবর বিপ্লবের পঞ্চাশ বছর', পরিচয়, কার্তিক-অগ্রহায়ণ, ১৩৭৪]

১৯২৬-২৭ সালে জন রীডের 'টেন ডেজ দ্যাট শুক্ দি ওয়র্লড', অ্যালবার্ট রীস উইলিয়ামসের 'থ্রু দি রাশিয়ান রেভল্যুশন' এবং ১৯২৮ সালে 'বাংলার বাণী' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত 'রুশিয়ার রক্তবিপ্লব' পাঠের পরেও তাঁর স্বীকারোক্তি, "তখন মোটামুটি এইটুকু মাত্র বুঝেছি যে, স্বাধীনতার লড়াই-এ মজুর-চাষীকে টেনে আনা দরকার। বুঝিনি বলশেভিক বিপ্লব, বলশেভিজম, কম্যুনিজমের তাৎপর্য তার চেয়ে অনেক, অনেক বেশি।" তারপর সন্ত্রাসবাদ, কংগ্রেসী রাজনীতি আর সোশ্যালিজমের পাঁচমিশেলী সমাহার তিনি কাটিয়ে ওঠেন '১৯৩০-৩২ সনে যখন বন্দীদশায়'।

অন্যান্য যেসব মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবী বাংলাদেশের শিল্প-সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনে অগ্রণীর ভূমিকা পালন করেছেন, তাঁদেরও অভ্যুদয় তিরিশ আর চল্লিশের দশকে। এঁদের মধ্যে একমাত্র ব্যতিক্রম বোধহয় স্বামী বিবেকানন্দ-র অনুজ বিপ্লবী নেতা ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত আর অধ্যাপক বিনয় সরকার। এঁরা দুজনেই প্রবাস-জীবনে মার্কসবাদের প্রতি আকৃষ্ট হন। কিন্তু ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ১৯২৪-২৫ সালে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে এ দেশে মার্কসীয় ধ্যান-ধারণা প্রচারে যে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন, অধ্যাপক বিনয় সরকার ঠিক সেই ভূমিকা গ্রহণ করেন নি বা করতে পারেন নি। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক সুশোভন সরকারের নামও স্মরণযোগ্য।

১৯৩১-৩২ সাল থেকে ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত মার্কসীয় দৃষ্টিকোণ থেকে শিল্প-সাহিত্য বিচারে প্রবৃত্ত হন। ১৯৩২-৩৩ সালের 'দেশ' এবং 'আনন্দবাজার পত্রিকা'-য় এর বেশ কিছু নিদর্শন ছড়িয়ে আছে। ১৯৪৫ সালে প্রকাশিত 'সাহিত্যে প্রগতি' নামক গ্রন্থে এগুলি সংকলিত হয়েছে। এইসব রচনায় ড. দত্তের মার্কসীয় দৃষ্টিতে সাহিত্য-বিচারের প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে লক্ষ্যণীয়।

অধ্যাপক বিনয় সরকারের যেসব রচনা আমি দেখেছি তার মধ্যে মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি বলতে যা বোঝায় তা হয়তো নেই, কিন্তু একথা স্বীকার্য, তাঁর রচনায় অনেক ক্ষেত্রে সামাজিক, রাজনৈতিক ও আর্থনীতিক অবস্থার

বিচার-বিশ্লেষণ আছে।

১৯৩১ সাল থেকেই সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত 'পরিচয়' পত্রিকা প্রকাশিত হতে থাকে। এই পত্রিকাকে কেন্দ্র করেই সর্বপ্রথম মার্কসীয় যুক্তি-বিজ্ঞানে বিশ্বাসী কয়েকজন বুদ্ধিজীবীর আবির্ভাব ঘটে। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত নিজে মার্কসবাদে বিশ্বাসী ছিলেন না; 'পরিচয়গোষ্ঠী'-র আদি যুগের লেখক, যাঁরা পরবর্তীকালে প্রগতিসাহিত্য ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য অথবা অনুরাগী সহযাত্রী রূপে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন, তাঁরাও ছিলেন নানা মানসিকতা ও ভাবগঙ্গায় সঞ্চরণশীল। তবু এঁদের অনেকের মুক্তবুদ্ধি চেতনার ফলে প্রথমাবধি 'পরিচয়'-এর পৃষ্ঠায় 'রুষ বিপ্লবের পটভূমি', 'রুষ বিপ্লবের ইতিবৃত্ত' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে। অধ্যাপক সুশোভন সরকার ছিলেন এই প্রবন্ধগুলির রচয়িতা।[১] অন্যদিকে ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের 'রাশিয়ার চিঠি'র সঙ্গে তুলনা করে ডিউই, ড্রাইজার ও বারব্যুসের সোভিয়েত-বিষয়ক তিনখানি বইয়ের সমালোচনা-প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছিলেন, "ভারতবর্ষে কমিউনিজম সম্ভব কিনা এ প্রশ্নের উত্তর জ্যোতিষী দিতে পারেন, অন্যে পারে না। তবে রাশিয়া সম্বন্ধে কোন ভাল বই পড়লে মনে হয় 'দিন আগত ঐ ভারত তবু কৈ' ?"

মোটকথা, তিরিশের দশকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সাহিত্য-সংস্কৃতির বিচার-বিশ্লেষণে 'পরিচয়গোষ্ঠী' যথেষ্ট সচেতনার স্বাক্ষর রেখেছিলেন। সুধীন্দ্রনাথের অধিনায়কত্বে গিরিজাপতি ভট্টাচার্য, নীরেন্দ্রনাথ রায়, হিরণকুমার সান্যাল, সুশোভন সরকার, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সাহেদ সুরাওয়ার্দি, বিষ্ণু দে প্রমুখ বিশিষ্ট কবি-সাহিত্যিক-সমালোচকেরা বহু উজ্জ্বল রচনায় সেদিন 'পরিচয়'কে মনোজ্ঞ আর মননশীল সাহিত্য পত্রিকায় পরিণত করতে কুণ্ঠিত ছিলেন না। কিন্তু এঁদের সকলের জীবন-দর্শন আর চিন্তা-ভাবনা এক ছিল না, বরং বহু বৈপরীত্য আর বৈচিত্র্যে, স্বচ্ছ-অস্বচ্ছ সমাজ-জিজ্ঞাসা এবং দ্বন্দ্ব-মিলনে তা ছিল মুখর। পুরনো 'পরিচয়'-এর পৃষ্ঠায় এর দৃষ্টান্ত মুদ্রিত আকারেই বিরাজমান। কিন্তু আমার জিজ্ঞাসা—এই উজ্জ্বল প্রতিভাধরদের মধ্যে কে বা কারা 'পরিচয়'-এর পৃষ্ঠায় শিল্প-সাহিত্য আলোচনায় মার্কসীয় যুক্তি-বিজ্ঞানকে প্রথম প্রয়োগ করেছিলেন।

---

১. পরিচয়, শ্রাবণ, কার্তিক, মাঘ ১৩৩৮ সালের সংখ্যা তিনটি দ্রষ্টব্য।

'পরিচয়গোষ্ঠী'র অন্যতম প্রবীণ সদস্য হিরণকুমার সান্যাল আমার এই জিজ্ঞাসার উত্তর দিয়েছেন 'পরিচয়-এর কুড়ি বছর' নামক তাঁর মূল্যবান স্মৃতিচারণায়। তিনি হুমায়ুন কবির-এর 'সাহিত্যে বাস্তবতাবোধ' [পরিচয়, কার্তিক, ১৩৩৯] এবং সমসাময়িককালে প্রকাশিত ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 'অথ কাব্য-জিজ্ঞাসা' নামক প্রবন্ধ দুটির তুলনামূলক আলোচনা করে মন্তব্য করেছেন, "কবির চেয়েছিলেন বাংলা সাহিত্যকে হিন্দুদের সাম্প্রদায়িক গণ্ডীর থেকে মুক্ত করতে, আর ধূর্জটিবাবু চাইলেন, তার অল্পদিন পরেই, বাংলা সাহিত্যে শ্রেণী-বিরোধ আমদানী করতে।"

এর পরেই হিরণকুমার সান্যাল 'পরিচয়'-এ মার্কসবাদী চেতনার প্রকাশ সম্পর্কে স্পষ্ট করে লিখেছেন, "মার্কসবাদের মূল সূত্রগুলির ব্যাখ্যায় এই প্রবন্ধটি (ধূর্জটিবাবুর 'অথ কাব্য-জিজ্ঞাসা'—ধ দা.) ঠাসা। তখনকার দিনে এ-সব কথা নতুন ছিল। ভাবগঙ্গার ঘোলাটে জলে ফুটল লালের আভা।

"এই সময়ে একটির পর একটি প্রবন্ধে সুশোভন সরকার বর্ণনা করেছিলেন তখনকার ইউরোপের রাজনৈতিক অবস্থা। অত্যন্ত সরল ভাষায় সমসাময়িক ইতিহাসের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের জন্যে এগুলি উল্লেখযোগ্য। অনেকেরই তখন চোখ ফুটেছিল ঐ লেখাগুলি পড়ে।"...

"এর কিছুকাল পরে সদ্য বিলেত-ফেরত হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এসে যোগ দিলেন পরিচয়-এর আড্ডায় ও লেখকগোষ্ঠীতে। পরিচয়-এর পাতায় লালের আভা আর একটু গাঢ় হল। কিন্তু এই রঙ প্রথম ফুটিয়েছিলেন ধূর্জটিবাবু তা ভুললে অন্যায় হবে।

"ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত বাদে এদেশে রীতিমত মার্কসবাদ অধ্যয়ন ও আলোচনা ধূর্জটিবাবুর আগে কে করেছিলেন জানি না।"

হিরণকুমার সান্যালের এই সাক্ষ্য অনুসারে আমরা জানতে পারছি, ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত-র পরে সাহিত্যের বিচার-বিশ্লেষণে ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ই মার্কসবাদের 'লাল রঙ' প্রয়োগ করতে অগ্রসর হয়েছিলেন। আমার অনুসন্ধানেও এই সাক্ষ্য সমর্থনযোগ্য, তবু একটা 'কিন্তু' থেকে যায়।

এই দুইজন প্রাজ্ঞ-পণ্ডিতের সাহিত্য-বিষয়ক রচনাবলী পাঠ করে আমার এই ধারণাই জন্মেছে যে, এঁরা মার্কসবাদী চিন্তাচর্চার ক্ষেত্রে অন্যতম পথিকৃৎ নিশ্চয়, কিন্তু এঁদের সাহিত্য-ভাবনায় ছিল মার্কসীয় নন্দনতত্ত্বের অস্পষ্ট চেতনা ;

সমাজতাত্ত্বিক (sociological) দৃষ্টিকোণ থেকেই তাঁরা কিছুটা আলোচনার সূত্রপাত করেছিলেন মাত্র। তাতে মার্কসবাদের 'লাল রঙ' তেমন পরিস্ফুট নয়, 'আভা'-র আভাসেই তা নিঃশেষিত। সুতরাং আমরা এখন এই সিদ্ধান্তেই পৌঁছাতে পারি যে, তিরিশের দশকের মধ্যভাগ পর্যন্ত বাঙলার শিল্প-সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য-বিচারের প্রশ্নে মার্কসীয় নন্দনতত্ত্ব ও যুক্তি-বিজ্ঞানের প্রয়োগ প্রায় বিরলদৃষ্ট বাস্তব সত্য।

এর পরবর্তী পর্যায়ে বাঙলা দেশের মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবীদের কর্মধারা অনুধাবন করতে হলে এই মধ্য-তিরিশের জাতীয়-আন্তর্জাতিক প্রধান কয়েকটি ঘটনার প্রতি আমাদের দৃষ্টিপাত করা বিশেষ প্রয়োজন।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এই মধ্য-তিরিশেই আমরা দেখলাম, জার্মানীতে ফ্যাশিস্ত হিটলার ক্ষমতা দখল করেছে (১৯৩৩)। ১৯৩৩ সালের ১০ মে বার্লিনের রাজপথে ফ্যাশিস্ত হিটলারের নাৎসী বাহিনী কর্তৃক বিশ্ববিখ্যাত প্রায় সকল লেখকের বই-এর বহ্ন্যুৎসব প্রমাণ করল তারা মানব-সংস্কৃতির কত বড় শত্রু। তারপর হিটলার আর মুসোলিনীর উদগ্র সাম্রাজ্যলালসা আর যুদ্ধ-প্রস্তুতির ফলে সমগ্র ইয়োরোপ যখন ভীত-সন্ত্রস্ত তখন ফ্যাশিজমের এই দানবিক ঔদ্ধত্য ও যুদ্ধপ্রস্তুতিকে ব্যর্থ করে দেবার জন্য রোলাঁ, গোর্কি ও অ্যারি বারব্যুস সারা বিশ্বের বিবেকবান প্রগতিশীল শিল্পী-সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীকে আহ্বান জানালেন প্রতিরোধ-আন্দোলনে শামিল হতে। ১৯৩৫ সালের ২১ জুন প্যারিসে অনুষ্ঠিত হল শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের ফ্যাশিবাদ-বিরোধী প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলন। এই সম্মেলনে আঁদ্রে জিদ্, ঈ. এম. ফর্স্টার, আঁদ্রে মালরো, অলডাস্ হাক্সলি, জুলিয়া বাদা, ওয়াল্ডো ফ্রাঙ্ক, মাইকেল গোল্ড, জন স্ট্র্যাচি প্রমুখ বরেণ্য সাহিত্যিক ও মনীষীরা যোগ দিলেন, আহ্বান জানালেন ফ্যাশিস্ত বর্বরতার বিরুদ্ধে সকল মানবপ্রেমিক শিল্পী-সাহিত্যিককে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে অগ্রসর হতে। এই বিশ্ব-সম্মেলনে ইয়োরোপ-প্রবাসী ভারতীয় লেখকদের পক্ষ থেকে খ্যাতনামা সাহিত্যিক মুলকরাজ আনন্দ প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন।

ফ্যাশিস্ত-বর্বরতা ও আসন্ন বিশ্বযুদ্ধের ভয়ঙ্কর পরিণামের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কমিউনিস্ট ইণ্টারন্যাশনাল ১৯৩৫ সালের সপ্তম অধিবেশনেই পেশ করে এক নতুন রণনীতি ও রণকৌশল। কমরেড ডিমিট্রভ-এর সেই বক্তব্য আজ

'যুক্তফ্রন্ট-থিসিস' নামে খ্যাত। এর কিছুকাল পরে, ১৯৩৬ সালের ১৮ জুলাই, জেনারেল ফ্রাঙ্কোর নেতৃত্বে স্পেনেও ঘটে ফ্যাশিস্ত অভ্যুত্থান।

আন্তর্জাতিক এই পটভূমিতে ভারতের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে নতুন আলোড়ন শুরু হয়ে গেল, এখানেও দেখা দিল বিরাট পরিবর্তনের সম্ভাবনা। মীরাট-ষড়যন্ত্র মামলায় বাঙলাদেশের পরিচিত কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তারের ফলে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছিল, ১৯৩১-৩২ সালের মধ্যে 'ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কলিকাতা কমিটি' গঠনের মাধ্যমে সেই শূন্যতা পূর্ণ করার জন্য তৎপর হলেন আবদুল হালিম, রণেন সেন, সোমনাথ লাহিড়ীর মতো তৎকালীন তরুণ নেতারা। ১৯৩৩ সালের আগস্ট মাসে মীরাট-ষড়যন্ত্র মামলার কয়েকজন বন্দী মুক্ত হয়ে এসে কমিউনিস্ট পার্টির একটি অস্থায়ী কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করলেন; এইভাবে বিভিন্ন গ্রুপে বিচ্ছিন্ন ঐক্যহীন কমিউনিস্ট পার্টিতে পুনর্বার সংহতি ফিরে এল। ১৯৩৫-এর ডিমিট্রভ-থিসিস এবং ১৯৩৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে প্রকাশিত দত্ত-ব্র্যাডলি থিসিসের ভিত্তিতে অতঃপর ভারতে 'সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী গণফ্রন্ট' রচনার কাজ শুরু হয়ে গেল।

জাতীয় কংগ্রেসও এই সময় জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে ফ্যাশিবাদ-বিরোধী এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। ১৯৩৬ সালের এপ্রিল মাসে লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে প্রদত্ত জওহরলাল নেহরুর ঐতিহাসিক ভাষণ এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। এই লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসের প্রাক্কালেই মুন্সী প্রেমচন্দ-র সভাপতিত্বে ১০ এপ্রিল গঠিত হল 'নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘ'।

প্রগতি লেখক সংঘ প্রতিষ্ঠার পিছনে ছিল মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবী ও কমিউনিস্ট পার্টির সক্রিয় উদ্যোগ। এই আয়োজন সেদিন সফল হয়েছিল সদ্য ইয়োরোপ-প্রত্যাগত সজ্জাদ জহীর, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবী ও লেখকদের সচেতন প্রচেষ্টায়। এঁদের উদার মানবিক দৃষ্টিই সেদিন এই সংগঠনের মধ্যে টেনে এনেছিল বহু অমার্কসবাদী অথচ গণতান্ত্রিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ খ্যাতিমান লেখক-শিল্পীকে।

প্রকৃতপক্ষে, ১৯৩২-৩৫ সালে একদা লণ্ডন-প্রবাসী মুলকরাজ আনন্দ, সজ্জাদ জহীর, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ভবানী ভটাচার্য, ইকবাল সিং, রাজা রাও, মুহম্মদ আশরফ প্রমুখ প্রতিভাবান ভারতীয় ছাত্র মার্কসবাদী ধ্যান-ধারণার সংস্পর্শে এসে প্রগতিসাহিত্য ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তোলার এক স্বপ্ন

দেখেছিলেন। তাঁরা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন রোলাঁ, গোর্কি, বারব্যুস, ফর্স্টার, জিদ, স্ট্র্যাচি প্রমুখ মনস্বীদের ফ্যাশিবাদ-বিরোধী সংগ্রামের আহ্বানে এবং হ্যারল্ড ল্যাস্কি, হার্বার্ট রীড, মণ্টেগু শ্ল্যাটার, পামি দত্ত প্রভৃতি বিদেশী বন্ধুদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ আলাপ-আলোচনায়। সেই স্বপ্নকেই তাঁরা স্বদেশের মাটিতে বাস্তবায়িত করলেন 'প্রগতি লেখক সংঘ' গঠনের মধ্য দিয়ে।

বাঙলা দেশেও প্রগতিশীল সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্র তখন অনেকটা প্রস্তুত। ফ্যাশিস্ত মুসোলিনী কর্তৃক আবিসিনিয়া আক্রান্ত হলে কলকাতায় কমিউনিস্ট আর কংগ্রেস-সোশ্যালিষ্ট পরিচালিত ট্রেড ইউনিয়ন-গুলির নেতৃত্বে শ্রমিকশ্রেণীর তীব্র ঘৃণা ও প্রতিবাদ ধ্বনিত হল। ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ এবং বুদ্ধিজীবীদের অনেকে মিলে ১৯৩৫-এর ২৭ অক্টোবর এক ঘরোয়া সভায় গঠন করলেন যুদ্ধ ও ফ্যাশিবিরোধী সংঘের সাংগঠনিক কমিটি। লক্ষ্ণৌ সম্মেলনে গঠিত প্রগতি লেখক সংঘের ঘোষণাপত্রকে ভিত্তি করে বাঙলা দেশের প্রগতিশীল লেখক ও বুদ্ধিজীবীরাও একটি সাংগঠনিক কমিটির মাধ্যমে ইতিমধ্যে কাজ শুরু করে দিয়েছিলেন। ১৯৩৬ সালের ১৮ জুন গোর্কির মৃত্যু-সংবাদ ঘোষিত হলে, নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘের সম্পাদক সজ্জাদ জহীর গোর্কি-দিবস পালনের আহ্বান জানাবার পূর্বে, বাঙলার প্রগতি লেখক সংঘের সাংগঠনিক কমিটি গোর্কির মৃত্যুতে ১৯৩৬ সালের ১১ জুলাই এলবার্ট হলের কমিটি রুমে একটি শোকসভার আয়োজন করেন। এই শোকসভার আহ্বাহক ছিলেন আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, কাজী নজরুল ইসলাম, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, ড. ধীরেন্দ্রনাথ সেন (সম্পাদক, এডভান্স) ও খগেন্দ্রনাথ সেন। এই সভায় সাহিত্যিক নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত-র সভাপতিত্ব করার কথা ছিল কিন্তু তিনি বিশেষ কারণে উপস্থিত হতে না পারায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন প্রখ্যাত সাংবাদিক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার। গোর্কির এই শোকসভা থেকেই আনুষ্ঠানিকভাবে ড. নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তকে সভাপতি ও অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামীকে সম্পাদক করে 'বঙ্গীয় প্রগতি লেখক সংঘ' গঠনের কথা ঘোষণা করা হয়।

'প্রগতি লেখক সংঘ' গঠনের এই বিস্তৃত পটভূমির কথা জানা না থাকলে শিল্প-সাহিত্য ও সংস্কৃতির অন্যান্য ক্ষেত্রে মার্কসীয় ধ্যান-ধারণা কিভাবে ক্রিয়াশীল

হয়েছিল তা অনুধাবন করা অনেক সময় কঠিন হয়ে পড়ে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রগতি লেখক সংঘ যেমন প্রথমাবধি রোলাঁ-বারবুাস পরিচালিত 'World congress for the defence of peace'-এর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছিল তেমনি জাতীয় ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, প্রেমচন্দ, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, প্রমথ চৌধুরী, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, নন্দলাল বসু, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, জওহরলাল নেহরু, সরোজিনী নাইডু প্রমুখ সর্বজনমান্য মনস্বীদের সক্রিয় সমর্থন ও সহযোগিতা বারংবার প্রার্থনা করেছে। এর শুভফল ফলতে তাই বিলম্ব ঘটেনি।

১৯৩৬ সালের ৩ সেপ্টেম্বর রোমাঁ রোলাঁর আহ্বানে ব্রাসেলস শহরে অনুষ্ঠিত বিশ্বশান্তি সম্মেলনে ভারতের প্রগতি লেখক সংঘের পক্ষ থেকে যে ঘোষণাপত্র প্রেরণ করা হয়, আমরা দেখলাম, তাতে স্বাক্ষর করেছেন উপর্যুক্ত ভারতীয় মনস্বীবৃন্দ। সেই ঘোষণাপত্রে বলা হলঃ "পৃথিবীর সম্মুখে আজ আতঙ্কের মতো আর এক বিশ্বযুদ্ধের বিভীষিকা সমুপস্থিত। ফ্যাশিস্ত স্বৈরতন্ত্র মাখনের বদলে কামান তৈরীতে মগ্ন। তারা সংস্কৃতির বিকাশের বদলে বিকশিত করছে সাম্রাজ্য জয়ের উন্মাদ লালসা, প্রকাশ করছে নিজের হিংস্র সামরিক স্বরূপকে। ইতালী যেভাবে আবিসিনিয়াকে পদানত করল, তা সভ্যতা ও মানবতার উপাসক সকল মানুষকেই স্তম্ভিত করেছে।"

আমরা আরও দেখলাম, 'তলস্তয়ের স্মৃতি' পাঠের পর যে-রবীন্দ্রনাথ গোর্কির নাম অপ্রসন্ন বিরূপতায় প্রথম উচ্চারণ করেছিলেন[১] সেই রবীন্দ্রনাথ ১৯৩৬ সালের ১৬ আগস্ট নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘের ডাকে বঙ্গীয় প্রগতি লেখক সংঘ কর্তৃক আশুতোষ কলেজ হলে অনুষ্ঠীত গোর্কি-স্মৃতি সভায় এক বাণী পাঠিয়ে গোর্কি সম্পর্কে তাঁর জীবনে দ্বিতীয় এবং সম্ভবত শেষ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করলেন: "ম্যাক্সিম গোর্কি স্বীয় মানবপ্রেম ও সাহিত্য-সৃষ্টি দ্বারা বিশ্ব-সাহিত্য ক্ষেত্রে অমর কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার স্মৃতির প্রতি আমি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিতেছি।"

এরি সমসাময়িককালে, স্পেনের বৈধ রিপাবলিকান সরকারের বিরুদ্ধে ফ্যাশিস্ত ফ্রাঙ্কোর সশস্ত্র আক্রমণ শুরু হলে, ১৯৩৬ সালের ২০শে নভেম্বর

১. পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারী ২৭ সেপ্টেম্বর, ১৯২৪; রবীন্দ্ররচনাবলী, শতবার্ষিকী সংস্করণ, দশম খণ্ড, পৃ ৫৯৪ দ্রষ্টব্য।

ফ্যাশিস্ত-বর্বরতাকে প্রতিহত করার জন্য মনীষী রোমাঁ রোলাঁ বিশ্ববাসীর কাছে এক আকুল আবেদন পেশ করেন। ১৯৩৭ সালের জানুয়ারি মাসে 'মডার্ন রিভিয়ু'তে প্রকাশিত রোলাঁর সেই আবেদন ভারতের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মহলে অভূতপূর্ব সাড়া জাগায়। ঐ বছর মার্চ মাসেই গড়ে ওঠে 'লীগ এগেনস্ট ফ্যাশিজম এণ্ড ওয়্যার'-এর সর্বভারতীয় কমিটি।

"রবীন্দ্রনাথ তখন কলকাতায়। বঙ্গীয় প্রগতি লেখক সংঘের সম্পাদক অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখেরা এই কমিটির প্রেসিডেণ্ট পদ গ্রহণের অনুরোধ নিয়ে কবির কাছে উপস্থিত হলে তিনি সেই প্রস্তাবে সানন্দে সম্মতি প্রদান করেন। স্পেনে অনুষ্ঠিত অমানুষিক ফ্যাশিস্ত-বর্বরতায় রবীন্দ্রনাথের মন তখন ক্ষুব্ধ-বিচলিত। তিনি ফ্যাশিস্ত-বর্বরতার তীব্র নিন্দা ও ভৎ‌র্সনা করে স্পেনের গণতান্ত্রিক সরকারের সাহায্যের জন্য এই সময় তাঁর স্বদেশবাসীর উদ্দেশে এক আহ্বান জানান। সর্বভারতীয় এই কমিটিতে রবীন্দ্রনাথ হলেন সভাপতি, কার্যকরী সভাপতি (চেয়ারম্যান) ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হলেন যথাক্রমে অধ্যাপক কে. টি. শাহ্ ও সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাছাড়া কমিটির সদস্য হিসেবে রইলেন : আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, সরোজিনী নাইডু, 'বম্বে ক্রনিকেল'-এর সম্পাদক এস. ব্রেলভি, মাদ্রাজের 'ডেলি এক্সপ্রেস'-এর সম্পাদক কে. শান্তনম, আর. এস. রুইকর, তুষারকান্তি ঘোষ, ড. ধীরেন সেন, অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, সজ্জাদ জহীর, ইন্দুলাল যাজ্ঞিক, স্বামী সহজানন্দ, এন. জি. রঙ্গ, এস. এ. ডাঙ্গে, পি. ওয়াই. দেশপাণ্ডে, ডাঃ সুমন্ত মেটা, মিঞা ইফতিকারউদ্দিন, কমলা দেবী, জয়প্রকাশ নারায়ণ, দেবেন সেন, নবকৃষ্ণ চৌধুরী, ডাঃ সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ।

তিরিশের দশকের শেষ ভাগে এমনি করেই সেতুবন্ধ রচিত হল জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ভাবজগতের। রাজনীতি ও সংস্কৃতি যেন হাত ধরাধরি করে যমজ সন্তানের মতো ভারতের মাটিতে মাথা উঁচু করে হাঁটতে শুরু করল। আর ঠিক এই সন্ধিক্ষণে নিখিল ভারত ছাত্রফেডারেশন স্বাধীনতা, শান্তি ও প্রগতির বাণী মুখে নিয়ে শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবীর পাশে নিজের স্থান বেছে নিল। এছাড়া ১৯৩৫ সালের শাসন-সংস্কার আইন অনুসারে ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে ৭টি প্রদেশে বিজয়ী জাতীয় কংগ্রেস প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনভার

গ্রহণ করেই তার মন্ত্রীসভাগুলিকে ভারতের বিভিন্ন কারাগারে ও বন্দীশালায় আটক রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তিদানের নির্দেশ দিল। ১৯৩৭-৩৮ সালের মধ্যে এইভাবেই বাঙলার বহু বিপ্লববাদী বন্দী, কারাজীবনে যাঁরা অনেক তর্ক-বিতর্ক ও আত্মানুসন্ধানের মধ্য দিয়ে সন্ত্রাসবাদের পথ পরিত্যাগ করে মার্কসবাদে দীক্ষা নিয়েছিলেন, মুক্তজীবনে ফিরে এসে শ্রমিক-কৃষক আর সাংস্কৃতিক আন্দোলনের শরিক হলেন।

এতদিন যে মার্কসীয় ধ্যান-ধারণা মূলত মুষ্টিমেয় মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল এবার তা শ্রেণীভিত্তিক বিভিন্ন গণ-সংগঠনে সম্প্রসারিত হল; বাঙলার সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও প্রগতি লেখক সংঘ সেই ধারাস্রোত থেকে রস আহরণ করে মার্কসীয় চিন্তাচর্চার শিশু চারিটির পরিপুষ্টি সাধনে গ্রহণ করল ধাত্রীর ভূমিকা।

এখানে আনন্দবাজার পত্রিকাকে কেন্দ্র করে সেই যুগে যেসব লেখক-সাংবাদিক কর্মরত ছিলেন তাঁদের দান ও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা কর্তব্য। আনন্দ-বাজারের তৎকালীন স্বনামধন্য সম্পাদক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, কবি অরুণ মিত্র, সাহিত্যিক স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য, বিনয় ঘোষ, মন্মথ সান্যাল, সুবোধ ঘোষ, বিজন ভট্টাচার্য, পুলকেশ দে সরকার প্রমুখ তাঁদের রচনায় ও সংবাদ পরিবেশনে এই সময়কার প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে যথেষ্ট সহায়তা দান করে-ছিলেন। এঁদের দ্বারা সংগঠিত 'অনামীচক্র' নামক সাহিত্য-আলোচনার আসরটি ছিল প্রগতিশীল তথা মার্কসীয় চিন্তাচর্চার একটি প্রধান কেন্দ্র। 'পরিচয়-গোষ্ঠী'র লেখকেরাও প্রগতি-সংস্কৃতি আন্দোলন থেকে দূরে সরে থাকেন নি। এঁদের মধ্যে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, নীরেন্দ্রনাথ রায়, হিরণকুমার সান্যাল প্রমুখ আরও কয়েকজন প্রগতি লেখক সংঘের আন্দোলনে সক্রিয় সহযোগিতাই করেছিলেন।

এইসব শিল্পী-সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীর মানস-সংস্কৃতির ফসল ধারণ করে আছে প্রগতি লেখক সংঘ কর্তৃক প্রকাশিত 'Towards Progressive Literature' এবং সংঘের পক্ষে সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত 'প্রগতি' নামক সংকলন দুটি। এই সংকলন দুটিতে স্থান পেয়েছিল ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, সজ্জাদ জহীর, মাহমুদ জাফর, সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়, সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, নীরেন্দ্রনাথ রায়, বিষ্ণু দে, অরুণ মিত্র, সজনীকান্ত দাস, সমর সেন, বিভূতি-

ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রবোধকুমার সান্যাল, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিধায়ক ভট্টাচার্য প্রমুখ আরও অনেকের রচনা।

'Towards Progressive Literature' এখন দুষ্প্রাপ্য। আমি বহু চেষ্টা করেও এটি আজ পর্যন্ত প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পাই নি। কিন্তু ১৯৩৭ সালে প্রকাশিত 'প্রগতি' সংকলন গ্রন্থখানি পাঠের সৌভাগ্য আমার একাধিকবার ঘটেছে। এই প্রবন্ধ রচনার সময়, এই মুহূর্তে, এটি আমার পাশেই রয়েছে।

'প্রগতি' সংকলনে দেখতে পাচ্ছি, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত-র 'ভূমিকা' সহ সাহিত্য-বিষয়ক মৌলিক রচনা পরিবেশিত হয়েছে পাঁচটি। নরেশ সেনগুপ্ত ব্যতীত অন্য চারটি প্রবন্ধের লেখক ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় ও সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী।

ধূর্জটিবাবুর 'প্রগতি' প্রবন্ধটি দিয়েই সংকলনের শুরু। সাহিত্যের ক্ষেত্রে 'প্রগতি' বলতে কি বোঝায় প্রবন্ধটিতে ছিল তারই আলোচনা। প্রগতিশীল সাহিত্যিক কি ভাবে তথ্য (facts), ঘটনা (events) এবং মূল্য (values) যাচাই করে সাহিত্যে তা প্রতিফলিত করবেন, বিজ্ঞানের কার্যকারণ সম্পর্কের সঙ্গে তুলনা করে লেখক তাঁর ধ্যান-ধারণা মতো সেটাই এখানে ব্যাখ্যা করতে প্রয়াসী।

১৯৩৭ সালের এই বক্তব্যের মধ্যে হয়তো অনেকে নতুন ইঙ্গিতের সন্ধান করবেন; কিন্তু কালের দূরত্বে দাঁড়িয়ে আমরা বিনীতভাবেই বলতে পারি, মার্কসীয় পদ্ধতিতে শিল্প-সাহিত্য বিচারে এ ছিল এক অস্ফুট উচ্চারণ মাত্র। বরং তুলনায় ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত-র 'সাহিত্যে প্রগতি' অনেক স্পষ্ট। তিনি যখন লেখেন, "একটি লোকের চিন্তা, ভাবধারা ও পারিপার্শ্বিক জগতের ঘটনাসমূহ (phenomen) পর্য্যবেক্ষণ করে তাহা যখন ভাষায় লিপিবদ্ধ হয়, তখন তাহাকে সাহিত্য বলা হয়। সাহিত্যে সম্পূর্ণ স্বকপোলকল্পিত কিছু নাই, মানবের চিন্তার ধারা তাহার বহির্জগতের অবস্থাসাপেক্ষ। ভাবের পশ্চাতে থাকে অর্থনৈতিক উপাদান। মানবসমষ্টির আর্থিক পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সামাজিক আবর্ত্তন ও বিবর্ত্তন ঘটে, সেই সঙ্গে তাহার ভাবরাজ্যেও পরিবর্ত্তন সংসাধিত হয়, তাহার নজির হয় ইতিহাসে, না হয় সাহিত্যে দেখিতে পাই[১]"—তখন বুঝতে পারি এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে আমরা অনেক বেশি পরিমাণে মার্কসীয় ধ্যান-ধারণার সমীপবর্তী।

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়-এর 'প্রগতি-সাহিত্যের রূপ' প্রবন্ধটির মধ্যে নিহিত আছে "রম‍্যাঁ রলাঁ, ম্যাক্সিম গোর্কি, র‍্যালফ ফক্স প্রমুখ মনীষীদের লেখা প'ড়ে প্রগতি-সাহিত্য সম্পর্কে"[১] তাঁর ধারণার একটি সুন্দর ভাবোচ্ছ্বাস। তাঁর মতে, "কি হবে আর্টের কল্পলোকে বিচরণ করে, যদি কোটী কোটী মানুষের জীবনের উপরে দুঃসহ দুঃখ জগদ্দল পাথরের মতই চেপে থাকে? সে আর্টের মূল্য কি যা পুরাতন বুর্জোয়া-সমাজকে চূর্ণ ক'রতে করে না সাহায্য? সে সাহিত্যের দাম কি যা শ্রেণীহীন সমাজের সৃষ্টির পথে হয় না সহায়?"[২]

এই উচ্ছ্বাসের পাশাপাশি সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামীর 'সাহিত্যে বাস্তব ও কল্পনা' নামক প্রবন্ধটি উল্লেখ্য। সাহিত্যে বাস্তব ও কল্পনার সীমারেখা নির্ধারণ করতে বসে তিনি সুন্দর ভাবে দেখান কোন্ বন্ধনহীন কল্পনা সুস্থতার সীমা অতিক্রম করে বিকারগ্রস্ত সাহিত্যের জন্ম দেয় আর কোন্ কল্পনা সাহিত্যের বাস্তবকে সুষমামণ্ডিত করে। তাঁর বক্তব্য, "...সমাজের পরিবর্ত্তনশীল ঐতিহাসিক জীবনের ধারা অতীন্দ্রিয় অদৃষ্ট শক্তির লীলাক্ষেত্র নয়; ধনোৎপাদন ও ধনবণ্টনের পদ্ধতি ঐতিহাসিক ধারার নিয়ামকরূপে সর্ব্বদাই বর্ত্তমান থাকে। সুতরাং সমাজের মানুষের সুখ-দুঃখ ও আশা-আকাঙ্খা যে বিশিষ্ট ঐতিহাসিক পরিস্থিতির রূপায়িত সমস্যা, তার সমাধানের জন্য কল্পনার অঙ্গুলিনির্দ্দেশ ঐতিহাসিক অগ্রগতির পূর্ব্বসঙ্কেতরূপে গ্রহণ করা যায়। কারণ বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির সঙ্গে সাহিত্যিক কল্পনার শুভদৃষ্টি ঐতিহাসিক ভবিষ্যতের গতিপথের দিকে বদ্ধলক্ষ্য না হয়ে পারে না। ঐতিহাসিক পরিবর্ত্তনের পরিণত ফল বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি ও সাহিত্যিক কল্পনা উভয়েরই কাম্য।"[৩]

'প্রগতি' সংকলনের অন্য গদ্য রচনাগুলি আঁদ্রে জিদ, ঈ. এম. ফর্স্টার, কার্ল মার্কস প্রমুখের প্রবন্ধের অনুবাদ। এগুলি অনুবাদ করেছিলেন যথাক্রমে অরুণ মিত্র, আবু সয়ীদ আইয়ুব ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। তিনটি রচনাই মূল্যবান ও প্রাসঙ্গিক। প্রথম দুটিতে আছে ফ্যাশিবাদী আক্রমণের মুখে ইয়োরোপীয় শিল্প-সাহিত্য-সমাজ ও রাজনৈতিক জগতের চমৎকার বিচার-বিশ্লেষণ আর দ্বিতীয়টি হলো 'ভারতে ইংরেজ শাসন' সম্পর্কে কার্ল মার্কস-এর সেই যুগান্তকারী রচনা।

মৌলিক এবং অনূদিত গদ্য-রচনাগুলির সাহায্যে সংকলন-কর্তাদের উদ্দেশ্য ও

---

১. 'প্রগতি', পৃ. ৭২; ২. ঐ, পৃ. ৭৫; ৩. ঐ, পৃ. ৮২ দ্রষ্টব্য।

আদর্শ কিছুটা অনুধাবন করা যায়। কিন্তু 'প্রগতি' সংকলনে প্রকাশিত স্বরচিত কিংবা অনূদিত কবিতার বিচিত্র সহ-অবস্থান পাঠক মনে বিভ্রম সৃষ্টি না করে পারে না। বিষ্ণু দে অনূদিত টি. এস. এলিয়ট-এর 'ফাঁপা মানুষ' আর সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর অনূদিত আলেকজান্দার ব্লক-এর বিপ্লবী কবিতা 'বারো' কিংবা নীরেন্দ্রনাথ রায় অনূদিত উজবেকিস্তানের কবি গোলাম গফুর-এর 'পথ'-এর মিল কোথায় তা বুঝে ওঠা কঠিন। স্বরচিত কবিতাগুলি আরও বিচিত্র। এখানে বিভা বসু, বুদ্ধদেব বসু, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, সজনীকান্ত দাস, অরুণ মিত্র, সমর সেন প্রমুখ কবিদের কবিতার গুণাগুণ তুচ্ছ করে দুই মলাটের মধ্যে সকলকে আবদ্ধ করাই যেন সম্পাদকের একমাত্র কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বিভূতিভূষণ-প্রবোধকুমার-মানিক-বিধায়ক এবং প্রেমেন্দ্র মিত্র-র গল্প সম্পর্কেও ঐ একই কথা প্রযোজ্য।

'প্রগতি' সম্পর্কে এত বিস্তৃত আলোচনার কারণ—এই সংকলন গ্রন্থই বাঙলা দেশে প্রথম সংঘবদ্ধ প্রগতি-সংস্কৃতি আন্দোলনের দান। এক্ষেত্রেও আমরা লক্ষ্য করলাম, শিল্প-সাহিত্য আর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য-বিচারের প্রশ্নে তখনও আমাদের হাঁটি হাঁটি পা পা অবস্থা। মোটের উপর যাঁরা বিশ্বাস করেন—'সামাজিক চৈতন্য সাহিত্য সৃষ্টির পরিপন্থী' নয় এবং রাষ্ট্রনীতি বিষয়ে পরস্পর মতভেদ থাকা সত্ত্বেও যাঁরা 'ফ্যাশিজমের বিরোধী', প্রগতি লেখক সংঘে এবং 'প্রগতি'তে তাঁদের সকলেরই সাদর আমন্ত্রণ![১]

নতুন চিন্তা-ভাবনা সব দেশে সর্বকালে তরুণ মনকে সকলের আগে আকর্ষণ করে। আবার প্রচলিত ধ্যান-ধারণায় লালিত-পালিত মানুষ তার স্থিতিবাদী অবস্থান থেকেও সহজে নড়তে চায় না। সুতরাং প্রগতির অভিযান, তা যতই হাঁটি হাঁটি পা পা হোক না কেন, স্থিতিবাদী মানুষের মনে আতঙ্ক সঞ্চার করে। 'প্রগতি' সংকলন-গ্রন্থও মোহিতলাল মজুমদার-এর মতো প্রাজ্ঞ অথচ রক্ষণশীল মানুষকে ক্ষিপ্ত করে তোলে। তিনি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনারত। প্রগতি লেখক সংঘের আন্দোলন ঢাকার তরুণ মনে সাড়া তুলেছিল। তৎকালীন সাংস্কৃতিক কর্মী রণেশ দাশগুপ্ত, নৃপেন্দ্র গোস্বামী, সত্যেন সেন, অচ্যুত গোস্বামী, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত এবং প্রায়-কিশোর সোমেন চন্দ-র প্রচেষ্টায় ঢাকাতেও স্থাপিত হয়েছিল প্রগতি লেখক সংঘের শাখা। কলকাতার পরে ঢাকার এই

১. 'প্রগতি'-র 'মুখবন্ধ' দ্রষ্টব্য।

শাখা কেন্দ্রই ছিল সবচেয়ে সক্রিয়। সম্ভবত মোহিতলাল মজুমদার এঁদেরও কর্মকাণ্ড লক্ষ্য করেছিলেন। সুতরাং তাঁর মতো স্থিতিবাদী পণ্ডিত চুপ করে থাকতে পারলেন না। ১৯২৩-এর শশাঙ্কমোহন সেন-এর প্রতিক্রিয়ার প্রতিধ্বনি পুনর্বার শোনা গেল মোহিতলাল মজুমদার-এর কণ্ঠে। তিনি 'বাংলার প্রগতিবাদী সাহিত্যিক' শিরোনামে 'প্রগতি'-র বিরুদ্ধে প্রচণ্ড রোষ এবং তিক্ততার সঙ্গে লিখলেন, "সকলকে বাতিল করিয়া দিয়া 'প্রগতি' নামক একটি অনার্য শব্দকে বিশাল বংশদণ্ডে বাঁধিয়া, ভদ্রবেশী বর্বরগণের অগ্রণী হইয়া, আধুনিক নগর-চত্বরের পণ্যবীথি প্রকম্পিত করিতে হইবে।...আজ যুগধর্মের সুযোগে—মানব-সভ্যতার এই অতিশয় সংকটময় দুর্দিনে—ইহারা, এই রস-অধিকার-বঞ্চিত হরিজনেরা, জাতে উঠিবার জন্য বিষম কোলাহল শুরু করিয়াছে।"২

প্রগতি-সংস্কৃতি আন্দোলনের বিরুদ্ধে মোহিতলাল মজুমদারই শুধু আক্রমণ করেন নি। 'প্রগতি লেখক সংঘ' গঠনের প্রারম্ভকাল থেকেই এর বিরুদ্ধে কুৎসার অভিযান শুরু হয়ে যায়। ১৯৩৬ সালের ২৮ জুন বিভিন্ন সংবাদপত্রে 'প্রগতি লেখক সংঘ'-র ইস্তাহারটি প্রকাশিত হওয়ার পর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থবাহক, 'স্টেটসম্যান' পত্রিকার সিমলাস্থিত বিশেষ প্রতিনিধি, তাঁর দু'কলমব্যাপী 'Communist Propaganda : Moscow Changes Tactics' নামক প্রতিবেদনে সদ্য-গঠিত 'প্রগতি লেখক সংঘ'-র বিরুদ্ধে বিষোদ্গার শুরু করেন। ১৯৩৬ সালের ৭ জুলাই এই প্রতিবেদনটি 'স্টেটসম্যান' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই কুৎসার জবাব দিয়েছিলেন সেদিন 'আনন্দবাজার পত্রিকা'-র স্বনামধন্য সম্পাদক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে (৮ জুলাই, ১৯৩৬), এ কথাটা স্মরণ না-করা আজ অন্যায় হবে।

এই সময় বাঙলা দেশের রাজনৈতিক জগতে বামপন্থী চেতনার প্রকাশ প্রবল হতে থাকে। কমিউনিস্ট পার্টি তার ন্যাশনাল ফ্রন্টের তত্ত্বানুযায়ী, বেআইনী থাকা সত্ত্বেও, কংগ্রেস-সোশ্যালিস্ট পার্টি ও জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে কাজ শুরু করে দেয়। শ্রমিক-কৃষক ও ছাত্র ফ্রন্টকেও সংগঠিত করার জোর প্রয়াস আরম্ভ হয়। ১৯৩৮ সালে হরিপুরা অধিবেশনে মহাত্মা গান্ধীর বিরোধিতা সত্ত্বেও সুভাষচন্দ্র বসু জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি পদে নির্বাচিত হলে বাঙলাদেশের কংগ্রেসী মহলে কমিউনিস্টরা আরও তৎপর হয়ে ওঠেন। কমিউনিস্ট নেতা

২. 'সাহিত্য-বিতান,' পৃ. ২৯১, ২৯৩ দ্রষ্টব্য।

বঙ্কিম মুখার্জি, পাঁচুগোপাল ভাদুড়ী ও সোমনাথ লাহিড়ী—সুভাষচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ সহযোগী রূপে কংগ্রেসকে বামমুখী করার কাজে সে-সময় যথেষ্ট বিচক্ষণতার পরিচয় দেন। আর, বিশ্বনাথ মুখার্জির নেতৃত্বে ছাত্র ফেডারেশন হয়ে ওঠে বেআইনী কমিউনিস্ট পার্টির কর্মসূচী প্রচারের প্রধান প্রবক্তা।

এরি সামগ্রিক ফলশ্রুতিস্বরূপ, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র কিংবা সদ্য শিক্ষা-জীবন সমাপনান্ত একদল প্রতিভাবান তরুণ লেখক ও সাংস্কৃতিক কর্মী যুক্ত হন প্রগতি-সংস্কৃতি আন্দোলনের সঙ্গে। ১৯৩৮-৩৯ সালের মধ্যে এই ভাবেই কমিউনিস্ট পার্টির সাংস্কৃতিক আন্দোলনে যুক্ত হয়েছিলেন সরোজ দত্ত, অনিল কাঞ্জিলাল, সুবোধ চৌধুরী, বিনয় ঘোষ, সমর সেন প্রমুখ আরও অনেকে। ১৯৩৮ সালে কারামুক্তির পর এই আন্দোলনে গোপাল হালদার-এর মতো পরিশীলিত সংস্কৃতিবিদ ও সৃজনশীল সাহিত্যিক আর সুধী প্রধান-এর মতো সংগঠককেও পাওয়া গেল। কমিউনিস্ট পার্টির সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংগঠক রূপে আজও যাঁকে চিহ্নিত করা যায়, সেই সর্বজনপ্রিয় চিন্মোহন সেহানবীশও ১৯৩৭-৩৮ সালের মধ্যে প্রগতি-সংস্কৃতির স্রোতধারায় নিজেকে মিশিয়ে দিলেন।

এই পরিবেশে, ১৯৩৮ সালের ডিসেম্বর মাসে, কলকাতার আশুতোষ কলেজ হলে অনুষ্ঠিত হল নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘের দ্বিতীয় সম্মেলন। সম্মেলনের মূল সংগঠক ছিলেন অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী এবং তাঁর সহযাত্রীরা। সারা ভারত থেকে এই সম্মেলনে যোগ দিতে এসেছিলেন মার্কসবাদী -অমার্কসবাদী অনেক খ্যাতিমান সাহিত্যিক। সম্মেলনের পরিচালনার জন্য যে সভাপতিমণ্ডলী গঠিত হয় তার মধ্যে ছিলেন মুলকরাজ আনন্দ, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু ও পণ্ডিত সুদর্শন। অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষ থেকে সমবেত প্রতিনিধি ও দর্শকদের সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে ভাষণ পাঠ করেন ড নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত। আর এই সম্মেলনের বিভিন্ন আলোচনায় যোগ দেন এবং রচনাপাঠে অংশ গ্রহণ করেন সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, হিরণকুমার সান্যাল, প্রেমেন্দ্র মিত্র, প্রবোধকুমার সান্যাল, সজ্জাদ জহীর, বলরাজ সাহানী, ড. আব্দুল আলিম, আহমদ আলি, মাজাজ, আলি সর্দার জাফরী প্রমুখ আরও অনেক সাহিত্যিক ও সুধীবৃন্দ। সম্মেলনের শুরুতে পঠিত হয় রবীন্দ্রনাথের একটি বাণী এবং আশ্চর্যের ব্যাপার, সেই বাণীতে রবীন্দ্রনাথ শিল্প-সাহিত্য বিষয়ে

কিছুই না বলে তুলে ধরেন এশিয়ার নবজাগরণ, বিশেষ করে মুস্তাফা কামালের নেতৃত্বে নতুন তুর্কির অগ্রগতির কথা।

প্রগতি লেখক সংঘের কলকাতা অধিবেশন বাঙলার প্রগতি-সংস্কৃতি আন্দোলনে যেমন নতুন উদ্দীপনা সঞ্চার করে তেমনি আলোচিত ও পঠিত বিষয়গুলিও ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির মতাদর্শগত বিতর্ককে উস্কে দেয়। সভাপতিমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য বুদ্ধদেব বসু-র পঠিত ভাষণটি ছিল এমনিই একটি বিতর্কিত বিষয়।

প্রগতি লেখক সংঘের কলকাতা অধিবেশনের অব্যবহিত পরে, ১৯৩৯ সালের জানুয়ারিতে প্রকাশিত হয় 'অগ্রণী' মাসিক পত্রিকা। বাংলা ভাষায় কমিউনিস্ট পার্টির নির্দেশে পরিচালিত প্রথম সাংস্কৃতিক পত্রিকা হচ্ছে এই 'অগ্রণী'। প্রফুল্ল রায় ছিলেন এর সম্পাদক। সম্পাদকমণ্ডলীতে ছিলেন দেবকুমার গুপ্ত, অদ্বৈত দত্ত, বীরেন্দ্র মজুমদার ও চিন্মোহন সেহানবীশ। কিছু দিনের মধ্যেই 'অগ্রণী'-সম্পাদনা ও পরিচালনার কাজে যুক্ত হন সরোজ দত্ত, সুনীল চট্টোপাধ্যায়, শ্যামনাথ সিংহ, সুধী প্রধান এবং অনিল কাঞ্জিলাল। এঁরা 'অগ্রণী'কে 'বামপন্থী মাসিক পত্রিকা' রূপে প্রকাশ্যেই ঘোষণা করেছিলেন।

'অগ্রণী'-র প্রথম বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যায়, ১৯৩৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে, প্রগতি লেখক সংঘের অধিবেশনে প্রদত্ত বুদ্ধদেব বসুর ভাষণটিকে আক্রমণ করেই সম্ভবত শুরু হয় বাঙলার মার্কসবাদীদের শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রথম মতাদর্শগত সংগ্রাম। সরোজকুমার দত্ত 'ছিন্ন কর ছদ্মবেশ' নামক নিবন্ধে বুদ্ধদেব বসু মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী সম্পর্কে চরম হতাশা প্রকাশ করেও মধ্যবিত্তের উপর শেষ পর্যন্ত আস্থা স্থাপন করে যে বক্তব্য উপস্থিত করেন, বক্তব্যের সেই অসঙ্গতিকেই মূলত ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে বিদ্ধ করেছিলেন। নিবন্ধটি তত্ত্বগত দিক থেকে তেমন কিছু নয়, কিন্তু polemical রচনা হিসেবে উল্লেখযোগ্য।

পরবর্তীকালে, 'অগ্রণী'-র দ্বিতীয় বর্ষের চতুর্থ সংখ্যায়, ১৯৪০ সালের এপ্রিল মাসে সরোজ দত্ত 'অতি আধুনিক বাংলা কবিতা' নামক প্রবন্ধে সমর সেন-এর 'In defence of the decadents' নামক প্রবন্ধের বিরুদ্ধে আরও বলিষ্ঠভাবে বক্তব্য উপস্থিত করেন। সমর সেন-এর ঐ প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় কেন্দ্রীয় প্রগতি লেখক সংঘের মুখপত্র 'New Indian Literature'-এ। সমরবাবুর মূল বক্তব্য ছিল: ১. ধনতন্ত্রী সমাজে যে প্রগতি স্তব্ধ হয়েছে বিপ্লবোত্তর সাম্যবাদী সমাজে সেই প্রগতি অব্যাহত গতিতে প্রবাহিত হবে। ২. ধ্বংসোন্মুখ ধনতন্ত্রী

সমাজ 'decadent', অতএব এই সমাজে সত্য-শিব ও সুন্দরের সাধনা অসম্ভব, ফলত decadent সাহিত্যই একমাত্র আন্তরিক সাহিত্য এবং এই আন্তরিকতার জন্য decadent হওয়া সত্বেও তার মধ্যে বৈপ্লবিক শক্তিমত্তা বর্তমান। এর নজির টি. এস. এলিয়ট-এর কাব্য। ৩. ধনতন্ত্রী সভ্যতার বর্তমান অবস্থার অন্তঃসারশূন্যতার যে-কোনো অভিব্যক্তিই বৈপ্লবিক শক্তি। ৪. কিষাণ-মজুর, লালঝাণ্ডা-ব্যারিকেড লড়াই নিয়ে উত্তেজক সাহিত্য সৃষ্টির জন্য যে নির্দেশ ও ফরমাইস দেওয়া হচ্ছে তার সম্পর্কে সমরবাবুদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা না থাকায় রোমান্টিক হওয়ার ভয়ে সেই নির্দেশ এবং ফরমাইস তাঁরা পালন করতে অক্ষম।

সরোজ দত্ত উপর্যুক্ত বক্তব্যকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেন এবং মার্কসীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার-বিশ্লেষণান্তে সমরবাবুর মতকে—অবক্ষয়ী, আঙ্গিকসর্বস্ব, প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া মতবাদ বলে চিহ্নিত করতে প্রয়াসী হন। এ ছাড়া তিনি পাঠকবর্গকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন, "ইণ্টেলেকটুয়ালী কুসংসর্গ হইতে সাম্যবাদের সাবধান হইবার দিন আসিয়াছে।"

'অগ্রণী'-র পঞ্চম সংখ্যায় (মে, ১৯৪০) সমর সেন এর জবাব দেন। তাঁর বক্তব্য: সরোজবাবুর দৃষ্টি যান্ত্রিকতাদোষদুষ্ট এবং তাঁর আক্রমণ-পদ্ধতি প্রায় 'সন্ত্রাসবাদী'। ঐ সংখ্যাতেই সরোজ দত্ত আবার সমরবাবুর জবাবের প্রত্যুত্তর দেন।

আমার ধারণায়, ভুল হোক শুদ্ধ হোক, সরোজ দত্ত বনাম সমর সেন-এর বিতর্কটিই প্রথম সচেতন আর বলিষ্ঠ মার্কসীয় সাহিত্য-বিতর্ক।

১৯৩৯ সালের জানুয়ারী থেকে ১৯৪০-এর জুন—এই ক্ষণস্থায়ী দেড় বছরের জীবনে 'অগ্রণী' প্রগতি-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মার্কসবাদী চিন্তা-ভাবনা প্রয়াসে যে নিষ্ঠা ও কর্মতৎপরতার পরিচয় দিয়েছে তা তুলনাহীন। বলা যায়, 'পরিচয়' পত্রিকায় যার সূচনা, সামাজিক, রাজনৈতিক আর্থনীতিক এবং সাংস্কৃতিক সকল ক্ষেত্রেই 'অগ্রণী' সেই মার্কসবাদী চিন্তা-চৈতন্যের প্রসারে গ্রহণ করেছিল এক সর্বাত্মক ভূমিকা। 'অগ্রণী' স্পষ্ট অনুধাবন করেছিল, "সাম্রাজ্যতন্ত্র-বিরোধের সঙ্গে ফ্যাশিস্ট বিরোধ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।"

মানবমুক্তির সংগ্রামে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ভাবজগতে প্রবাহিত তৎকালীন প্রগতিমুখী সমস্ত ধারার প্রতিফলন ঘটেছিল 'অগ্রণী'র প্রতিটি সংখ্যার প্রত্যেকটি রচনায়। সোমনাথ লাহিড়ী, আব্দুল হালিম, রণেন সেন, ভবানী

সেন, সরোজ মুখোপাধ্যায়, সুধাংশু দাশগুপ্ত, বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, ড. জি. অধিকারী, অজয়কুমার ঘোষ, পি. সি. যোশী, অর্জুন অরোরা, ডি. ডি. কোশাম্বী, চিন্মোহন সেহানবীশ, করুণাকর গুপ্ত, নৃপেন্দ্র চক্রবর্তী, সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, মনোরঞ্জন রায়, সুধী প্রধান, সরোজ দত্ত, সমর সেন, বিনয় ঘোষ, সুভাষ মুখোপাধ্যায় প্রমুখের রাজনীতি-সমাজনীতি-অর্থনীতি ও সাহিত্য-বিষয়ক প্রবন্ধাবলী, ইয়োরোপের 'New Writing'-এর আন্দোলনসহ র‍্যালফ ফক্স, কডওয়েল, সিলোন, এডওয়ার্ড আপওয়ার্ড প্রমুখের রচনার অনুবাদ কিংবা পরিচিতিমূলক রচনাবলী আমার উপর্যুক্ত কথার সত্যতা প্রমাণ করে। দেড় বছরে এঁদের প্রায় প্রত্যেকের একাধিক রচনা 'অগ্রণী'-র পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে। রচনাশৈলীর মান আজকের বিচারে হয়তো উন্নত ছিল না কিন্তু বিষয়বস্তুর বৈশিষ্ট্যে এগুলি ছিল নতুন চিন্তা-ভাবনার বাহক।

সৃজনশীল রচনাতেও 'অগ্রণী'-র দান একেবারে হেলাফেলা করার মতো নয়। 'অগ্রণী'তে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত বিশ্ব বিশ্বাস-এর উপন্যাস 'মজদুর', আঙ্গিক-নৈপুণ্যে অসাধারণ না হলেও 'কল্লোল-যুগে'র মজুর-বিলাস থেকে নিঃসন্দেহে তা স্বতন্ত্র। আর, সুবোধ ঘোষ-এর 'ফসিল'-এর মতো অনবদ্য গল্প প্রকাশের কৃতিত্ব তো 'অগ্রণী'-রই প্রাপ্য। আজ যাঁরা রবীন্দ্রোত্তর যুগের প্রগতিশীল কবি রূপে প্রখ্যাত তাঁদের মধ্যে অরুণ মিত্র, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র ('ত্রিশঙ্কু' ছদ্মনামে), সরোজ দত্ত, দিনেশ দাস, সমর সেন, চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায় ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবি-প্রতিভা প্রকাশেরও যথেষ্ট সুযোগ করে দিয়েছিল এই 'অগ্রণী' পত্রিকা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, 'অগ্রণী'-র পৃষ্ঠায় বিষ্ণু দে-র বিস্ময়কর অনুপস্থিতি।

সম্প্রতি লক্ষ্য করলাম, ঐতিহাসিক কার্যকারণ, পরিপ্রেক্ষিত এবং কালানুক্রম বিস্মৃত হয়ে, এমনকি পুরনো 'অগ্রণী'-র পৃষ্ঠায় চোখ না বুলিয়েই, বিষ্ণু দে-প্রতিষ্ঠিত 'সাহিত্যপত্র'কে গৌরবমণ্ডিত করতে বসে জনৈক তরুণ বুদ্ধি-বিলাসীর কয়েকটি অর্বাচীন উক্তি। তাঁর মতে, "অগ্রণী এবং তার অধিকাংশ লেখকেরা নেতিবাচক ভূমিকা চালিয়ে গেলেন সাহিত্য বিষয়ে অনুদারতা ও অসহিষ্ণুতার আমদানি ঘটিয়ে।"[১] 'সাহিত্যপত্র' সম্পর্কে পরবর্তীকালে হয়তো আমাকে কিছু কথার অবতারণা করতে হবে। তবু 'অগ্রণী'-প্রসঙ্গ শেষ করার আগেই আমি বলতে

১. দ্র. সাহিত্যপত্র, গ্রীষ্ম সংকলন, বৈশাখ ১৩৮২, পৃ ৯৩

চাই, 'সাহিত্যপত্র'-র গুণগানে আমার বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই, কিন্তু 'অগ্রণী' সম্পর্কে এই অসত্য উক্তি নিঃসন্দেহে নিন্দনীয় এবং অল্পপুঁজি বুদ্ধি-বিলাসীর অজ্ঞতার সূচক মাত্র।

যাহোক, ঘটনাবহুল তিরিশের দশক শেষ হল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের রণদামামার ভয়ঙ্কর শব্দে। কিন্তু এই দশকই আমাদের হাতে তুলে দিয়ে গেল মার্কসীয় চিন্তাচর্চার কিছু ইতিবাচক ফসল। তিরিশের দশকের প্রারম্ভেই রবীন্দ্রনাথ গিয়েছিলেন রাশিয়া-পরিভ্রমণে। 'রাশিয়ার চিঠি'তে তিনি আমাদের জানালেন, সোভিয়েট রাশিয়ায় "না এলে এ জন্মের তীর্থদর্শন অত্যন্ত অসমাপ্ত থাকত।" ১৯৩৩ সালে আমাদের হাতে এল নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় অনূদিত ও গ্রন্থাকারে প্রকাশিত গোর্কি-র 'মা' উপন্যাস। ১৯৩৫ সালে ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় লিখলেন 'অন্তঃশীলা' এবং ১৯৩৭-৩৮ সালের মধ্যে প্রকাশিত হল মনোরঞ্জন হাজরার কৃষক-সংগ্রামকে ভিত্তি করে রচিত 'নোঙরহীন নৌকা', আর ১৯৩৯ সালে আমরা পেলাম সদ্য-কারামুক্ত গোপাল হালদার-এর সন্ত্রাসবাদ থেকে মার্কসবাদে উত্তরণের কাহিনীভিত্তিক উপন্যাস 'একদা'। 'অগ্রণী'-প্রসঙ্গে উল্লেখিত রচনাবলীর সঙ্গে সৃজনশীল এই রচনাগুলি মিলিয়ে দেখলে স্পষ্ট বুঝা যায়, বাংলা সাহিত্যে মার্কসীয় চিন্তা-চৈতন্য আর দুর্লক্ষ্য নয়, যুদ্ধ-দামামার সঙ্গে তার হাঁটি হাঁটি পা পা অবস্থারও অবসান ঘটতে চলেছে।

এরপর চল্লিশের দশক। এই দশককে বাঙলা দেশে কমিউনিস্ট আন্দোলন এবং মার্কসবাদী মতাদর্শ প্রচার ও প্রসারের দশক রূপে নিশ্চিতভাবে চিহ্নিত করা যায়। প্রগতি লেখক সংঘের আন্দোলনে ১৯৩৯-৪০ সালের মধ্যে ভাঁটার টান লক্ষিত হলেও ঢাকা, কুমিল্লা, শ্রীহট্ট, যশোহর, ফরিদপুর প্রভৃতি জেলায় এই আন্দোলন কিছু তরুণ বুদ্ধিজীবীকে প্রগতিশীল শিল্প-সাহিত্য তথা সংস্কৃতিচর্চায় উদ্বুদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছিল। এঁরা 'প্রতিরোধ', 'নবযুগ', 'বলাকা', 'প্রগতি' প্রভৃতি সাময়িকী প্রকাশের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড এবং মার্কসীয় চিন্তাচর্চায় বেশ কিছুকাল তৎপরও ছিলেন।

'অগ্রণী' পত্রিকার মতাদর্শগত বিরোধভিত্তিক রচনা ছাড়াও ১৯৩৯-৪০ সালে প্রকাশিত হল বিনয় ঘোষ-এর 'শিল্প, সংস্কৃতি ও সমাজ' এবং 'নূতন সাহিত্য ও সমালোচনা' নামক দু-খানি বৃহদায়তন গ্রন্থ। ১৯৩৪ সালে সোভিয়েতের লেখক-কংগ্রেসে গৃহীত 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা'-র আদর্শ, ইয়োরোপের 'New

Writing' আন্দোলনের ভাবধারা এবং স্পেনের ফাশিস্ত-বিরোধী প্রতিরোধ সংগ্রামে নিহত প্রখ্যাত তরুণ মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবী ক্রিস্টোফার কডওয়েল-এর সুবিখ্যাত গ্রন্থ 'Illusion And Reality' আর 'Studies in Dying Culture' তখন এদেশের মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবীদের হাতে পৌঁছে গিয়েছে; র‍্যালফ ফক্সের রচনার সঙ্গেও তাঁরা আর অপরিচিত নন। বিনয় ঘোষ এইসব রচনাদি পাঠ করে অনুপ্রাণিত হলেন। তাঁর তরুণ মনের মার্কসীয় নন্দনতাত্ত্বিক জিজ্ঞাসা তাই পরিতৃপ্ত করলেন উপর্যুক্ত গ্রন্থদ্বয়ের সাহায্যে।

এই আতিশয্যের ফল যা হবার তাই-ই হল। 'অগ্রণী'তে প্রকাশিত বিরোধকে তিনি আরও তীব্র করে তুললেন। তাঁর সমালোচনা থেকে অতুলচন্দ্র গুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু, অমিয় চক্রবর্তী, বিষ্ণু দে, সমর সেন রেহাই পেলেন না, এমনকি রবীন্দ্রনাথকে তিনি ভাববাদী বুর্জোয়া মতাদর্শের প্রবক্তা এবং সেই সূত্রে 'আন্তর্জাতিক কল্পনাবিলাসী, সৌখীন সাহিত্যের স্রষ্টা' রূপে চিত্রিত করতেও কসুর করলেন না। অথচ ঐ একই গ্রন্থে তিনি 'শনিবারের চিঠি'-র সম্পাদকের মতো বিচিত্র মানুষের হাল্কা কবিতার প্রশংসাতেও পঞ্চমুখ হলেন।

প্রসঙ্গত একটি কথা এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্য-জীবনে বহুবার সমালোচিত এবং ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের সম্মুখীন হয়েছেন। 'রবীন্দ্র-বিদূষণ'-এর সেই তথ্য আজ সর্বজনজ্ঞাত। কিন্তু মার্কসবাদীদের পক্ষ থেকে কিংবা মার্কসীয় দৃষ্টিকোণ থেকে, ভুল-শুদ্ধ যেভাবেই হোক না কেন, রবীন্দ্র-সাহিত্য সমালোচনার কটু দৃষ্টান্ত কি বিনয় ঘোষই প্রথম স্থাপন করলেন? আমার ধারণা এ তথ্য ভুল। কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং তাত্ত্বিক নেতা এস. এ. ডাঙ্গেই সম্ভবত প্রথম ১৯২১ সালের ২৭ নভেম্বর 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় একটি চিঠি প্রকাশের মাধ্যমে গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথের 'যন্ত্রযুগ-বিমুখতা' এবং 'প্রাচীন ভারতের আদিম সভ্যতার স্বপ্নে বিভোর হওয়া'কে সমালোচনা করেন। তিনি রবীন্দ্রনাথের 'মুক্তধারা'-র বক্তব্যের সরাসরি বিরোধিতা করেছিলেন ঐ চিঠিতে। তবে বিনয় ঘোষ আর এস. এ. ডাঙ্গের ব্যক্তি-মানসিকতার যে পার্থক্য তাই ব্যক্ত হয়েছে দুজনের উপর্যুক্ত রচনাশৈলীর বিভিন্নতায়।

মোটকথা, বিনয় ঘোষ-এর গ্রন্থদ্বয় মার্কসবাদী শিবিরে যেমন বিতর্কের সৃষ্টি করে তেমনি অমার্কসবাদী বুদ্ধিজীবীদের অনেকের মনকেই রুষ্ট করে তোলে।

'অগ্রণী' এবং বিনয় ঘোষ-এর রচনার মাধ্যমে এইভাবে প্রগতি-সংস্কৃতি ফ্রন্টের ভিতরে ও বাইরে মতবাদের লড়াইয়ের সূত্রপাত হয়।

প্রগতি-শিবিরের ঘনিষ্ঠ সহযোগী 'পরিচয়গোষ্ঠীর' লেখকেরা প্রায় সকলেই 'অগ্রণী' ও বিনয়বাবুর বক্তব্যের বিরোধী ছিলেন। রবীন্দ্র-স্নেহধন্য সাহিত্যিক ও প্রখ্যাত সাংবাদিক অমল হোম ভীষণ ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন বিনয় ঘোষ-এর রবীন্দ্র-বিরোধিতায়। তিনি এর প্রতিবাদে লিখলেন, 'কেরাণী রবীন্দ্রনাথ' নামক প্রবন্ধটি। ১৯৪১ সালে রচিত ও কলকাতা কর্পোরেশন কর্মচারীসংঘ কর্তৃক অনুষ্ঠিত একাশীতম রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসবে সভাপতির ভাষণ রূপে পঠিত ঐ প্রবন্ধে অমল হোম তীব্র শ্লেষের সঙ্গেই বললেন, "কিছুদিন থেকে শোনা যাচ্ছে প্রগতিবাদীদের মুখে—'রবীন্দ্রনাথ বড়লোকের কবি; তিনি শুধু এঁকেছেন তাঁর কাব্যে, গল্পে, উপন্যাসে বড়লোকদের ছবি; দুঃখ-দারিদ্র্য, অভাব-অনটন কি তা' তিনি জানেন না, গরীব লোকের খবর তিনি রাখেন না'!...সেই যে কবে বিপিন পাল মশাই 'বঙ্গদর্শন'-এ লিখে-ছিলেন—'রবীন্দ্রনাথের কাব্য বস্তুতন্ত্রহীন,' সেই থেকে সুর ধরলেন এক দল—বাংলায় গীতি-কবিতার সত্য রূপটি ফোটেনি তাঁর কাব্যে, দেশের নাড়ীর সঙ্গে নেই নাকি তার যোগ। টিঁকলো না কিন্তু এই সব টিপ্পনী, দেশ নেয়নি ও-সব সমালোচনা। কিন্তু সূর্যের চেয়ে বালির তাপ বরাবরই বেশি; তাই বড় বড় মহারথীদের নারায়ণীসেনা যখন গেল ভেসে, বৈষ্ণবরসতত্ত্ব আর উজ্জ্বলনীলমণি, রাইকিশোরী আর বাংলার রূপ গেল মুছে, তখন এই সব সমালোচকেরা মার্কসিস্ট বুলি আউড়িয়ে, কড্‌ওয়েল কপ্‌চিয়ে, Illusion আর Reality-তে গুলিয়ে ফেলে চেঁচামেচি সুরু করেছেন,—রবীন্দ্রনাথ 'আন্তর্জাতিক কল্পনাবিলাসী সৌখীন সাহিত্যের স্রষ্টা';...রবীন্দ্রনাথ নাকি 'সমস্ত রকমের আধুনিকতার বিরোধী,' শুধু 'সমাজ ও বাস্তবজীবনের প্রতি আকাশস্পর্শী উদাসীনতা নিয়ে তিনি অনাবিল সৌন্দর্য্য ও ব্রহ্মস্বাদস্বরূপ 'রসের' মধ্যে নিমজ্জিত'!...এই সব মার্কসিস্ট মৌলানারা ফতোয়া জারী করেছেন যে, রবীন্দ্রনাথ 'বুর্জোয়া', অতএব তিনি 'ব্যাক নাম্বার'! নূতন সাহিত্য ও সমালোচনার নামে এই সব ব্রিন্নয়ীরা বুঝোতে চাচ্ছেন আমাদের—আমি আবার তাঁদের ভাষা উদ্ধার করছি—যে রবীন্দ্রনাথের কাছে 'মানুষ বা মরজগতের জয় হয় নি'; 'তাঁর 'এবার ফিরাও মোরে' আহ্বান দিগ্‌ভ্রান্ত সরল শিশু-হৃদয়ের কাতরানি'; তিনি 'বাদশাহ

রাজা-উজীরের আওতায় মধ্যযুগের নির্জ্জন নিরাপদ প্রকোষ্ঠে বসে' আছেন; তিনি 'সামন্ততন্ত্রের সমাহিত প্রতিবেশের মধ্যে…মুক্তির আশ্রয় খুঁজছেন'; তিনি 'সংখ্যালঘিষ্ঠ রাজামহারাজা ও ধনিক গোষ্ঠীর…পৃষ্ঠপোষকতা করছেন এবং তাঁর বিমূর্ত্ত কুয়াশাচ্ছন্ন অস্পষ্ট মানবপ্রেম পরোক্ষে স্বশ্রেণীপ্রীতির মহিমা কীর্ত্তন করছে'। এই 'সাম্যবাদী' সমালোচকেরা জানাতে চান যে, যেহেতু রবীন্দ্রনাথ চোখে ডায়ালেকটিকসের ঠুলি এঁটে সাহিত্যের ঘানি টানেন না, সেইহেতু তাঁর সাহিত্য সেই তেল যোগাতে পারছে না, যার অভাবে আজকের দিনে মানুষের ঘরে নাকি আলো আর জলবে না!"[১]

মার্কসবাদীদের মধ্যেও এই নিয়ে মতান্তর দেখা দেয়। হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এবং আরও দু-একজন বিনয়বাবুর দৃষ্টিভঙ্গির বিরোধিতা করেন। পক্ষান্তরে, স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য, অরুণ মিত্র, বিজন ভট্টাচার্য, সুধী প্রধান, সরোজ দত্ত এবং অনিল কাঞ্জিলাল মোটের উপর সমর্থন করেন বিনয় ঘোষকেই। গোপাল হালদার ও চিন্মোহন সেহানবীশ এ-ব্যাপারে একটু ভিন্ন অবস্থান গ্রহণ করেন। এঁরা দুজনে বিনয়বাবুর দুর্বিনীত ভাষা-প্রয়োগ সমর্থন করেন নি, কিন্তু মূল দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে তাঁদেরও ঝোঁক ছিল ঐ বক্তব্য মানার দিকে। এই সময় একটা ব্যাপার স্পষ্ট হয়ে ওঠে। একদল মার্কসবাদী চাইতেন, সমালোচনা ও আত্মসমালোচনার মাধ্যমে প্রগতি-সংস্কৃতি ফ্রন্টের দুর্বলতা দূর করে আন্দোলনকে বলিষ্ঠ পথে পরিচলনা করতে আবার কেউ কেউ এই সমালোচনা ও আত্মসমালোচনা এড়িয়ে চলার চেষ্টা করতেন। যাঁরা ফ্রন্টের ভিতরে সমালোচনা চাইতেন তাঁরা খুঁজে বের করার চেষ্টা করতেন প্রগতি-শিবিরের 'মেকী প্রগতিবাদীদের' এবং তাঁদের উপরেই চালাতেন সমালোচনার খড়গাঘাত। অন্যেরা মুখে যথার্থ ও সুকৌশলী সমালোচনা চাইতেন বটে কিন্তু কার্যত তা যতদূর সম্ভব এড়িয়ে চলতেই সচেষ্ট ছিলেন।

চল্লিশের দশকের শুরুতে বাঙলার প্রগতি-সংস্কৃতি শিবিরের অভ্যন্তরে যখন জাতীয় সংস্কৃতির অতীত আর বর্তমান নিয়ে কিছুটা বিতর্ক শুরু হতে চলেছে তখনি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের তাণ্ডব শুরু হয়ে গেল। কমিউনিস্ট পার্টি এই যুদ্ধকে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ বলে ঘোষণা করল এবং এর বিরুদ্ধে 'না এক পাই, না এক ভাই' মনোভাব নিয়ে অগ্রসর হল প্রচার-অভিযানে। স্বভাবতই, আতঙ্কিত-

১. দ্র. অমল হোম, 'পুরুষোত্তম রবীন্দ্রনাথ, তৃতীয় সংস্করণ', পৃঃ ৩৩-৩৪

ব্রিটিশ সরকারের দমননীতি নেমে এলো কমিউনিস্ট পার্টির উপরে। অসংখ্য কমিউনিস্ট নেতা ও কর্মীকে বন্দী বা কলকাতা থেকে বহিষ্কৃত করা হয়, অনেকে হলেন অন্তরীণাবদ্ধ। ব্রিটিশ সরকারের এইদমননীতি এড়াবার জন্যও অনেক নেতা ও কর্মী বাধ্য হলেন আত্মগোপনের আশ্রয় নিতে। এর ফলে, বাঙলার কমিউনিস্ট পার্টির নির্দেশে পরিচালিত প্রথম সাংস্কৃতিক পত্রিকা 'অগ্রণী'-র প্রকাশ বন্ধ হয়ে গেল। প্রগতি লেখক সংঘের কাজকর্মও কার্যত হল স্তব্ধ।

সংস্কৃতি-ক্ষেত্রের এই আপাত-শূন্যতাকে সেদিন পূর্ণ করতে অগ্রসর হয়েছিল ছাত্র ফেডারেশনের নেতৃত্বে সংস্কৃতিমনস্ক এক দল ছাত্রকর্মী। এছাড়া ১৯৪০ সালের মাঝামাঝি সময়ে নিখিল চক্রবর্তী, রেণু রায়, শ্যামনাথ সিংহ, সুনীল চট্টোপাধ্যায়, চিন্মোহন সেহানবীশের উদ্যোগে এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জলি কাউল, সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীল সেন, হরকুমার চতুর্বেদী, সুনীলকান্তি সেনগুপ্ত, রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, অম্বিকা ঘোষ, নেভিল ক্যাম্বেল, সমর গুপ্ত, দেবব্রত বসু, দিলীপ রায়, উমা চক্রবর্তী, সুজাতা মুখোপাধ্যায়, রমা গোস্বামী প্রমুখ ছাত্র-ছাত্রীদের সক্রিয় সহযোগিতায় গড়ে ওঠে 'Youth's Cultural Institute' নামে একটি ভিন্ন সংগঠন। এখানে বলা প্রয়োজন যে, ছাত্র ফেডারেশন-এর নেতৃত্বে পরিচালিত সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড আর Youth's Cultural Institute-এর কর্মকাণ্ড ও উদ্দেশ্যের মধ্যে যথেষ্ট মিল থাকা সত্ত্বেও যে কোন কারণেই হোক প্রথমাবধি দুটির মধ্যে ছিল প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্পর্ক। তবু একথা আজ অবশ্য স্বীকার্য যে, Y. C. I-ই সেদিন আরম্ভ করেছিল নিয়মিত সংস্কৃতি-বিষয়ক আলোচনার আসর, বিতর্কসভা, অভিনয়, পোস্টার প্রদর্শনী এবং গান। পরবর্তীকালে গণনাট্য সংঘ বাঙলার সংস্কৃতিতে প্রগতিমুখী ভাবধারা সঞ্চালনে যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, সম্ভবত Y. C. I. ছিল তার সূতিকাগার।

অচিরেই আমরা দেখলাম, পার্টির ছাত্র-ফ্রন্টের নেতৃত্বের সঙ্গে Y. C. I. পরিচালকবর্গের দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য এবং তজ্জনিত সংঘর্ষ ঘনিয়ে উঠেছে। বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়-এর নেতৃত্বে পরিচালিত ছাত্র-নেতৃত্ব তখন মনে করতেন Y C. I.-এর সাংস্কৃতিক কার্যকলাপ সমাজের উচ্চকোটি মানুষের সন্তানদের বিলাসী খেয়াল পরিতৃপ্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ এবং পার্টির পক্ষে এটা 'শ্বেতহস্তী পোষার শামিল'। 'সংস্কৃতির ছুতো করে Y. C. I. আসলে ঘনায়মান বিপদ

এড়াতে চায়,' একথাও মনে করতেন কেউ কেউ। মার্কসবাদী সাহিত্য ও সংস্কৃতির শিবিরে মতাদর্শগত যে-সংগ্রামের কথা আমি পূর্বে উল্লেখ করেছি, অন্যভাবে এবং সংস্কৃতির অন্য বিভাগে, ছাত্র-যুবদের মধ্যেও, ভিন্ন রূপে তারই জের পরিলক্ষিত হল।

এই সব ঘটনা মূলত কেন্দ্রীভূত ছিল সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র কলকাতায়। মফঃস্বল শহরের আপাতনিস্তরঙ্গ সংস্কৃতির স্রোতে এর ধাক্কা বোধহয় তেমন কোনো আবর্ত সৃষ্টি করতে পারে নি। বরং লক্ষ্য করা যায়, ঢাকা শহরের তরুণ মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবীরা বেশ কিছুটা সদর্থক ভূমিকা তখনও পালন করে চলেছেন। এঁদের উদ্যোগে ঢাকার নূতন সাহিত্য ভবন থেকে ১৯৪০ সালে প্রকাশিত হল 'ক্রান্তি' নামক প্রগতিশীল সাহিত্য-সংকলন। ঐ সংকলনে ঢাকা জেলা প্রগতি লেখক সংঘের অন্যতম নেতা রণেশ দাশগুপ্ত 'নতুন দৃষ্টিতে উপন্যাস'-এর পর্যালোচনা করলেন, নৃপেন্দ্রচন্দ্র গোস্বামী লিখলেন 'সাহিত্যে সৌন্দর্যবাদ'। নৃপেনবাবু তাঁর প্রবন্ধে অসংকোচে জানালেন, "আমরা এমন সাহিত্য চাই যা আমাদের হাতুড়ি পিটিয়ে মানুষ করতে পারে। আমরা বাংলাসাহিত্যে একজন গোর্কির অভ্যুদয় দেখতে চাই"। [ক্রান্তি, পৃ. ৬৫]

উপর্যুক্ত কথাগুলি আজ হয়তো খুব সহজ সরল আপ্তবাক্য বলে মনে হতে পারে; কিন্তু ১৯৪০ সালে মফঃস্বল-শহরে বসে ঐ বক্তব্য জানাবার জন্য যথেষ্ট মানসিক প্রস্তুতি ও দুঃসাহসের প্রয়োজন ছিল। যাহোক, ১৯৪১ সালের ২২ জুন ফ্যাশিস্ত হিটলারের নাৎসী বাহিনী বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। মুহূর্তের মধ্যে বদল হয়ে গেল যুদ্ধের চরিত্র। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিও অতি দ্রুত অনুভব করল নতুন পরিস্থিতি।

যদিও প্রগতি লেখক সংঘ এই সময় প্রায় নির্বাপিত এবং 'ফাশিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ'-ও জন্ম গ্রহণ করে নি, তবুও ফ্যাশিস্ত-বিরোধী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ধারাস্রোত বাঙলাদেশের শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের মনের মাটিতে যে পলিজল সিঞ্চন করেছিল, নাৎসী জার্মানীর সোভিয়েতভূমি আক্রমণে সেই পলিমাটিতে নতুন ফসল ফলাবার সম্ভাবনা পুনর্বার দেখা দিল।

১৯৪১ সালে গঠিত হল 'সোভিয়েত সুহৃৎ সমিতি'। সোভিয়েত দেশের উপর নাৎসী বাহিনীর বর্বর আক্রমণে বিচলিত বাঙলার কমিউনিস্ট বুদ্ধিজীবীদের

উদ্যোগে গঠিত হয়েছিল এই সংগঠন। হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, স্নেহাংশুকান্ত আচার্য, জ্যোতি বসু, রাধারমণ মিত্র প্রমুখ কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দ সেদিন 'সোভিয়েত সুহৃৎ সমিতি' গঠন করে এক ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছিলেন। এই সমিতির সভাপতিপদে বৃত হয়েছিলেন ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এবং সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন স্নেহাংশুকান্ত আচার্য ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। শান্তিনিকেতনে অসুস্থ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করে সমিতির পক্ষে অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী কবির আশীর্বাদ প্রার্থনা করলে রবীন্দ্রনাথ সদ্যস্থাপিত এই সমিতির পৃষ্ঠপোষক হতে রাজী হয়েছিলেন সেদিন।

'সোভিয়েত সুহৃৎ সমিতি'-র মাধ্যমেই ভাঁটাপড়া সাংস্কৃতিক আন্দোলনে পুনর্বার জোয়ারের বেগ সঞ্চারিত হল। সোভিয়েতভূমির পক্ষে জনমত গঠনের উদ্দেশ্যে সমিতির কর্মীরা তখন একের পর এক জনসভা, পোস্টার-প্রদর্শনী চলচ্চিত্র-প্রদর্শনী, সঙ্গীত-আসর প্রভৃতি পরিচালনা করতে থাকেন। 'সোভিয়েত সুহৃৎ সমিতি'-র অন্যতম নেতা মোহিত ব্যানার্জি নিজে তেমন সঙ্গীতজ্ঞ না হয়েও অনুবাদ করেছিলেন 'জাগো জাগো জাগো সর্বহারা' কিংবা 'সোভিয়েতভূমি বিশ্বশ্রমিকপ্রিয়'-র মতো আন্তর্জাতিক এবং বিপ্লবী সঙ্গীত। আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি, সোভিয়েতের জনজীবনের বিভিন্ন দিক এবং সোভিয়েত-সংস্কৃতির সঙ্গে এই সমিতিই সেদিন বাঙলার জনসাধারণ এবং বুদ্ধিজীবীদের ব্যাপক পরিচয় ঘটিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিল।

এর পরবর্তী উল্লেখযোগ্য ঘটনা, সাংবাদিক-প্রবর সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার-এর সম্পাদনায় সাপ্তাহিক 'অরণি' পত্রিকার আত্মপ্রকাশ। 'অগ্রণী' বন্ধ হয়ে যাবার পর প্রগতিশীল সাহিত্যিক মহল যে অভাব অনুভব করছিলেন, 'অরণি' পত্রিকার মাধ্যমে সেই অভাব অনেক পরিমাণে দূরীভূত হল। ১৯৪১ সালের শারদীয় সংখ্যা দিয়েই সম্ভবত 'অরণি'-র প্রথম যাত্রা শুরু। তারপর ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত এই পত্রিকা বাঙলার প্রগতি-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অনেক অমূল্য অবদান রেখে লুপ্ত হয়ে যায়।

সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার-এর সঙ্গে 'অরণি' পত্রিকার সম্পাদনার কাজে প্রথম থেকেই যুক্ত হয়েছিলেন স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য, অরুণ মিত্র, বিজন ভট্টাচার্য,, বিনয় ঘোষ, সরোজ দত্ত, অনিল কাঞ্জিলাল প্রমুখ প্রগতি-সংস্কৃতি আন্দোলনের তৎকালীন প্রধান ও অগ্রগণ্য বুদ্ধিজীবীদের একাংশ। চিন্মোহন সেহানবীশ

এবং সুধী প্রধানও এঁদের সঙ্গে কোনো-না-কোনোভাবে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করতেন। কিছুকাল পরে সাহিত্যিক প্রভাত গোস্বামী, সুশীল জানা এবং নিখিল সেনও এসে যেগে দেন 'অরণি'-র আসরে। কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র 'জনযুদ্ধ' প্রকাশের আগে এই 'অরণি' পত্রিকা একদিকে যেমন ছিল বাঙলার কমিউনিস্ট পার্টির রাজনৈতিক মতবাদ প্রচারের অঘোষিত মুখপত্র, অন্যদিকে তেমনি 'অরণি'-র পৃষ্ঠায় পরিবেশিত হতো ফ্যাশিস্ত-বিরোধী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সকল তাৎপর্য আর সৃজনশীল সাহিত্যিকদের নানা রচনা। সুকান্ত ভট্টাচার্য-র মতো বিপ্লবী কবিসহ অনেক তরুণ-প্রতিভা এই 'অরণি' পত্রিকার পৃষ্ঠাতেই প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন। স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য 'অনামী' ছদ্মনামের আড়ালে 'কথা-প্রসঙ্গে' নামক একটি নিয়মিত 'ফিচার' লিখতেন 'অরণি' পত্রিকায়। এর মাধ্যমে তিনি নিপুণভাবে ও সরসভঙ্গিতে নানা সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক-প্রসঙ্গের মার্কসবাদী পর্যালোচনা তুলে ধরতেন পাঠকদের সম্মুখে। সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার নিজেই 'মধ্যবিত্তের দুশ্চিন্তা' নামে একটা চমৎকার 'ফিচার' নিয়মিত লিখতেন। অথচ কী আশ্চর্য, 'অগ্রণী' পত্রিকা-প্রসঙ্গে আলোচিত সেই তরুণ বুদ্ধি-বিলাসী 'অরণি' পত্রিকা সম্পর্কে আবার তাঁর পাণ্ডিত্য জাহির করে লিখেছেন, "...চল্লিশের দশকে সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের 'অরণি' পত্রিকাতে এই বাদানুবাদ ও সংকীর্ণতার জেহাদ চালিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।"[১] কোন্ 'বাদানুবাদ', কার সঙ্গে এবং কেন; কিংবা 'সংকীর্ণতার' কোন্ চেহারা কিভাবে 'অরণি'কে গ্রাস করেছিল, তার একটিও দৃষ্টান্ত তুলে না ধরে 'অরণি'-র বিশেষ যুগের এক উজ্জ্বল ভূমিকাকে এইভাবে বিকৃত করার মধ্যে বুদ্ধিবিলাসীর অসত্য ভাষণ আর বালখিল্য চপলতার প্রকাশ ছাড়া আমি তো আর কিছুই লক্ষ্য করতে পারি না।

সত্যি কথা বলতে কি, 'অরণি' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবীদের শিল্প-সাহিত্য-বিষয়ক মতামত আর 'পরিচয়' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত লেখকদের, বিশেষ করে হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও বিষ্ণু দে-র মতামতে বিস্তর ব্যবধান ছিল। এগুলি লিখিত 'বাদানুবাদ' আকারে 'অরণি'তে কোনোদিন প্রকাশিত হয় নি। বিভিন্ন সাহিত্যিক আড্ডার আসরে এসব ছিল মূলত মুখরোচক মৌখিক আলোচনার অঙ্গ। এই নিয়েই অনেক সময় ভুল বোঝাবুঝি, এমনকি গোষ্ঠীগত মতান্তরও দেখা দিত। কিন্তু এসবের ফয়সালা হতো সাধারণত অভ্যন্তরীণ

১. দ্র. সাহিত্যপত্র, গ্রীষ্ম সংকলন, বৈশাখ ১৩৮২, পৃ. ৯৩।

আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে, অন্য কোনোভাবে নয়। আর, সুনির্দিষ্ট মতামতের ভিত্তিতে তখনকার মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবীরা কোনো পাকাপোক্ত বিশেষ 'চক্র', 'উপদল' বা 'গোষ্ঠী'তেও বিভক্ত ছিলেন না। শুনেছি, একবার নাকি হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কোনো কোনো লেখককে 'অরণি-গোষ্ঠীভুক্ত' বলে অভিহিত করায় তাঁরা প্রচণ্ড ক্ষোভের সঙ্গে এর প্রতিবাদ করেন।

এ-প্রসঙ্গে একটা কথা না বল্লে বোধহয় সত্যের অপলাপ করা হবে। চল্লিশের দশকের প্রারম্ভে মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবীরা ব্যক্তিগত ভালোলাগা-মন্দলাগার ঊর্ধ্বে উঠে সাধারণভাবে সকলেই মার্কসবাদের অনুশীলন ও তার প্রয়োগে সামগ্রিক অর্থে দৃঢ়তার সঙ্গে অগ্রসর হয়েছিলেন। ব্যক্তি-প্রতিভা ও ব্যক্তি-মানসিকতার তারতম্য ও ঝোঁক অবশ্যই ছিল। যেমন, চিন্তা-ভাবনার দিক দিয়ে স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য, অরুণ মিত্র, বিজন ভট্টাচার্য, সুধী প্রধান, বিনয় ঘোষ, সরোজ দত্ত, অনিল কাঞ্জিলাল এবং কিছুটা পরিমাণে চিন্মোহন সেহানবীশ অনেক বেশি পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ছিলেন এবং নিজেদের ভিতর মতামতও বিনিময় করতেন। আবার, সাধারণভাবে হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, বিষ্ণু দে, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, সমর সেন প্রমুখ চিন্তা-ভাবনার দিক দিয়ে ছিলেন পরস্পরের অনেক বেশি কাছাকাছি।

প্রথম পক্ষ মনে করতেন, বাংলাসাহিত্যের ঐতিহ্যের প্রতি বিমুখতা, কৃত্রিম ভাষা ও একান্ত ব্যক্তিগত চিত্রকল্প ব্যবহার, উৎকট ইয়োরোপ-মনস্কতা, উদ্ভট আঙ্গিকবিলাস এবং মনে মনে পশ্চিমী অবক্ষয়বাদী সাহিত্যধারার প্রতি সহানুভূতি পোষণের মাধ্যমে দ্বিতীয় পক্ষ এক ভ্রান্ত, অমার্কসীয় পথ অনুসরণ করছেন। পক্ষান্তরে, দ্বিতীয় পক্ষ ভাবতেন, বাংলাসাহিত্যের ঐতিহ্য বরণের নামে সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধ আঁকড়ে থাকা, ভাষা ও আঙ্গিক সম্পর্কে গোঁড়া ও সংকীর্ণ মনোভাব পোষণ, বিষয়-মাহাত্ম্যের নামে নতুন আঙ্গিক গ্রহণে অনিচ্ছা এবং সজনীকান্ত-গোষ্ঠীর প্রতি প্রচ্ছন্ন পক্ষপাতের মধ্য দিয়ে প্রথম পক্ষ বাঙলার প্রগতি-সংস্কৃতি আন্দোলনকে ক্ষতিগ্রস্ত করছেন।

আসলে, পেটিবুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে সর্বদেশে, সর্বকালে যেসব ঝোঁক ও প্রবণতা লক্ষ্য করা গিয়েছে, আমাদের দেশেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। এবং এদেশের অসম বিকাশের ফলে গ্রামীণ সভ্যতা-সংস্কৃতি আর নাগরিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির মধ্যে আশৈশব লালিত-পালিত ব্যক্তি-মানসিকতায় যে-দ্বন্দ্ব থাকা

স্বাভাবিক সেই দ্বন্দ্ব থেকে উপর্যুক্ত বুদ্ধিজীবীরা সম্ভবত কেউ মুক্ত ছিলেন না।

এতদ্‌সত্ত্বেও এঁরাই ছিলেন এদেশের সাহিত্য তথা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মার্কসবাদী ধ্যান-ধারণা প্রসারে নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তিত্ব। সমগ্র চল্লিশের দশক জুড়ে মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবীরা যৌথভাবে প্রায় এক অসাধ্য সাধন করেছিলেন। 'অরণি' পত্রিকার দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ষের বিভিন্ন সংখ্যায় গোলাম কুদ্দুস, নবেন্দু রায়, বিষ্ণু দে, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, সুকান্ত ভট্টাচার্য-র অক্টোবর বিপ্লব ও লেনিন-বিষয়ক কবিতা, 'লেনিনের দৃষ্টিতে—আর্ট ও জনমানব' কিংবা সুধী প্রধান-এর 'বাংলা সাহিত্য ও মার্কসবাদ' প্রভৃতি রচনাবলী এর কয়েকটি দৃষ্টান্ত মাত্র। মোটকথা, 'অরণি'কে কেন্দ্র করে যদি কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটে থাকে তবে তা ঘটেছে ব্যক্তি-নিরপেক্ষ ভাবে, তার উৎস নিহিত আছে বাঙলাদেশের তৎকালীন সমগ্র মার্কসবাদীদের কর্মকাণ্ডের মধ্যেই।

হিটলারের নাৎসী বাহিনী কর্তৃক সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রান্ত হওয়ার পর ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির রণনীতি বদলের কথা আমি পূর্বে উল্লেখ করেছি। এই নীতি-বদলের ফলে এদেশে শুরু হয় 'জনযুদ্ধের যুগ'। দীর্ঘ প্রায় আট বছর পরে কমিউনিস্ট পার্টির উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হয় এবং ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ব্রিটিশ রাজের আরোপিত বেআইনী যুগের অন্ধকার অতিক্রম করে প্রবেশ করে গণমানবের প্রকাশ্য আলোর রাজ্যে। প্রয়াত কমিউনিস্ট নেতা ভবানী সেন সে-সময় গ্রহণ করেন বাঙলার কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদকের দায়িত্ব। এই সন্ধিক্ষণে শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্তের বিভিন্ন গণফ্রন্টে নতুন প্রাণের সাড়া জাগে। ফ্যাশিবাদ-বিরোধী সেই চেতনাকে সর্বস্তরে পরিব্যাপ্ত করার পুরোভাগে ছিল তখন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি।

ইতিহাসের এই তাৎপর্যময় মুহূর্তে, ফ্যাশিবাদ-বিরোধী এক মিছিল পরিচালনা করার সময় ঢাকার তরুণ কমিউনিস্ট-লেখক সোমেন চন্দ নিহত হন ফ্যাশিবাদী গুণ্ডাদের হাতে। ১৯৪২ সালের ৮ মার্চ ঘটে এই বেদনাদায়ক ঘটনা। সোমেন চন্দ-র হত্যাকাণ্ডে বিচলিত হয়ে ওঠেন বাঙলার সকল দলের সর্বমতের শিল্পী-সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীরা। এমনকি বুদ্ধদেব বসু, অমিয় চক্রবর্তীর মতো দল-নিরপেক্ষ লেখকও এই হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা করে সেদিন বিবৃতি প্রকাশ করেন। ফ্যাশিবাদ-বিরোধী সংগ্রামে মানবিকতার বিবেক, শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের ব্যাপক অংশ যেন একটা ঐক্যসূত্র খুঁজে পেলেন। এই সূত্র ধরেই

১৯৪২ সালের ২৮ মার্চ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হল ফ্যাশিস্ত-বিরোধী লেখক সম্মেলন এবং এই সম্মেলন-মঞ্চেই গঠিত হয় 'ফ্যাশিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ'। সংঘের সাংগঠনিক কমিটিতে সভাপতি এবং যুগ্ম-সম্পাদক রূপে নির্বাচিত হলেন যথাক্রমে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এবং বিষ্ণু দে ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়। স্থির করা হল, 'ফ্যাশিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ' অতঃপর নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘের শাখা রূপেই বাঙলাদেশে কাজ করবে।

দ্বিতীয় পর্যায়ের এই প্রগতি-সংস্কৃতি আন্দোলন নানা দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। এবার সংঘের পক্ষ থেকে এক আবেদনে স্পষ্টভাবে ফ্যাশিবাদের বিপদ সম্পর্কে উদ্বেগ ও তা প্রতিরোধের জন্য দৃঢ় সংকল্প ঘোষণা করে বলা হল :

"ভারতবর্ষ আজ অভূতপূর্ব বিপদের সম্মুখীন। আমাদের গৃহ, পরিজন, জীবিকা ও গ্রাসাচ্ছাদনের উপায় পর্যন্ত জাপানের আক্রমণে বিপন্ন হইয়াছে। আমরা এতদিন যে মুক্তির স্বপ্ন দেখিয়াছি, যে মুক্তির জন্য অপরিমেয় আত্মোৎসর্গ করিয়াছি, সেই মুক্তি যখন আসন্ন হইয়া আসিয়াছে ঠিক সেই সময় ফ্যাশিস্টরা কঠিনতর শৃঙ্খলে আমাদের বাঁধিবার জন্য উদ্যত; জাপানী আক্রমণকে যদি আমরা প্রতিরোধ করিতে না পারি তবে এদেশে নূতন করিয়া এমন এক বিদেশী স্বৈরশাসন প্রতিষ্ঠিত হইবে যাহা আমাদের এতদিনকার সংগ্রামার্জিত কোন অধিকারই লেশমাত্র টিকিয়া থাকিতে দিবে না—আমাদের কংগ্রেস, আমাদের সংবাদপত্র, আমাদের ট্রেড ইউনিয়ন ও কৃষক আন্দোলন ও অন্যান্য বিবিধ অধিকারকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দিবে।

"এই চরম সংকটকালে সাহিত্যিকসমাজ দেশের ভাগ্য সম্বন্ধে উদাসীন থাকিতে পারে না। অন্যান্য বুদ্ধিজীবী ও বৃত্তিজীবিগণ অপেক্ষা সমাজে সাহিত্যিকদের মর্যাদা ও প্রভাব অনেক বেশী। এই মর্যাদা ও প্রভাবের উপযুক্ত মূল্য দিবার দিন আজ আসিয়াছে। আজ বিপন্ন জাতিকে আত্মরক্ষার দৃঢ়সংকল্পে উদ্বুদ্ধ করিবার, বিভ্রান্ত জনসাধারণের চিন্তাকে আত্মসমর্পণ ও আত্মঘাতের পথ হইতে ফিরাইয়া পরিত্রাণের পথে চালিত করিবার দায়িত্ব সাহিত্যিকদের।

"শুধু স্বজাতি ও স্বদেশ নয়, শিল্প ও সংস্কৃতিকে আসন্ন ধ্বংসের কবল হইতে রক্ষা করিবার দায়িত্ব আজ সাহিত্যিকদের পক্ষে প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। সৃষ্টির ভার আমার, রক্ষার ভার অপরের—এই মনোভাব আজ সাহিত্যিককে বর্জন

করিতে হইবে। নিজের সৃষ্টি রক্ষায় তাহার নিজেকেই অগ্রণী হইতে হইবে। ফ্যাশিস্টরা জানে যে, দেশের স্বাধীন চিন্তানায়ক ও মনীষীরা তাহাদের স্বার্থসিদ্ধির বড় বিঘ্ন—তাই আজ রোমঁ্যা রোলাঁ বন্দী, টলস্টয়ের স্মৃতি অপমানিত; প্রবাসে নির্বাসনে বৃদ্ধ ফ্রয়েডের জীবনাবসান, আইনস্টাইন, টমাস মান প্রমুখ মহাভাগগণ স্বদেশ হইতে বহিষ্কৃত। ফ্যাসিশস্ট জার্মানীর মন্ত্রশিষ্য জাপানে এবং জাপান-অধিকৃত দেশে অসংখ্য লেখক ও শিল্পী নিহত ও নির্য্যাতিত। জার্মানীতে ইউরোপের অমর সাহিত্য সৃষ্টির বহ্ন্যুৎসব এবং চীনের বিশ্ববিশ্রুত বিশ্ববিদ্যালয়ে জাপানী বোমার অগ্নিকাণ্ড—সংস্কৃতি ধ্বংসের একই অভিযান। এই ধ্বংসবন্যার গতিরোধ করিবার জন্য সাহিত্যিককে আজ তাহার সাহিত্য ও সর্বস্ব পণ করিতে হইবে এবং এই প্রতিরোধ-সংগ্রামের মধ্য দিয়া নূতন জগতের নূতন সাহিত্যকে সম্ভব করিয়া তুলিতে হইবে।

"দেশ ও সংস্কৃতি রক্ষার এই আদর্শকে সম্মুখে রাখিয়া 'ফ্যাশিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ' গঠিত হইয়াছে। আমরা আমাদের দেশের সমস্ত সাহিত্যিক ও শিল্পীগণকে এই সংঘে যোগদান করিয়া সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থার ভিত্তিতে অবিলম্বে কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে আহ্বান জানাইতেছি।"

আমাদের মনে রাখা দরকার, সংঘের আবেদন যখন প্রকাশিত হচ্ছে তার মাত্র সাত-আট মাস আগে, ১৯৪১-এর ৭ আগস্ট (২২ শ্রাবণ, ১৩৪৮) রবীন্দ্রনাথের মতো মহামনীষীর তিরোধান ঘটেছে এবং কয়েক মাস পরেই ১৯৪২-এর ৮ আগস্ট নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিতে গৃহীত হয়েছে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে 'ভারত ছাড়ো' প্রস্তাব। ফলত, ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক সর্বভারতীয় কংগ্রেস নেতৃবৃন্দকে গ্রেপ্তার, দেশব্যাপী 'আগস্ট আন্দোলন' এবং কমিউনিস্ট-বিরোধী জেহাদ ও কুৎসার প্লাবনে দেশের আবহাওয়া ঘুলিয়ে উঠতেও দেরি হয় নি।

প্রতিকূল এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করেছিলেন সেদিন বাঙলাদেশের মার্কসবাদী শিল্পী-সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীরা। সত্যিকার এক ব্যাপক-ভিত্তিক সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য তাঁরা সংঘের আবেদন মতো যেন সর্বস্ব পণ করেই অগ্রসর হয়েছিলেন। সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে সংগঠিত ও পরিচালিত করার জন্য বাঙলার কমিউনিস্ট পার্টি এই সময় সর্বপ্রথম পার্টিগতভাবে কিছুটা সচেতন ও সক্রিয় উদ্যোগ নিয়ে গঠন করলেন একটি প্রাদেশিক সাংস্কৃতিক

ইউনিট। এই ইউনিট গঠিত হল ট্রেড ইউনিয়ন থেকে আগত প্রখ্যাত সঙ্গীত-শিল্পী বিনয় রায়, 'জনযুদ্ধ' পত্রিকা থেকে আগত বিশিষ্ট লেখক-সংগঠক চিন্মোহন সেহানবীশ ও সুধী প্রধান আর কবি-সাহিত্যিক অনিল কাঞ্জিলাল এবং সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে নিয়ে। সংস্কৃতি-আন্দোলন ক্রমশ বহুমুখী হয়ে উঠতে লাগল। অজস্র প্রতিভাবান প্রবীণ ও নবীন শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী অতঃপর একে একে এসে যোগ দিলেন জীবনমুখী এই আন্দোলনের উদার অঙ্গনে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালের মধ্যেই দেখা গেল গণনাট্য সংঘকে কেন্দ্র করে বিনয় রায়, দেবব্রত বিশ্বাস, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, হরিপদ কুশারী, হেমাঙ্গ বিশ্বাস, সুজাতা মুখোপাধ্যায়, সুপ্রিয়া মুখোপাধ্যায়, প্রীতি সরকার, সাধনা রায়চৌধুরী, ভূপতি নন্দী, সুরপতি নন্দী প্রমুখ সঙ্গীত-শিল্পীরা গণ-জীবনের কামনা-বাসনাকে মূর্ত করে তুলছেন গানে গানে ; ময়মনসিংহে নিবারণ পণ্ডিত, ঢাকায় সত্যেন সেন আর সাধন দাশগুপ্ত রচনা করছেন নতুন গণসঙ্গীত। শচীন দেববর্মন, জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, পঙ্কজকুমার মল্লিক ও সন্তোষ সেনগুপ্ত-র মতো গুণী সঙ্গীতশিল্পীরাও মাঝে মাঝে সাহায্য ও সহযোগিতার হাত প্রসারিত করে দিচ্ছেন 'নবজীবনের গান'-এর স্রষ্টা এই শিল্পী-কর্মীদের প্রতি।

'জনতাকে তারকায়িত করা'র মহান ব্রত নিয়ে গণনাট্য সংঘের নাট্য-বিভাগে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালের মধ্যে এসে যোগ দিলেন নাট্য-জগতের শ্রদ্ধেয় 'মহর্ষি'—মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য ; সংঘের ডাকে সাড়া দিয়ে এগিয়ে এলেন শম্ভু মিত্র, চারুপ্রকাশ ঘোষ, গঙ্গাপদ বসু, নিমাই ঘোষ, সজল রায়চৌধুরী, শোভা সেন, তৃপ্তি মিত্র, রেবা রায়, অনু দাশগুপ্ত প্রমুখ আরও অনেক নবীন নাট্য-প্রতিভা। এঁদের সঙ্গে অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করলেন গোপাল হালদার, রবীন্দ্র মজুমদার, মণিকুন্তলা সেন, কল্যাণী কুমারমঙ্গলম-এর মতো পরিচিত কমিউনিস্ট নেতা ও কর্মীবৃন্দ। বিজন ভট্টাচার্য একাগ্র নিষ্ঠায় রচনা করলেন 'আগুন', 'জবানবন্দী', 'নবান্ন'-র মতো গণজীবন-ভিত্তিক নতুন নাটক। শম্ভু মিত্র ও বিজন ভট্টাচার্য-র প্রযোজনা আর পরিচালনায় এবং অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সমবেত অভিনয়-নিষ্ঠায় বাঙলার নাট্য-জগতে উন্মোচিত হল এক নতুন দিগন্ত।

সাহিত্যিক মহলেও এই আন্দোলনের প্রভাব বিস্তৃত হল। 'ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ'-র কর্মযজ্ঞে রবীন্দ্রোত্তর যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ

ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এসে যোগ দিলেন। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত-র পাশাপাশি; সাময়িকভাবে হলেও, বিমলচন্দ্র সিংহ, সজনীকান্ত দাস, বুদ্ধদেব বসু, অমিয় চক্রবর্তী, প্রতিভা বসু প্রমুখের নামও সংঘের সভ্য-তালিকার অন্তর্ভুক্ত হল। 'পরিচয়গোষ্ঠী'র নীরেন্দ্রনাথ রায় এই চল্লিশের দশকের প্রারম্ভেই পণ্ডিচেরীর প্রিয়বন্ধু দিলীপকুমার রায়-এর প্রভাব মুক্ত হয়ে মার্কসবাদকেই গ্রহণ করলেন তাঁর জীবনের ধ্রুবতারা রূপে। অধ্যাপক সুশোভন সরকার, হিরণকুমার সান্যাল, গিরিজাপতি ভট্টাচার্য প্রমুখ 'পরিচয়' পত্রিকার সুধী-লেখকেরা সাধ্যমত সহযোগিতা করলেন 'ফ্যাশিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ'-র আন্দোলনকে প্রসারিত করার কাজে। ৪৬ নম্বর ধর্মতলা স্ট্রীটকে কেন্দ্র করে তখন সত্যিই শুরু হয়ে গিয়েছে প্রবীণ আর নবীন সাহিত্যিক এবং সাংস্কৃতিক কর্মীদের সৃজনশীলতার মহোৎসব। সেই সৃজনশীল মহোৎসবে পূর্বোক্ত লেখকদের সঙ্গে ক্রমান্বয়ে যোগ দিয়েছেন পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, অতুলচন্দ্র গুপ্ত, রাধারমণ মিত্র, গোপাল হালদার, অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র, সুকুমার মিত্র, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, বিমলচন্দ্র ঘোষ, চঞ্চল চট্টোপাধ্যায়, কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সুশীল জানা, গিরীন চক্রবর্তী, মণীন্দ্র রায়, গোলাম কুদ্দুস, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, ননী ভৌমিক, দিলীপ রায়, নীহার দাশগুপ্ত, রবীন্দ্র মজুমদার, অনিল সিংহ, বিষ্ণু মুখোপাধ্যায়, দ্বিজেন নন্দী, হরিদাস নন্দী, মনোরঞ্জন বড়াল, নরহরি কবিরাজ, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, অবন্তী সান্যাল, সুকান্ত ভট্টাচার্য, আবুল মনসুর আহ্‌মদ, ফররুখ আহ্‌মদ, আহসান হাবীব, শওকত ওসমান প্রমুখ অসংখ্য খ্যাত ও প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন কবি-সাহিত্যিক আর সাংস্কৃতিক-কর্মী।

চারু-শিল্পীরাও এই আন্দোলন থেকে দূরে সরে থাকেন নি। মণি রায়, জয়নুল আবেদিন, গোপাল ঘোষ, নীরদ মজুমদার, রথীন মৈত্র, শুভ ঠাকুর, প্রভাস সেন, চিত্তপ্রসাদ প্রমুখ শিল্পীর রঙে আর রেখায় সেদিন মূর্ত হয়ে উঠেছিল পঞ্চাশের বাঙলার দুর্ভিক্ষ-পীড়িত মানুষের মর্মবেদনা, শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্ত-মেহনতী মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, সংগ্রামী জীবনের অব্যক্ত ব্যথা আর বিক্ষোভ। সুনীল জানা আর শম্ভু সাহার ক্যামেরায় কালজয়ী হয়ে আছে যুদ্ধকালীন বাঙলার সেই ভয়ঙ্কর-সুন্দর স্থিরচিত্র।

১৯৪২ থেকে ১৯৪৫ সালের মধ্যে এই অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলেছিলেন বাঙলার মার্কসবাদী শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীরা। এই বিপুল সৃজনশীল কর্মপ্রয়াসকে সংগঠিতভাবে পরিচালনা করার জন্য কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে গঠিত হল গণনাট্য সেল, লেখক ও সাংবাদিক সেল, চিত্রশিল্পী সেল, 'পরিচয়' সেল প্রভৃতি। এতগুলি সেলের মধ্যে যোগাযোগ আর সমন্বয়সাধন এবং সাধারণভাবে আন্দোলনকে নির্দিষ্ট খাতে প্রবাহিত করার জন্য একটি সাংস্কৃতিক ফ্যাকশানও সেদিন গঠন করা হয়েছিল। কিছু কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও, সব মিলিয়ে বলা যায়, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালের মধ্যেই বাঙলার সংস্কৃতিজগতে মার্কসবাদী চিন্তাচর্চার প্রভাব গুণগত ও পরিমাণগতভাবে অতীত দশকগুলির সব প্রয়াসকে অতিক্রম করে গেল।

বিশ্বযুদ্ধের টালমাটাল সময়ের ঝুঁটি ধরে ফ্যাশিজমের বীভৎসতা সম্পর্কে দেশবাসীকে সচেতন করার জন্য বুদ্ধদেব বসু লিখলেন—'ফ্যাশিজম ও সভ্যতা', প্রতিভা বসু রচনা করলেন—'ফ্যাশিজম ও নারী', বিনয় ঘোষ-এর কলম থেকে বেরিয়ে এল—'সংস্কৃতির দুর্দিন'। এই সময়ে প্রকাশিত হল গোপাল হালদার-এর 'সংস্কৃতির রূপান্তর', লেখক সংঘ র উদ্যোগে 'জনযুদ্ধের গান', দক্ষিণ কলকাতার ছাত্র ফেডারেশনের উদ্যোগে 'প্রাচীর' কবিতা-সংকলন; আমরা আরও পেলাম, বিষ্ণু দে-র কাব্য-পুস্তিকা 'বাইশে জুন', সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও গোলাম কুদ্দুস-এর সম্পাদনায় 'একসূত্রে' কাব্য-সংকলন ও সুকান্ত ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'আকাল'; 'অরণি' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হল বিজন ভট্টাচার্য-র যুগান্তকারী নাটক 'নবান্ন'; অন্য দুটি উল্লেখযোগ্য প্রকাশনা সুধী প্রধান সম্পাদিত 'কয়েকজন লোককবি', হিরণকুমার সান্যাল ও সুভাষ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত প্রগতিশীল লেখকদের জবানবন্দী 'কেন লিখি'। ঠিক এই সময়টাতেই তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিষ্ণু দে, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, হেমাঙ্গ বিশ্বাস, বিনয় রায়, অরুণ মিত্র, বিমলচন্দ্র ঘোষ, সুভাষ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ প্রখ্যাত কবি-সাহিত্যিকেরা গল্প-কবিতা আর গানে যেন সৃষ্টিসুখের উল্লাসে মেতে উঠলেন।

'ফ্যাশিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ'-র উদ্যোগে এবং নেতৃত্বে উপর্যুক্ত কাজগুলি সেদিন যথেষ্ট সাফল্যের সঙ্গেই সম্পন্ন হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে আমরা সংঘের কর্মতৎপরতার কিছু বিবরণ এবার স্মরণ করতে পারি।

সোমেন চন্দ-র হত্যাকাণ্ডের পর প্রবাসী-সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়-এর সভাপতিত্বে 'ফ্যাশিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ'-র যে-সাংগঠনিক কমিটি গঠিত হয় তারই আহ্বানে ১৯৪২ সালের ১৯-২০ ডিসেম্বরে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে অনুষ্ঠিত হয় সারা বাঙলার শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের প্রথম রাজ্য সম্মেলন। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে সভাপতিমণ্ডলীর চেয়ারম্যান নির্বাচিত করে প্রখ্যাত শিল্পী যামিনী রায়, সাহিত্যিক বুদ্ধদেব বসু, সুলেখক লীগ-নেতা হবিবুল্লাহ্ বাহার এবং সমালোচক আবু সয়ীদ আইয়ুবকে নিয়ে গঠিত এক সভাপতিমণ্ডলী এই সম্মেলনের কাজ পরিচালনা করেন। শিল্পী যামিনী রায় সম্মেলনে উপস্থিত হতে না পারায় সভাপতিমণ্ডলীতে তাঁর স্থান গ্রহণ করেন 'যুগান্তর'-সম্পাদক বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়। মহাপণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন-এর উপর অর্পিত হয়েছিল সম্মেলন-উদ্বোধন করার দায়িত্ব। কিন্তু তিনি অনিবার্যকারণে অনুপস্থিত থাকায় এই দায়িত্ব পালন করেন প্রখ্যাত সংস্কৃতিবিদ অতুলচন্দ্র গুপ্ত। অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান, 'পরিচয়'-সম্পাদক হিরণকুমার সান্যাল, সমবেত প্রতিনিধিদের জানান সাদর সম্বর্ধনা। যুগ্ম-সম্পাদক সুভাষ মুখোপাধ্যায় সম্মেলনে পেশ করেন সংঘের কর্মতৎপরতার প্রতিবেদন। ঢাকা, ময়মনসিংহ, খুলনা, মুর্শিদাবাদ, বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলার শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের কিছু সংখ্যক প্রতিনিধিও যোগ দিয়েছিলেন এই সম্মেলনে। হিন্দী-কবি অমৃত রায়, ওড়িয়া কবি শচীরাউত রায়, বাঙালী কবি অমিয় চক্রবর্তী, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবী নীহাররঞ্জন রায় প্রমুখ এই সম্মেলনে ভাষণ আর কবিতাপাঠে অংশ গ্রহণ করে যেমন উদ্দীপনার সঞ্চার করেছিলেন, তেমনি সম্মেলনে পরিবেশিত গণসঙ্গীতের নতুন রসধারায় পরিতৃপ্ত হয়েছিল সকলের মন।[১]

একথা সত্যি, এই সম্মেলন মূলত ফ্যাশিবাদের বিরুদ্ধে শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের এক ব্যাপকভিত্তিক গণফ্রন্ট গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিল। কিন্তু এটাও মিথ্যা নয় যে, এর পরবর্তীকালে, ব্যাপকভিত্তিক গণফ্রন্টের আশু প্রয়োজনে শিল্প-সাহিত্য তথা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য-বিচারের ক্ষেত্রে সমালোচনা-মূলক দৃষ্টিভঙ্গি প্রায় বর্জন করেই মার্কসবাদীরা এই আন্দোলনকে অগ্রসর

১. Hiren Mukherjee, 'Bengal Writers & Artists,' *People's War*, January 10, 1943 দ্রষ্টব্য।

করে নিয়ে যাওয়ার মধ্যে ইষ্ট খুঁজে পেয়েছিলেন। এসব ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও 'আগস্ট-বিপ্লবী'দের কমিউনিস্ট-বিদ্বেষ প্রচারের সকল অপচেষ্টাকে প্রতিহত করে ১৯৪৩ সালে বাঙলার সেই মহাদুর্দিনে 'ফ্যাশিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ' আর্ত মানুষের সেবার ব্রত গ্রহণ করেছিল, সৃজনশীল নানা রচনা—গল্প-কবিতা-নাটক আর গানে গানে মানুষের মনে জ্বালিয়ে দিয়েছিল আশার আলো। হরীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও বিনয় রায়-এর নেতৃত্বে গণনাট্য সংঘ-র শিল্পীদের নিয়ে গঠিত 'ভয়েস অফ বেঙ্গল' দল কলকাতা, পাটনা, এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ, দিল্লী, লাহোর, বোম্বে প্রভৃতি শহরে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করে এই সময় সংগ্রহ করেছিল এক লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা। আর এই টাকা বাঙলার শিল্পীরা তুলে দিয়েছিলেন 'পীপলস রিলিফ কমিটি'-র হাতে, দুর্ভিক্ষপীড়িত নর-নারীর সেবার জন্য।

আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন, এই নতুন সাংস্কৃতিক আন্দোলনের প্রতি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে সুপরিকল্পিত নেতৃত্ব ও নির্দেশ যতখানি আশা করা গিয়েছিল কিংবা সর্বোচ্চ স্তর থেকে এদিকে যতখানি দৃষ্টি দেওয়া উচিত ছিল, তা সব সময় পরিলক্ষিত হয় নি। কিন্তু একথা অবশ্যই স্বীকার্য যে, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির তৎকালীন সম্পাদক পি. সি. যোশীর ব্যক্তিগত উৎসাহ, প্রেরণা আর পরামর্শ এই আন্দোলনকে প্রসারিত ও শক্তিশালী করতে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অন্যতম নেতা, প্রখ্যাত কবি-সুরকার জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র পুরনো দিনের স্মৃতি-চারণায় পি. সি. যোশীর এই ভূমিকার কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করে লিখেছেন, "...পার্টির সেই গৌরবের দিনে, বিশেষত কালচারাল ফ্রন্টের সেই যুগান্তকারী কর্মকাণ্ডের দিনগুলিতে, যোশীর সৃজনশীল ও মানবিক নেতৃত্বের মুক্তকণ্ঠ প্রশংসা না করাটা খুবই অন্যায় হবে। গোটা সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের তিনিই ছিলেন প্রধান formulator, যোশী না হলে এসব এত অনায়াসে হত কিনা সন্দেহ।"[১]

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদক পি. সি. যোশী যেমন সাংস্কৃতিক ফ্রন্টে তাঁর ব্যক্তিগত দায়িত্ব পালনে অগ্রসর হয়েছিলেন, তেমনি বাঙলা দেশেও পার্টি-নেতৃত্বের মধ্য থেকে বঙ্কিম মুখার্জি, ভবানী সেন এবং সোমনাথ লাহিড়ীই

সম্ভবত বিভিন্ন সময়ে নানাভাবে তাঁদের ব্যক্তিগত পরামর্শ ও সহযোগিতা দিয়ে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অনেক জটিল-কুটিল সংশয় ও সংকট অতিক্রমণে সাহায্য করেছিলেন। চল্লিশের দশকের সাংস্কৃতিক আন্দোলনে এই চার-নেতার অবদান নিঃসন্দেহে তাই স্মরণযোগ্য।

এরপর ১৯৪৩ সালের মে মাসে বোম্বে শহরে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম কংগ্রেসের প্রাক্কালে অনুষ্ঠিত হল প্রগতি লেখক সংঘের তৃতীয় সর্ব-ভারতীয় সম্মেলন। এরি পাশাপাশি একটি ভিন্ন সম্মেলনের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক ভাবে গঠিত হয় ভারতীয় গণনাট্য সংঘ। ভারতের সকল রাজ্য থেকেই বহু প্রখ্যাত শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী 'প্রগতি লেখক সংঘ'-র তৃতীয় সম্মেলনে প্রতিনিধি রূপে যোগ দিয়েছিলেন। বাঙলাদেশ থেকেও গিয়েছিলেন সত্যেন্দ্র-নাথ মজুমদার, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বিষ্ণু দে, দেবব্রত বিশ্বাস, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, বিনয় রায়, শম্ভু মিত্র, বিজন ভট্টাচার্য, চিন্মোহন সেহানবীশ, সুভাষ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ প্রগতি-সংস্কৃতি আন্দোলনের নেতৃস্থানীয় প্রতিনিধিবর্গ।

বোম্বাই সম্মেলনে গৃহীত ফ্যাশিস্ত-বিরোধী যুদ্ধে শিল্পী-সাহিত্যিকের দায়িত্ব সম্পর্কিত ইস্তাহার, প্রস্তাব ও বক্তৃতাবলী পর্যালোচনা করলে আমরা বুঝতে পারি, এখানেও মতাদর্শগত সংগ্রামকে তেমন কোনো গুরুত্ব দেওয়া হয় নি, স্বতঃস্ফূর্ততার ঝোঁকই যেন প্রবল হয়ে উঠেছিল সম্মেলনের কর্মধারায়। সভাপতিমণ্ডলীর সদস্যরূপে কমিউনিস্ট নেতা এস. এ. ডাঙ্গে-র ভাষণটি ছিল এর একমাত্র ব্যতিক্রম। তিনি তাঁর ভাষণে মারাঠি-সাহিত্যের অগ্রগতির রূপরেখা তুলে ধরে মহারাষ্ট্রের গণ-আন্দোলনের সঙ্গে সাহিত্যের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক বর্ণনা-কালে এমন কিছু ঐতিহাসিক তথ্য উপস্থিত করেন যা প্রতিনিধিমণ্ডলীর মন স্পর্শ করতে সক্ষম হয়েছিল।

এই সম্মেলনেও পার্টির কোনো স্থায়ী সাংস্কৃতিক ফ্যাকশন গঠন করা সম্ভব হয় নি। এমন কি পার্টি-কংগ্রেসে আগত সর্বভারতীয় কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দ এই সময় বোম্বাইতে উপস্থিত থেকে ও প্রগতি লেখক এবং গণনাট্য সংঘ-র সম্মেলনের বিভিন্ন অধিবেশনে অনেকে ব্যক্তিগতভাবে যোগদান করেও পার্টির প্রথম কংগ্রেসের সুদীর্ঘ অধিবেশন চলা কালে তাঁদের কেউ-ই কিন্তু সাংস্কৃতিক ফ্রন্ট সম্পর্কে কোনো আলোচনা করলেন না কিংবা সাংস্কৃতিক ফ্রন্ট পরিচালনার জন্য কোনো নির্দেশক প্রস্তাবও গ্রহণ করলেন না। এর ফলে, ১৯৪৩ থেকে ১৯৪৭

সালের মধ্যে সংঘের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ক্রমশ নিষ্ক্রিয়তার অনিবার্য পথেই গা ভাসালেন।[১]

কেন্দ্রীয় প্রগতি লেখক সংঘ নিষ্ক্রিয়তার পথে পা বাড়ালেও এই সময় ভারতীয় গণনাট্য সংঘ কিন্তু কেন্দ্রীয়ভাবে যথেষ্ট সক্রিয় ও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। গণনাট্য সংঘের প্রতি পার্টি-নেতৃত্ব, বিশেষ করে পার্টি-সম্পাদক পি.সি. যোশী-র ব্যক্তিগত সহযোগিতা ও পরামর্শ এই সংগঠনের ব্যাপ্তি ও গণগত মান উন্নয়নে এক আশ্চর্য ফল প্রসব করে।

বোম্বাই সম্মেলনের পর, ১৯৪৪ সালের জানুয়ারি মাসে কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয় 'ফ্যাশিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ'-র দ্বিতীয় রাজ্য সম্মেলন। এই সময় কিংবা এর কিছু আগে-পরে, বাঙলাদেশে ফ্যাশিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের সঙ্গে যুক্ত নাট্য ও সঙ্গীতশিল্পীরা পৃথক ভাবে গঠন করেন 'ভারতীয় গণনাট্য সংঘ'-র রাজ্যশাখা। যাহোক, 'ফ্যাশিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ' এবং 'গণনাট্য সংঘ' বাঙলাদেশে তখন নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও সাহিত্য ও শিল্পের ক্ষেত্রে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করে চলেছেন। আমি পূর্বেই বলেছি, আগস্ট-বিপ্লব, দেশজোড়া মন্বন্তর, যুদ্ধাতঙ্ক, জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রের কমিউনিস্ট-বিদ্বেষ—এর সব কিছুই সেদিন কিভাবে মোকাবিলা করেছিলেন মার্কসবাদী শিল্পী-সাহিত্যিক আর বুদ্ধিজীবীরা। এই সংকটময় মুহূর্তে একদা সহযোগী অতুলচন্দ্র গুপ্ত, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, সজনীকান্ত দাস, সুবোধ ঘোষ প্রমুখ খ্যাতিমান সাহিত্যিকবৃন্দ যেমন প্রগতি-সংস্কৃতির ফ্রন্ট ত্যাগ করেছেন তেমনি মানবপ্রেমিক অনেক প্রবীণ ও নবীন শিল্পী-সাহিত্যিক এসে হাত মিলিয়েছেন প্রগতি-সংস্কৃতির সৃষ্টিমুখর কর্মযজ্ঞে।

এরি প্রতিফলন আমরা দেখলাম 'ফ্যাশিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ'-র দ্বিতীয় সম্মেলনে। সংঘের দ্বিতীয় সম্মেলনে মূল সভাপতি রূপে নির্বাচিত হলেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক প্রেমেন্দ্র মিত্র আর সভাপতিমণ্ডলীর সদস্যরূপে ১৫ জানুয়ারি থেকে ১৭ জানুয়ারি (১৯৪৪) পর্যন্ত সম্মেলনের কার্যসূচী পরিচালনায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, অতুল বসু, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, আবুল মনসুর আহ্মদ, গোপাল হালদার ও শচীন দেববর্মন-এর মতো বাঙলার

---

১. ১৯৪৭ সালে প্রকাশিত প্রগতি লেখক সংঘ-র বুলেটিনে সংঘ-সম্পাদক সজ্জাদ জহীর-এর প্রতিবেদন দ্রষ্টব্য।

সাংস্কৃতিক জগতের অগ্রগণ্য প্রতিনিধিবৃন্দ।

প্রথম সম্মেলনের তুলনায় দ্বিতীয় সম্মেলন সকল দিক দিয়েই সফল হল। প্রায় সমস্ত জেলা থেকে শতাধিক প্রতিনিধি যোগ দিয়েছিলেন এই সম্মেলনে। এখানেই আমরা প্রথম শুনলাম নিবারণ পণ্ডিত-এর মতো লোককবির পাঁচালী গান, অধুনা খ্যাত শিল্পী নির্মল চৌধুরী-র লোকসঙ্গীত, যশোহরের কবিয়াল নেপাল সরকার-এর কবিগান, মালদহের শিল্পী সতীশ মণ্ডল-এর গম্ভীরাগান আর রংপুরের অমূল্য সেন-সম্প্রদায়ের কীর্তন-সঙ্গীত। এছাড়া পানু পাল-এর 'মহামারী-নৃত্য', অনু দাশগুপ্ত-র 'চা-বাগিচা-নৃত্য' ও বিনয় রায়-এর 'মাঁয় ভূখা হুঁ' নাটিকা শ্রদ্ধানন্দ পার্কে সমবেত প্রায় ছয় সহস্রাধিক নর-নারীর প্রাণ-মনকে সেদিন সত্যিই মাতিয়ে দিয়েছিল। ১৭ জানুয়ারি মিনার্ভা থিয়েটারে বিজন ভট্টাচার্য-র 'জবানবন্দী' নাটক অভিনয়ের মধ্য দিয়ে শেষ হয় 'ফ্যাশিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ'-র দ্বিতীয় রাজ্য সম্মেলন।[১] তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি। এই সম্মেলনেই প্রেমেন্দ্র মিত্রকে সভাপতি আর জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র ও গোলাম কুদ্দুসকে যুগ্ম-সম্পাদক নির্বাচিত করে গঠিত হয় সংঘের নতুন কমিটি।

শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের ফ্যাশিবাদ-বিরোধী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বাঙলা দেশে যে নতুন সাংস্কৃতিক চেতনা পরিব্যাপ্ত হল নানা দিক দিয়ে তা তাৎপর্যপূর্ণ। এই সময় সৃজনশীল শিল্পী-সাহিত্যিকেরা তাঁদের নাগরিক বিচ্ছিন্নতা অনেকখানি কাটিয়ে উঠে স্বদেশের লোকায়ত সংস্কৃতির ভাণ্ডার থেকে আহরণ করতে চেষ্টা করেছেন সৃষ্টির প্রাণবন্ত সম্পদ, আবার নাগর-সংস্কৃতির গণমুখীন মানবিক বিষয়বস্তুকে নতুন আঙ্গিকে বিধৃত করে তাঁরা পৌছে দিতে চেয়েছেন নিপীড়িত লোকমানসের কাছে। আমরা দেখেছি, প্রতিভাধর নট ও নাট্য-পরিচালক শম্ভু মিত্র ছাত্রের মতো পাঠ গ্রহণ করতে যোগদান করেছেন ময়মনসিংহ জেলার কিসান-স্কুলে;[২] প্রখ্যাত শিল্পী নীরদ মজুমদার নেত্রকোণায় অনুষ্ঠিত সারা ভারত কিসান সভার সম্মেলনে অন্যান্য শিল্পী-বন্ধুদের সঙ্গে মিলে রাত-দিন পরিশ্রম করে সুসজ্জিত করেছেন বক্তৃতামঞ্চ; আর,

১. দ্র **Hiren Mukherjee, 'Shed your Pride, Join hands with the people,' *People's war*, February 13, 1944.**

২. ঐ

কৃষ্ণনগরের লোকশিল্পী লক্ষ্মী পাল টঙ্ক-আন্দোলনের কৃষকনেতা হৃদয় সরকারকে 'মডেল' করে নমনীয় মাটি দিয়ে শিল্প-সুষমামণ্ডিত সংগ্রামী কৃষকমূর্তি গড়ে সেটিকে স্থাপন করেছেন সম্মেলনের তোরণদ্বারে;[১] জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র আর বিজন ভট্টাচার্য দুর্ভিক্ষপীড়িত বাঙলার গ্রাম-শহরে যন্ত্রণাক্ষত হৃদয় দিয়ে ছুটে বেড়িয়েছেন আর সেই বঞ্চিত মানুষদের ব্যথা-বেদনা, আশা-আকাঙ্ক্ষাকে রূপায়িত করার জন্য রচনা করেছেন 'নবজীবনের গান' এবং 'নবান্ন'-র মতো নাটক। গোপাল হালদার, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সুশীল জানা প্রমুখ কথাশিল্পীর হাতে এই সময়কালেই অঙ্কিত হয়েছিল যুদ্ধ আর মন্বন্তরের ভাঙনধরা সমাজ-জীবনের কাহিনী—কখনো উপন্যাসের ব্যাপ্ত পরিসরে, কখনো-বা ছোটগল্পের পরিমিত তীক্ষ্ণতায়। কবিতার আত্মায় আর শরীরেও লক্ষ্য করা গিয়েছিল নতুন সমাজসত্য এবং আঙ্গিকগত পরীক্ষা-নিরীক্ষার বহুবিধ স্বাক্ষর।

এই পটভূমিকায়, সোভিয়েত ইউনিয়নের জনগণ এবং লালফৌজের অসীম ত্যাগ ও বীরত্বের মধ্য দিয়ে ফ্যাশিস্ত দানবেরা যখন পিছু হটতে শুরু করেছে, ইয়োরোপের রণাঙ্গনে নাৎসী বাহিনীর পরাজয় যখন প্রায় আসন্ন তখন ১৯৪৫ সালের মার্চ মাসে আবার এক সম্মেলনে মিলিত হলেন সারা বাঙলার 'ফ্যাশিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ'-র সকল স্তরের শিল্পী সাহিত্যিক এবং সাংস্কৃতিক কর্মীরা।

মহম্মদ আলি পার্কের সুসজ্জিত বিশাল মণ্ডপে ৩ মার্চ থেকে ৮ মার্চ—ছয়দিন ব্যাপী এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সর্ব অর্থে এত ব্যাপক, বৈচিত্র্যপূর্ণ অথচ তাৎপর্যময় সাংস্কৃতিক সম্মেলন সম্ভবত ইতিপূর্বে আর কোনোদিন অনুষ্ঠিত হয় নি। নগরকেন্দ্রিক আধুনিক সংস্কৃতির জীবনমুখী ধারার সঙ্গে গ্রামীণ লোকসংস্কৃতির প্রাণবন্ত ঐতিহ্যের সেতুবন্ধনের সচেতন ও সার্থক প্রচেষ্টা এই সম্মেলনকে সত্যিই এক ঐতিহাসিক মর্যাদা দান করেছিল। সম্মেলনের মূল সভাপতি ছিলেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। সভাপতি-মণ্ডলীতে আসন গ্রহণ করেছিলেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, ড. ধীরেন সেন-এর পাশাপাশি বাঙলাদেশের শ্রেষ্ঠতম লোককবি শেখ গোমহানী এবং বীরভূম জেলার

১. দ্র. গোপাল হালদার, 'বাঙালী সংস্কৃতির রূপ', পৃ. ১৩৭-৩৮।

খ্যাতিমান মৃৎশিল্পী পশুপতি ভট্টাচার্য।

সেদিন এই সম্মেলনকে অভিনন্দন জানিয়ে বক্তৃতা করেন প্রবীণ মনীষী ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, প্রখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা বঙ্কিম মুখার্জি ও সাংবাদিকপ্রবর সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার। আর, এই উপলক্ষে আয়োজিত 'এই আমাদের দেশ' নামে চিত্র-প্রদর্শনীটির উদ্বোধন করেন প্রখ্যাত শিল্পী অসিতকুমার হালদার। এই চিত্র-প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছিল সমকালীন বাঙলার শ্রেষ্ঠ শিল্পী অতুল বসু, রমেন চক্রবর্তী, বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, সুধীর খাস্তগীর, জয়নুল আবেদিন, সতীশ সিংহ, শৈল চক্রবর্তী, গোবর্ধন আশ, রথীন মৈত্র, মাখন দত্তগুপ্ত, মুরলীধর টালি, মণি রায় প্রমুখের বাঙলাদেশ-ভিত্তিক অপূর্ব চিত্রাবলী। ঢাকার মসলিন আর কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পেরও বেশ কিছু শ্রেষ্ঠ নিদর্শন রাখা হয়েছিল এই প্রদর্শনীতে।

সম্মেলনের বিভিন্ন অধিবেশনে একদিকে যেমন সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন হিরণকুমার সান্যাল, আবু সয়ীদ আইয়ুব, অমিয় চক্রবর্তী, বিষ্ণু দে, বিমলচন্দ্র ঘোষ, জ্যোতির্ময় রায়, অধ্যাপক ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, ড. নলিনাক্ষ সান্যাল-এর মতো কলকাতার সুধীসমাজের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধিরা, অন্যদিকে তেমনি চট্টগ্রাম থেকে প্রবীণ সংস্কৃতিসেবী মৌলভী আব্দুল করিম সাহিত্যবিশারদ, রংপুর থেকে মহিলা-সাহিত্যিক দৌলতুন্নেসা খাতুন, শ্রীহট্ট থেকে কবি অশোকবিজয় রাহা, জলপাইগুড়ি থেকে কথাসাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ও দিল্লী থেকে আগত অধ্যাপক আহমদ আলির মতো সাংস্কৃতিক আন্দোলনের প্রবীণ ও নবীন প্রতিনিধিরাও ভাববিনিময়ের জন্য দূরান্তরের বাধা অতিক্রম করে ছুটে এসেছিলেন মহানগরী কলকাতার এই সাংস্কৃতিক সম্মেলনে।

কলকাতার মানুষ এই সম্মেলন-মঞ্চে সেদিন সর্বপ্রথম এমন কয়েকজন প্রতিভাধর লোকশিল্পীর সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন, যাঁদের নাম স্মরণীয় হয়ে আছে তাঁদের স্মৃতিপটে। এঁদের মধ্যে রংপুর-স্কোয়াডের সঙ্গে আগত কোচবিহারের অন্ধগায়ক টগর অধিকারীর নাম নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য। তিনি 'দোতারা' নামক একটি বাদ্যযন্ত্রের সহযোগে তাঁর অপূর্ব কণ্ঠসঙ্গীতে মুগ্ধ করেছিলেন কয়েক সহস্র নর-নারীকে। এই সঙ্গে স্মরণীয় আগরতলার বাউল সঙ্গীত-শিল্পী সাহেব আলি, শ্রীহট্টের লোকসঙ্গীত-শিল্পী নির্মল চৌধুরী, খালেদ চৌধুরী আর কুমিল্লার অন্ধ-গায়ক ব্রজেন বিশ্বাসের নাম। গণনাট্য সংঘের

জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র এবং তাঁর সহযোগী শিল্পীরা ১৮৬০ সাল থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত রচিত দেশাত্মবোধক সঙ্গীত পরিবেশনে যে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছিলেন তাও ছিল এই সম্মেলনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ। এছাড়া চট্টগ্রামের দেশপ্রেমিক লোককবি রমেশ শীল বনাম কবিগানের রাজা শেখ গোমহানীর 'কবির লড়াই' বিকেল ৫টা থেকে শুরু করে রাতের শেষ প্রহর পর্যন্ত উৎকর্ণ হাজার হাজার শ্রোতার মনকে লোকসংস্কৃতির নতুন রসে মজিয়ে রেখেছিল।

প্রসঙ্গত মনে রাখা প্রয়োজন, গণনাট্য সংঘ এই সম্মেলনের মাত্র কয়েক মাস আগে (১৯৪৪ সালের ২৪ অক্টোবর) শ্রীরঙ্গম-মঞ্চে 'নবান্ন' নাটকের অভিনয়ের মধ্য দিয়ে বাঙলার নাট্য-জগতে এক নতুন ঐতিহাসিক সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছিল। বিজন ভট্টাচার্য ও শম্ভু মিত্র-র যুগ্ম-পরিচালনায় গণনাট্য সংঘের সেই ঐতিহাসিক পালাবদলের নাটক 'নবান্ন' আবার অভিনীত হল এই সম্মেলন-মঞ্চে; সেই সঙ্গে নৃত্যশিল্পী শান্তি বর্ধন-এর পরিচালনায় 'ভারতীয় গণনাট্য সংঘ'-এর কেন্দ্রীয় স্কোয়াড কর্তৃক অভিনীত হল 'ভারতের মর্মবাণী' নামক অপূর্ব এক নৃত্যনাট্য। সব কিছু মিলিয়ে চল্লিশের দশকের প্রথমার্ধে মার্কসবাদী শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের সংগঠিত প্রয়াস ফ্যাশিবাদ-বিরোধী সংগ্রামের মধ্য দিয়েই বাঙলার সংস্কৃতিকে গণতন্ত্রীকরণের পথে যে বহুদূর অগ্রসর করে দিয়েছিল, একথা অনস্বীকার্য। আর, সাংস্কৃতিক আন্দোলনে এই নতুন গণতান্ত্রিক চেতনার কথা উপলব্ধি করে এবং বিশ্বব্যাপী ফ্যাশিস্ত দানবশক্তির প্রত্যাসন্ন পরাজয়কে মনে রেখে, 'ফ্যাশিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ' এই সম্মেলনেই রূপান্তরিত হল 'প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ' নামে। সংঘের নতুন যুগ্ম-সম্পাদক নির্বাচিত হলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য।[১]

চল্লিশের দশকের প্রথমার্ধ জুড়ে মার্কসবাদী শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের কর্মকাণ্ডের যে বিস্তৃত বিবরণ এতক্ষণ উপস্থিত করলাম তার থেকে কয়েকটি বিষয় খুব পরিষ্কার হয়ে বেরিয়ে আসে।

প্রথমত, এই পর্বটি মার্কসবাদী শিল্পী সাহিত্যিকদের এক আশ্চর্য সৃজনশীলতার পর্ব। দ্বিতীয়ত, এই সৃজনশীলতা সার্থকতর পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়েছে সঙ্গীত-নাটক আর কবিতাকে কেন্দ্র করে। তৃতীয়ত, এই পর্ব অবক্ষয়ী

১. দ্র. Hiren Mukherjee, 'Bengal's leading writers and artists meet in conference,' *People's War*, April 1, 1945.

শহুরে সংস্কৃতির বেড়াজাল অতিক্রম করে লোকসংস্কৃতির জীবন্ত ঐতিহ্য গ্রহণ করতে অগ্রসর হয়েছে। চতুর্থত, শিল্প-সাহিত্য যে মানবমুক্তির সংগ্রামে এক বলিষ্ঠ হাতিয়ার হতে পারে, এই উপলব্ধির বাস্তব প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। পঞ্চমত, প্রতিক্রিয়ার শক্তিকে পরাভূত করার জন্য সকল স্তরের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীকে ব্যাপকভিত্তিক গণতান্ত্রিক ফ্রন্টে সংঘবদ্ধ করার সুদূর প্রসারী প্রভাব অনুভূত হয়েছে। ষষ্ঠত, আন্দোলনের কোনো বিশেষ স্তরে কিংবা জাতীয় জীবনের সংকটকালে মতাদর্শের সংঘাত উপস্থিত হলে ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির প্রয়োজনে একদা ঘনিষ্ঠ ও সহযোগী পেটিবুর্জোয়া শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীরা যে অক্লেশে ফ্রন্ট ত্যাগ করে প্রতিক্রিয়ার শিবিরে বসে শত্রুতামূলক আচরণ করতে পারেন, এটাও জানা গিয়েছে। সপ্তমত, সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের বিশেষ দায়-দায়িত্ব ও বৈশিষ্ট্য গভীরভাবে উপলব্ধি না করে আশু লাভের প্রয়োজনে জনযুদ্ধের রাজনীতিকে যেন-তেন প্রকারে সংঘের মঞ্চ থেকে প্রচারের মধ্য দিয়ে অনেক সময় ভিন্ন মতাদর্শী সহযোগীর মনে অকারণ তিক্ততা সৃষ্টির সুযোগ দেওয়া হয়েছে। অষ্টমত, সাংস্কৃতিক আন্দোলন যে নিরবচ্ছিন্ন মতাদর্শগত সংগ্রামেরই অঙ্গ, একথা প্রায়শ বিস্মৃত হয়ে সমালোচনা ও আত্মসমালোচনার সঠিক পথ শিল্প-সাহিত্য বিচারে যথার্থভাবে কোনোদিন প্রয়োগ করা হয় নি। নবমত, আমাদের অতীত সংস্কৃতির কোন ঐতিহ্য গ্রহণ এবং কোন ঐতিহ্য বর্জন করতে হবে, এর কোনো বিচার-বিশ্লেষণ না করেই সামগ্রিকভাবে অতীত সংস্কৃতির প্রতি নির্বিচার মুগ্ধদৃষ্টি বর্ষিত হয়েছে। দশমত, ফ্যাশিবাদ-বিরোধী সংগ্রামের মূল রণনীতি নির্ভুল হওয়া সত্ত্বেও জাতীয় জীবনের প্রবল সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতার সঙ্গে তাকে অঙ্গীভূত না করার রণকৌশলগত ভ্রান্তির ফলে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অন্তঃসার যথেষ্ট পরিমাণে খর্বিত হয়েছে এবং দেশপ্রেমিক মানুষের এক ব্যাপক অংশ, সাময়িক ভাবে হলেও, সাংস্কৃতিক আন্দোলনের বহু সদর্থক প্রচেষ্টাকে সন্দেহের চোখে দেখেছেন।

আমার এই পর্যালোচনা হয়তো একটু অপ্রাসঙ্গিক এবং দীর্ঘায়ত ; কিন্তু মার্কসবাদী সাহিত্য-বিচারের মূল প্রসঙ্গে পৌছাতে গেলে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পশ্চাদ্‌পট এবং তার ফলশ্রুতি নিবেদন করা ভিন্ন আর কোন পথ অবলম্বন করা সম্ভব? চল্লিশের দশকের সৃজনশীল শিল্প-সাহিত্যের বাস্তবভূমির

উপরেই তো ফলবে সমালোচনার সম্ভাব্য ফসল। প্রকৃতপক্ষে, যত সীমিতভাবে হোক না কেন, পূর্বোক্ত সময়সীমার মধ্যে ঘটনার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া এই ভাবেই ঘটেছে।

আমি পূর্বেই বলেছি, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শুরুতে 'অগ্রণী' পত্রিকা বন্ধ হয়ে যায় এবং 'অরণি' পত্রিকা হয়ে ওঠে প্রগতি-সংস্কৃতি আন্দোলনের মুখপত্র। ঢাকা থেকেও ১৯৪২ সালের মে-জুন মাসে (১৫ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৯) প্রগতি লেখক সংঘের মুখপত্র রূপে আত্মপ্রকাশ করে 'প্রতিরোধ' নামে একটি পাক্ষিক পত্রিকা। ১৯৪৩ সালের জুন মাসে 'প্রতিরোধ' রূপান্তরিত হয় মাসিকে। 'প্রতিরোধ'-ও ছিল "মার্কসবাদী ও ফ্যাশিবাদ-বিরোধী সাহিত্যের' ধারক ও বাহক। প্রথম দু-বছর এই পত্রিকাটি সম্পাদনা করেন কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত ও অচ্যুত গোস্বামী। পরবর্তীকালে এর সম্পাদনার দায়িত্ব অর্পিত হয় রণেশ দাশগুপ্ত ও অজিত গুহ-র উপর। এছাড়া কমিউনিস্ট পার্টির সাপ্তাহিক মুখপত্র 'জনযুদ্ধ' ও ***'People's War'*** মূলত রাজনীতির পত্রিকা হলেও এখানেও মাঝে-মধ্যে প্রকাশিত হতো কিছু সৃজনশীল রচনাসহ শিল্প-সাহিত্য বিষয়ক নিবন্ধ ও প্রবন্ধাবলী। আর চল্লিশের দশকের অন্য উল্লেখযোগ্য ঘটনা—'পরিচয়' পত্রিকার মালিকানা বদল। সম্ভবত, ১৯৪৪ সালের জুলাই-আগস্ট মাসে 'পরিচয়'-এর মালিক-সম্পাদক সুধীন্দ্রনাথ দত্ত পত্রিকার স্বত্ব-স্বামিত্ব স্বেচ্ছায় সমর্পণ করেন তাঁর মার্কসবাদী বন্ধুদেরই হাতে।

চল্লিশের দশকের প্রথমার্ধে উপর্যুক্ত পত্র-পত্রিকাগুলি ছিল মার্কসবাদী শিল্প-সাহিত্য প্রচারের তথা সাংস্কৃতিক আন্দোলনের প্রধান বাহন। কিন্তু একটা জিনিস এ-পর্বেও লক্ষ্যণীয়। নাটক ব্যতীত অন্য কোনো বিষয় নিয়ে এই সময় লিখিতভাবে প্রকাশ্যে তেমন কোনো সমালোচনা বা বিতর্কের সূত্রপাত ঘটে নি।

বিনয় ঘোষ-এর 'নূতন সাহিত্য ও সমালোচনা' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে প্রকাশিত বিরূপ মন্তব্য এবং তার প্রতিবাদে ১৯৪১ সালে অমল হোম মহাশয় কর্তৃক লিখিত 'কেরাণী রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধটির কথা আমি ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। সম্ভবত এর জের টেনে এবং 'সাম্যভাবাপন্ন বন্ধুদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব সম্বন্ধে মতভেদ' লক্ষ্য করে অধ্যাপক সুশোভন সরকার ১৩৪৮ সালের অগ্রহায়ণ মাসের 'পরিচয়' পত্রিকায় লেখেন 'রবীন্দ্রনাথ ও অগ্রগতি' নামক প্রবন্ধটি। এই

প্রবন্ধে সুশোভনবাবু 'রবীন্দ্রনাথের চিন্তা ও কর্মের মধ্যে প্রগতি-বিরোধী ধারণার অসদ্ভাব নেই' যেমন দেখাতে চেয়েছেন, তেমনি সামগ্রিকভাবে তিনি রবীন্দ্রনাথকে 'অগ্রগতির সহায়ক-রূপেই স্বীকার করে' নিয়েছেন। পরবর্তীকালে, ১৯৪৮ সালের অক্টোবরে, 'মার্কসবাদী'-র প্রথম সংকলনে বীরেন পাল ছদ্মনামে লিখিত ভবানী সেন-এর 'বাংলা সাহিত্যের কয়েকটি ধারা' নামক রচনায় রবীন্দ্রনাথের মূল্যায়নে এই প্রবন্ধের সুরই যেন আংশিকভাবে প্রতিধ্বনিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে চল্লিশের দশকের প্রারম্ভে 'পরিচয়' পত্রিকায় প্রকাশিত বসুধা চক্রবর্তী-র রবীন্দ্র-সমালোচনামূলক অন্য একটি প্রবন্ধের কথাও উল্লেখ করা যায়। আর, ১৩৫১ সালের শ্রাবণ মাসে 'পরিচয়' পত্রিকায় গোপাল হালদার 'ঔপনিবেশিক সমাজ ও উপন্যাসের যুগ' নামে যে প্রবন্ধটি লেখেন তার মধ্যে বিতর্কের উপাদান থাকা সত্ত্বেও দেখা গেল, শেষ পর্যন্ত এ নিয়ে কেউ কোনো আলোচনাই করলেন না। অর্থাৎ, প্রগতি সাহিত্য ও সংস্কৃতির আন্দোলন সংগঠিত হলেও তার বিচার-বিশ্লেষণে মার্কসীয় ধ্যান-ধারণার প্রয়োগ এখনও পর্যন্ত যেন ঔদাসীন্যের ভারে শ্লথগতি।

একটু যা ব্যতিক্রম দেখা গেল, তা নাটক নিয়ে। গণনাট্য সংঘের 'জবানবন্দী' ও 'নবান্ন' নাটকের অভিনয় এই সময় বাঙলার সংস্কৃতি-জগতকে সত্যিই চমকে দিয়েছিল। জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রগুলি সাধারণভাবে কমিউনিস্ট-বিদ্বেষ প্রচার করা সত্ত্বেও 'জবানবন্দী' ও 'নবান্ন' নাটকের তাৎপর্য ও সাফল্যকে যেমন স্বীকৃতি না জানিয়ে পারে নি তেমনি শুভবুদ্ধিসম্পন্ন বহু বিশিষ্ট শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীর অকুণ্ঠ অভিনন্দনেও তা ধন্য হয়েছে। প্রখ্যাত নাট্যকার শচীন সেনগুপ্ত, অভিনেতা নরেশ মিত্র, বিশ্বনাথ ভাদুড়ী এবং বিশিষ্ট সমালোচক ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় 'জবানবন্দী'-র অভিনয় দেখে মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করেছিলেন। অভিভূত ধূর্জটিপ্রসাদ লিখেছিলেন, "আমাদের সংস্কৃতি সম্বন্ধে Socialist realism এতদিন আমার কাছে ধরতাই বুলি ছিল। আজ আর নেই।"[১]

ধূর্জটিপ্রসাদ যেমন 'জবানবন্দী'তে 'socialist realism'-এর প্রথম প্রকাশ দেখে উল্লসিত হলেন, রঙ্গীন হালদার তেমনি এই নাটকের মধ্যে দেখলেন 'বাংলা নাট্যকলার নূতন সূচনা'। তাঁর অভিজ্ঞ চোখে গণনাট্য সংঘের

১. ১৯৪৪ সালের অক্টোবর মাসের শেষে প্রকাশিত ভারতীয় গণনাট্য সংঘের 'সুভেনির' দ্রষ্টব্য।

অভিনয়ে অনেক 'ত্রুটি' ধরা পড়ল, নাটকও যে 'পুরো নাটক' নয় কিছুটা 'চিত্র বা নক্‌সা' ধর্মী—এটাও তিনি লক্ষ্য করলেন। ১৩৫১ সালের শ্রাবণ মাসে 'পরিচয়' পত্রিকায় রঙ্গীন হালদার 'বাংলা নাটকের নূতন সূচনা' নামক প্রবন্ধে উপর্যুক্ত কথাগুলি লিপিবদ্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে একটি নির্দিষ্ট যুগের সামাজিক-আর্থনীতিক প্রেক্ষাপটে বাঙলার নাট্যকলার অতীত ঐতিহ্যের বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখালেন—গিরিশ-যুগ, রবীন্দ্র-যুগ আর শিশির-যুগের পার্থক্য—সফলতা আর ব্যর্থতার কারণ। এই তিন যুগের পটভূমিতেই তিনি স্থাপন করলেন চতুর্থ যুগে গণনাট্য সংঘের অবদান এবং প্রত্যক্ষ করালেন 'নাট্যকলার···অবরোধ-মুক্তির' নতুন সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ।

সত্যি কথা বলতে কি, রঙ্গীন হালদার মহাশয়ের প্রবন্ধটি মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন-এর উদ্ধৃতি-কণ্টকিত না হয়েও মার্কসবাদী শিল্প-সাহিত্য বিচারের ক্ষেত্রে একটি স্মরণীয় সংযোজন। 'বহুরূপী' পত্রিকার 'নবান্ন স্মারক সংখ্যা'-য় এই প্রবন্ধটি পুনর্মুদ্রিত হয়েছে; কিন্তু দুঃখের কথা, সেটি যে পূর্ণাঙ্গ পাঠ নয়—এ-সম্পর্কে কোনো উল্লেখ নেই। 'পরিচয়' পত্রিকা ছাড়া প্রবন্ধটির পূর্ণাঙ্গ পাঠ, যতদূর মনে পড়ে, পুনর্মুদ্রিত আকারে পাওয়া যাবে ১৯৪৭ সালে অগ্রণী বুক ক্লাব থেকে প্রকাশিত গোপাল হালদার-রচিত 'বাঙালী সংস্কৃতির রূপ' নামক প্রবন্ধ-গ্রন্থে।

এরপর 'নবান্ন'-র পালা। 'নবান্ন' নাটকের অভূতপূর্ব সাফল্যে বাঙলার সুধীসমাজের এক বিরাট অংশ তখন প্রকৃতই উৎফুল্ল। 'মহর্ষি' মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য সানন্দে 'জনযুদ্ধ' পত্রিকার ১৯৪৪ সালের নভেম্বর-দিবস বিশেষ সংখ্যায় একটি নিবন্ধে 'নবান্ন'কে অভিনন্দিত করলেন। 'অরণি' পত্রিকার ১৯৪৪-এর ২৭ অক্টোবর সংখ্যায় 'সুজা' নামের আড়ালে সুশীল জানা 'নবান্ন' সম্পর্কে যে আলোচনা করলেন তা প্রচলিত অর্থে মার্কসবাদ-সম্মত হলেও সেই আলোচনাতে 'নবান্ন'-র ত্রুটি-বিচ্যুতি নিয়ে কোনো কথা ছিল না; এর মধ্যে ফুটে উঠেছিল আলোচকের বিমুগ্ধ বিস্ময় আর নির্বিশেষ প্রশংসা। এর ব্যতিক্রম ঘটল 'পরিচয়' পত্রিকার ১৩৫১ সালের কার্তিক সংখ্যায়। 'নাট্যকলা: নবান্ন' এই শিরোনামে 'সংস্কৃতি-বিভাগে' অস্বাক্ষরিত যে নিবন্ধটি প্রকাশিত হয় তাতে অভিনয়-গুণের প্রশংসা করেও 'নাটক হিসাবে 'নবান্ন'কে মোটেই সক্ষম রচনা বলা চলে না'—একথা নির্দ্বিধায় ঘোষণা করলেন স্বাক্ষর-না-করা

নিবন্ধকার হিরণকুমার সান্যাল। এই নিবন্ধটি পাঠ করে মার্কসবাদী সাহিত্যিক স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য ক্ষুব্ধ কণ্ঠে প্রতিবাদ জানিয়ে বললেন, "…একখানা মোটেই সক্ষম নয় নাটককে আশ্রয় করে এতখানি ভালো অভিনয় হতে পারে বলে সহজ বুদ্ধি মানতে চায় না। …অনেকটা সক্ষম, কিছু সক্ষম, আধা-সক্ষম, সিকি সক্ষম—এমন একটা বিশেষণও কি 'নবান্ন'-র প্রাপ্য নয়? 'মোটেই সক্ষম রচনা বলা চলে না' কি সম্পাদকের অনবধানতা-প্রসূত মন্তব্য?"

স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য-র ঐ প্রতিবাদপত্র 'পরিচয়'-এর 'পাঠকগোষ্ঠী'-তে প্রকাশিত হয় ১৩৫১ সালের অগ্রহায়ণে। পরের মাসে, অর্থাৎ পৌষ-সখ্যা 'পরিচয়'-এ, 'নবান্ন' সম্পর্কে প্রকাশিত হয় দুটি নিবন্ধ। একটির রচয়িতা প্রবীণ কবি কালিদাস রায়, অন্যটির লেখক স্বয়ং পরিচয়-সম্পাদক হিরণকুমার সান্যাল। কালিদাস রায় 'নবান্ন'র অভিনয় দেখে সত্যিই চমৎকৃত হয়েছিলেন। তিনি অকপটে স্বীকার করলেন, "নবান্নের অভিনয় দেখিতে গিয়া আমি অশ্রু সংবরণ করিতে পারি নাই। এই অশ্রু অলস বাষ্প মাত্র নয়—সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ে একটা অকপট কল্যাণ বুদ্ধির উন্মেষ হইয়াছে। মনে হইয়াছে এই দুঃস্থ দুর্গতগণের জন্য আমার যতটুকু করিবার ছিল তাহা করা হয় নাই।

"মাটির যাহারা খাঁটি মালিক—আসল বাংলাদেশ যাহাদের সুখদুঃখের মধ্যে অবিরাম স্পন্দিত হইতেছে তাহাদের উপেক্ষিত জীবনযাত্রা লইয়া রচিত নাটক বাংলা সাহিত্যে এই বোধহয় প্রথম। এই নাটক পূর্ববর্তী কোন নাটকের অনুকৃতি নয়। ইহার বিষয়বস্তুতে মৌলিকতার দাবি অস্বীকার করিবার উপায় নাই। নবযুগে নাট্য সাহিত্যের ইহা অগ্রদূত।" ['নবান্ন', পরিচয়, পৌষ ১৩৫১]

আর হিরণকুমার সান্যাল অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রকাশিত স্বর্ণকল ভট্টাচার্য-র প্রতিবাদের প্রত্যুত্তরে কেন তিনি 'নবান্ন'কে নাটক হিসাবে 'মোটেই সক্ষম রচনা' বলে মনে করেন না তার কারণ বিশদ ও বিস্তারিতভাবে পেশ করে শেষ পর্যন্ত স্বীকার করেছেন, "'নবান্ন' নাটক হিসাবে—'নাটক' কথাটার উপর বিশেষ জোর দিয়ে বলছি—অক্ষম হলেও 'সীতা' বা 'আলমগীর'-এর মতন নিম্নশ্রেণীর রচনা নিশ্চয়ই নয়।

"…যদিও বিজনবাবু একটি সক্ষম নাটক লিখে উঠতে পারলেন না,…তবু এমন একটি নাটক রচনার চেষ্টা তিনি করেছেন যা শুধু চেষ্টার গুণেই স্মরণীয়। …সংলাপে, বিষয়বস্তুতে, ঘটনা-সমাবেশে, বিজনবাবুর কলম ও কল্পনা এতদূর

এগিয়েছে যে বাংলা রঙ্গমঞ্চে ও বাংলা সাহিত্যে তিনি নতুন হাওয়া এনেছেন এই কথা না বললে তাঁর প্রতি অবিচার হবে।" [ঐ]

'নবান্ন' নিয়ে 'পরিচয়' পত্রিকায় আরও কয়েকটি আলোচনা প্রকাশিত হয়। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় লিখলেন, "বাংলা সাহিত্যে নাটকের ক্ষেত্রে নূতন আবেগ এবং নূতন সুর যোজনা করেছেন বিজন ভট্টাচার্য। এই মন্বন্তরকে অবলম্বন করেই সে সুর, সে আবেগ পরিপূর্ণ বিকাশ লাভ করেছে। বিজন ভট্টাচার্যের নাটক ব্যাকরণ অনুযায়ী হয়ত এখনও আদর্শ নাটক হয় নাই, কিন্তু তাঁর রচনার মধ্যে যে প্রচণ্ড অবরুদ্ধ আবেগ সে সত্যই অতুলনীয়।" ['মন্বন্তর ও সাহিত্য', পরিচয়, চৈত্র ১৩৫১]

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ একই সংখ্যায় ভিন্ন সুরে কথা বললেন। তিনি একদিকে যেমন তুলে ধরলেন গণনাট্য আন্দোলনের সত্য উপলব্ধিকে, ধিক্কার জানালেন সাধারণ রঙ্গমঞ্চের মুনাফালোভী কর্মকর্তাদের অসহযোগী মনোভাবকে, অন্যদিকে তেমনি সৎ শিল্পীর মতো আত্মসমালোচনাও করলেন। এই প্রথম একজন মার্কসবাদী সাহিত্যিক নিজেদের সৃষ্টির দিকে শুধু মুগ্ধ-বিস্ময়ে তাকালেন না, আন্দোলনের ফলাফল থেকে শিক্ষা গ্রহণের জন্য নির্দ্বিধায় নিজের ত্রুটি উদ্ঘাটিত করে জানালেন, "কথা-শিল্পী হিসাবে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের কাছে একটি ব্যক্তিগত ঋণের কথা স্বীকার না করলে অন্যায় হবে। ...সাহিত্যিক হিসাবে আমার একটি ভীরুতা সম্বন্ধে এঁরা আমাকে সচেতন করেছেন। পাঠক সাধারণকে একটু বেশীরকম ভোঁতা ও একগুঁয়ে মনে করার প্রতিক্রিয়া অনেক লেখকের রচনাতেই কতগুলি অনাবশ্যক সতর্কতা হয়ে দেখা দেয় নানা ভাবে, সমস্ত রচনাটিকে প্রভাবান্বিত করে। লেখকের ভীরুতাই এজন্য দায়ী। সঙ্ঘের অভিনব প্রচেষ্টাকে সাধারণ দর্শক যে রকম উদারতার সঙ্গে গ্রহণ করেছেন তাতে আমি উপলব্ধি করেছি যে আমরাই, লেখক ও শিল্পীরাই, পাঠক ও দর্শক সাধারণের ঘাড়ে অযথা দোষ চাপাই, তাঁদের কতগুলি সঙ্কীর্ণতা ও বিরোধিতা স্বতঃসিদ্ধ বলে ধরে নিই। আসলে তাঁরা আমাদের সব রকম সুযোগ ও স্বাধীনতা দিতে সর্বদাই প্রস্তুত, আমরাই তাঁদের এই উদারতা স্বীকার করতে ভয় পাই। আমি বিশ্বাস করি নিজের এই দুর্বলতা চেনার ফলে আমার লেখার উন্নতি হবে।" ['ভারতের মর্মবাণী', পরিচয়, চৈত্র ১৩৫১]

এই আত্মসমালোচনা একমাত্র মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়-এর পক্ষেই সম্ভব। মার্কসবাদী সাহিত্য-শিবিরে তিনি ছিলেন সত্যিই এক বিরল ব্যতিক্রম। শ্রমিক-শ্রেণীর জীবনদর্শনই তাঁকে শিখিয়েছিল সমালোচনা আর আত্মসমালোচনার পথে নিজেকে অগ্রসর করে নিয়ে যেতে। 'নবান্ন' তথা গণনাট্য আন্দোলন সেদিন শুধু তাই বিতর্কের সৃষ্টি করে নি, সৃজনশীল শিল্পী-সাহিত্যিকের চেতনায় আত্ম-জিজ্ঞাসাও জাগ্রত করেছিল।

এগুলি তো সব সদর্থক দিকের কথা। উপর্যুক্ত আলোচনা এবং সমালোচনা পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে বাঙলার রঙ্গমঞ্চের তৎকালীন একঘেঁয়ে ক্লান্ত পরিবেশে দুর্গত কৃষক-জীবনের মঞ্চ-সফল শৈল্পিক উপস্থাপনায় প্রায় সকল আলোচক অথবা সমালোচক জীবন্ত নতুনের আস্বাদে আবিষ্ট এবং মুগ্ধ। এঁরা সকলেই তাই 'নবান্ন' নাটকের বিষয়বস্তুগত (cotent) সীমাবদ্ধতাকে উপেক্ষা করেছেন। এই দিক দিয়ে বিচার করলে, পরবর্তীকালে 'মার্কসবাদী' পত্রিকায় ১৯৪৯ সালের জুলাই মাসে প্রকাশিত এবং এই গ্রন্থে সংকলিত, প্রকাশ রায় ছদ্মনামে প্রদ্যোৎ গুহ-র 'বাংলা প্রগতি সাহিত্যের আত্মসমালোচনা' নামক প্রবন্ধের 'নবান্ন'-সম্পর্কিত আলোচনাটি প্রণিধানযোগ্য।[১] প্রদ্যোৎবাবুর আলোচনার উগ্রতা এবং 'আত্মসমালোচনা'র নামে অনেক ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত যদিও বর্জনীয় (লেখক বহু পূর্বেই এগুলি বর্জন করেছেন), তবু তিনি 'নবান্ন' নাটকের বিষয়বস্তুর মধ্যে মার্কসবাদীদের তৎকালীন সংস্কারবাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলনকে যেভাবে আবিষ্কার ও চিহ্নিত করেছিলেন, আজও তা বিচার বিবেচনার আশা রাখে।

নাচ-গান-নাটক—এগুলির আবেদন যেহেতু প্রবল ও প্রত্যক্ষ, সেইহেতু চল্লিশের দশকের মধ্যভাগ পর্যন্ত মার্কসবাদীদের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সিংহ-ভাগ দখল করে ছিল 'ভারতীয় গণনাট্য সংঘ'-র কৃতিত্বময় অবদানগুলি। সুতরাং প্রকাশ্য বিতর্ক প্রধানত নাট্য-আন্দোলনকে কেন্দ্র করেই তখন আবর্তিত হয়েছে।

এই কালে মার্কসবাদীদের মধ্যে সাহিত্যের অন্যান্য শাখা নিয়ে কোনো উল্লেখযোগ্য প্রকাশ্য বিতর্কের দৃষ্টান্ত এখনও পর্যন্ত আমার নজরে পড়ে নি। তবে

১. বর্তমান গ্রন্থের ৭৩-৭৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

"'পরিচয়' পত্রিকার ১৩৫২ সালের শ্রাবণ-সংখ্যায় বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত 'কবিতা' সম্পর্কে আলোচনা-প্রসঙ্গে হিরণকুমার সান্যাল যেসব মন্তব্য করেছিলেন, বিশেষ করে বুদ্ধদেব বসু-র নিজস্ব সৃষ্টি এবং তাঁর সামগ্রিক সাহিত্যদৃষ্টির প্রতি যে তীব্র কটাক্ষ হেনেছিলেন, তা সাহিত্যিক মহলে যথেষ্ট উত্তাপ সঞ্চার করেছিল। হিরণকুমার লিখেছিলেন, "সাহিত্যের অলিগলিতে অনির্দিষ্ট ভাগ্যান্বেষণের রোমাঞ্চকর চেষ্টা তিনি (বুদ্ধদেব বসু) বহুদিন ছেড়ে দিয়েছেন—বাইরের চাপে না, সম্পূর্ণ নিজের তাগিদে। এই তাগিদেই তিনি আশ্রয় নিয়েছেন সাহিত্যের রাজপথে বৃহৎ বৃক্ষের ছায়ায়, অর্থাৎ যে-রবীন্দ্রনাথকে পাশ কাটিয়ে একদিন তিনি স্ব-সমুখ শক্তিতে উদ্যত হয়েছিলেন সাহিত্যজগতে নব নবতর রাজ্যখণ্ড জয় করতে, সেই রবীন্দ্রনাথেরই কাব্যের আওতায়। এই নিরাপদ আশ্রয়ে তিনি আজ প্রায় স্থাণু হ'য়ে বসেছেন।

"ইতিমধ্যে বাংলার সাহিত্যে নতুন হাওয়া বইতে শুরু করেছে। বুদ্ধদেব বাবু সযত্নে এই হাওয়া থেকে গা বাঁচিয়ে প্রচার করেছেন শিল্পসৃষ্টির অনাদি ও অকৃত্রিম চিরন্তনতা। কিন্তু তবু এই হাওয়ায় যারা আলোড়িত হ'য়ে নতুন ছাঁদের রচনায় উৎসাহিত হয়েছে তাদের তিনি অবহেলা করেন নি, বরঞ্চ উৎসাহই দিয়েছেন, এমন কি মাঝে মাঝে তাদের আঙ্গিক পর্যন্ত কিছু কিছু আত্মসাৎ করবার চেষ্টা করেছেন—চিরন্তনী ভাবধারার কাঠামোর মধ্যে যতটা সম্ভব। সময়ে সময়ে মনে হয় এই কাঠামোই হয়েছে বুদ্ধদেব বাবুর কফিন, তাঁর সাহিত্যিক সমাধি ঘটেছে এরই অতলস্পর্শ অন্ধকারে।···প্রগতিকে উনি খুব উৎসাহের সঙ্গে বরণ করতে পারেননি, কিন্তু, প্রতিক্রিয়াকেও উনি কখনো আমল দেননি। এই জন্য বুদ্ধদেব বাবুর কাছে আমরা নিশ্চয়ই কৃতজ্ঞ। কিন্তু আমাদের কৃতজ্ঞতার এমন কি শক্তি আছে যে বুদ্ধদেব বাবুকে বাংলা সাহিত্যে সম্মানের আসন দিতে পারে? ইতিহাসকে যারা উপেক্ষা করে ইতিহাস তাদের মনে রাখে না।"[১]

'কবিতা'-সম্পর্কিত আলোচনায় সাহিত্যিক বুদ্ধদেব সম্বন্ধে এ বড় নির্মম মন্তব্য! কবি অরুণকুমার সরকার এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানান। তাঁর সেই প্রতিবাদপত্র প্রকাশিত হয় 'পরিচয়'-এর 'পাঠক-গোষ্ঠী'তে, ১৩৫২ সালের পৌষ

১. দ্র 'পত্রিকা-প্রসঙ্গ,' পরিচয়, শ্রাবণ ১৩৫২, পৃ. ৭৬-৭৭।

তিপ্পান্ন

সংখ্যায়। এই বিতর্কের জের চলেছিল 'পরিচয়'-এর মাঘ ও ফাল্গুন (১৩৫২) সংখ্যা জুড়ে। বিতর্কগুলির মধ্যে অজিতকুমার রাহা ও চিদানন্দ দাশগুপ্ত-র আলোচনা দুটি উল্লেখযোগ্য।

গোপাল হালদারও 'পরিচয়'-এর শ্রাবণ-সংখ্যায় (১৩৫২) ড. নীহাররঞ্জন রায়-এর 'রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা'-র সমালোচনা-প্রসঙ্গে কয়েকটি বিতর্কমূলক প্রশ্নের অবতারণা করেছিলেন। ড. নীহাররঞ্জন রায় রবীন্দ্র-সাহিত্যের আলোচনায় 'ঐতিহাসিক বোধ' এবং 'ঐতিহাসিক দৃষ্টি'-র যে 'শুভ পরিণয়' লক্ষণীয় বলে মনে করেছিলেন, গোপাল হালদার তা গ্রহণ করতে পারেন নি। তাঁর মতে, "রবীন্দ্রনাথের এই মানসিক বিবর্তনকে 'ঐতিহাসিক বোধ' বলা অপেক্ষা বলা উচিত—তাঁর বরাবরকার উদার আদর্শবাদের ও মানবতার স্বাভাবিক বিকাশ। ...ঐতিহাসিক শক্তি নিচয়ের বিচার বিশ্লেষণের উপর এর ভিত্তি নয়;...সুস্থ গণতন্ত্র যেমন শ্রেণীস্বার্থ ও ব্যক্তি-স্বার্থের মোহ কাটাতে পারলে পরিণত হয় সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতিতে, তেমনি সুস্থ উদারনীতি ও আদর্শবাদেরও ফ্যাশিস্ত বর্বরতার যুগে এরূপ পরিণতিই লাভ করবার কথা।"[২]

ড. নীহাররঞ্জন রায় ও গোপাল হালদার-এর উপর্যুক্ত দৃষ্টিভঙ্গি ও বক্তব্য নিয়ে নিশ্চয়ই বিতর্কের অবকাশ ছিল; কিন্তু মার্কসবাদীরা এই বিষয়ে তখন কোনো বিতর্কে প্রবেশ করেছিলেন, এমন নজীর আমি অন্তত খুঁজে পাই নি।

১৯৪৫ সালের মধ্যে প্রকাশিত অন্য যে বিতর্কমূলক রচনাটির কথা আমি উল্লেখ করতে চাই, সেটি লিখেছিলেন মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়। "কাব্যদৃষ্টি ও সমর সেনের 'তিন পুরুষ'"—এই নামে ১৩৫২ সালের পৌষ-এর 'পরিচয়'তে মঙ্গলাবাবু এটি লিখেছিলেন। সমর সেন-এর 'তিন পুরুষ' কাব্যগ্রন্থটির সমালোচনা-প্রসঙ্গে মঙ্গলাচরণ সেদিন মার্কসীয় যুক্তি-বিজ্ঞান প্রয়োগের এক চমৎকার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। 'সমর সেন ও অন্যান্য আধুনিক কবি থিয়োরীর ক্ষেত্রে বুদ্ধদেববাবুর সঙ্গে একমত না হলেও' কার্যত এঁরা 'কাব্য ও দর্শনের মৌল বিরোধের সমীকরণ' করে কেন একাত্ম হতে পারেন না তার কারণ বিশ্লেষণান্তে মঙ্গলাবাবু লিখেছিলেন, "কবির ব্যক্তিস্বরূপের অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং সেই ব্যক্তিসত্তার সঙ্গে শ্রেণীসমাজের অনবরত বিরোধ একাত্মতা উপলব্ধির এই

২. দ্র. 'পুস্তক-পরিচয়', ঐ, পৃ. ৬৫।

পদ্ধতিকে সর্বদাই সংকটাকুল ক'রে রাখে। সংকটের এই আবর্তে তাই কবির পক্ষে শেষপর্যন্ত দুটি পথ খোলা : হয় তিনি এই সংঘাতের মধ্যেই নতুন সংহতির ভিত্ রচনা ক'রে সামাজিক অগ্রগতিকে রক্তমাংসে সঞ্জীবিত ক'রে তুলবেন, তা না হ'লে, অন্ধ ঘূর্ণিপাকের জটিলতায় তিনি তলিয়ে যাবেন এবং হয়তো শেষকালে পালিয়ে বাঁচবেন কিংবা হার মেনে কবিতা লেখাই ছেড়ে দেবেন।"[১]

মঙ্গলাবাবুর ধারণা, সমর সেন-এর 'একাত্মতা-বোধ', 'নিষ্ক্রিয়তা-বোধ' এবং 'উগ্রতর স্বাতন্ত্র্য-বোধ'-এর মূল উৎস ঐখানেই নিহিত। সমরবাবুর 'তিন পুরুষ' কাব্যগ্রন্থে এই খণ্ডিত কাব্যদৃষ্টিরই প্রাবল্য। এবং কী আশ্চর্য,সমর সেন সম্বন্ধে মঙ্গলাবাবুর শেষ উক্তিটি আজ কত অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণিত সত্য !

পূর্বে উল্লিখিত রঙ্গীন হালদার-এর নাট্যবিষয়ক আলোচনাটি ছাড়া মঙ্গলা-চরণের মতো এমন গভীর বিতর্কমূলক অথচ মার্কসীয় দৃষ্টিসম্মত নন্দনতাত্ত্বিক আলোচনা এই পর্যায়ে প্রায় বিরল। আর একটি বিষয় সম্পর্কেও মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবীরা নীরব ছিলেন। আমাদের দেশের অতীত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্পর্কে গবেষণা এবং মার্কসীয় দৃষ্টিতে তার বিচার-বিশ্লেষণ ও পুনর্বিবেচনার প্রশ্নটিকে এই সময়কাল পর্যন্ত তাঁরা আদৌ গুরুত্ব দিয়ে অনুধাবন করার চেষ্টা করেন নি।

লিখিত এবং প্রকাশ্য এই বিতর্কগুলির পাশাপাশি মার্কসবাদীদের নিজস্ব শিবিরেও কিছু অপ্রকাশ্য বাদানুবাদ চালু ছিল। বিশেষ করে তারাশঙ্কর ও বিষ্ণু দে-র সাহিত্যদৃষ্টি এবং তাঁদের সৃজনশীল রচনার মূল্যায়নে মার্কসবাদীদের মধ্যে মাঝে মাঝে প্রবল মতপার্থক্য এবং তজ্জনিত বিতর্কও উপস্থিত হয়েছে। ***'People's War'*** পত্রিকায় তারাশঙ্কর ও বিষ্ণু দে সম্বন্ধে যে-রচনা প্রকাশিত হয় মার্কসবাদী শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের এক গরিষ্ঠ অংশ তার মধ্যে নির্ভেজাল 'স্তুতিবাদ' লক্ষ্য করে রুষ্ট হন এবং সেই বক্তব্যকে অভ্যন্তরীণ আলোচনায় তিক্ত সমালোচনায় বিদ্ধ করেন।

সত্যের প্রয়োজনে এ-প্রসঙ্গে একটি বিষয় উল্লেখ না করলে অন্যায় হবে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিষ্ণু দে নিঃসন্দেহে রবীন্দ্রোত্তর যুগের অন্যতম

১. দ্র. 'পুস্তক-পরিচয়,' পরিচয়, পৌষ ১৩৫২, পৃ. ৪০৬।

প্রধান কথাসাহিত্যিক ও কবি। এঁরা দুজনেই প্রগতি-সংস্কৃতি আন্দোলনকে সূচনাপর্ব থেকেই নানাভাবে সহায়তা দান করেছেন। কিন্তু একথাও সত্যি, এঁদের শিল্পদৃষ্টিকে মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবীদের একাংশ যেমন গ্রহণ করতে পারেন নি তেমনি এঁদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধকেও তাঁরা কোনোদিন ভালো চোখে দেখেন নি। এই দুইজন সম্পর্কে তাঁদের মনে সংশয়ের কাঁটা সম্ভবত সর্বদাই উদ্যত ছিল। আর, এই কাঁটার খোঁচায় তাঁরা নিজেরাই মাঝে মধ্যে একে অন্যকে ক্ষত-বিক্ষত করেছেন।

এই অপ্রকাশ্য বিতর্কের কথা সাংস্কৃতিক আন্দোলনের প্রবীণ নেতাদের মুখ থেকে যতটুকু শুনেছি তাতে মনে হয়েছে, ব্যাপারটা অনেক সময় গুরুতর আকারই ধারণ করেছে। বহু ক্ষেত্রে পার্টির সর্বোচ্চ নেতা, বিশেষ করে ভবানী সেনকেই হস্তক্ষেপ করতে হয়েছে সাংস্কৃতিক ফ্রণ্টের অভ্যন্তরীণ সংকট নিরসনের জন্য। হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়-এর 'তরী হতে তীর' গ্রন্থে এর স্বীকৃতি আছে। তিনি লিখেছেন, "পার্টি মহলে···বিনয় ঘোষ প্রভৃতি বেশ কয়েক জনের মনে তাঁর (বিষ্ণু দে) সম্বন্ধে নানান নালিশ জমা থাকত, মাঝে মাঝে প্রকাশও হয়ে পড়ত, এবং দুই তরফের লোক হয়ে আমার ঘটত অস্বস্তি, একাধিকবার পার্টি-সেক্রেটারী ভবানী সেন-এর সঙ্গে বসে ফয়সালার চেষ্টা হত— ভবানীবাবু অন্তত এ-সব ব্যাপারে অন্য পার্টিনেতার তুলনায় ছিলেন সাহিত্যিক সমস্যার সমঝদার।"[১]

প্রকৃত প্রস্তাবে, তারাশঙ্কর ও বিষ্ণু দে-র মূল্যায়নে হীরেনবাবুর দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গেই মার্কসবাদী সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীদের একাংশের বারংবার সংঘাত ঘটেছে। ঐ দুই সাহিত্যিক-ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে হীরেনবাবুর 'সমালোচনাহীন উচ্ছ্বাস' প্রধানত স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য, অরুণ মিত্র, বিজন ভট্টাচার্য, সুধী প্রধান, বিনয় ঘোষ ও অনিল কাঞ্জিলাল-এর বিরূপতার সম্মুখীন হয়েছে। গোপাল হালদার এবং চিন্মোহন সেহানবীশ কিছুটা পরিমাণে 'মধ্যপন্থা' অবলম্বন করলেও তাঁদেরও মোটামুটি সমর্থন ছিল শেষোক্ত পার্টি-সভ্যদের প্রতি।

এই সংঘাতের কারণগুলি আমাদের দীর্ঘকালীন অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আজ কিছুটা বিচার-বিশ্লেষণ করা যায়, আর কিছুটা পারা যায় অনুমান করতে।

১. দ্র. হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, 'তরী হতে তীর', পৃ ৪৪১-৪২।

হীরেনবাবু ও বিষ্ণুবাবু মূলত একই পালকের পাখি। তাঁদের শৈশব-কৈশোরের গৃহ-পরিবেশ, আধুনিক নাগরিক সভ্যতায় লালিত-পালিত মনের বিকাশ, শিক্ষা-দীক্ষা, একদিকে ইয়োরোপ-মনস্কতা অন্যদিকে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি টান—উভয়ের মনকে এমন এক মার্জিত বৈদগ্ধ্য দান করে যা শিল্প-সাহিত্যের 'শুদ্ধতা' এবং জটিল প্রকরণকলার প্রতিই তাঁদের অধিকতর বিশ্বস্ত করে তোলে। এর মধ্য দিয়ে এবং সম্ভবত অতিমার্জিত নাগরিক বৈদগ্ধ্য যে অহং-বোধের জন্ম দেয়, সেই শৈল্পিক অহংবোধকেই তাঁরা কেউ সৃজনশীলতায়, কেউ-বা গুণগ্রাহী আলোচকের ভূমিকায় নেমে পরিতৃপ্ত করতে চেয়েছেন। হীরেনবাবু কমিউনিস্ট পার্টির সক্রিয় নেতৃত্বে লিপ্ত থেকেও যেমন এই মানসিকতা সব সময় অতিক্রম করতে পারেন নি, তেমনি বিষ্ণুবাবুও শ্রমিকশ্রেণীর জীবনদর্শনের অনুরাগী হয়ে এবং 'সতত-সঞ্চরমান এই বিশ্বে মানুষের ইতিহাসের জঙ্গমতার প্রতি পর্যায়ে সাড়া' দিয়েও আজ পর্যন্ত তাঁর শিল্পগত মূল অবস্থানে প্রায় অটল এবং উর্ধ্বশির।

এর ভালো-মন্দ আজ আমার বিচার্য বিষয় নয়। আমি শুধু লক্ষ্য করেছি, সাংস্কৃতিক ফ্রন্টে হীরেনবাবুর প্রতিপক্ষীয়দের অধিকাংশই ছিলেন সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে আসা একটু ভিন্ন ধাতুতে গড়া মানুষ। এঁরা অন্তত সে-সময় ছিলেন কর্ম ও ঘর্মের সঙ্গে যুক্ত অধিক মাত্রায় পার্টিজান। তাঁরা তাই সঙ্গতভাবে দাবি করেছিলেন, গান্ধীবাদী দর্শনের দ্বারা প্রভাবান্বিত, কিছুটা পরিমাণে ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্রের প্রতি সহানুভূতিশীল অথচ উদার বুর্জোয়া মানবিকতার সাহিত্যিক-প্রতিনিধি তারাশঙ্কর-এর সৃষ্টিকর্মের নির্ভেজাল স্তুতির পরিবর্তে বন্ধুত্বপূর্ণ সমালোচনা এবং মার্কসীয় দর্শনের প্রতি অনুরক্ত রবীন্দ্রোত্তর যুগের অন্যতম প্রধান কবি বিষ্ণু দে-র অতিরিক্ত বুদ্ধিচর্চা, আঙ্গিকবিলাস ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধের কাব্যিক অভিব্যক্তিকে নির্বিচার প্রশংসাপত্র প্রদান না করে তাঁর প্রতি অন্তত কিঞ্চিৎ সমালোচনার দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে। মোটকথা, গণআন্দোলনমুখী সাহিত্য-চেতনার সারল্য এবং শুদ্ধাচারী শিল্পদৃষ্টি ও নাগরিক বৈদগ্ধ্যের জটিল মানসিকতার মধ্যে এই অভ্যন্তরীণ সংঘাত ও অপ্রকাশ্য বিতর্কের মূল প্রোথিত ছিল।

চল্লিশের দশকের প্রায় মধ্যভাগে সংঘটিত আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়ের প্রতি আমি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ১৯৪২-এর আগস্ট আন্দোলনের পর

যে উগ্র জাতীয়তাবাদ শিক্ষিত মধ্যবিত্তের একাংশকে কমিউনিস্ট-বিদ্বেষী করে তোলে সেই জাতীয়তাবাদই জন্ম দেয় এক ধরনের বিকৃত সাহিত্যের। এই সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিল প্রধানত সেদিনের তথাকথিত জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্র এবং সজনীকান্ত দাস পরিচালিত ও সম্পাদিত 'শনিবারের চিঠি'। হুমায়ুন কবীর-এর 'চতুরঙ্গ' এবং সঞ্জয় ভট্টাচার্য-সম্পাদিত 'পূর্বাশা' পত্রিকার কিছু পৃষ্ঠাও এই বিকৃতির ফসল সানন্দে ধারণ করে আছে। আজ ভাবতে আশ্চর্য লাগে, সেদিন মার্কসবাদকে হেয় প্রতিপন্ন করার কাজে কিংবা কমিউনিস্ট-চরিত্রকে হীন এবং ঘৃণ্য ভাবে আঁকবার জন্য বাঙলাদেশের প্রধান এবং খ্যাতিমান শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে তেমন বেশি সাড়া মেলে নি। কংগ্রেসনেতা কিরণশঙ্কর রায়-এর পৃষ্ঠপোষকতায়, সজনীকান্ত দাস-এর অধিনায়কত্বে এবং নিষ্ঠাবান কংগ্রেসকর্মী শচীন্দ্রনাথ মিত্র ও স্মৃতীশ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর উদ্যোগে, সম্ভবত ১৯৪৪ সালে, গড়ে ওঠে 'কংগ্রেস সাহিত্য সংঘ'। সৃজনশীল সাহিত্যিকদের মধ্যে বনফুল আর সুবোধ ঘোষ ঐ সময় কিংবা এর কিছু আগে-পরে রচনা করেন কমিউনিস্ট-বিদ্বেষ ও মিথ্যাচারে পরিপূর্ণ তাঁদের সেই কুৎসামূলক প্রচারধর্মী উপন্যাস 'অগ্নি' ও 'তিলাঞ্জলি'। মোহিতলাল ও ড. বটকৃষ্ণ ঘোষ-এর মতো খ্যাতিমান পণ্ডিতকেও সজনীকান্ত এই সময় ব্যবহার করেন মার্কসবাদ ও মার্কসীয় সাহিত্যের অন্তঃসারশূন্যতা প্রমাণের কাজে।

সজনীকান্ত দাস তথা 'কংগ্রেস সাহিত্য সংঘ'-র কমিউনিস্ট-বিদ্বেষী উগ্র জাতীয়তাবাদী প্রচার 'ফ্যাশিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ'-র সজীব কর্মপ্রচেষ্টাকে সেদিন একটুও ম্লান করতে পারে নি। এমন কি, প্রগতি-সংস্কৃতি আন্দোলনের একদা সহযোগী সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও বুদ্ধদেব বসু প্রগতির শিবির ত্যাগ করলেও প্রতিক্রিয়ার ঐ শিবিরেও শামিল হন নি। তাঁরা তখনও হিরণকুমার সান্যাল-কথিত 'পাপ ও পুণ্যের মধ্যবর্তী সংকীর্ণ পথে বিহার' করাকেই শ্রেয়ঃ বলে মনে করেছেন।

যাহোক, 'প্রগতি লেখক সংঘ'-র পাল্টা সংগঠন হিসেবে 'কংগ্রেস সাহিত্য সংঘ' গঠিত হলেও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সব কিছু কৃতিত্ব কংগ্রেসেরই প্রাপ্য—এই মনোভাব এবং উৎকট কমিউনিস্ট-বিদ্বেষ প্রাণপণে প্রচার করা সত্ত্বেও জনমনে 'কংগ্রেস সাহিত্য সংঘ' কিন্তু খুব বেশি প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। এই সংঘ-কর্তৃক পরিবেশিত 'অভ্যুদয়' নৃত্যনাট্যটি কিঞ্চিৎ জনপ্রিয়

হয়েছিল। যতদূর মনে পড়ে, সজনীকান্ত দাস ছিলেন এই নৃত্যনাট্যটির রচয়িতা এবং কৃতী সঙ্গীতশিল্পী সুকৃতি সেন ছিলেন এর সুরকার ও পরিচালক।

কংগ্রেস সাহিত্য সংঘ তার সীমিত জীবনে প্রগতি-সংস্কৃতি আন্দোলনের তেমন কোনো ক্ষতি করতে না পারলেও সজনীকান্ত দাস-সম্পাদিত 'শনিবারের চিঠি' কিন্তু শিক্ষিত মধ্যবিত্তের একাংশের মধ্যে, বিশেষ করে ছাত্র ও যুব-মানসে যথেষ্ট বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল। এই কাজে সজনীকান্ত ও বনফুল সবচেয়ে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন। সুবোধ ঘোষ এঁদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে 'তিলাঞ্জলি' লিখেছিলেন ব্যক্তিগত ক্ষোভ থেকে। সুবোধ ঘোষকে প্রতিক্রিয়ার শিবিরে ঠেলে দেওয়ার জন্য মূলত দায়ী ছিল নাকি হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়-এর কিছু অসতর্ক উক্তি এবং অমিত্রসুলভ আচরণ। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে প্রগতি-সংস্কৃতি আন্দোলনের অন্যতম প্রধান নেতা স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য অন্তত আমাকে সেই কথাই বলেছিলেন। হীরেনবাবুর 'তরী হতে তীর' গ্রন্থেও এই ঘটনার কিঞ্চিৎ স্বীকৃতি লিপিবদ্ধ আছে।[১]

সজনীকান্ত ও বনফুলেরা এই সময় কমিউনিস্ট-বিদ্বেষে এতই আচ্ছন্ন ছিলেন যে, তাঁরা সামান্যতম সাহিত্যিক-সততার পরিচয় দিতেও কার্পণ্য বোধ করেছেন। 'শনিবারের চিঠি'-র গল্প-কবিতা-উপন্যাস, প্রবন্ধ-নিবন্ধ, টীকা-টিপ্পনী —যেখানে যখন যে-পরিমাণে সম্ভব উগ্র কমিউনিস্ট বিদ্বেষের আগুনকে হাওয়া দিয়ে উস্কে দেওয়া হয়েছে। 'পচা feudal রক্তে / কম-red জন্ম নেয় পটাপট' জাতীয় রসিকতাও ১৯৪৪-৪৫ সালে পড়েছি 'শনিবারের চিঠি'-র পৃষ্ঠায়। তাঁদের এই মিথ্যাচারের মুখোশ খুলে দেওয়ার জন্য মার্কসবাদী শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীরা সে-সময় তেমন কোনো তৎপরতা দেখিয়েছেন, এমন কথাও বলা যায় না।

গোপাল হালদার-এর একটি রচনা অবশ্য এর উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। ১৯৪৫ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি ভারতীয় গণনাট্য সংঘ পরিবেশিত 'ভারতের মর্মবাণী' নামক নৃত্যনাট্যের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন সজনীকান্ত দাস ও বনফুল। গোপাল হালদারও তাঁর এই দুই বন্ধু-সাহিত্যিকের পাশাপাশি বসে সেই নৃত্যানুষ্ঠান দর্শন করেন। সজনীকান্ত ও বনফুল এতই অভিভূত হয়েছিলেন

১. দ্র. হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, 'তরী হতে তীর', পৃ. ৩৭৭-৭৮।

যে, অনুষ্ঠান চলাকালে ও শেষে গোপাল হালদার-এর কাছে তাঁরা উভয়েই নৃত্যনাট্যটির ভূয়সী প্রশংসা করে কংগ্রেস সাহিত্য সংঘ-র মাধ্যমে এই ধরনের অনুষ্ঠান করার ইচ্ছা ব্যক্ত করেছিলেন। কিন্তু ১৩৫১ সালের ফাল্গুন-সংখ্যা 'শনিবারের চিঠি'তে যখন 'ভারতের মর্মবাণী' সম্পর্কে অভিমত প্রকাশিত হল তখন দেখা গেল সেখানে সমগ্র অনুষ্ঠানের কুৎসিত নিন্দাবাদ ছাড়া আর কিছুই প্রায় দুর্লভ।

এই ঘটনা ব্যক্ত করে দারুণ শ্লেষ ও বিদ্রূপের সঙ্গে ১৩৫১ সালের ফাল্গুন মাসের 'পরিচয়' পত্রিকায় 'গণনাট্য সংঘের নৃত্যাভিনয়' শীর্ষক নিবন্ধটিতে গোপাল হালদার 'শনিবারের চিঠি'-র সম্পাদক সজনীকান্ত দাস ও সাহিত্যিক বনফুল-এর মিথ্যাচারের মুখোশ অনেকখানি উদ্ঘাটন করেন।

এই প্রসঙ্গে আর একটি স্মরণীয় প্রবন্ধের উল্লেখ না করলে গুরুতর অপরাধ ঘটবে। আমি যে সময়-পর্ব নিয়ে আলোচনা করছি, যদিও প্রবন্ধটি সেই পর্বের একটু পরে, অর্থাৎ ১৩৫২ সালের মাঘ মাসে প্রকাশিত, তবু সেই প্রবন্ধটিতে আমার আলোচ্য পর্বের মার্কসবাদ-বিরোধী তথাকথিত পণ্ডিতদের মিথ্যাচার, ভণ্ডামী ও অসার পাণ্ডিত্যকে এমন শাণিত ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ আর মার্কসীয় যুক্তি-বিজ্ঞানের মনীষাদীপ্ত আলোকে ছিন্নভিন্ন করা হয়, যার তুলনা বাঙলাদেশের মার্কসীয় সমালোচনা-সাহিত্যে সত্যিই বিরল। প্রবন্ধটি লিখেছিলেন প্রখ্যাত মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবী সরোজ আচার্য। রচনাটির শিরোনাম—'মার্কসবাদ ও স্বাধীনতা' এবং এটি প্রকাশিত হয়েছিল 'পরিচয়' পত্রিকার মাঘ-সংখ্যায় (১৩৫২)।

'শনিবারের চিঠি', 'চতুরঙ্গ' ও 'পূর্বাশা'-র উগ্র মার্কসবাদ-বিরোধিতার কথা ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। ঐ সব পত্র-পত্রিকায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন এক খ্যাতিমান পণ্ডিত ড. বটকৃষ্ণ ঘোষ 'মার্কসীয় জড়বাদ ও সমাজতন্ত্র (চতুরঙ্গ, পৌষ ১৩৫১), 'অভিব্যক্তি, প্রগতি ও বিপ্লব' (শনিবারের চিঠি, শ্রাবণ ১৩৫২) এবং 'সাম্য ও স্বাধীনতা' (শনিবারের চিঠি, কার্তিক ১৩৫২) নামে মার্কসবাদের চূড়ান্ত অপব্যাখ্যামূলক যেসব প্রবন্ধ লেখেন সরোজ আচার্য উপর্যুক্ত রচনায় ('মার্কসবাদ ও স্বাধীনতা') তার জবাবহীন জবাব দেন।

যেমন, ড. ঘোষ-এর মতে, "বানর ও মানবের ঐকান্তিক অনন্যত্ব সম্বন্ধে

Marx-এর মনে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই···মানবের বানরত্ব প্রতিপাদন Marxist-দের একটি মুখ্য প্রচেষ্টা।" সরোজ আচার্য-র জবাব, "কিন্তু এইরূপ "প্রতিপাদন" মার্কস করিবেন কিরূপে? মার্কস তো ঘোষ বা কৃপালনিদের[১] দেখিবার সুযোগ পান নাই, তাই মার্কস ও মার্কসবাদীদের মুখ্য প্রচেষ্টাই হইল— যে সমাজ-ব্যবস্থা "দো দো রূপেয়ায়" বুদ্ধিজীবীকে বাঁদরনাচ করিতে বাধ্য করে তাহার আমূল পরিবর্তন সাধন।" এই নিষ্করুণ polemical উক্তির পরেই সরোজবাবু *German Ideology* থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে প্রমাণ করেছেন যে, মার্কস 'বানর ও মানবের অনন্যত্বের কথা' কোনোদিন বলেন নি, বরং এর স্বাতন্ত্র্যের কথাই তিনি ব্যক্ত করেছেন।

যদিও বিরল দৃষ্টান্ত, তবু এক খ্যাতিমান পণ্ডিতের অজ্ঞতা ও অসত্য ভাষণকে সেদিন মার্কসবাদীরা চ্যালেঞ্জ করতে দ্বিধা করেন নি, এইটুকু অন্তত আজ আমাদের সান্ত্বনা।

এমনি ভাবে চলতে চলতে, শিল্প-সাহিত্য ও সংস্কৃতির জগতে বেশ কিছু সাফল্যের চিহ্ন এঁকে, কিছুটা ব্যর্থতার দায় কাঁধে নিয়ে, আর শিল্প-সাহিত্য কিংবা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য-বিষয়ক মতাদর্শগত সংগ্রামকে প্রায় পাশ কাটিয়ে, বাঙলার মার্কসবাদী শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীরা অবশেষে পৌঁছে গেলেন যুদ্ধান্তের নতুন পর্বে।

১৯৪৫ সালের মে মাস। বার্লিনের পতন-সংবাদ পৌঁছে গেল কলকাতায়। সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রধানতম শত্রু ফ্যাশিবাদের পরাজয়ে আনন্দে মুখর হয়ে উঠল শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ। ৪ মে অপরাহ্নে পঁচিশ হাজার নর-নারীর বিজয় মিছিলে শামিল হলেন কলকাতার শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের এক প্রধান অংশ। লাল পতকা হাতে শ্রমিক-ছাত্র আর মধ্যবিত্তের পাশে সেদিন হেঁটেছিলেন নতুন যুগের সংগ্রামী চেতনায় উদ্বুদ্ধ মানবাত্মার কারিগরেরা।

১৯৪৫ সালের ৪ মে বার্লিনের পতন ঘটলেও ফ্যাশিস্ত হিটলারের সামরিক বাহিনী বিনাশর্তে আত্মসমর্পণ করে আরও কিছুদিন পরে, ৮ মে রাতের শেষ প্রহরে। আর, হিটলারের দোসর ফ্যাশিস্ত জাপ-বাহিনী আত্মসমর্পণের দলিলে

১. কংগ্রেসনেতা জে. বি. কৃপালনি এই সময় উগ্র কমিউনিস্ট-বিদ্বেষ প্রচার করছিলেন। এখনও তিনি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও সোভিয়েত-বিরোধী কুৎসায় অক্লান্ত।—লেখক

স্বাক্ষর করে ১৯৪৫ সালের ১৪ আগস্ট। ফ্যাশিস্ত দানবের কবলমুক্ত নতুন দুনিয়ায় এরপর মার্কসবাদের অপরাজেয় শক্তি বাঁধ-ভাঙ্গা স্রোতের মতো আরও দুর্বার গতিতে অগ্রসর হতে থাকে।

যুদ্ধান্তের পরাধীন ভারতবর্ষেও এর ব্যতিক্রম ঘটে নি। যুদ্ধকালের মধ্যে বাঙলার মানুষ প্রত্যক্ষ করেছিল পঞ্চাশের মন্বন্তর, একান্নর মহামারী, চোরা-বাজারের রাজত্ব, মুনাফার ফাঁস, আমলাতন্ত্রের অপদার্থতা—সামগ্রিকভাবে বাঙালীর নৈতিক ও মানসিক জগতের বিপুল ভাঙ্গন। এর বিপরীতে দাঁড়িয়ে অশুভ শক্তির সকল অপপ্রয়াসকে ব্যর্থ করার জন্য সেদিন কমিউনিস্ট পার্টি এবং তার প্রতিটি গণ-সংগঠন যেভাবে লড়াই করেছিল, ভাঙ্গনধরা বাঙলার মানুষকে যেভাবে আশা আর উদ্দীপনা যুগিয়েছিল, তাও ভুলবার নয়। তাই যুদ্ধান্তের বাঙলায় যখন জাতীয় স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী গণঅভ্যুত্থান শুরু হল তখন এই কমিউনিস্টদেরই দেখা গেল তার পুরোভাগে।

যুদ্ধ-শেষে কারামুক্ত সর্বভারতীয় কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ ভারতীয় জনগণের সংগ্রামী চেতনাকে সঠিক পথে প্রবাহিত করার পরিবর্তে এ্যাটলি-ওয়াভেল-এর আপোষ নীতিকেই জাতীয় স্বাধীনতা অর্জনের সর্বোত্তম পথ বলে গ্রহণ করলেন। ফলে, দিল্লীর লালকেল্লায় আজাদ হিন্দ ফৌজের বন্দী নেতা শাহ্‌ নওয়াজ, সায়গল ও ধীলন-এর বিচার শুরু হলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ঔদ্ধত্যের বিরুদ্ধে যে প্রচণ্ড গণরোষ ফেটে পড়ল, ১৯৪৫ সালের ২১ নভেম্বর থেকে ২৩ নভেম্বর কলকাতার ছাত্রসমাজ পুলিশের লাঠি-গুলি-বেয়নেটকে উপেক্ষা করে যেভাবে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী বিক্ষোভের উত্তাল তরঙ্গে কলকাতার জনজীবনকে স্তব্ধ করে দিল, কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দ সংগ্রামী ছাত্র-জনতার সেই কৃতিত্বকে অভিনন্দিত করা দূরে থাক, অভূতপূর্ব এই গণজাগরণকে ধিকৃত করলেন কমিউনিস্টদের 'উস্কানি' ও 'গুণ্ডামি' বলে। কংগ্রেসনেতা শরৎচন্দ্র বসু-র কার্যকলাপ ও বিবৃতিগুলি এই প্রসঙ্গে আমরা স্মরণ করতে পারি। আর মনে মনে আবৃত্তি করতে পারি, এরি প্রতিক্রিয়ায় রচিত বিপ্লবী-কবি সুকান্ত-র সেই 'গুণ্ডার' দলে নাম লেখাবার অবিস্মরণীয় পঙ্‌ক্তিটি।

তারপর ১৯৪৬ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৫ ফেব্রুয়ারি 'রশীদ আলি দিবস'কে কেন্দ্র করে কলকাতার সংগ্রামী মানুষ ব্রিটিশ-শাসনকে অন্তত কয়েক-দিনের জন্য আবার অচল করে দিল। সেদিনও এই উত্তাল গণবিক্ষোভের প্রথম

সারিতে ছিল কমিউনিস্ট পার্টির নেতা ও কর্মীরা। বাঙলার তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী (মুখ্যমন্ত্রী) মুসলিম লীগ-নেতা হুসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দিকেও বিক্ষুব্ধ ছাত্র-জনতা বাধ্য করেছিল সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী এই মিছিলে শামিল হতে। ফেব্রুয়ারির শেষ সপ্তাহে ঘটল আরও অভাবনীয় ঘটনা। ভারতীয় নৌবাহিনীর সেনানীরা বোম্বাই আর করাচি বন্দরে বিদ্রোহ ঘোষণা করল, তাদের কামান-বন্দুক গর্জে উঠল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে। অবিস্মরণীয় এই গণজাগরণে মার্কসবাদী শিল্প-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীরা আর তাঁদের শুভানুধ্যায়ী সহযোগীরা এতটুকু নিষ্ক্রিয় ছিলেন না। তাঁরা যেমন জনতার ব্যারিকেডের পাশে দাঁড়িয়ে লড়াই করেছেন তেমনি শিল্পায়িত করতেও চেষ্টা করেছেন নভেম্বর-ফেব্রুয়ারির রক্তরাঙা দিনগুলোর অন্তর্নিহিত বাস্তব সত্য। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়-এর 'চিহ্ন' আর তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়-এর 'ঝড় ও ঝরাপাতা' উপন্যাসে অঙ্কিত আছে এই সব দিনের রক্ত-মাংসে গড়া মানুষের জীবন্ত ছবি।

যে কমিউনিস্ট-বিদ্বেষের কথা আমি ইতিপূর্বে বারংবার উল্লেখ করেছি তাও এই সময় প্রবল হয়ে উঠল। সাম্রাজ্যবাদের বিভেদনীতিকে পরাস্ত করার জন্য যেহেতু কমিউনিস্টরা আন্তরিকভাবে চেয়েছিলেন কংগ্রেস-লীগের ঐক্য, গণ-অভ্যুত্থানগুলিকে কংগ্রেস-লীগ-কমিউনিস্ট পার্টির মিলিত নেতৃত্বে পরিচালনা করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের হাত থেকে জাতীয় স্বাধীনতা ছিনিয়ে নিতে, সেইহেতু আপোষপন্থী কংগ্রেস আর লীগ উভয় দলের নেতাদের কাছে কমিউনিস্টরা হলেন চক্ষুশূল। তাঁদের উপর এই সময় গুণ্ডামিও শুরু হল। ১৯৪৫-এর ৯ ডিসেম্বর কবি গোলাম কুদ্দুস প্রহৃত হলেন, কালিঘাট আর হাওড়ায় আক্রান্ত হল কমিউনিস্ট পার্টির স্থানীয় অফিস, ১০ ডিসেম্বর বঙ্গবাসী কলেজে ছাত্র-ফেডারেশনের কর্মীরা নিগৃহীত হলেন, মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির সভ্যদেরও লাঞ্ছনার সম্মুখীন হতে হল ; সাংবাদিক নিখিল সেন কমিউনিস্ট হওয়ার অপরাধে আর হুমায়ুন কবীর মুসলিম লীগপন্থী নন বলে পরের মাসে রাজনৈতিক গুণ্ডামির শিকার হলেন। এই সব ঘটনার বিচার-বিশ্লেষণ করে সেদিন গোপাল হালদার তীব্র যন্ত্রণা আর ক্ষোভ নিয়ে একে একে লিখেছিলেন 'বিক্ষোভের হিসাব নিকাশ', 'ইতরতার বেসাতি', 'ইতরতার বিস্তৃতি' ইত্যাদি নামে ছোট ছোট নিবন্ধ।[১]

১. দ্র. পরিচয়, অগ্রহায়ণ, পৌষ ও মাঘ ১৩৫২।

ছোট হলেও এগুলির মধ্যে লিপিবদ্ধ আছে একটি বিশেষ ঐতিহাসিক সময়ের অনেক বড় সত্য-সাক্ষ্য।

এই সব 'ইতরতা' ও 'নোংরা' রাজনীতির পাশ কাটিয়ে এবং কংগ্রেস-লীগের বিভেদপন্থাকে অতিক্রম করে উত্তাল সময় ইতিহাসের হাত ধরে আঁকা-বাঁকা পথে ঠিকই অগ্রসর হয়ে গেল। ডাক-তার ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে মেহনতী মানুষ ২৯ জুলাই (১৯৪৬) কলকাতা সহ সারা বাঙলাদেশকে আবার স্তব্ধ করে দিল। কিছুদিন পরে, ১৯৪৬-এর ১৬ আগস্ট তবুও আমরা দেখলাম, মুসলিম লীগের 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম' সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির যূপকাষ্ঠে কী ভাবে হত্যা করল সংগ্রামী মানুষের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা। ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা আর রক্তের বন্যায় কলংকিত হল কলকাতার রাজপথ। অপরাজেয় মানুষ আবার রুখে দাঁড়াল, মনুষ্যত্বের এই ঘোর দুর্দিনে বাঙলার মার্কসবাদী ও গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন সকল স্তরের শিল্পী-সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবী জীবন বিপন্ন করেও দাঙ্গার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠলেন। বছর না ঘুরতেই দাঙ্গা-বিধ্বস্ত বাঙলাদেশের হৃদয় হতে বেরিয়ে এল আর এক অপরূপ মূর্তি। ১৯৪৬-৪৭ সালে শুরু হল সারা বাঙলা জুড়ে লক্ষ লক্ষ নিরন্ন ভাগচাষীর মৃত্যুঞ্জয়ী তে-ভাগা সংগ্রাম।

যত সহজে আমি যুদ্ধোত্তর অস্থির সময়ের অতি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা এখানে তুলে ধরছি, ব্যাপারটা মোটেই অত সহজ-সরল ছিল না। ইতিহাসকে এই সময় অনেক জটিল-কুটিল আর বঙ্কিম পথ পাড়ি দিতে হয়েছে। প্রগতিশীল শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের মানস-জগতেও ঘটেছে বিরাট পরিবর্তন। মার্কসীয় ধ্যান-ধারণাকে কেউ কেউ আরও শাণিত করে নিয়েছেন, কেউ-বা শঙ্কিত চিত্তে দোদুল্যমান অবস্থানও গ্রহণ করেছেন।

আমরা তাই দেখেছি, বার্লিন-দিবসে প্রগতি লেখক সংঘ-র ফেস্টুন নিয়ে অংশ গ্রহণ করাকে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় অনুমোদন করতে পারেন নি। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তিনি লেখক সংঘ থেকে পদত্যাগের হুমকি পর্যন্ত দিয়েছিলেন। ফররুখ আহ্মদ প্রগতির শিবির বর্জন করে সাম্প্রদায়িকতাবাদী মুসলিম লীগের আদর্শকেই ক্রমান্বয়ে ধ্রুব সত্য বলে মেনে নিয়েছেন। অন্যদিকে, ছাত্র ফেডারেশনের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন বাঙলার স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় সকল প্রতিভাবান সেরা ছাত্র-ছাত্রী। তরুণ লেখক ও শিল্পীদের মনে মার্কসবাদ ও প্রগতি লেখক সংঘ-র আকর্ষণ দুর্বার হয়ে উঠেছে। আজকের খ্যাতিমান

লেখক-শিল্পী ও বুদ্ধিজীবী রমেশচন্দ্র সেন, দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অশোক গুহ, দেবব্রত মুখোপাধ্যায়, অমল দাশগুপ্ত, সমরেশ বসু, বুলবুল চৌধুরী, প্রদ্যোৎ গুহ, রামেন্দ্র দেশমুখ্য, অরুণাচল বসু, আশীষ বর্মন, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, জগন্নাথ চক্রবর্তী, অসীম রায়, সিদ্ধেশ্বর সেন, মৃগাঙ্ক রায়, চিদানন্দ দাশগুপ্ত, সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সত্যপ্রিয় ঘোষ, রাম বসু, অমলেন্দু গুহ, দীপ্তিকল্যাণ চৌধুরী, বিমল ভৌমিক, কৃষ্ণ ধর, সলিল চৌধুরী, সরদার ফজলুল করিম, মুনীর চৌধুরী, সানাউল হক প্রমুখ আরও অনেকে সরাসরি অথবা ছাত্রফেডারেশনের মধ্য দিয়ে প্রাক-স্বাধীনতা কালেই প্রগতি-সংস্কৃতির আন্দোলনে যুক্ত হয়েছেন।

যুদ্ধোত্তর ও প্রাক-স্বাধীনতা কালপর্বে শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রে মার্কসবাদী ধ্যান-ধারণার প্রয়োগে ও চিন্তা-চৈতন্যের প্রসারে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন বোধহয় গোপাল হালদার, নীরেন্দ্রনাথ রায় ও অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র। ১৯৪৪ সালের অক্টোবর মাসে কমিউনিস্ট কর্মীদের জন্য লেখা গোপাল হালদার-এর 'কালচার ও কমিউনিস্ট দায়িত্ব' নামক প্রবন্ধটি এই প্রসঙ্গে নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য। এই প্রবন্ধে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে 'সংস্কৃতি' বলতে কমিউনিস্টরা কি বোঝে, তাঁদের দৃষ্টির সীমাবদ্ধতা এবং তা অতিক্রম করার পন্থা, শ্রমিকশ্রেণী সভ্যতা ও সংস্কৃতির কোন উত্তরাধিকার গ্রহণ করবে, কি তার আজকের দায়-দায়িত্ব ইত্যাদি প্রশ্ন সেই সময়কালের পক্ষে যতটা সুন্দর ভাবে তুলে ধরা সম্ভব তারই চেষ্টা তিনি করেছিলেন। একজন মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবী যত সীমাবদ্ধভাবেই হোক না কেন, এই প্রথম 'কালচারের মানে কি, সেদিকে কমিউনিজমের কি ভূমিকা, কমিউনিস্ট পার্টির দায়িত্ব কতটা, বাঙলা-দেশে কালচারাল সংকটের স্বরূপ কি, তা কতটা জটিল, কতটা জরুরী'[১]—সেদিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন।

নীরেন্দ্রনাথ রায়ও এর কিছু পরেই তাঁর 'সাম্প্রতিক বিচারে শেকসপীয়র' (পরিচয়, ফাল্গুন ১৩৫২) এবং 'কবিতায় বক্তব্য' (পরিচয়, শারদীয় সংখ্যা, ১৩৫৩) শীর্ষক প্রবন্ধে শেকসপীয়র-বিচারে থিয়োডোর স্পেনসার-এর ভাববাদী দৃষ্টির সীমাবদ্ধতা খণ্ডন করে কডওয়েল ও স্মিরনভ-এর মার্কসবাদী বিশ্বদৃষ্টির আলোকে শেকসপীয়র-এর কাল ও তাঁর সৃষ্টিকর্ম বিচার-বিশ্লেষণ করতে যেমন

১. দ্র. গোপাল হালদার, 'বাঙালী সংস্কৃতির রূপ', পৃ. ১২১-২৯।

প্রয়াস পেয়েছেন, তেমনি মাইকেল-এর 'মেঘনাদ বধ' এবং রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী' ও 'উর্বশী' কবিতার নতুন মার্কসীয় ব্যাখ্যাও দান করেছেন। বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যের তুলনামূলক বিচারে এবং শ্রেণীদৃষ্টিতে সাহিত্যের সত্যমূল্য আবিষ্কারের এই প্রচেষ্টায় নীরেন্দ্রনাথ রায় অবশ্যই পথিকৃৎ। শুনেছি, সে-সময় মাইকেল-রবীন্দ্রনাথের কবিতার মার্কসীয় ব্যাখ্যার জন্য নীরেন্দ্রনাথকে তাঁর বন্ধুজনদের কিছু ঠাট্টা-বিদ্রূপের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। কিন্তু এসব ছিল ঘরোয়া আড্ডার আলোচনা, নীরেন্দ্রনাথ-এর বক্তব্যের বিরুদ্ধে কোনো লিখিত নিদর্শন এখনও আমি খুঁজে পাইনি।

অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র শিল্প-সাহিত্য নিয়ে এই সময় কোনো প্রবন্ধ রচনা না করলেও মার্কসীয় অর্থনীতির আলোচনায় তিনি বেশ বলিষ্ঠভাবেই অগ্রসর হয়েছিলেন। তাঁর 'কেইন্‌সীয় অর্থনীতি' (পরিচয়, জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৩) ও লিয়নটিয়েভ-এর 'মার্কসীয় অর্থনীতি' (পরিচয়, 'পুস্তক-পরিচয়', পৌষ ১৩৫৩) সম্পর্কে আলোচনা দুটি মার্কসবাদী চিন্তাচর্চার মূল ভিত্তিকে সুদৃঢ় করতে সেদিন নিঃসন্দেহে খুব সাহায্য করেছিল। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় 'পরিচয়' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত-র 'ভারতীয় সমাজপদ্ধতির উৎপত্তি ও বিবর্তনের ইতিহাস' নামক প্রবন্ধাবলীর কথা। ড. দত্ত মার্কসবাদী সমাজবিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে ভারতীয় সমাজ-জীবনকে তাঁর সাধ্যমত সেদিন বিচার-বিশ্লেষণ করেছিলেন।

শিল্প-সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই পর্বে আর যাঁরা মার্কসবাদকে প্রয়োগ করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে বিনয় ঘোষ অন্যতম। 'আধুনিক রূপ-বিদ্যার একদিক' (পরিচয়, শ্রাবণ ১৩৫২) 'সংস্কৃতির তত্ত্ব-বিচার' (পরিচয়, 'পুস্তক-পরিচয়', বৈশাখ ১৩৫৩) কিংবা 'আধুনিক বিজ্ঞান ও সাহিত্য' (পরিচয়, শারদীয় সংখ্যা, ১৩৫৩) ইত্যাদি প্রবন্ধে বিনয়বাবু মার্কসবাদ ও বিজ্ঞানের সর্বাধুনিক আবিষ্কৃত তত্ত্ব ও তথ্যকে নিষ্ঠার সঙ্গেই প্রয়োগ করে যথাক্রমে প্রাচীন যুগের সৌন্দর্যতত্ত্ব ও আধুনিক যুগের সৌন্দর্যতত্ত্বের পার্থক্য নিরূপণ করতে চেয়েছিলেন, আলোচনা করেছিলেন বিখ্যাত নৃবিজ্ঞানী ব্রনিস্লোভ ম্যালিন-ভস্কি-র '*A Scientific Theory of Culture and other Essays*' অবলম্বনে মানব-সংস্কৃতির 'বাস্তব হাতিয়ার' (**material tools**) ও 'মানসিক হাতিয়ার' (**Spiritual tools**)-এর প্রসঙ্গ, এক কথায় মার্কস-এঙ্গেলস-কথিত বস্তুজগৎ ও

ভাবজগতের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-মিলনের সম্পর্ক ; আর আধুনিক সাহিত্যের সুস্থ ও স্বাভাবিক বিকাশের জন্য আধুনিক বিজ্ঞানের বাস্তব (Technical) ও দার্শনিক (Ideology) তত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞানার্জন যে কত প্রয়োজন—তার প্রতিও তিনি আমাদের সাহিত্যিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছিলেন, "গতানুগতিকতা ও জড়তার চেয়ে নতুনের পথে দুঃসাহসিক অভিযান অনেক ভাল। কারণ, 'জীবনের ধর্ম্ম' তাই, এবং 'সাহিত্য ধর্ম্ম'ও তাই হওয়া উচিত।"

বিনয়বাবুর শেষোক্ত প্রবন্ধটির বক্তব্য বিতর্কের সম্মুখীন হয়। ১৩৫৩-এর পৌষ-সংখ্যা 'পরিচয়' পত্রিকার 'পাঠক-গোষ্ঠী'-তে বিষ্ণুকুমার মুখোপাধ্যায় প্রবন্ধ-লেখকের যান্ত্রিক দৃষ্টিকে আক্রমণ করে লেখেন, "উপন্যাসে new tools সম্পর্কে তাঁর ধারণাটা new tools of Production-এরই সঙ্গে এমন একটা যান্ত্রিক ঐক্যে বন্দী হয়ে গেছে যে, নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে, বিজ্ঞানের জীবনদর্শনের সঙ্গে শিল্প-সাহিত্যের new tools-এর প্রশ্নটি যে ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে তা তিনি দেখতে পান নি। কারণ হল তাঁর যান্ত্রিক চিন্তার ফল।" [ঐ, পৃ. ৪৫১]

সমসাময়িক কালে মার্কসবাদী শিল্পী-সাহিত্যিকদের সৃজনশীল রচনাকে 'প্রচারবাদী' সাহিত্য নাম দিয়ে ভিন্ন মতাদর্শের কোনো কোনো লেখক আক্রমণ করতে শুরু করেন। এই সময় কবি অজিত দত্ত-র সম্পাদনায় 'দিগন্ত' নামে একটি বার্ষিক সাহিত্য-সংকলন প্রকাশিত হয়। ঐ সংকলনে সর্বজনমান্য সাহিত্যিক অতুলচন্দ্র গুপ্ত একটি প্রবন্ধ লেখেন। প্রবন্ধটির নাম 'কংগ্রেস সাহিত্য সংঘ'। অতুলচন্দ্র যেহেতু তখন 'কংগ্রেস সাহিত্য সংঘ'-র অন্যতম কর্ণধার, সেইহেতু তিনি ঐ সংঘের আদর্শ ও উদ্দেশ্য ব্যক্ত করতে বসে কমিউনিস্ট সাহিত্যিকদের নাম না করেও কার্যত তাঁদের সৃজনশীল রচনাকে রাজনৈতিক প্রচারের উদ্দেশ্যে নিবেদিত বলে উল্লেখ করেন এবং এর বিপরীতে, 'কংগ্রেস সাহিত্য সংঘ' থেকে প্রচারে নামা উচিত কাজ হয়েছে বলে উপসংহার টানেন।

অতুলচন্দ্র গুপ্ত এবং তাঁর মতানুসারীদের বক্তব্যের একটি চমৎকার জবাব দিয়েছিলেন চিদানন্দ দাশগুপ্ত। ১৩৫৩-র আষাঢ় মাসের 'পরিচয়'-তে "'প্রচারবাদী' সাহিত্য" নামে চিদানন্দবাবুর সেই প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। একজন মার্কসবাদী, সাহিত্যে 'প্রচার' বলতে কি বোঝেন, কমিউনিস্টরা যা 'প্রচার' করেন তা কেন সাহিত্যধর্মের সঙ্গে সমন্বিত, কমিউনিস্ট-সাহিত্যিক চাপানো কর্তব্যের তাগিদে, না প্রাণের তাগিদে সাহিত্য সৃষ্টি করেন—মার্কসীয় যুক্তি-

বিজ্ঞানের সাহায্যে আমাদের দেশের বাস্তব দৃষ্টান্ত তুলে ধরে চিদানন্দবাবু তা বিচার-বিশ্লেষণ করেন। সাহিত্যক্ষেত্রে ভিন্ন মতাদর্শীদের আক্রমণ প্রতিহত করে স্বীয় মতাদর্শ প্রতিষ্ঠা করার একটি উজ্জ্বল নিদর্শন উপর্যুক্ত প্রবন্ধটি।

এতকাল আমরা যে মতাদর্শগত সংগ্রামের প্রতীক্ষায় ছিলাম, যুদ্ধোত্তর বাঙলায় মার্কসবাদে দীক্ষিত শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীরা সেই দিকে আর একটু দৃঢ় পায়ে যেন অগ্রসর হতে চেষ্টা করলেন। এই পর্যায়ে একটি বিতর্কের কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। বিতর্কটির সূত্রপাত ঘটে পাটনা থেকে প্রকাশিত 'প্রভাতী' পত্রিকায়, ১৩৫৩ সালের অগ্রহায়ণ মাসে সুবোধ দাশগুপ্ত-রচিত 'নূতন সাহিত্য' শীর্ষক একটি প্রবন্ধকে কেন্দ্র করে।

'প্রভাতী' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন মণীন্দ্রচন্দ্র সমাদ্দার। ইনি সম্ভবত মানবেন্দ্রনাথ রায়-এর র‍্যাডিকাল হিউম্যানিস্ট-পন্থায় বিশ্বাস করতেন। এঁর সম্পাদিত 'প্রভাতী' পত্রিকায় ১৯৪৬-৪৭ সালে দেখেছি বাঙলার বহু প্রগতিশীল সাহিত্যিকের নানা রচনা প্রকাশিত হতে। আমি নিজেও ১৯৪৭-৪৮ সালে 'প্রভাতী' পত্রিকায় কয়েকটি কবিতা লিখেছিলাম এবং মণীন্দ্রবাবুর আগ্রহাতিশয্যে তাঁর সম্পাদিত ইংরেজী সাপ্তাহিক '*Behar Herald*'-এ 'Role of the Litterateurs in our Social Revolution' নামে শ্রীমতী এলেন রায়, শিবনারায়ণ রায় যে-বিতর্কটি শুরু করেছিলেন সেই বিতর্কে, আমার জীবনে প্রথম এবং আজ পর্যন্ত শেষ, একটি ইংরাজী রচনার মাধ্যমে অংশও গ্রহণ করেছিলাম। মণীন্দ্রবাবুর বিতর্কিত রচনার প্রতি আকর্ষণ থেকেই বোধহয় 'প্রভাতী' পত্রিকায় সুবোধ দাশগুপ্ত-র উক্ত রচনাটি প্রকাশিত হয়।

'প্রভাতী' পত্রিকার ফাইল আমার কাছে নেই। সুতরাং বলতে পারব না, ঐ রচনা নিয়ে 'প্রভাতী' পত্রিকায় কি ধরনের আলোচনা পরিবেশিত হয়েছিল। তবে অন্য একটি আলোচনার সূত্রে জানতে পারছি 'প্রভাতী' পত্রিকার বিতর্কে যোগ দিয়েছিলেন কবি অরুণকুমার সরকার, অশোক মিত্র প্রমুখ লেখকবৃন্দ। আর কলকাতায় প্রগতি-সংস্কৃতির মুখপত্র 'পরিচয়'-তে যে বেশ সোরগোল উঠেছিল তার দৃষ্টান্ত তো আমার হাতের কাছেই আছে।

সুবোধ দাশগুপ্ত-রচিত 'নূতন সাহিত্য' প্রবন্ধটির মূল প্রতিপাদ্য ছিল—প্রগতিশীল লেখকেরা প্রগতির নামে যে-সাহিত্য সৃষ্টি করছেন তার মধ্যে প্রগতির নাম-গন্ধ নেই। 'প্রগতির নোটবুক মুখস্থ করে' প্রগতিশীল হওয়া যায়

-না। তিনি প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ-র 'পাল্টা জবাব' হিসেবে কংগ্রেস সাহিত্য সংঘ প্রতিষ্ঠার জন্য 'বিচলিত' নন, কিন্তু প্রগতির 'ছাপমারা' সাহিত্যিকরা যে-সাহিত্য সৃষ্টি করে চলেছেন তার সঙ্গে 'প্রগতিবিরোধী সাহিত্যের মূলগত প্রভেদ' না থাকায় তিনি বিচলিত। তাঁর ধারণা, 'প্রগতির ছদ্মবেশে' এই সব সাহিত্যিকেরা 'ফ্যাশিস্তবাদকে সমর্থন করে যাচ্ছেন'। তাই সুবোধবাবুর পরামর্শ, 'সাহিত্যে রুচি পরিবর্তনের জন্য' নির্মম সাহিত্য-সমালোচনার আয়োজন করা এবং এর মাধ্যমে বিরোধ সৃষ্টি করে আন্দোলনের দিকে অগ্রসর হওয়া; আর সমালোচনার ক্ষেত্রে চরম সত্য বলে গ্রহণ করতে হবে বস্তুবাদকে এবং অস্বীকার করতে হবে 'সকল রকম প্রভুত্ব ও বিধি-নিষেধকে'।

হিরণকুমার সান্যাল 'পরিচয়'-এর 'পত্রিকা-প্রসঙ্গ' বিভাগে (পৌষ ১৩৫৩) সুবোধবাবুর এই মতকে গুরুত্ব সহকারে আলোচনা করে বলেন, "…যদিও অনেক জায়গায় তাঁর মতামত সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য করেছি, তবু, মোটের ওপর, তাঁর মত শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণীয়। সুবোধবাবুর মূল বক্তব্য এই যে প্রগতি অবশ্যম্ভাবী নয়,…কিন্তু তা সম্ভব, ও এই সম্ভাবনাকে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করার ব্রত সকল মানুষকে গ্রহণ করতে হবে, সাহিত্যিককেও। এ কথা সার কথা।"[১]

১৩৫৩-এর ফাল্গুনে 'পরিচয়' পত্রিকায় সুবোধবাবুর পক্ষে ধীরেন্দ্রনাথ রায় এবং বিপক্ষে প্রভাতকুমার দত্ত তাঁদের মতামত প্রকাশ করেন। এর মধ্যে প্রভাতকুমার দত্ত-র বক্তব্যটি মার্কসীয় চিন্তাচর্চার একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

এর জের টেনে ১৩৫৩ সালের চৈত্র মাসের 'পরিচয়' পত্রিকায় অনিলা গোস্বামী ছদ্মনামে নৃপেন্দ্র গোস্বামী 'নূতন সাহিত্য' নামে একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এমন ধীর-শান্ত অথচ বিদগ্ধ মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক এ পর্যন্ত 'পরিচয়'-এর পৃষ্ঠায় খুব কমই দৃষ্টিগোচর হয়েছে। প্রবীণ সাহিত্যসেবী রণজিৎকুমার সেন-এর কাছে শুনেছি, ১৯৩৮-৩৯ সালে প্রগতি সাহিত্য-আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামীর জন্মভূমি ফরিদপুর জেলায় সুরেনবাবুরই প্রেরণায় যে প্রগতি লেখক সংঘ গড়ে ওঠে তার অন্যতম চালক ছিলেন এই নৃপেন্দ্র গোস্বামী। নৃপেনবাবু তাই তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও সচেতন মার্কসবাদী প্রজ্ঞার সাহায্যে উক্ত প্রবন্ধে সুবোধবাবুর বহু ভ্রান্ত ঝোঁককে যেমন

১. দ্র. পরিচয়, 'পত্রিকা-প্রসঙ্গ', পৌষ ১৩৫৩, পৃ. ৪৫০।

খণ্ডন করেন তেমনি তাঁর সমালোচনার সদর্থক দিকগুলির প্রতিও জানান যথাযোগ্য সমর্থন।

নৃপেনবাবু তাঁর প্রবন্ধে যুদ্ধোত্তর সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ফ্রান্সের কমিউনিস্ট-লেখকদের মধ্যে যে মতাদর্শগত সংগ্রাম চলছিল সেই পরিপ্রেক্ষিতটি প্রথমে তুলে ধরেন এবং এরই পৃষ্ঠপটে সুবোধ দাশগুপ্ত-র মতামতকে বিচার-বিবেচনা করতে অগ্রসর হন। নৃপেনবাবুর বক্তব্য, সুবোধবাবুর মাপকাঠি দিয়ে সাহিত্য-বিচার করলে, অর্থাৎ কোনো লেখকের রচনায় বিন্দুমাত্র ধর্মীয় চেতনা লক্ষ্য করলে যদি তাঁকে বাতিল করতে হয় তবে পূর্বসূরী মাইকেল-বঙ্কিম-রবীন্দ্র-শরৎচন্দ্র থেকে শুরু করে সমসাময়িক কালের প্রায় সকল লেখককেই বর্জন করতে হবে। কিংবা, সুবোধবাবুর পরামর্শ মতো সর্বপ্রকার বিধি-নিষেধকে অগ্রাহ্য করার নীতিও নৃপেনবাবু ভ্রমাত্মক বলে মনে করেন। সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই ঝোঁককে নৃপেনবাবু অভিহিত করেন 'বামপন্থী-বিচ্যুতি' বা 'Left deviation' বলে। নৃপেনবাবু মাইকেল-বঙ্কিম-রবীন্দ্র-শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে আলোচনা করে দেখান, এইসব পূর্বসূরীরা কেউ ত্রুটি-মুক্ত নন এবং 'বালজাক অথবা সারভেন্টিসের কাজ কেউ করতে সক্ষম হননি, তার কারণ এদেশীয় বুর্জোয়া-মানস পরদেশী সাহিত্য ও সংস্কৃতির আওতায় অস্বাভাবিকভাবে গড়ে উঠেছে,' তবু নৃপেনবাবুর মতে, 'এঁরাই যুগপ্রগতিকে রীতিমত প্রেরণা দান করেছেন।' নৃপেনবাবু নির্দ্বিধায় বলেছেন, "…সামন্ত জীবনধারাকে চরম আঘাত হানবার যে দায়িত্ব পালনে বুর্জোয়াধর্মী দিক্‌পাল সাহিত্যরথীরা অক্ষমতা দেখিয়েছেন তা ভালভাবে সুষ্ঠুভাবে শেষ করবার দায়িত্ব পড়েছে বর্তমানের শিল্পীদের উপরে।" [দ্র. ঐ, পৃ. ৬৬১]

এরপর নৃপেনবাবু সমসাময়িক কালের প্রগতিশীল সাহিত্যিকরূপে খ্যাত তারাশঙ্কর, মানিক, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সুশীল জানা প্রমুখের সবলতা-দুর্বলতা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোকপাত করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, "বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক কর্তব্যগুলি বর্তমানে আর বুর্জোয়া শিল্পীদের দ্বারা সাধিত হতে পারে না,…সে কাজগুলি এবং গ্রাম্য-সহুরে সর্বহারাদের পথনির্দেশক চিত্রাঙ্কনের কাজগুলি একসঙ্গে করে যাওয়ার দায়িত্ব ঘাড় পেতে এঁদের নিতে হবে, নইলে প্রগতির যথার্থ বাহক এঁরা হতে পারবেন না।" [দ্র. ঐ, পৃ. ৬৬২]

নৃপেনবাবুর এই আলোচনাটির গুরুত্ব অপরিসীম। একজন মার্কসবাদী

সমালোচক এই বোধহয় প্রথম স্বদেশের জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের অন্তঃসার ও সাহিত্য-সত্যের প্রতি যথার্থভাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন এবং অতি-বামপন্থী ঝোঁককে গ্রহণ করতেও অস্বীকৃত হলেন।

ঠিক এই সময়ে রচিত প্রখ্যাত কথাশিল্পী নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়-এর একটি প্রবন্ধেও লক্ষ্য করা যাচ্ছে 'প্রভাতী' পত্রিকায় উত্থাপিত বিতর্কের প্রতিধ্বনি। এটি প্রকাশিত হয়েছিল অনিল সিংহ-সম্পাদিত 'নতুন সাহিত্য' পত্রিকার প্রথম সংকলনে, ১৩৫৩ সালের পৌষ মাসে। পাঠকদের এই প্রসঙ্গে একটি কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন। মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবী এবং প্রগতি-সংস্কৃতি আন্দোলনের অগ্রগণ্য সংগঠক অনিল সিংহ-র সম্পাদনায় 'নতুন সাহিত্য' মাসিক পত্রিকা রূপে ১৩৫৭ সালের বৈশাখ মাসে আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু এর আগে ১৩৫৩ সালের পৌষ মাসে এবং ১৩৫৫ সালের বৈশাখ মাসে অনিলবাবুর সম্পাদনায় 'নতুন সাহিত্য'-র দুটি পৃথক সংকলন প্রকাশিত হয়। 'প্রভাতী' পত্রিকার বিতর্কের জবাবে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়-লিখিত আলোচ্য প্রবন্ধটি ('সাম্প্রতিক কথাসাহিত্যে সংকট') প্রকাশিত হয় উক্ত 'নতুন সাহিত্য'-র প্রথম সংকলনেই (পৌষ, ১৩৫৩)।

এই প্রবন্ধে, যতদূর মনে পড়ছে, নারায়ণবাবু 'প্রভাতী' পত্রিকার কথা উল্লেখ না করেই সমসাময়িক প্রগতিশীল সাহিত্যিকদের বিরুদ্ধে সুবোধ দাশগুপ্ত যে-অভিযোগ এনেছিলেন তার উত্তর দিতে চেষ্টা করেছিলেন।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রগতিশীল সাহিত্যিকদের পক্ষাবলম্বন করে লিখেছিলেন, "কোন যুগের সমালোচকই সমসাময়িক সাহিত্যের ওপর প্রসন্ন দৃষ্টি বর্ষণ করেন নি। তাঁরা প্রায় প্রত্যেকেই ধিক্কার দিয়ে বলেছেন এ যুগের সাহিত্য কিছুই হচ্ছে না—এটা age of decadence !" তাঁর আরও বক্তব্য, "...বেশির ভাগ বিচারকেরই সমকাল সম্বন্ধে একটা 'ফোবিয়া' এবং অতীত সম্বন্ধে মোহ আছে" ; সুতরং তাদের বিচার সঠিক নয়।

এর পরে নারায়ণবাবু যে-কথা বলেছিলেন সেটাই প্রণিধান যোগ্য। তিনি স্পষ্টই লিখেছিলেন, "রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের মতো দিকপাল সাহিত্যিক আজ নেই বলে বাংলা সাহিত্যকে তুচ্ছ করলে অপরাধ হবে। এটাকে Age of Fragments বলা যেতে পারে, কিন্তু fragments গুলির একত্রীভূত যে শক্তি তা ব্যক্তি-স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের চাইতে অনেক বেশি, তার ক্ষেত্র বহু বিস্তৃত, তার

ভাবনা বহুমুখী, তার জীবন-দর্শন বহু-বিচিত্র। কাল থামে না, প্রগতি থামে না সুতরাং আমাদের সাহিত্যও থেমে দাঁড়ায় নি। বরং লাভের মধ্যে এই হয়েছে যে একটি পরিস্ফীত ধারায় অনাবশ্যক প্লাবন সৃষ্টি না করে তা সহস্রবেণী হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে, বহুক্ষেত্রের মাটিকে উর্বরা করে নানা ফসলকে সে ফলিয়ে তুলছে। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের পরিচয় রবীন্দ্র-শরৎ নামী কোন মহীরুহ নয়, নামী অনামী জ্ঞাত অজ্ঞাত বহু ফসলেই তার পরিপূর্ণতা।" [দ্র. নতুন সাহিত্য, পৌষ ১৩৫৩, পৃ. ৭-৮]

নারায়ণবাবুর এই উক্তির মধ্যে সম্ভবত প্রথম ব্যক্ত হল আধুনিক প্রগতিশীল লেখকদের আত্মপ্রত্যয়ের কণ্ঠস্বর, আর 'রবীন্দ্র-শরৎ নামী' মহীরুহদের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কেও সূক্ষ্ম মন্তব্য।

প্রগতি-সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন ১৯৪৬-৪৭ সালে সত্যিই যথেষ্ট আত্মপ্রত্যয়শীল হয়ে উঠেছিল। ৪৬ নম্বর ধর্মতলা স্ট্রীটের প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ-র দপ্তর সে-সময় প্রগতিকামী তরুণ শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের কলগুঞ্জনে মুখর। বুধবার-এর সাহিত্য পাঠের বৈঠক প্রবীণ আর নবীন সাহিত্যিকদের ভীড়ে তখন জমজমাট। গণনাট্য সংঘ 'নবান্ন'-র পরে এই সময় পর্যন্ত নাট্য-প্রযোজনায় উল্লেখযোগ্য কোনো অবদান না রাখলেও ১৯৪৬ সালে মঞ্চস্থ করল 'শহীদের ডাক' নামে একটি ছায়ানাট্য। কিছু ত্রুটি সত্ত্বেও জনসম্বর্ধনায় সম্বর্ধিত হল এই ছায়াভিনয়। গানের স্কোয়াড ইতিমধ্যে আরও শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। নতুন গানের মহড়ায় আর সুর-ঝঙ্কারে ৪৬ নম্বরের প্রতিটি কক্ষই তখন যেন উৎকর্ণ।

এই সময় মার্কসবাদী শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের মননক্রিয়ার পরিপুষ্টিতে ন্যাশনাল বুক এজেন্সী, অগ্রণী বুক ক্লাব, পূরবী পাবলিশার্স, পুঁথিঘর, ঈগল পাবলিশার্স, ইণ্টারন্যাশনাল পাবলিশিং হাউস, র‍্যাডিকাল বুক ক্লাব প্রভৃতি প্রকাশন-সংস্থার অবদানও স্মরণযোগ্য। ১৯২৪ সালে ব্রজবিহারী বর্মন 'বর্মন পাবলিশিং হাউস' প্রতিষ্ঠা করে মার্কসবাদী সাহিত্য প্রচারে এককভাবে যে প্রচেষ্টা শুরু করেছিলেন, ১৯৪১ সালে কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ন্যাশনাল বুক এজেন্সী সেই দায়িত্ব সংঘবদ্ধভাবে পালনে অগ্রসর হল। কমিউনিস্ট পার্টির সচেতন প্রচেষ্টায় মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন-এর মৌলিক রচনার অনুবাদ যেমন প্রকাশিত হতে লাগল, তেমনি মার্কসবাদী ধ্যান-ধারণাকে জনপ্রিয়ভাবে পরিবেশনের জন্য অনিল মুখার্জি-র 'সাম্যবাদের ভূমিকা', অমিত সেন ছদ্মনামে

সুশোভন সরকার-এর 'ইতিহাসের ধারা' জাতীয় বই একের পর এক সাধারণ মানুষের হাতে পৌঁছে গেল। উপর্যুক্ত প্রগতিশীল প্রকাশন সংস্থাগুলি স্বদেশ ও বিদেশের বহু উল্লেখযোগ্য মৌলিক এবং অনূদিত গ্রন্থ এই পর্বে প্রকাশ করার কৃতিত্ব নিঃসন্দেহে দাবি করতে পারে। কিন্তু এই সময়-সীমায় প্রকাশন-জগতে সবচেয়ে স্মরণীয় ঘটনা—কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে পার্টির নিজস্ব মুখপত্র দৈনিক 'স্বাধীনতা'-র আত্মপ্রকাশ। ১৯৪৫ সালের ২৫ ডিসেম্বর ১২১ লোয়ার সার্কুলার রোড থেকেমেহনতী মানুষের তিল তিল দানে প্রতিষ্ঠিত তাঁদের নিজস্ব দৈনিক সংবাদপত্র 'স্বাধীনতা' বের হতে থাকে। প্রখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা সোমনাথ লাহিড়ী হলেন 'স্বাধীনতা'-র সম্পাদকমণ্ডলীর প্রথম সভাপতি।

যুদ্ধোত্তর বাঙলাদেশের গণজাগরণ ও চিন্তাচর্চার নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে মার্কসবাদ যখন তার হাঁটি হাঁটি পা পা অবস্থা অতিক্রম করে চঞ্চল পদক্ষেপে ক্রম-অগ্রসরমান, যুদ্ধোত্তর দুনিয়ার দূরত্বও যখন ক্রমশ কমে আসছে, তখন এদেশের মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবীরাও শিল্প-সাহিত্যের বিচারে অনেক বেশি প্রখর দৃষ্টি ও পরিশীলিত মন নিয়ে অগ্রসর হবেন, এটাই তো কাম্য এবং স্বাভাবিক ঘটনা হওয়া উচিত।

সাহিত্য-বিচারে মার্কসবাদী ধ্যান-ধারণার প্রয়োগ তুলনামূলকভাবে যে বেশ কিছুটা সাবালকত্ব অর্জন করতে চলেছে আমার পূর্ব-বর্ণিত আলোচনার মধ্যে তার কিছু লক্ষণ পাঠকেরা নিশ্চয় খুঁজে পাবেন। কিন্তু মতাদর্শগত সংগ্রামে মার্কসবাদী শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে তখনও যে দুস্তর ব্যবধান বর্তমান, সেটাও লক্ষ্য না করে পারা যায় না। সোভিয়েত দেশের পার্টি-লেখকদের বিচার-সভায় ১৯৪৬ সালের ২১শে সেপ্টেম্বর জ্দানভ-এর বক্তৃতা এবং ফরাসী দেশের কমিউনিস্ট-লেখকদের মধ্যে মার্কসীয় নন্দনতত্ত্ব নিয়ে এরি সমসাময়িক কালে যে-বিতর্কের শুরু, তার ঢেউ যখন আমাদের দেশে পৌঁছে গেল তখন স্পষ্ট হয়ে উঠল এই ব্যবধান।

আমি সঠিক তারিখ বলতে পারব না, সম্ভবত ১৯৪৭ সালের শেষদিকে কোনো এক সময় প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ-র সদস্যেরা সোভিয়েত ও ফরাসী দেশের পার্টি-লেখকদের মতামত নিয়ে একাধিক বৈঠকে মিলিত হয়েছিলেন।

সোভিয়েত লেখক জশ্‌চেঙ্কো ও মহিলা-কবি আনা আখমাতোভাকে তাঁদের সৃষ্ট সাহিত্যে সোভিয়েত-সমাজজীবনকে বিকৃতভাবে পরিবেশনের জন্য দায়ী করা

হয়, ইয়োরোপীয় সাহিত্যের অবক্ষয়ী চিন্তা-ভাবনার পরিপোষক রূপে তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপিত হয় এবং অবশেষে এই অপরাধের জন্য তাঁরা সোভিয়েত লেখক-সংঘ থেকেও বিতাড়িত হন। এই বিতাড়নপর্বে সোভিয়েত লেখকেরা শিল্প-সাহিত্য সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন উত্থাপন করেন, তা নিয়ে দীর্ঘকাল বিতর্ক চলে এবং তার পরিসমাপ্তি ঘটে জ্‌দানভ-এর বক্তৃতার পর উক্ত লেখকদ্বয়কে দণ্ডদানের মধ্য দিয়ে।

প্রগতি লেখক সংঘ-র বৈঠকে জ্‌দানভ-এর বক্তৃতার যাথার্থ্যই সকলে স্বীকার করে নেন। কিন্তু ফরাসী দেশের কমিউনিস্ট-লেখক রজের গারোদি, পিয়ের এরভে এবং লুই আরাগঁ-র বিতর্ক যেহেতু তখনও সেই দেশের কমিউনিস্ট পার্টির বিবেচনাধীন, সেইহেতু এই আলোচনায় প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ-র বৈঠকে, মার্কসবাদী শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীরা নিজ নিজ মতামত অকুণ্ঠিত মনে প্রকাশ করতে থাকেন।

রজের গারোদি এবং পিয়ের এরভে দু-জনেই ছিলেন ফরাসী দেশের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সভ্য। গারোদির মত হল, "আর্টের ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট পার্টির লাইন বলে কোনো বস্তু নেই; শিল্পীর পক্ষে কোন লাইন না মেনে নিজের মতো চলাই সঙ্গত।" এরভে-র বক্তব্য, "কমিউনিস্ট নন্দনতত্ত্ব (aesthetics) বলে কোনো পদার্থ নেই; আর্টের ক্ষেত্রে সমালোচক নন্দন-তাত্ত্বিক দিক দিয়ে নিছক ব্যক্তি হিসেবেই বিচার করতে পারেন।" আর, আরাগঁ দৃঢ়ভাবে জানালেন, "নন্দনতত্ত্বকেও দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের মাপকাঠিতে যাচাই করে নিতে হবে। এটা না-মানার অর্থ হল—শ্রেণীসংগ্রামে শিল্পের দায়িত্বকেই প্রায় অস্বীকার করা।"

প্রগতি লেখক সংঘ-আয়োজিত মতাদর্শগত সংগ্রামের এই আলোচনা-বৈঠকে দেখা গেল, বাঙলার মার্কসবাদী শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী এবং তাঁদের সহযাত্রী লেখকেরা ব্যাপকভাবে অংশ গ্রহণ করতে এগিয়ে এসেছেন। এতকাল তাঁদের ব্যক্তি-মানসে যেসব প্রশ্ন আর দ্বন্দ্ব বাসা বেঁধেছিল, যা নিয়ে অতীতে কোনো সংঘবদ্ধ আলোচনা সম্ভব হয় নি, সময় সময় যা নিছক ব্যক্তি-কেন্দ্রিক ভালো-লাগা, মন্দ-লাগায় বিস্ফোরিত হয়েছে, এই আলোচনার মাধ্যমে তা ব্যক্ত করা এবং যাচাই করার একটা সুযোগ ঘটে গেল।

এই বিতর্কে এটা পরিষ্কারভাবে বেরিয়ে এল যে, ফ্রন্টের অন্যান্য লেখকেরা

তো বটেই, মতাদর্শের প্রশ্নে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যরাও দ্বি-ধা বিভক্ত। বিষ্ণু দে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করলেন গারোদি ও এরভে-র বক্তব্য, অর্থাৎ—"আর্টের ক্ষেত্রে পার্টি-লাইন বলে কিছু নেই, কমিউনিস্ট নন্দনতত্ত্ব বলেও নেই কোনো পদার্থ।" নীরেন্দ্রনাথ রায় সমর্থন জানালেন লুই আরগঁ-র বক্তব্যকে। তিনি বললেন, "আর্টকে পুরোপুরি যাচাই করার মতো সমস্ত মালমশলা হয়তো এই মুহূর্তে আমাদের হাতে নেই, চূড়ান্ত কথা বলাও হয়তো সম্ভব নয়, কিন্তু সমাজ-পরিবর্তনের লড়াই, বিশেষ করে অপরিহার্য মতবাদগত লড়াই-এর মধ্য দিয়ে মানুষ অন্যান্য জ্ঞানের মতো মার্কসীয় নন্দনতত্ত্বের জ্ঞান আয়ত্ত করতে পারবে, যাচাই করতে পারবে আর্টের মান। বিচারের এই বাস্তব মানদণ্ড না থাকলে সাহিত্য-বিচার করা যায় না। তাই মার্কসীয় নন্দনতাত্ত্বিক জ্ঞান অর্জন করতে হলে তা মতাদর্শগত লড়াই ও রাজনৈতিক লড়াই চালিয়েই করতে হবে।" কমিউনিস্ট সদস্যদের মধ্যে বিষ্ণুবাবুর মতকেই মোটের উপর সমর্থন জানালেন—হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, অরুণ মিত্র, চিন্মোহন সেহানবীশ ও সুভাষ মুখোপাধ্যায় এবং নীরেন্দ্রনাথ রায়-এর পক্ষে দাঁড়ালেন—রাধারমণ মিত্র, গোপাল হালদার, সরোজ দত্ত, অনিল কাঞ্জিলাল, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, অনিল সিংহ প্রমুখ লেখকেরা। সহযাত্রী অন্যান্য লেখকদের মধ্যে তারাশঙ্কর ও জ্যোতির্ময় রায় সেদিন বিষ্ণুবাবুর মতকেই সমর্থন জানিয়েছিলেন।

কিন্তু এই বিতর্কটিও কোনো সুস্থ পরিণতির দিকে লেখকদের টেনে নিয়ে গেল না। দ্বিতীয় দিনের আলোচনা-সভায় তারাশঙ্করবাবুর সঙ্গে কোনো কোনো কমিউনিস্ট-লেখকের প্রবল কথা কাটাকাটি হয়। ভীষণ উত্তেজনার মধ্যে শেষ হয় সভা। এর ফলে নেতৃস্থানীয় পার্টি-লেখকেরা বিচলিত হয়ে পড়েন এবং পরবর্তী সভা কিভাবে পরিচালিত হবে তার জন্য নির্দেশ চেয়ে পার্টি-নেতৃত্বের শরণাপন্ন হন। এখানে উল্লেখযোগ্য, এই বিতর্কের কিছু আগে কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসের প্রস্তুতি হিসেবে রাজ্য-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে গিয়েছে এবং সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের কাজকর্ম পরিচালনার জন্য নতুন পার্টি-নেতৃত্ব গোপাল হালদার, নীরেন্দ্রনাথ রায়, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, স্নেহাংশু আচার্য, চিন্মোহন সেহানবীশ, সুধী প্রধান, বিনয় রায়, চারুপ্রকাশ ঘোষ, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, ভবানী সেন ও সোমনাথ লাহিড়ীকে নিয়ে একটি প্রাদেশিক সাংস্কৃতিক সাব-কমিটিও গঠন করে দিয়েছেন।

যাহোক, এই সাব-কমিটির নির্দেশে শেষ পর্যন্ত ঠিক হয়—আরাগঁপন্থী পার্টি-লেখকেরা শেষ দিনের আলোচনায় কোনো কথা বলতে পারবেন না, শেষ কথা বলবেন—গারোদিপন্থী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্যোতির্ময় রায় এবং বিষ্ণু দে। আরগঁপন্থীদের এই কণ্ঠরোধের ফলে আলোচনা কোনো সুষ্ঠু পরিসমাপ্তিতে পৌছায় না। যেসব সাধারণ শ্রোতা প্রতিদিন সাগ্রহে বিতর্ক শুনতে আসতেন তাঁরা বিভ্রান্ত হলেন। কমিউনিস্ট-লেখকদের মধ্যে গারোদিপন্থীরা উল্লসিত এবং আরগঁপন্থীরা বিমর্ষ মনে যে-যার অবস্থানে ফিরে গেলেন। তারাশঙ্কর-বিষ্ণুবাবুরাও প্রতিপক্ষের সমস্ত যুক্তি শোনার সুযোগ পেলেন না, কিন্তু সেই উত্তেজনাময় মুহূর্তে ফাঁকা মাঠে গোল দেবার আনন্দে মশগুল হয়ে রইলেন। মতাদর্শের এই মার্কসবাদী মন্থনে অমৃত কতটুকু উঠেছিল তার পরিমাপ করতে পারব না, কিন্তু আমাদের পেটিবুর্জোয়া বুদ্ধিজীবী-মানসে কিঞ্চিৎ বিষক্রিয়া যে শুরু হয়েছিল পরবর্তী অনেক ঘটনায় তার প্রমাণ মিলবে।

এইসব যখন ঘটছে তার কিছু আগেই স্বাধীনতার খড়্গে ভারতবর্ষ দ্বিখণ্ডিত হয়েছে। সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্পে দেশের আবহাওয়া কলুষিত। বাঙলা দেশের যন্ত্রণা এবং ক্ষোভ আরও বেশি। কারণ, হিন্দু মুসলিমের মিলিত বাঙলাও তখন দ্বিখণ্ডিত। কংগ্রেস আর লীগ নেতারা আপোসের মাধ্যমে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের কাছ থেকে ক্ষমতা হস্তান্তর পর্ব শেষ করে দিল্লী আর করাচির মসনদে যদিও গদীয়ান তবু এই সময় মহাত্মা গান্ধী সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার প্রয়োজনে বেদনার্ত মনে বেলেঘাটার শিবিরে অনশনরত। আর, এর কয়েক মাস আগে, ১৯৪৭ সালের ১৩ মে (২৯ বৈশাখ, ১৩৫৪) নতুন যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিপ্রতিভা সুকান্ত ভট্টাচার্য-র জীবনদীপ নির্বাপিত হল যাদবপুরের যক্ষ্মা হাসপাতালে। আমরা আরও দেখলাম, স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিকে পরাস্ত করার সংগ্রামে আগুয়ান কংগ্রেস সাহিত্য সংঘ-র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক শচীন্দ্রনাথ মিত্র এবং স্মৃতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় শহীদ হলেন গুপ্ত ঘাতকের শাণিত ছুরিতে।

প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ এবং কংগ্রেস সাহিত্য সংঘ এই সময় যুগ্মভাবে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে যেমন মিলিত আন্দোলন পরিচালনা করেছে, তেমনি ১৫ আগস্টের স্বাধীনতা-উৎসবের অনুষ্ঠানেও শামিল হয়েছে সম্মিলিতভাবে। কংগ্রেস সাহিত্য সংঘ-র সঙ্গে মিলে 'স্বাধীনতা-উৎসব' করায় নাকি সেদিন

আপত্তি তুলেছিলেন হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, অরুণ মিত্র, বিষ্ণু দে, জ্যোতির্ময় রায় প্রমুখ সাহিত্যিকেরা। আপত্তিটা নীতিগত নয়; সজনীকান্ত-র সঙ্গে হাত মেলাতেই তাঁরা ছিলেন অনিচ্ছুক। তবু পার্টি-নির্দেশে সেই উৎসব মিলিতভাবেই সম্পন্ন হয়। আর, আর্টিস্টস এসোসিয়েশন-এর উদ্যোগে পরিচালিত দাঙ্গা-বিরোধী মিছিলে প্রগতি লেখক সংঘ, গণনাট্য সংঘ ও কংগ্রেস সাহিত্য সংঘ-র শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের ব্যাপক অংশ গ্রহণ ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসের সব চেয়ে বড় ঘটনা। থিয়েটার-ফিল্ম-রেডিও-র প্রখ্যাত শিল্পীরা সেদিন লেখক ও বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে এই দাঙ্গা-বিরোধী মিছিলে যোগ দিয়ে কলকাতার মানুষের মনে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও শুভবুদ্ধি জাগ্রত করতে সত্যিই যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন।

দ্বন্দ্ব-মিলনের এমনি অনেক কথাই এখানে লিপিবদ্ধ করা যায়। কিন্তু প্রগতি-সংস্কৃতি আন্দোলনের সেই বিস্তৃত প্রতিবেদন এখানে উপস্থিত করার বোধহয় প্রয়োজন নেই। আমি মূল প্রবণতা এবং তৎকালীন সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের কিছুটা আভাস দিয়েই পূর্ব-প্রসংগে আবার ফিরে যেতে চাই।

এ-পর্যন্ত মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক সম্বন্ধে আমি যেসব বাস্তব উদাহরণ তুলে ধরেছি, পাঠকেরা নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন, তার মধ্যে একটি বিষয় প্রায় অনালোচিতই রয়ে গেছে। এই বিষয়টি হল—আমাদের দেশের অতীত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, বিশেষ করে উনবিংশ শতাব্দীর চিন্তা-নায়কদের অবদান সম্পর্কে মার্কসীয় দৃষ্টিতে বিচার-বিবেচনা ও পুনর্মূল্যায়ন।

সুদূর অতীতের কথা বাদ দিলেও, ভারতে ইংরেজ শাসন শুরু হওয়ার প্রাক্কালে কিংবা এর কিছু আগে-পরে সংঘটিত সামাজিক আর্থনীতিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের পর্যালোচনা করতে কোনো মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবী নিষ্ঠার সংগে অগ্রসর হয়েছেন, এমন প্রমাণ চল্লিশের দশকের মধ্যভাগ পর্যন্ত প্রায় দুর্লভ ব্যাপার। এমন কি, উনবিংশ শতাব্দীর বাঙলাদেশের 'রেনেসাঁস' সম্বন্ধে যেসব মত চালু ছিল তার যাথার্থ্য বিচারেও কেউ তেমন মাথা ঘামান নি। সম্ভবত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির তৎকালীন সম্পাদক পি. সি. যোশী-র অনুরোধক্রমেই অধ্যাপক সুশোভন সরকার এদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন এবং '***Notes on the Bengal Renaissance***' নামে কাজ চলার মতো একখানি

ইংরাজী পুস্তিকা আমাদের হাতে তুলে দেন। এই পুস্তিকা যত সংক্ষিপ্ত আর অসম্পূর্ণ হোক না কেন, এর জন্য পথিকৃতের সম্মান অবশ্যই অধ্যাপক সরকারের প্রাপ্য। কিন্তু এই পুস্তিকায় আলোচিত উনবিংশ শতাব্দীর চিন্তানায়ক ও সমাজ-সংস্কারক রামমোহন-বঙ্কিম-বিবেকানন্দ-সৈয়দ আহ্‌মেদ সম্বন্ধে যে-দৃষ্টিভঙ্গি লেখক প্রকাশ করেছেন তা নিঃসন্দেহে ছিল বিতর্কের বিষয়। ১৯৪৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রকাশিত 'মার্কসবাদী' পত্রিকার পঞ্চম সংকলনে 'বাংলা প্রগতি সাহিত্যের আত্মসমালোচনা' নামক প্রবন্ধে রবীন্দ্র গুপ্ত ছদ্মনামে ভবানী সেন এই পুস্তিকার লেখকের 'সংস্কারবাদী' দৃষ্টিকে চ্যালেঞ্জ করার পূর্বে অন্য কোনো মার্কসবাদী লেখক বা বুদ্ধিজীবী কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন বলে আমি অন্তত জানি না।[১] বরং উনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাস এবং সেই ইতিহাসের পৃষ্ঠপটে ব্যক্তি-মানুষের ভূমিকা সম্বন্ধে যে সামান্য আলোচনা 'পরিচয়' এবং অন্যান্য পত্র-পত্রিকায় ঐ সময়কালে প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে অধ্যাপক সরকার-এর দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলনই মূলত প্রত্যক্ষ করা গিয়েছে।

মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে নরহরি কবিরাজই উপর্যুক্ত বিষয় নিয়ে কিছুটা আলোচনার সূত্রপাত করেছিলেন, লিখিত সাক্ষ্য অন্তত সেই কথাই বলে। তাঁর লেখা 'উনবিংশ শতকের শ্রেণীবিন্যাস' [পরিচয়, বৈশাখ ১৩৫৩], 'উনিশ শতকে 'ইয়ং বেঙ্গল' '[পরিচয়, পৌষ ১৩৫৩], 'স্বদেশপ্রেমিক শিবনাথ' [পরিচয়, ফাল্গুন ১৩৫৩], 'বাঙলায় রেনেশাঁস আন্দোলন ও মুসলমান' [পরিচয়, ভাদ্র ১৩৫৪], 'বাঙালী রাজনীতির গোড়ার কথা' [পরিচয়, কার্তিক ১৩৫৪], 'বিবেকানন্দের মত ও পথ' [পরিচয়, কার্তিক ১৩৫৫] প্রভৃতি প্রবন্ধগুলি উনবিংশ শতাব্দীর বিভিন্ন দিকের উপর নিঃসন্দেহে সুশোভনবাবুর তুলনায় অনেক বেশি আলোকপাত করেছিল, কিন্তু নরহরিবাবুরও মূল দৃষ্টিভঙ্গি সমালোচনামূলক ছিল না, তা ছিল যথেষ্ট পরিমাণে খণ্ডিত এবং উনবিংশ শতাব্দী সম্বন্ধে উদারচেতা গবেষকদের মতামতেরই প্রায় অনুসারী।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, ১৩৫৫ সালের মাঘ মাসে 'পরিচয়' পত্রিকায় বিনয় ঘোষ-এর 'বাংলার নবজাগৃতি' গ্রন্থের সমালোচনা-প্রসঙ্গে নরহরিবাবু মন্তব্য করেছিলেন, "বাঙলার নবজাগৃতির আন্দোলন ঔপনিবেশিক বুর্জোয়া শ্রেণীর

---

১. বর্তমান গ্রন্থের ১২০-২২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

নেতৃত্বে গ'ড়ে ওঠায় এর গতিশীলতার পাশে এর আড়ষ্টতা, এর দ্বিধা, এর রাজনৈতিক অসহায়তা এক প্রধান ও অবিচ্ছেদ্য বৈশিষ্ট্য" এবং এই বুর্জোয়াশ্রেণীর "কলুষিত জীবনদৃষ্টি, তাদের রুগ্ন নীতিবোধের বিরুদ্ধে পাঠককে মোটেই অবহিত করেন নি" বলে তিনি বিনয় ঘোষকে অভিযুক্তও করেছিলেন। বিনয় ঘোষ-এর রচনা সম্বন্ধে পরবর্তীকালে নরহরি বাবুর যে অভিযোগ, তাঁর পূর্বোক্ত লেখাগুলি সম্বন্ধেও আমরা মোটের উপর সেই একই অভিযোগ উত্থাপন করতে পারি। নরহরিবাবুর রচনাগুলি নিয়ে এই পর্বে কোনো বিতর্ক হয়নি, এটা কোনো আশ্চর্যজনক ঘটনা নয়। কারণ, বাংলাদেশের মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবীরা তখনও পর্যন্ত স্বদেশের অতীত ঐতিহ্য-বিচারে প্রায় উদাসীন ছিলেন।

কমিউনিস্ট পার্টির বেআইনী যুগের তাত্ত্বিক পত্রিকা 'মার্কসবাদী' থেকে এই গ্রন্থে সংকলিত 'বাংলা প্রগতি সাহিত্যের আত্মসমালোচনা' নামক প্রবন্ধে পাঠকেরা লক্ষ্য করলে দেখতে পাবেন, প্রকাশ রায় ছদ্মনামে প্রদ্যোৎ গুহ, বিশেষ করে রবীন্দ্র গুপ্ত ছদ্মনামে ভবানী সেন মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবীদের এই শূন্যতা পূর্ণ করার ইচ্ছায় এবং তাঁদের 'সংস্কারবাদী' দৃষ্টিভঙ্গি সংশোধনের জন্য, কী মারাত্মক আঘাতই হেনেছিলেন। ভবানীবাবু এই কাজে অগ্রসর হয়ে মার্কসবাদী গবেষকদের দ্বারা এ-পর্যন্ত উপেক্ষিত ঊনবিংশ শতাব্দীর কৃষক-বিদ্রোহগুলির প্রতি যথার্থভাবেই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন, এ কথা সত্যি; কিন্তু তিনি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির তৎকালীন অতিবামপন্থী হঠকারী নীতির দ্বারা চালিত হয়েছিলেন বলে ঊনবিংশ শতাব্দীর কৃষক-বিদ্রোহগুলির ভূমিকা তাঁর রচনায় এত অধিক গুরুত্ব পায় যে, তদানীন্তন সমাজ-বিকাশে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ও ভাবধারার ভূমিকা, বিশেষ করে রামমোহন, বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথের অবদানকে তিনি প্রায় অস্বীকারই করেছিলেন।

ভবানীবাবু শেষ-বিচারে ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে পৌছালেও তিনি উক্ত 'আত্মসমালোচনা'য় মার্কসবাদীদের আংশিক, অর্ধসত্য, একদেশদর্শী দৃষ্টিকে যে নাড়া দিতে পেরেছিলেন, এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। নরহরিবাবু এক সাক্ষাৎকারে আমাকে অন্তত এই কথাই বলেছেন। তাঁর কাছেই শুনেছি, অধ্যাপক সুশোভন সরকারও নাকি ভবানীবাবুর ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করেও তাঁর অনেক সদর্থক পর্যবেক্ষণের প্রতি সেদিন সমর্থন জানিয়েছিলেন। আর, নরহরিবাবু নিজেই স্বীকার করেছেন, ১৯৫৪ সালে 'স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলা' গ্রন্থ প্রকাশের সময়

তিনি ভবানী সেন-এর আলোচনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে ঐ গ্রন্থে সেই শিক্ষার ইতিবাচক দিকগুলি প্রয়োগ করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন।

যাহোক, গারোদি-আরগঁ বিতর্কের পর মার্কসবাদী শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী এবং তাঁদের সহযাত্রীদের মধ্যে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব বেশ প্রকট হয়ে ওঠে। বিষ্ণু দে, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং জ্যোতির্ময় রায় এই সময় স্পষ্টই বলতে থাকেন, যেহেতু গোঁড়া কমিউনিস্টরা প্রায় সকলেই আরগঁপন্থী এবং যেহেতু তাদের হাতেই 'পরিচয়' পত্রিকার পরিচালনাভার ন্যস্ত, সেইহেতু তাঁরা প্রতিপক্ষের মত প্রকাশের সুযোগ দিচ্ছেন না। বিষ্ণু দে নাকি এই সময় নীরেন্দ্রনাথ রায়কে একখানি চিঠি লিখে জানান যে, 'নীরেন্দ্রনাথ রায় ও রাধারমণ মিত্র-র পরমত অসহিষ্ণুতা প্রায় ফ্যাশিস্ত শোভন'। সুতরাং 'পরিচয়'-এর পাশাপাশি অন্য দৃষ্টিভঙ্গির পত্রিকা প্রকাশ করা অপরিহার্য।

এই মনোভাব থেকেই বিষ্ণু দে ও চঞ্চল চট্টোপাধ্যায়-এর সঙ্গে 'লোকায়ত' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করলেন হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এবং স্নেহাংশুকান্ত আচার্য। এই নতুন পত্রিকার ব্যবসাগত দায়-দায়িত্ব স্নেহাংশুবাবুই পালন করতে সম্মত হয়েছিলেন। এর মধ্যে স্নেহাংশুবাবুর সাহিত্যিক মত প্রতিষ্ঠার তাগিদ যতটা ছিল, তার চেয়ে বেশি ছিল নীরেন্দ্রনাথ রায় ও গোপাল হালদার-এর প্রতি তাঁর প্রবল বিরূপতা। এসব সত্ত্বেও হীরেনবাবু নাকি মনে করতেন, 'পরিচয়' এবং প্রকাশিতব্য 'লোকায়ত' পত্রিকার সম্পর্ক সুস্থ প্রতিযোগিতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে।

পূর্বোক্ত প্রাদেশিক সাংস্কৃতিক সাব-কমিটির কাছে যখন 'লোকায়ত' প্রকাশের প্রশ্নটি উত্থাপিত হল তখন হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, স্নেহাংশুকান্ত আচার্য ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় 'লোকায়ত' প্রকাশের সপক্ষে তাঁদের মত দৃঢ়ভাবে প্রকাশ করেন। সুধী প্রধান, চিন্মোহন সেহানবীশ ও সুভাষ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ এই পত্রিকা প্রকাশের যৌক্তিকতা নিয়ে কিছু প্রশ্ন তোলেন, আর সোমনাথ লাহিড়ী করেন এই প্রস্তাবের সরাসরি বিরোধিতা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভবানী সেন-এর হস্তক্ষেপের ফলে এই বিতর্কের অবসান ঘটে। স্থির হয়, 'লোকায়ত' প্রকাশিত হবে এবং 'পরিচয়' ও 'লোকায়ত' দুটি পত্রিকাকেই গণ্য করা হবে মার্কসবাদীদের দ্বারা পরিচালিত পত্রিকা রূপে। দুটি পত্রিকাতেই দুই মতের লেখকদের মত প্রকাশের অধিকার থাকবে এবং এইভাবে বিতর্কের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ-

সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যাবে। সিদ্ধান্ত যাই হোক না কেন, সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের পার্টি-কর্মীরা স্পষ্ট বুঝলেন, মতবিরোধের ফলেই প্রকাশিত হতে যাচ্ছে নতুন পত্রিকা। কিন্তু 'লোকায়ত' প্রকাশিত হয়নি ; দ্বিতীয় কংগ্রেসের পর কমিউনিস্ট পার্টি বেআইনী ঘোষিত হওয়াই এর মূল কারণ। এসব সত্ত্বেও বিষ্ণুবাবুরা চুপ করে বসে ছিলেন না। তিনি এবং চঞ্চল চট্টোপাধ্যায় অবশেষে ১৩৫৫ সালের শ্রাবণ মাসে প্রকাশ করেন 'সাহিত্যপত্র'।

এই পর্বে 'পরিচয়' পত্রিকায় প্রকাশিত কয়েকটি রচনাকে কেন্দ্র করে প্রবল বিতর্ক উপস্থিত হয়। যে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের কথা আমি একটু আগে উল্লেখ করেছি এই সব বিতর্কিত আলোচনায় তা বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। 'পরিচয়' পত্রিকার শারদীয় সংখ্যায় (১৩৫৪) বিষ্ণু দে লেখেন 'গল্পে উপন্যাসে সাবালক বাংলা' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধে তিনি হয়তো গারোদি-র 'আর্টের ক্ষেত্রে পার্টি-লাইন বলে কিছু নেই' এটা প্রমাণ করার জন্যই 'কল্লোলযুগ'-এর লেখকদের হাতেই বাংলা কথাসাহিত্যের সাবালকত্ব প্রাপ্তির কথা সোচ্চারে ঘোষণা করেন। বিষ্ণুবাবু লেখেন, "··প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্পের স্বচ্ছ করুণা, বুদ্ধদেবের বিদ্রোহী রবীন্দ্রবিরোধী আবেগ, শৈলজানন্দের বীরভূমের নিসর্গের মতো ঋজুকঠিন কথকতা, অচিন্ত্যকুমারের ক্লান্তিহীন বিষয়-অনুসন্ধিৎসা ও রচনার পরীক্ষা নিরীক্ষা এসবেরই কাছে বাংলাসাহিত্য ঋণী।" [দ্র. পরিচয়, শারদীয় ১৩৫৪, পৃ. ২৭২]

বিষ্ণুবাবু অবশ্য মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তারাশঙ্কর-এর সাহিত্য-কৃতিত্বের কথাও সানন্দে উচ্চারণ করেন এবং তাঁর অদৃশ্য প্রতিপক্ষকে খোঁচা দিয়ে বলেন, "...নিজের দেশের সীমায় নিজের সাহিত্য-শ্রদ্ধা না করে নঙর্থক সমালোচনায় রুশ সাহিত্যের তুলনায় সবই নস্যাৎ করা সাহিত্য তথা রাজনীতি দুদিক দিয়েই ভুল।" [দ্র. ঐ]

অতঃপর তারাশঙ্কর-এর সঙ্গে রবীন্দ্র-শরৎচন্দ্র-র প্রতিতুলনায় বিষ্ণুবাবুর মনে হয়, "তাঁর একাধারে প্রসার ও জীবনের সত্যের তুলনায় রবীন্দ্রনাথের অলৌকিক কবিসত্য লাগে মাইকেল এঞ্জেলোর পাশে জ্যত্তোর মতো গীতিকবিতার স্বর্গচারী সারল্য এবং শরৎচন্দ্র মনে হয় বাঙালী গৃহিনীর মধ্যাহ্ন মনোরঞ্জনে দ্বিপ্রহরের ভোজান্তে পানদোক্তার ভাববিলাসী ঘোর।" [ঐ, পৃ. ২৭৩] তাই বিষ্ণুবাবু 'পণ্ডিত-মূর্খের হঠকারিতা না করেই' বলেন, "তারাশঙ্করের গল্পোপন্যাসের জুড়ি য়ুরোপ আমেরিকায় আজ হাতে গোনা যায়"। [ঐ]

বিষ্ণুবাবু কথাশিল্পী মানিকবাবুরও 'চমকপ্রদ দক্ষতায় মুগ্ধ' এবং তিনি উপলব্ধি করেছেন, "সে কৃতিত্ব আজ সংহত দৃষ্টিতে সেই নবসম্ভাবনায় ঐশ্বর্যবান, যেখানে জীবনের ব্যাপ্তিতে লেখা হয়ে ওঠে নৈর্ব্যক্তিক, মহৎ।" [ঐ] কিন্তু তিনি 'বিশেষ করে' বলতে চান 'অচিন্ত্যকুমারের কথা'। তাঁর মনে অচিন্ত্যকুমারের "পরিণতির সার্থকতা ঐতিহাসিক তুলনা জাগায় হেমিংওয়ের সঙ্গে।" এঁদেরই হাতে বিষ্ণুবাবু 'গল্পে-উপন্যাসে সাবালক বাঙলা'র সন্ধান পেয়ে মুগ্ধ এবং অভিভূত।

বিষ্ণু দে-র স্বাধীন চিন্তা অবশ্যই বিবেচনাযোগ্য। এবং এটা বিচার-বিবেচনা করার জন্যই বোধহয় নীহার দাশগুপ্ত ঐ বছরের অগ্রহায়ণ সংখ্যা 'পরিচয়' পত্রিকায় 'শারদীয়া সাহিত্যে ছোটগল্প' নামে একটি পর্যালোচনামূলক প্রবন্ধ প্রকাশ করে বিষ্ণুবাবুর শেষ মতামতকেই আঘাত করলেন। নীহারবাবুর এই পর্যালোচনা ১৩৫৪ সালের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার শারদীয় সংখ্যায় প্রকাশিত ছোটগল্পকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হলেও তিনি মূলত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়-এর 'গায়েন' ও অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত-র 'মুচিবায়েন' গল্প দুটির বিষয়বস্তু ও শিল্প-আঙ্গিক আলোচনা করেই রায় দিলেন, "মানিকবাবুর অধুনা লিখিত গল্পগুলির মধ্যে 'গায়েন' শ্রেষ্ঠ"; আর অচিন্ত্যকুমারের 'মুচিবায়েন' পড়ে তাঁর মনে হল, "সাধারণ মানুষ গল্পের ভেতর ভিড় করে এলেই গল্প বাস্তব ও প্রগতিশীল হয়ে ওঠে না, দৃষ্টিভঙ্গীর অপরিচ্ছন্নতায় ও দরদের অভাবে সে গল্প প্রতিক্রিয়াশীলতার পর্যায়েও পৌঁছতে পারে।" অবশেষে বিষ্ণুবাবু-কথিত পুরনো প্রসঙ্গ টেনে তিনি মন্তব্য করলেন, "অচিন্ত্যবাবুর তীক্ষ্ণধার ভাষা ও গল্প বলার কায়দার জোরে গল্পগুলি সুপাঠ্য হয়ে উঠলেও কোন এক কবি-সমালোচকের মত তাঁকে হেমিংওয়ের সঙ্গে তুলনা করতে পারবো না। বলতে পারবো না, 'তাঁর গল্পের জীবন, জীবনেরই মত বিচিত্র, তিক্ত, মধুর, বিস্ময়কর মিশ্রাবেগ।'"[১]

প্রগতিশীল সাহিত্য-শিবিরে মতাদর্শের যে-সংঘাত এতদিন ছাইচাপা আগুনের মতো ধিকি ধিকি জ্বলছিল, এই ঘৃতাহুতিতে তা এবার দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। পরের মাসের, অর্থাৎ পৌষ ১৩৫৪ সালের 'পরিচয়' পত্রিকাটি এদিক থেকে, আমার বিবেচনায়, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ঐ সংখ্যার 'পাঠক-গোষ্ঠী'তে বিষ্ণু দে তীব্রভাবে আক্রমণ করলেন নীহার দাশগুপ্ত-র বক্তব্য। তাঁর

১. দ্র. পরিচয়, পত্রিকা-প্রসঙ্গ,' অগ্রহায়ণ ১৩৫৪, পৃ. ৪৮৫-৮৬।

সমালোচনাকে বিষ্ণুবাবু অভিহিত করলেন 'বামপন্থী বিধর্মে' 'ট্রটস্কি-মার্কা প্রতিক্রিয়াশীলতা' বলে। তিনি নীহারবাবুর বক্তব্যের মধ্যে খুঁজে পেলেন 'সংস্কৃতির লাল রাস্তা' বানাবার কৌশল, 'সাহিত্যিক স্পেশ্যাল পাওয়ার্সের খেলা' এবং 'স্বজাতিপ্রীতিমূলক মনোভাব'। বিষ্ণুবাবু বেশ রূঢ়ভাবেই প্রতিবাদ জানালেন কমিউনিস্টদের 'দলগত' মনোভাবের বিরুদ্ধে।

পৌষ-সংখ্যা 'পরিচয়'-তে আরও দুটি বিস্ফোরণ ঘটল। একটি ঘটালেন আবু সয়ীদ আইয়ুব তাঁর 'সাহিত্যের চরম ও উপকরণ মূল্য' নামক প্রবন্ধে, অন্যটিতে অগ্নি সংযোগ করলেন হিরণকুমার সান্যাল—'পুস্তক-পরিচয়' বিভাগে, তারাশঙ্কর-এর উপন্যাস 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'-র সমালোচনা-প্রসঙ্গে।

পরবর্তী ঘটনা দুটির কথা বিচার-বিশ্লেষণ করার আগে 'শারদীয়া সাহিত্যে ছোট গল্প' নিয়ে উত্থাপিত বিতর্ক-প্রসঙ্গটি শেষ করা যাক। এই বিতর্কে অতঃপর যোগ দিলেন স্বয়ং নীহার দাশগুপ্ত, অনিলকুমার সিংহ [দ্র. পরিচয়, মাঘ ১৩৫৪] আর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় [দ্র. পরিচয়, ফাল্গুন ১৩৫৪]।

১৩৫৪ সালের মাঘ মাসের 'পরিচয়'-তে নীহারবাবু তাঁর প্রত্যুত্তরে অচিন্ত্যবাবুর গল্প সম্পর্কে আরও বিশদ করে বলার নামে বিষ্ণুবাবুকে ব্যক্তিগত ভাবেই আক্রমণ করলেন। তিনি লিখলেন, "বিষ্ণুবাবু আমার বিদ্যাবুদ্ধির ওপর অজস্র ব্যক্তিগত কটাক্ষ করেছেন। 'পরিচয়'-এর সম্পাদকরাও বাদ যান নি। বুদ্ধিবিলাসীর আত্মাভিমানে যখন আঘাত লাগে, তখন তাঁর তথাকথিত ভদ্রতার মুখোস খুলে পড়ে, প্রতিপক্ষের গায়ে কাদা ছিটানো ছাড়া তাঁর আর কোনো গত্যন্তর থাকে না।" অনিলকুমার সিংহ প্রায় মধ্যপন্থা অবলম্বন করে জানালেন, "আসলে গোল বেধেছে বিষ্ণুবাবুর মহানুভবতার আধিক্য ও নীহারবাবুর কার্পণ্যের ফলে। বিষ্ণুবাবু অচিন্ত্যকুমারকে তাঁর প্রাপ্যের অনেক বেশি দেবার জন্য ব্যগ্র, অন্যদিকে নীহারবাবু তাঁর প্রাপ্যটুকুও পুরোপুরি দিতে চান না।" অনিলকুমার সিংহ কিন্তু নীহার দাশগুপ্ত-র সমালোচনাপদ্ধতিকে সমর্থন করেন নি; আবার, বিষ্ণুবাবুর সমালোচনাকেও আদর্শ সমালোচনা বলে গ্রহণ করলে, তাঁর মতে, "বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যের ভবিষ্যৎ এইখানেই সমাধিস্থ" হবে।[১]

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এই বিতর্কে যোগদান করে ১৩৫৪ সালের ফাল্গুন-সংখ্যা 'পরিচয়'তে যে বক্তব্য রাখেন তা নানা দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ। একজন

১. দ্র. 'পরিচয়, 'পাঠক-গোষ্ঠী,' মাঘ ১৩৫৪, পৃ. ১১৬-১৭।

সৃজনশীল লেখক তাঁর নিজের রচনার দুর্বলতা সম্বন্ধে কতখানি সচেতন, অন্যের রচনা সম্বন্ধে তিনি কি মত পোষণ করেন এবং 'বিষ্ণুবাবুর মার্কসিস্ট দৃষ্টি' কী পরিমাণ 'বিকৃত' মানিকবাবু কোনো রকম সংকোচ না করেই তা ব্যক্ত করেছেন। মানিকবাবু তাঁর নিজের এবং অচিন্ত্যকুমারের গল্পের ফাঁকি ধরিয়ে দিয়ে বললেন, "...মানিক বা অচিন্ত্য একজনও ভাল শিককাবাব বা ভাল সন্দেশ বানাচ্ছেন না।" [দ্র. ঐ, পৃ. ১৯৭]

এরপর মানিকবাবু একে একে বিষ্ণুবাবুর 'অমার্কসীয়' সাহিত্যদৃষ্টি উদ্‌ঘাটনে প্রয়াসী হয়েছেন এবং কমিউনিস্টদের 'দলগত মনোভাব' ও 'স্বজাতিপ্রীতি' সম্পর্কে বিষ্ণুবাবুর অভিযোগের প্রত্যুত্তরে বলেছেন, "দুটো দল হয়ে গেছে, উপায় কি। ব্যক্তিগতদের ব্যক্তি-প্রীতির দল এবং জনসাধারণের নৈর্ব্যক্তিক স্বজাতি-প্রীতির দল। দ্বিতীয় দলে গত না হলে প্রগতি হয় না।" [দ্র. ঐ, পৃ. ২০১]

এই বিতর্কের সমকালেই তারাশঙ্কর-এর 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'-র সমালোচনা-প্রসঙ্গে হিরণকুমার সান্যাল লিখলেন, "হাঁসুলী-বাঁকের উপকথা একেবারে ভানুমতির ভেলকি। এর ঘরবাড়ি যেন চলচ্চিত্রের ক্ষণস্থায়ী তোড়জোড়। কোপাইয়ের স্রোতে আলোছায়ার আলপনার মতন এখানকার মেয়েপুরুষের হাসিকান্না। সবই অলীক—অবাস্তব। অসাধারণ মুন্সিয়ানার জোরে যে-উপকথা বিস্তৃত হয়েছে দীর্ঘ চারশো পাতা ধরে, শেষ পর্যন্ত তা উপকথাই থেকে গেল, জাতীয় জীবনের প্রতিচ্ছবি বহন করে তা উচ্চস্তরের কথাসাহিত্যে উত্তীর্ণ হতে পারল না।...যে-আদিম অন্ধকার থেকে কাহার-পল্লীর উদ্ভব, সেই অন্ধকারেই হল তার বিলুপ্তি। তারাশঙ্করবাবু মাটির মানুষের ছবি আঁকলেন জমিদারি প্রাসাদের ভগ্নস্তূপ থেকে। কিন্তু এ মাটিই যে দেশের মাটির থেকে বিচ্ছিন্ন। এখানকার ইতিকথা মানিকবাবুর 'পুতুলনাচের ইতিকথা'র মতন সত্যিকারের বাংলাদেশের মানুষের ইতিকথা নয়, এ হল ঠাকুরমার ঝুলি থেকে বের করা ছেলেভোলানো রূপকথা।" [দ্র. পরিচয়, 'পুস্তক-পরিচয়', পৌষ ১৩৫৪, পৃ. ৫৭৪-৭৫]

এই তিক্ত-তীব্র বিতর্ক ও সমালোচনার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম কী ঘটতে পারে, আশা করি পাঠকেরা তা সহজেই অনুমান করতে পারছেন। বিষ্ণু দে রবীন্দ্রোত্তর যুগের একজন অন্যতম প্রধান কবি, প্রগতি সাহিত্য-আন্দোলন ও 'পরিচয়'-পরিচালকমণ্ডলীরও তিনি দীর্ঘদিনের সুখ-দুঃখের সাথী। যে-পত্রিকার

তিনি অন্যতম পরিচালক সেই পত্রিকাতেই তাঁর এতদিনের লালিত সাহিত্য-বিষয়ক ধ্যান-ধারণা ও বিশ্বাস শুধুমাত্র কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য-লেখকেরাই নন, হিরণকুমার সান্যাল-এর মতো উদার-হৃদয় প্রবীণ সমালোচকও যেভাবে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিলেন তাতে তাঁর মনের প্রতিক্রিয়া কত ভয়ংকর রূপ পরিগ্রহ করতে পারে, কালের ব্যবধানে দাঁড়িয়েও তা বুঝতে আমাদের এতটুকু অসুবিধা হয় না।

অনুসন্ধিৎসু পাঠকেরা ১৩৫৪ সালের ফাল্গুন-সংখ্যা 'পরিচয়' পত্রিকার উপর দৃষ্টিপাত করলে দুঃখের সঙ্গে নিশ্চয় লক্ষ্য করবেন, 'পরিচয়'-এর পরিচালকমণ্ডলীতে যে-নামটি দীর্ঘকাল ধরে শোভা পেত, সেই 'বিষ্ণু দে' নামটি সেখানে আর মুদ্রিত নেই। শুনেছি, হিরণকুমার সান্যাল-এর সমালোচনার প্রতিবাদেই বিষ্ণুবাবু 'পরিচয়'-এর পরিচালকমণ্ডলী থেকে দারুণ ক্ষোভ নিয়েই পদত্যাগ করেন।

এইসব ঘটনার এক মাসের মধ্যে, ১৯৪৮ সালের ২৬ মার্চ, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়; ফলে 'লোকায়ত' প্রকাশের উদ্যোগ-আয়োজন ব্যর্থ হলেও মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে, ১৩৫৫ সালের শ্রাবণ মাসে বিষ্ণুবাবুর উদ্যোগে কেন 'সাহিত্যপত্র' প্রকাশিত হল—সে ঘটনার পশ্চাদ্‌পট বুঝতে আমাদের তাই বেগ পেতে হয় না। আর, 'সাহিত্যপত্র'-র প্রথম সংখ্যাতে কমিউনিস্ট পার্টির যখন ঘোর দুর্দিন, যখন গোপাল হালদার, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায় সহ হাজার হাজার নেতা ও কর্মী কারান্তরালে কিংবা আত্মগোপনের দুঃসহ যন্ত্রণায় জর্জর, তখন বিষ্ণুবাবু স্বনামে 'রাজায়-রাজায়' নামক প্রবন্ধে বুদ্ধদেব বসুর '*An Acre of Green Grass*'-এর সমালোচনা-প্রসঙ্গে কেন কমিউনিস্ট-লেখক, বিশেষ করে মানিকবাবুর বক্তব্যকে তীব্রভাবে আক্রমণ করে মানিকবাবু ও বুদ্ধদেববাবুর থেকে সমদূরত্বে 'নিরপেক্ষ' অবস্থান গ্রহণ করেন, তাও আমরা হৃদয়ঙ্গম করতে পারি।

পাঠকেরা যদি উপর্যুক্ত ঘটনাগুলি স্মরণে রাখেন তবে 'মার্কসবাদী' পত্রিকার প্রথম সংকলনে বীরেন পাল ছদ্মনামে ভবানী সেন-এর 'বাংলা সাহিত্যের কয়েকটি ধারা' এবং উর্মিলা গুহ ছদ্মনামে প্রদ্যোৎ গুহ-র 'সাহিত্য বিচারের মার্কসীয় পদ্ধতি' শীর্ষক প্রবন্ধ দুটিতে বিষ্ণুবাবু কেন যে উভয়ের আক্রমণের অন্যতম প্রধান কেন্দ্রবিন্দু হলেন তা অনুধাবন করতে পারবেন এবং তারাশঙ্কর-অচিন্ত্য-বুদ্ধদেব-প্রসঙ্গে উদ্ধৃত হিরণকুমার সান্যাল, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, নীহার

দাশগুপ্ত প্রমুখের উক্তির প্রাসঙ্গিকতা বুঝতেও তাঁদের কোনো অসুবিধা ঘটবে না।

যাহোক, পৌষ-সংখ্যা (১৩৫৪) 'পরিচয়'-এর অন্য বিস্ফোরণটি, অর্থাৎ আবু সয়ীদ আইয়ুব-এর 'সাহিত্যের চরম ও উপকরণ মূল্য' নামক প্রবন্ধটিকে ভিত্তি করে যে-বিতর্ক শুরু হল, আমার বিশ্বাস, তার মধ্যে ধূলি-ঝঞ্ঝা যতখানি উৎক্ষিপ্ত হয়েছিল তার চেয়ে অনেক বেশি বিচ্ছুরিত হয়েছিল শিল্প-সাহিত্যে মার্কসবাদ প্রয়োগের মৌলিক প্রশ্ন-সঞ্জাত প্রদীপ্ত আলোকরশ্মি। 'পরিচয়'-এর সমগ্র জীবনে তথা মার্কসবাদী শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের এ-পর্যন্ত রচিত প্রবন্ধাবলীর মধ্যে, এই বিতর্ক-ভিত্তিক রচনাগুলিই সম্ভবত মার্কসীয় দৃষ্টিতে সাহিত্য-বিচারের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন রূপে গণ্য হওয়ার যোগ্য।

আবু সয়ীদ আইয়ুব তাঁর উক্ত প্রবন্ধে 'পুঁজিতন্ত্রের উচ্ছেদ ও সমাজতান্ত্রিক আর্থিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তা' স্বীকার করে নিলেন এবং এই কাজ সমাধার জন্য 'বিপ্লবী শক্তির হাতে সাহিত্য ধারালো অস্ত্র রূপে ব্যবহৃত হোক'—এটাও কাম্য বলে ঘোষণা করলেন। কিন্তু তাঁর মতে এটা তো সাহিত্যের 'উপকরণ মূল্য' মাত্র। সোভিয়েত ইউনিয়নে সাহিত্যের এই 'উপকরণ মূল্য'ই সৃষ্টি হচ্ছে এবং সেই কারণেই আইয়ুব সাহেব তাকে শুধুমাত্র 'ফলিত সাহিত্য' রূপেই আখ্যায়িত করতে ইচ্ছুক। তাঁর প্রশ্ন, যে-সমাজে ও সাহিত্যে সত্য, শিব ও সুন্দর—এই চরম মূল্যত্রয় নিন্দিত ও অন্তর্হিত, সে-সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য 'বিপ্লব' ঘটাবার সত্যিই কি কোনো প্রয়োজন আছে? তিনি সূক্ষ্ম ও সুকৌশল যুক্তিজাল বিস্তার করে স্পষ্ট বললেন, "সত্য-শিব-সুন্দরের পরিপূর্ণ বিকাশ ও বিকীরণই যখন সামাজিক উন্নতির আদর্শ, তখন রাষ্ট্রিক বিপ্লব বা অর্থনৈতিক ব্যবস্থান্তর ঘটানোর ধারালো অস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হওয়াকেই শিল্পসাহিত্যের চরম সার্থকতা বলে নির্দেশ করা, non--party লেখকদের ধ্বংস কামনা করা, ঘোষণা করা যে সাহিত্যকে সুনিয়ন্ত্রিত সুসংবদ্ধ বিপ্লবী দলের অংশ বিশেষ হতেই হবে—এসব কি চরম উদ্দেশ্যকে উপস্থিত উপায়ের মধ্যে হারিয়ে ফেলার মত উল্টোবুদ্ধির লক্ষণ নয়?" আয়ুব সাহেব তাঁর প্রবন্ধের উপসংহারে জানালেন, "ফলিত সাহিত্যের ভূয়সী প্রচারকে আমরা সাদর সম্ভাষণ জানাব, কিন্তু বিশুদ্ধ সাহিত্যের প্রতি আমাদের যে অন্তরতম অনুরাগ আছে সেটাকে যেন ব্যাহত হতে না দিই। তার জন্য বুর্জোয়া, প্রতিক্রিয়াশীল, ডেকেডেণ্ট—

যত গালাগালি দেওয়া হোক সমস্ত সহ্য করবার মত মহৎ বেহায়াপনা যেন আমাদের থাকে।" [দ্র. পরিচয়, পৌষ ১৩৫৪, পৃ. ৫৩৫-৩৬]

• ১৩৫৪ সালের মাঘ মাসের 'পরিচয়' পত্রিকায় অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র সংক্ষিপ্ত অথচ শাণিত লেখনীতে জবাব দিলেন আবু সয়ীদ আইয়ুব-এর প্রত্যেকটি অভিযোগের। অমরেন্দ্রপ্রসাদ লিখলেন, "মার্কসিস্ট সাহিত্য=ফলিত সাহিত্য= অসত্য, অশিব ও অসুন্দর সাহিত্য, এই ইকোয়েশনটা কাগজেকলমে লিখে ফেললেই কি স্বতঃসিদ্ধ হয়ে ওঠে?" তিনি আইয়ুব সাহেবের সোভিয়েত বিরোধী বক্তব্যকে খণ্ডন করে বললেন, "চারিত্র্য, ব্যক্তিস্বাধীনতা, ব্যক্তিসত্তার বিকাশ, ব্যক্তিচৈতন্যের ব্যাপ্তি, গভীরতা ও বস্তুজগতের উপর নেতৃত্ব, আত্মিক আনন্দানুভূতি, ইত্যাদি যে কোন অজড়বাদী মাপকাঠি দিয়ে আইয়ুব সাহেব সোভিয়েট দেশের সোশ্যালিস্ট সভ্যতার বিচার করুন, তিনি দেখতে পাবেন, ঠিক এইসব আধ্যাত্মিক মূল্যগুলিই সোভিয়েট সমাজে উত্তরোত্তর প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে এবং এটাই সেই সমাজের সবচেয়ে গৌরবের কথা।" [দ্র. পরিচয়, মাঘ ১৩৫৪, পৃ. ৯০-৯১]

আইয়ুব সাহেব সাহিত্যকে 'ফলিত' ও 'বিশুদ্ধ' সাহিত্যরূপে যেভাবে বিভাজন করেছেন তার যান্ত্রিকতা, 'চরম ও উপকরণ মূল্য' এবং 'সত্য, শিব ও সুন্দর' সম্বন্ধে বুর্জোয়া তাত্ত্বিকদের ধ্যান-ধারণার সঙ্গে মার্কসবাদীদের চিন্তা-ভাবনার পার্থক্যগুলি অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র চমৎকারভাবে উদ্ঘাটন করে বলেন, "কালচারের প্রসার, ব্যক্তিচৈতন্যের বিকাশ, চারিত্র্যের ঐশ্বর্যসাধন, মানবাত্মার স্বাধিকারলাভ, এই সবই বিপ্লবী তথা সোশ্যালিস্ট সাহিত্যের উদ্দেশ্য। তাই এটা ফলিত সাহিত্য নয়, সত্যকার সাহিত্য বা শুধুই সাহিত্য।...এর একটা উপকরণ মূল্য আছে...এটা বিপ্লবকে এগিয়ে দেয়...। অন্যদিক থেকে দেখা যায়, একটা বিশেষ স্তরে...ওই সাহিত্যের মধ্যেই সাংস্কৃতিক মূল্য পূর্ণভাবে প্রকাশ পেয়েছে। সুতরাং ওর আছে চরম মূল্য।" "...সত্য, শিব ও সুন্দর যদি বিশুদ্ধ abstraction হয়, তাকে স্বীকার করাও যা অস্বীকার করাও তা। অর্থাৎ সেটা হবে সত্যের মুখোস এবং সেই মুখোস পরে যে কোনো অসত্য যষ্ঠি সঞ্চালন করে আমাদের বলতে পারে—আমিই একমাত্র সত্য, আমাকে ভজনা কর। আবার ধরুন শিবকে বা মঙ্গলকে স্বীকার করলাম।...আজকের দিনে সাম্রাজ্যবাদ শ্রমিকশ্রেণী ও জনসাধারণের বিরুদ্ধে...যুদ্ধ করে পৃথিবীকে রক্তের

বন্যায় ডোবাতে চায়। সুতরাং তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ও শ্রেণীসংগ্রাম এ দুটোই মঙ্গলের পথ। সুন্দর সম্বন্ধেও ওই একই কথা।" [দ্র. ঐ, পৃ. ৯৪-৯৫]

আইয়ুব সাহেব এবং অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র-র এই বিতর্ককে সংক্ষিপ্তকরণের মধ্য দিয়ে আমি হয়তো উভয়ের প্রতিই অবিচার করছি। তাঁদের যুক্তির ঔজ্জ্বল্যও হয়তো এর ফলে অনেকখানি ম্লান হয়ে যাচ্ছে। এজন্য আমি পাঠকদের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী। তবু, এই প্রবন্ধ দুটি পরবর্তীকালে 'মার্কসবাদী'-র প্রথম সংকলনে বীরেন পাল ছদ্মনামে ভবানী সেন-এর রচনায়[১] কেন গুরুত্ব সহকারে উল্লিখিত হয়েছিল, তার তাৎপর্য পাঠকেরা অনুধাবন করবেন, এটা নিশ্চয় আশা করতে পারি।

এই বিতর্কে এরপর যোগদান করেন শীতাংশু মৈত্র। তিনি ১৩৫৪ সালের ফাল্গুন-সংখ্যা 'পরিচয়'-এ একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখে আয়ুব সাহেব-এর বক্তব্যের অসারতা প্রমাণ করার জন্য মার্কসীয় যুক্তি-বিজ্ঞানের তূণীরে যত অস্ত্র আছে তার প্রায় প্রত্যেকটিই নিরঙ্কুশভাবে প্রয়োগ করেছিলেন। আর এই অস্ত্র-প্রযোগ খুব শৃঙ্খলার সঙ্গে না করায় রচনাটি যত পাণ্ডিত্যের ভার বহন করেছিল, তত বেশি ধারালো হতে পারে নি। এমন কি ঐ রচনায় রবীন্দ্রনাথের 'ওরা কাজ করে' কবিতাটির অপব্যাখ্যাও করা হয়েছিল।

চৈত্র-সংখ্যা 'পরিচয়' পত্রিকায় (১৩৫৪) অমরেন্দ্রপ্রাসদ মিত্র-র জবাবে আবার একটি প্রবন্ধ লিখলেন আবু সয়ীদ আইয়ুব। এটির শিরোনাম—'বিশুদ্ধ ও ফলিত সাহিত্য'। আইয়ুব সাহেব-এর এই প্রবন্ধটিও খুব মূল্যবান। তিনি 'বিশুদ্ধ' ও 'ফলিত' সাহিত্য বলতে কি বোঝেন, এই প্রবন্ধে তা সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। একজন বিশুদ্ধ সাহিত্যরসের রসিক মার্কসবাদী সাহিত্যবিচারকদের সঙ্গে সাহিত্য-বিচারে কোথায় এবং কোন কোন বিষয়ে মতভেদ পোষণ করেন, আইয়ুব সাহেব তাঁর প্রবন্ধে তা স্পষ্ট করে ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, "মানব-ধর্মী কোন শিল্পীর রচনায় সমাজগত ও শিল্পগত মূল্যের সাযুজ্য ঘটতে পারে; যদি ঘটে তবে তেমন রচনা আমাদের কাছে অত্যধিক সমাদরের বস্তু হবে নিশ্চয়ই। কিন্তু তাই বলে আমি মানতে প্রস্তুত নই যে রাজনৈতিক ও সাহিত্যিক মূল্যবিচার একই জিনিস।" তাঁর দ্বিতীয় বক্তব্য: "সাহিত্যের কাজ হচ্ছে সামাজিক সত্তাকে আর্টের মাধ্যমে প্রতিফলিত করা—এ কথা ঠিক। কিন্তু এটুকু

১. বর্তমান গ্রন্থের ১৮-১৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

বললে সাহিত্যের সংজ্ঞা সম্পূর্ণ হয় না। বরঞ্চ বলা যেতে পারে যে সাহিত্যে এবং শিল্পকলা মাত্রে আমরা পাই বাস্তব সত্তার রূপায়নিক অভিব্যঞ্জনা। সমাজই একমাত্র বাস্তব সত্তা নয়। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের রহস্যঘন প্রকৃতি, চেখভ কিংবা হেন্‌রী জেম্‌সের কথাসাহিত্যে ব্যক্তিচেতনার যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সত্তা অভিব্যক্ত—রসের বিচারে এদের বাস্তবতাও অগ্রাহ্য নয়।" [দ্র. পরিচয়, চৈত্র ১৩৫৪, পৃ. ২৪৯-৫১]

মোটকথা, উক্ত প্রবন্ধে আইয়ুব সাহেব যে-অভিমত প্রকাশ করেন তার মূল কথা হল: "…সাহিত্য যদি শুধু বিপ্লবের ধারালো অস্ত্রই হয় তবে কেবল উপকরণরূপেই তা মূল্যবান। এবং যে-সাহিত্যের চরম মূল্য আছে তা বিপ্লবী দলের হাতে হাতিয়ার হতেও পারে, নাও পারে। না হলেও তার যে মূল্যটি চরম তার কোন ব্যত্যয় ঘটবে না। [ঐ, পৃ. ২৫৬]

এই বিতর্কের সূত্র ধরেই সম্ভবত ২৭. ৫. ৪৮-এ রচিত হয়েছিল নীরেন্দ্রনাথ রায়-এর সেই বিখ্যাত প্রবন্ধ—'সাহিত্যবিচারে মার্কসবাদ'। প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৫৫ সালের বৈশাখ-আষাঢ় যুগ্ম-সংখ্যা 'পরিচয়' পত্রিকায়। এই প্রবন্ধে নীরেন্দ্রনাথ কোথাও আবু সীয়দ আইয়ুব কিংবা অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র-র নাম উল্লেখ করেন নি সত্যি, কিন্তু তাঁর প্রবন্ধের প্রতিটি যুক্তিবিন্যাস লক্ষ্য করলেই সন্ধান পাওয়া যাবে এর উৎসভূমিটি। আমার ধারণা, আবু সয়ীদ আইয়ুব-এর সাহিত্য-বিচারের বিকল্পরূপে নীরেন্দ্রনাথ রায় স্পষ্টতই উপস্থিত করেছিলেন মার্কসবাদী সাহিত্যবিচারের এই ব্যাখ্যা। তিনি সমাজবিকাশের ধারা বিশ্লেষণ করে দেখান, "সাহিত্য সমাজ-মানসের ভাষাগত প্রকাশ।" তাঁর মতে, "আন্তেতর সামাজিক বাস্তবতার প্রতিফলন—এই সূত্রানুযায়ী মার্কসীয় পদ্ধতিতে বিচার করিলে সাহিত্যের, অর্থাৎ কবিতা, নাটক, উপন্যাস প্রভৃতির মূল্যবিচার অনেকখানি নির্ভরযোগ্য হয়ে ওঠে।" তিনি স্পষ্ট করেই বলেন, "মার্কসবাদ মানে না যে সুন্দর বলিতে বুঝায় কাণ্ট-উদ্ভাবিত একটি আত্মিক প্রত্যয়, আন্তেতর বাস্তবতায় যার মূল প্রোথিত নাই।…মানুষের মনে সৌন্দর্য অনুভূতির বিকাশ হয় ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর প্রভাবে, উৎপাদন পদ্ধতির বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে। আমরা যে পরিমাণে প্রকৃতির উপর প্রভুত্ব করিতে পারিয়াছি সেই অনুসারে আমাদের সৌন্দর্যবোধও বিবর্তিত হইয়াছে।" [দ্র. পরিচয়, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৫৫, পৃ. ২৯২, ২৯৬-৯৭]

সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃতি দিয়ে এই প্রবন্ধটির মূল্যও হ্রাস না করে আমি সমগ্র রচনাটির

প্রতিই পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এ-পর্যন্ত আলোচিত বিতর্কগুলির মধ্যে আবু সয়ীদ আইয়ুব বনাম অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র ও নীরেন্দ্রনাথ রায়-এর বিতর্কটিই সুকৌশলী ভাববাদী দার্শনিক মতবাদের 'নিরপেক্ষ' সাহিত্য-বিচারের বিরুদ্ধে মার্কসীয় দার্শনিক প্রত্যয় থেকে শিল্প-সাহিত্যে নন্দনতাত্ত্বিক ধ্যান-ধারণা প্রয়োগের সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন রূপেই বিবেচিত হবে বলে আমার বিশ্বাস।

১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় কংগ্রেসের পর ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিকে বেআইনী ঘোষণা করার কথা আমি ইতিপূর্বেই উল্লেখ করেছি। ১৩৫৪ সালের ফাল্গুন-সংখ্যা 'পরিচয়' পত্রিকার 'সম্পাদকীয়' থেকেও জানা যাচ্ছে—'পরিচয়'-সম্পাদক গোপাল হালদার ও কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে বিনাবিচারে আটক রাখা হয়েছে। 'পরিচয়'-এর চৈত্র, ১৩৫৪ সংখ্যা এই দুর্বিপাকের মধ্যে প্রকাশিত হলেও পরবর্তী সংখ্যা বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় ১৩৫৫—এই তিন মাসের যুগ্ম-সংখ্যা রূপেই প্রকাশিত হয়। এই সংখ্যাটি বৈশাখ-আষাঢ় যুগ্ম-সংখ্যা হলেও এটি প্রকাশিত হয় ভাদ্র মাসের মধ্যভাগে। 'সম্পাদক-মণ্ডলী ও 'পরিচয়'-এর কর্তৃপক্ষদের পক্ষে' এই সংখ্যার 'সম্পাদকীয়'তে গোপাল হালদার এর কারণ বিশ্লেষণ করেন এবং ঘোষণা করেন, 'পরবর্তী সংখ্যা শ্রাবণ হইতে না বাহির হইয়া কার্তিক হইতে বাহির হইবে'। 'পরিচয়'-এর সম্পাদকীয় কার্যালয় ৩০ চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-১৬ থেকে ১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-১২ ঠিকানায় স্থানান্তরের কথাও আমরা 'পরিচয়'-এর একটি ঘোষণায় এ-সময় জানতে পারি।

এই সময়-পর্বে, ১৩৫৫ সালের বৈশাখ মাসে, অনিল সিংহ সম্পাদিত 'নতুন সাহিত্য'-র দ্বিতীয় সংকলন প্রকাশিত হয়। এই সংকলনে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় 'প্রতিবিপ্লবী সাহিত্য' নামে একটি বিতর্কমূলক প্রবন্ধ লেখেন। নারায়ণবাবু তাঁর প্রবন্ধে বর্তমান বিপ্লবী সাহিত্যের সংজ্ঞা নির্দেশ করে 'অতি-বিপ্লবী' উৎসাহে বঙ্কিম-রবীন্দ্র-শরৎচন্দ্র থেকে শুরু করে আধুনিক সাহিত্যিকদের মধ্যবিত্ত জীবন-ভিত্তিক রচনাকে 'প্রতিবিপ্লবী' সাহিত্য রূপে অভিহিত করার প্রবণতাকে আক্রমণ করেন। তিনি প্রশ্ন তোলেন, "প্রতিক্রিয়াশীল সাহিত্যকে ধিক্কার দিতে গিয়ে আমরা মুখোশ-আঁটা Leftism-এর খপ্পরে গিয়ে পড়ছি না তো? প্রতি-বিপ্লবকে ঠেকাতে গিয়ে পা দিচ্ছি না তো অতি-বিপ্লবের চোরাবালিতে? [দ্র. নতুন সাহিত্য, দ্বিতীয় সংকলন, বৈশাখ ১৩৫৫]

১৩৫৩ সালের পৌষ মাসে প্রকাশিত 'নতুন সাহিত্য'-র প্রথম সংকলনে 'সাম্প্রতিক কথাসাহিত্যে সংকট' প্রবন্ধে নারায়ণবাবু যা লিখেছিলেন এ যেন প্রায় তার বিপরীত কণ্ঠস্বর। মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় 'নতুন সাহিত্য'-র ঐ দ্বিতীয় সংকলনেই নারায়ণবাবুর বক্তব্যের একটি যুক্তিগ্রাহ্য জবাব দেন। 'উগ্র বামপন্থা, না দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতি ?'—এই শিরোনামে মঙ্গলাবাবু লেখেন, "'মধ্যবিত্ত জীবন আর গণসাহিত্যের আশ্রয় নয়'···আজকের দিনে গণতান্ত্রিক বিপ্লবে বিশ্বাসী কোনও প্রগতিবাদী লেখকের যদি এরকম মারাত্মক বিভ্রান্তি থেকে থাকে, তবে তা সর্বপ্রকারে অপনোদনের চেষ্টা করা অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু এর বিরুদ্ধে নারায়ণবাবুর যা যুক্তি, তা উল্টো দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতিরই পরিচায়ক, ফলে তাও কম বিপজ্জনক নয়!" নারায়ণবাবু বলেছিলেন, "এখনো আমাদের দেশে মধ্যবিত্তই বিপ্লবের মশালচী", সুতরাং তাঁর মতে, "সাহিত্য যদি বিশেষ করে মধবিত্ত জীবনাশ্রয়ী না হয় তাহলে তা সত্যনিষ্ঠ হবে না, বস্তুনিষ্ঠও হবে না।"—এই উক্তির জবাবেই মঙ্গলাবাবু লিখেছিলেন উপর্যুক্ত কথাগুলি।

এই বিতর্কটি আমার কাছে বেশ মূল্যবান মনে হয়েছে। কারণ, এই সময় প্রগতিশীল সাহিত্যিকদের মধ্যে একদিকে অতি-বামপন্থী উগ্রতা, অন্যদিকে দক্ষিণপন্থী সংস্কারবাদের ঝোঁক বেশ প্রবল হয়ে উঠেছিল। সেই পরিপ্রেক্ষিতটিই নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় আর মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়-এর বিতর্কের মধ্যে ভালোভাবেই বিবৃত হয়েছে।

এর পরেই ঘটে 'পরিচয়' পত্রিকার বিবর্তিত প্রকাশ। আমরা দেখতে পাচ্ছি, ১৩৫৫ সালের কার্তিক মাসে যখন 'পরিচয়' আবার প্রকাশিত হল তখন তার সম্পাদনার দায়িত্ব থেকে হিরণকুমার সান্যাল মুক্ত ; নতুন সম্পাদকরূপে গোপাল হালদার ও নীরেন্দ্রনাথ রায়-এর নামই সেখানে মুদ্রিত।

ইতিমধ্যে চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায়কে সম্পাদক করে বিষ্ণু দে-র উদ্যোগে 'সাহিত্যপত্র' আত্মপ্রকাশ করেছে। সেখানে বিষ্ণুবাবুর আক্রমণাত্মক রচনা মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবীদের একাংশের মধ্যে জাগ্রত করল প্রচণ্ড ক্ষোভ। তাই 'সাহিত্যপত্র' পরিচালনা ও সম্পাদনার ব্যাপারে যখন কমিউনিস্ট পার্টির লেখক-সদস্যদের কাছে বিষ্ণুবাবুরা সহযোগিতা চাইলেন তখন কমিউনিস্ট-লেখকদের অনেকেই করলেন তার বিরোধিতা। তাঁদের বক্তব্য ছিল, "যেহেতু বিষ্ণুবাবুরা মার্কসবাদের অপব্যাখ্যা করছেন এবং প্রগতি লেখক

আন্দোলন তথা পার্টির কর্মনীতির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন, সেইহেতু পার্টি ও শ্রমিকশ্রেণীর শত্রু হিসাবে গণতান্ত্রিক ফ্রন্টে তাঁদের আর স্থান হতে পারে না, এবং এই কারণেই 'সাহিত্যপত্র'-র সঙ্গে সহযোগিতার কোনো প্রশ্নই ওঠে না।" সেদিন এই যুক্তির পক্ষে ছিলেন নীরেন্দ্রনাথ রায়, অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র, নরহরি কবিরাজ, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, অনিল সিংহ, নীহার দাশগুপ্ত প্রমুখ আরও অনেকে।

ঐ বক্তব্যের সরাসরি বিরোধিতা করেন চিন্মোহন সেহানবীশ। গোপাল হালদার ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ও প্রথমোক্তদের যুক্তি পুরোপুরি সমর্থন করতে পারেন নি ; এঁরা দুই জন মোটের উপর সমর্থন করেছিলেন চিন্মোহন সেহানবীশ-এর বক্তব্য।

অভ্যন্তরীণ এই বিতর্কের মধ্য দিয়ে শেষপর্যন্ত স্থির হয়, 'সাহিত্যপত্র'-পরিচালকদের সাহিত্যিক মতামত খণ্ডন করার জন্যই শুধু ঐ পত্রিকায় প্রবন্ধ লেখা যাবে, অন্য কোনো রচনা 'সাহিত্যপত্রে' লেখা চলবে না। এই সিদ্ধান্ত অনুসারেই 'সাহিত্যপত্র'-র তাত্ত্বিক মতামত ও সাহিত্যদৃষ্টিকে মার্কসবাদ-বিরোধী এবং ভ্রান্ত বলে প্রমাণ করার জন্যই নরহরি কবিরাজ রচনা করেন তাঁর বহু-বিতর্কিত প্রবন্ধ 'মার্কসবাদের নয়া ভাষ্য'।

নরহরিবাবুর প্রবন্ধটি 'সাহিত্যপত্র'-র পরিচালকবর্গ পত্রস্থ করতে এবং এই নিয়ে বাদানুবাদ চালাতে সম্মত ছিলেন। কিন্তু প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ-র আসন্ন সম্মেলন উপলক্ষে মতবাদগত প্রস্তুতি চালাবার জন্য কমিউনিস্ট লেখকেরা 'মার্কসবাদের নয়া ভাষ্য' প্রবন্ধটির আশু প্রকাশ এতই জরুরী মনে করেন যে, তাঁদের পরামর্শক্রমে প্রবন্ধটি 'সাহিত্যপত্র' থেকে প্রত্যাহার করে সেটিকে ১৩৫৬ সালের বৈশাখ-সংখ্যা 'পরিচয়' পত্রিকায় প্রকাশের ব্যবস্থা করা হয়।

'মার্কসবাদের নয়া ভাষ্য' প্রবন্ধটিতে নরহরিবাবু মূলত জ্দানভ ও আরর্গ-র সাহিত্যতত্ত্বকেই ধ্রুব সত্য বলে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি 'সাহিত্যপত্র'-র তাত্ত্বিক অবস্থানকে 'না-বুর্জোয়া, না-কমিউনিস্ট' তৃতীয়পক্ষ-সুলভ সুবিধাবাদী অবস্থান রূপেই চিত্রিত করেন। তাঁর মূল বক্তব্য ছিল, "মার্কসবাদের শক্তি যতই বেড়েছে, মার্কসবাদের শত্রুরা ততই আক্রমণের নতুন নতুন কায়দা আবিষ্কার করতে বাধ্য হয়েছে। তাদের সর্বশেষ কায়দা হল মার্কসবাদের শিবিরে প্রবেশ ক'রে মার্কসবাদের পুনর্বিচার বা সংশোধনের নামে মার্কসবাদ-বিরোধী অপপ্রচার

চালিয়ে যাওয়া।" [দ্র. পরিচয়, বৈশাখ ১৩৫৬, পৃ. ৬০৩]

'সাহিত্যপত্র'-র তাত্ত্বিক নেতা মিত্রবেশে কিভাবে মার্কসবাদকে বিকৃত করে তৃতীয়পক্ষ-সুলভ মনোভাব নিয়ে শত্রু শিবিরের পক্ষে কাজ করে চলেছেন নরহরিবাবু একের পর এক তার দৃষ্টান্ত তুলে ধরে শেষপর্যন্ত ঘোষণা করেন, "মার্কসবাদী সাহিত্য সৃষ্টির স্বাধীনতার নামে সাহিত্যিকের এই শ্রেণী-নিরপেক্ষ, জনগণ-বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গীকে কিছুতেই বরদাস্ত করে না। জনসাধারণের সংগ্রামী চেতনার প্রতি উদাসীন এই ধরনের সাহিত্য-সেবীরা যে বিপ্লবের মুহূর্তে বিঘ্ন স্বরূপ, তা মার্কসবাদীরা জানে।" [দ্র. ঐ, পৃ. ৬১৩]

মোটকথা, কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসের পর অতি-বামপন্থী যে-রণনীতি ও রণকৌশল ধীরে ধীরে কমিউনিস্টদের স্বচ্ছ চিন্তাকে গ্রাস করছিল, সাংস্কৃতিক ফ্রন্টেও যে তা বেশ ক্রিয়াশীল হয়ে উঠেছে, নরহরি কবিরাজ-এর 'মার্কসবাদের নয়া ভাষ্য' প্রবন্ধটিতে সেই হঠকারিতার অট্টহাসিই যেন ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত।

এইসব ঘটনার অব্যবহিত পূর্বে কিংবা সমকালে একে একে প্রকাশিত হয়েছে কয়েকটি বিতর্কমূলক রচনা। এর মধ্যে গোপাল হালদার-এর 'সংস্কৃতির সংকট' (পরিচয়, কার্তিক ১৩৫৫), নরহরি কবিরাজ-এর 'বিবেকানন্দের মত ও পথ' (ঐ), দেবকুমার চক্রবর্তী-র 'সোভিয়েট সাহিত্যের মূল্য বিচার' (ঐ), চিন্মোহন সেহানবীশ-এর 'সংস্কৃতির আহ্বান' (পরিচয়, অগ্রহায়ণ, ১৩৫৫), ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ-এর 'টি. এস. এলিয়ট ও নোবেল পুরস্কার' (ঐ), 'সরোজিনী নাইডুর কবিতা', (পরিচয়, বৈশাখ ১৩৫৬), অনিমেষ রায় ছদ্মনামে অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র-র জুলিয়াস ফুচিক-এর '*Notes from the Gallows*' গ্রন্থের সমালোচনা (পরিচয়, অগ্রহায়ণ ১৩৫৫), 'বুদ্ধিবিলাসীর 'ডায়ালেকৃটিকস" (পরিচয়, বৈশাখ ১৩৫৬), দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও আবু সয়ীদ আইয়ুব-এর বাদ-প্রতিবাদ (পরিচয়, পৌষ ও ফাল্গুন ১৩৫৫) উল্লেখ্য। কারণ, এই রচনাগুলিকে ভিত্তি করেই পরবর্তীকালে 'মার্কসবাদী'-র চতুর্থ সংকলনে প্রকাশ রায় ছদ্মনামে প্রদ্যোৎ গুহ তাঁর 'বাংলা-প্রগতি সাহিত্যের আত্মসমালোচনা' প্রবন্ধটি রচনা করেন।

আমার এই দীর্ঘ আলোচনার মধ্য দিয়ে পাঠকেরা নিশ্চয় বিশের দশকে কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠার কাল থেকে শুরু করে ১৯৪৮ সালে কমিউনিস্ট পার্টি বেআইনী ঘোষিত হওয়ার সময় পর্যন্ত এদেশের মার্কসবাদী শিল্পী-সাহিত্যিক-

বুদ্ধিজীবীদের সৃষ্টিশীল প্রয়াস, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য-বিচারে তাঁদের কর্মতৎপরতা এবং মতাদর্শগত সংগ্রামের ক্ষেত্রে তাঁদের অবদান সম্পর্কে কিঞ্চিৎ ধারণা গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। আমি এ সম্বন্ধে আর দু-একটি ঘটনার প্রতি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এই প্রসঙ্গ শেষ করতে ইচ্ছুক।

আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন, ১৯৪৫ সালে অনুষ্ঠিত হয়েছিল প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ-র তৃতীয় সম্মেলন। এরপর ১৯৪৯ সালের ২২ এপ্রিল থেকে ২৪ এপ্রিল কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয় সংঘ-র চতুর্থ সম্মেলন। অর্থাৎ, দীর্ঘ চার বৎসর পরে বাঙলার প্রগতিশীল শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীরা আবার একটি সম্মেলনে মিলিত হওয়ার সুযোগ পেলেন। ইতিমধ্যে বাঙলা তথা ভারতের বুকে বহু যুগান্তকারী ঘটনা ঘটে গিয়েছে। নানা গণঅভ্যুত্থান, কলংকময় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রত্যক্ষ ভারত-শাসনের অবলুপ্তি, দেশ-বিভাগের মধ্য দিয়ে স্বাধীন ভারত ও পাকিস্তানের অভ্যুদয়, কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসে নতুন রণনীতি ও রণকৌশল গ্রহণ এবং তার পরিণতিতে কংগ্রেস-সরকার কর্তৃক পার্টিকে নিষিদ্ধকরণ, প্রচণ্ড দমননীতি, গ্রেপ্তার, চীনের মুক্তিসংগ্রামের বিজয় ইত্যাদি—এই পর্বে সংঘটিত ঘটনাবলীর কয়েকটি সংক্ষিপ্ত উদাহরণ মাত্র।

এই পরিপ্রেক্ষিতে যখন প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ-র চতুর্থ সম্মেলন শুরু হতে যাচ্ছে তখন তা যে দ্বন্দ্ব-মুখর হবে, এটা অনুমান করা কিছু কঠিন নয়। বস্তুত, সম্মেলনের প্রস্তুতি-পর্বে এবং সম্মেলন চলাকালে সেই ঘটনাই ঘটেছিল।

নীরেন্দ্রনাথ রায়-রচিত খসড়া ঘোষণাপত্রটি সম্মেলনে উপস্থিত করা হলে সেটি প্রবল বিতর্কের সম্মুখীন হয়। খসড়া ঘোষণাপত্রে উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা-সাহিত্যের ঐতিহ্য-বিচারে নীরেন্দ্রনাথ নাকি 'ঐ যুগকে বুর্জোয়া সাহিত্যের স্বর্ণযুগ' বলে অভিহিত করেন এবং তিনি নাকি 'লেখক ও শিল্পীকে তেমন জোরালোভাবে গণসংগ্রামে শামিল হওয়ার আহ্বান জানান নি', আর 'শ্রমিক ও কৃষকের মধ্য থেকে শিল্পী-সাহিত্যিক আবির্ভূত হবেন'—এই প্রত্যয়ের কথাও ঘোষণাপত্রে রাখেন নি, ফলে নীরেন্দ্রনাথ রায়-রচিত খসড়া ঘোষণাপত্রটিকে বাতিল করা হয়।

আমি ইতিপূর্বে এই পর্বে উত্থাপিত যেসব অপ্রকাশ্য বিতর্কের কথা উল্লেখ করেছি, প্রগতি লেখক সংঘ-র যুগ্ম সম্পাদক রূপে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও স্বর্ণকমল

ভট্টাচার্য তাঁদের সম্পাদকীয় প্রতিবেদনে তার প্রায় প্রত্যেকটি বিষয় কোথাও স্পষ্ট, কোথাও বা আভাসে-ইঙ্গিতে স্বীকার করেছেন।[১] গোপাল হালদার এই সম্মেলনের মূল সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন কিন্তু তাঁকে নিরাপত্তা আইনে গ্রেপ্তার করায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কার্যকরী সভাপতিরূপে সম্মেলনের কাজ পরিচালনা করেন।

নীরেন্দ্রনাথ রায়-এর খসড়া ঘোষণাপত্র গৃহীত না হওয়ার সম্মেলনের প্রতিনিধিমণ্ডলীর পক্ষ থেকে অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র, নীরেন্দ্রনাথ রায়, চিন্মোহন সেহানবীশ, শীতাংশু মৈত্র, নিরঞ্জন সেন ও জগন্নাথ চক্রবর্তীকে নিয়ে গঠিত একটি কমিটি নতুন ঘোষণাপত্র রচনা করেন এবং সেই ঘোষণাপত্রটিই সম্মেলনে গৃহীত হয়। এই সম্মেলনে যাঁরা বিভিন্ন আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বিমলচন্দ্র ঘোষ, অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র, সুশীল জানা, নবেন্দু ঘোষ, নীরেন্দ্রনাথ রায়, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, সতীনাথ ভাদুড়ী, ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, তুলসী লাহিড়ী, হিরণকুমার সান্যাল, ড. শশিভূষণ দাশগুপ্ত, নরহরি কবিরাজ, নরেন্দ্রনাথ মিত্র ও পারভেজ শাহেদী-র নাম উল্লেখযোগ্য। সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন প্রবীণ সাহিত্যিক পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়।[২]

এই সম্মেলনে গৃহীত 'ঘোষণাপত্র'টি সত্যিই খুব গুরুত্বপূর্ণ। পরবর্তীকালে 'মার্কসবাদী'-র চতুর্থ ও পঞ্চম সংকলনে প্রকাশ রায় ছদ্মনামে প্রদ্যোৎ গুহ এবং রবীন্দ্র গুপ্ত ছদ্মনামে ভবানী সেন 'বাংলা প্রগতি সাহিত্যের আত্মসমালোচনা' মূলক প্রবন্ধে যেসব অতি-বামপন্থী হঠকারী সিদ্ধান্তে উপনীত হন তার প্রায় প্রাথমিক রণধ্বনি এই 'ঘোষণাপত্র'-র মধ্যেই নিহিত ছিল। প্রদ্যোৎবাবু ও ভবানীবাবু উনবিংশ শতকের ঐতিহ্যে রামমোহন-রবীন্দ্রনাথের অবদানকে প্রায় অস্বীকার করেছিলেন; কিন্তু উক্ত ঘোষণাপত্রে "বাংলা দেশের রামমোহন-মাইকেল-রবীন্দ্রনাথ একদা মানবের বিরাটত্বের সাধনা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সাহিত্যে পাই অতীতকে পশ্চাতে ফেলিয়া নূতনের দিকে জয়যাত্রার প্রেরণা। মানবের মহৎ ভবিষ্যৎ, মহৎ চরিত্র, মহৎ কর্ম, মহৎ চিন্তা ও শক্তি—এই সকল ঐতিহ্য তাঁহারা

১. দ্র. 'সম্পাদকীয় বিবরণ', পরিচয়, জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৩৫৬, পৃ. ৬৯৩-৯৯।

২. দ্র. 'প্রগতি লেখক ও শিল্পী সম্মেলন', ঐ, পৃ. ৬৮১-৮৫।

বাংলা সাহিত্যে রাখিয়া গিয়াছেন"[১]—এই স্বীকৃতিটুকু অন্তত লিপিবদ্ধ ছিল। এছাড়া ঐ ঘোষণাপত্রে অন্য যেসব নির্দেশক বক্তব্য উপস্থিত করা হয়েছিল তা সাংস্কৃতিক ফ্রন্টকে অনিবার্যভাবে বামপন্থী হঠকারিতার পথেই চালিত করতে সাহায্য করেছিল। সুতরাং যাঁরা বলেন, শুধুমাত্র প্রকাশ রায় ও রবীন্দ্র গুপ্ত—অর্থাৎ প্রদ্যোৎ গুহ এবং ভবানী সেনই শিল্প-সাহিত্য বিচারের ক্ষেত্রে হঠকারী নীতির পথপ্রদর্শক, আমি সমস্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ বিচার-বিবেচনা করে তাঁদের সঙ্গে একমত হতে অক্ষম।

দ্বিতীয় কংগ্রেসের পর, 'দক্ষিণপন্থী সংস্কারবাদী বিচ্যুতি'-র বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে অগ্রসর হয়ে, স্বাধীনতা প্রাপ্তির মধ্য দিয়ে ভারতের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব সমাধা হয়ে গিয়েছে—অতএব এখন আর ভারতের বুর্জোয়াশ্রেণীর কোনো বিপ্লবী ভূমিকা নেই, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরেই এখন আমরা উপনীত, শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বেই সেই বিপ্লব সমাধা করতে হবে, কৃষকশ্রেণীই একমাত্র তার মিত্র এবং অন্য সবাই শত্রু-শিবিরভুক্ত—এই অস্বচ্ছ ভ্রান্ত চেতনাই সমগ্র কমিউনিস্ট পার্টিকেই ধীরে ধীরে পৌঁছে দেয় অতি-বামপন্থী হঠকারিতার ভয়ঙ্কর অন্ধ গলিতে। তাই, এই ভ্রান্তির জন্য কেউ এককভাবে দায়ী নন, এটাই আমার মূল বক্তব্য।

অক্টোবর বিপ্লবের পর জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নানা ভাব-সংঘাতের মধ্য দিয়ে তিনটি দশক জুড়ে আমাদের দেশে মার্কসবাদী বিশ্ববীক্ষার যে-আলোক বিচ্ছুরিত হল, সেই আলোকে পথ কেটে মার্কসীয় দৃষ্টিতে শিল্প-সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য-বিচারের ক্ষেত্রে বাঙলাদেশের মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবীরা যে-বিতর্কগুলি উত্থাপন করেছিলেন, আমি এ-পর্যন্ত তার সংক্ষিপ্ত অথচ বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস পাঠকদের কাছে উপস্থিত করার চেষ্টা করেছি। আমার ধারণা, কমিউনিস্ট পার্টির বেআইনী যুগে ভবানী সেন-সম্পাদিত তাত্ত্বিক পত্রিকা 'মার্কসবাদী'-তেই পরিবেশিত হয় এই পর্যায়ের সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ বিতর্কগুলি।

১৯৪৮ সালের অক্টোবর মাসে 'মার্কসবাদী'-র প্রথম সংকলন প্রকাশিত হয়। পুরো দু-বছর, অর্থাৎ ১৯৫০ সালের অক্টোবর পর্যন্ত মোট আটটি সংকলন আত্মপ্রকাশের পর 'মার্কসবাদী"-র আয়ুষ্কাল ফুরিয়ে যায়। প্রসঙ্গত মনে রাখা

১. দ্র. ঘোষণাপত্র', ঐ, পৃ. ৭০৪।

ভালো, 'মার্কসবাদী' নামে পত্রিকা বাংলা ভাষায় নতুন নয়। মিরাট-ষড়যন্ত্র মামলার প্রাক্কালে ১৯৩১ সালে যখন 'কমিউনিস্ট পার্টির কলকাতা-কমিটি' গঠিত হয় তখন আবদুল হালিম, রণেন সেন, সোমনাথ লাহিড়ীর পরিচালনায় 'মার্কসবাদী' নামে একটি পত্রিকা সর্বপ্রথম আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু মাত্র একটি সংখ্যা প্রকাশের পরেই সরকারী নিষেধাজ্ঞায় ঐ 'মার্কসবাদী'-র কণ্ঠ রুদ্ধ হয়।[১] ১৯৪৮ সালের বেআইনী যুগে কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দ সেই অবলুপ্ত 'মার্কসবাদী'-র ঐতিহ্যই সম্ভবত পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা করেছিলেন।

যাহোক, পুনরুজ্জীবিত 'মার্কসবাদী'-র প্রধান সম্পাদক ছিলেন তৎকালীন কমিউনিস্ট পার্টির পলিট ব্যুরোর সদস্য ভবানী সেন। কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সোমনাথ লাহিড়ীও ছিলেন এর সম্পাদনার সঙ্গে যুক্ত। আত্মগোপনকারী এই দুই নেতা অন্যান্য পার্টি-সদস্যদের সহযোগিতায় 'মার্কসবাদী'কে প্রকৃতই একটি তাত্ত্বিক পত্রিকায় রূপান্তরিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। বুর্জোয়া ভাবাদর্শের বিরুদ্ধে 'মতবাদের সংগ্রাম' পরিচালনা করার জন্যই যে 'মার্কসবাদীর' আত্মপ্রকাশ—একথা প্রথম সংকলনে 'সম্পাদকের ভূমিকা'য় স্পষ্টভাবেই ঘোষণা করা হয়। এটাও বলা প্রয়োজন যে, 'মার্কসবাদী'র কোনো সংকলনেই সম্পাদকের নাম মুদ্রিত ছিল না।

'মার্কসবাদী'-র ৮টি সংকলনের মধ্যে প্রথম (অক্টোবর ১৯৪৮), চতুর্থ (জুলাই ১৯৪৯), পঞ্চম (সেপ্টেম্বর ১৯৪৯) এবং ষষ্ঠ (ডিসেম্বর ১৯৪৯) সংকলনেই শুধু শিল্প-সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য-বিচার সম্বন্ধে মোট ৫টি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই পাঁচটি প্রবন্ধ রচনা করেন তিনজন লেখক: বীরেন পাল ও রবীন্দ্র গুপ্ত ছদ্মনামে ভবানী সেন, উর্মিলা গুহ ও প্রকাশ রায় ছদ্মনামে প্রদ্যোৎ গুহ এবং নবগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ছদ্মনামে গণেন বন্দ্যোপাধ্যায়।

আমাদের স্মৃতিশক্তি এতই দুর্বল যে, ইতিমধ্যেই এই ছদ্মনামের আড়ালে লুকানো আসল ব্যক্তিটিকে সনাক্তকরণ করতে অগ্রসর হয়ে আমরা নানা বিভ্রান্তির জটিল জালে জড়িয়ে পড়ছি। প্রগতি-সংস্কৃতি আন্দোলনের যাঁরা প্রবীণ নেতা তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করার সময় আমি এই বিভ্রান্তি লক্ষ্য করেছি। বীরেন পাল যে ভবানী সেন-এর এবং প্রকাশ রায় যে প্রদ্যোৎ গুহ-র—রবীন্দ্র গুপ্ত ও

উর্মিলা গুহ-র মতো আর একটি ছদ্মনাম, তাও দেখলাম অনেকে ভুলে গিয়েছেন। আমি প্রদ্যোৎ গুহ-র সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়েছি এবং রবীন্দ্র গুপ্ত ছদ্মনামী ভবানী সেন, 'মার্কসবাদী-র পঞ্চম সংকলনে, বীরেন পাল যে তিনিই স্বয়ং, তা প্রকাশ করেছেন।১ আর, নবগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় সম্বন্ধে আমি প্রথমে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের প্রবীণ নেতাদের কাছ থেকে কোনো কিছুই জানতে না পেরে যখন হতাশ হয়ে পড়ি, তখন প্রদ্যোৎ গুহ-ই আমাকে একটি সম্ভাবনার সূত্র ধরিয়ে দেন। সেই সূত্রেই আমি উপস্থিত হই 'বসুমতী'-র প্রাক্তন সহযোগী সম্পাদক গণেন বন্দ্যোপাধ্যায়-এর কাছে। তিনিই যে ছদ্ম-নামের আড়ালে নবগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়—তার স্বীকৃতি দিয়ে গণেনবাবু আমাকে অযথা হয়রানির হাত থেকে মুক্তি দেন।

'মার্কসবাদী'-র প্রথম সংকলনে বীরেন পাল ছদ্মনামে ভবানী সেন-এর 'বাংলা সাহিত্যের কয়েকটি ধারা' প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধটি রচনা করে ভবানীবাবু সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের কর্মীদের কাছে আলোচনার জন্য পেশ করেন। সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের নেতৃস্থানীয় প্রায় সকলেই সামান্য সংশোধনীসহ ভবানীবাবুর এই প্রবন্ধটিকে সানন্দে সমর্থন জানান। একমাত্র হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় নাকি বিরক্ত হয়ে বলেন, "পার্টির বিপদের দিনে এসব নিয়ে এই মুহূর্তে আলোচনার এমন কি দরকার।"

আমার মতে, ভবানীবাবুর এই প্রবন্ধটিতে কিছু খণ্ডিত ও ভ্রান্ত দৃষ্টির সাক্ষাৎ পাওয়া গেলেও, রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তাঁর যে মূল্যায়ন তা মোটের উপর সঠিক। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন, "...রবীন্দ্রযুগ হল উদীয়মান ধনিক সভ্যতার যুগ থেকে আরম্ভ করে ধনিক সভ্যতার অন্তিম যুগ পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত। রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভিতর তাই আছে সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততান্ত্রিক প্রভুত্ববাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, সেই সঙ্গে ধনতন্ত্রের আভ্যন্তরীণ দৈন্যের আত্মসমালোচনা।" [দ্র. বাংলা সাহিত্যের কয়েকটি ধারা, পৃ. ২]

বনফুল, তারাশঙ্কর, মানিক, সুবোধ ও বিষ্ণু দে সম্বন্ধে ভবানীবাবুর মতামত নিয়ে হয়তো এখনও আলোচনার অবকাশ আছে কিন্তু তিনি যেসময় এই প্রবন্ধটি লিখেছিলেন তখন এই সব সাহিত্যিকদের সামগ্রিক সৃষ্টিচেতনা এবং অন্যান্য কর্মকাণ্ড যে খাতে প্রবাহিত হচ্ছিল তা মনে রাখলে ভবানীবাবুর বক্তব্যকে

১. বর্তমান গ্রন্থের ১১২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। আর, এই প্রবন্ধের শেষে বিপ্লবী সাহিত্যিকদের অগ্রগতির পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য ভবানীবাবু যে নীতি-নির্দেশক বক্তব্য উপস্থিত করেছিলেন তা মূলত অভ্রান্ত ছিল বলেই আমার বিশ্বাস। [দ্র. 'বাংলা সাহিত্যের কয়েকটি ধারা,' পৃ. ২৪-২৬]

• 'মার্কসবাদী'-র প্রথম সংকলনে 'সাহিত্য বিচারের মার্কসীয় পদ্ধতি' ও চতুর্থ সংকলনে 'বাংলা প্রগতি সাহিত্যের আত্মসমালোচনা' নামক প্রবন্ধ দুটিতে উর্মিলা গুহ এবং প্রকাশ রায় ছদ্মনামে প্রদ্যোৎ গুহ যে-বক্তব্য উপস্থিত করেন তার বহু সিদ্ধান্ত ছিল একপেশে এবং অতি-বামপন্থী ঝোঁকের দ্বারা আচ্ছন্ন। প্রদ্যোৎবাবু নিজেও তাঁর এই বক্তব্যকে এখন আর সঠিক বলে মনে করেন না, একথা তিনি অকপটেই আমার কাছে স্বীকার করেছেন। কিন্তু এ-প্রসঙ্গে একটি বিষয়ের প্রতি আমি মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবী, বিশেষ করে প্রগতি-সংস্কৃতি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত তরুণ শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

আজ থেকে প্রায় ছাব্বিশ বছর আগে পঁচিশ বছরের একজন তরুণ বুদ্ধিজীবী মার্কসীয় দৃষ্টিতে শিল্প-সাহিত্য বিচারের ক্ষেত্রে অগ্রসর হয়ে যে সৎ-সাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন, হতে পারে তিনি বেশ কিছু ভুলও করেছিলেন, তা কি অভিনন্দনযোগ্য নয়? মার্কসীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের অজস্র ধারাস্রোতে আমরা যখন স্নান করছি, তখন কোথায় সেই মার্কসবাদে দীক্ষিত তরুণ বুদ্ধিজীবীর দল, যাঁরা শিল্প-সাহিত্য এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য-বিচারে অতীতের ভুল-ভ্রান্তি শুধরে আমাদের পৌঁছে দেবেন শুদ্ধতর চিন্তার জগতে? তরুণ মার্কসবাদী প্রদ্যোৎ গুহ একদা যে-দুঃসাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন, এই পরিপ্রেক্ষিতেই তার বিচার হোক, এটাই আমি কামনা করি।

প্রদ্যোৎ গুহ-র বক্তব্যের জের টেনে 'মার্কসবাদী'-র পঞ্চম সংকলনে রবীন্দ্র গুপ্ত ছদ্মনামে ভবানী সেন 'বাংলা প্রগতি সাহিত্যের আত্মসমালোচনা' শীর্ষক যে-প্রবন্ধটি প্রকাশ করেন, সেটাই এই পর্যায়ের সব থেকে বিতর্কমূলক রচনা। আমার স্পষ্ট মনে আছে, এই রচনাটি প্রকাশের পর মার্কসবাদী ও অমার্কসবাদী শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী মহলে কী তুমুল আলোড়ন শুরু হয়েছিল। এই প্রবন্ধে ভবানীবাবু তাঁর পূর্ব-সিদ্ধান্ত থেকে, অর্থাৎ 'মার্কসবাদী'-র প্রথম সংকলনে ব্যক্ত মতামত থেকে, সম্পূর্ণ অন্য সিদ্ধান্তে উপনীত হন। বিশেষ করে উনবিংশ শতাব্দীর চিন্তানায়ক রামমোহন-বঙ্কিম-বিবেকানন্দ এবং রবীন্দ্রনাথের ঐতিহ্যকে

বর্জন করেই বাংলা প্রগতি-সংস্কৃতিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে, এই অভিমত তিনি ব্যক্ত করেন। তাঁর এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার পশ্চাতে কমিউনিস্ট পার্টির তৎকালীন ভ্রান্ত রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিই যে ক্রিয়াশীল ছিল, আমি ইতিপূর্বেই তা উল্লেখ করেছি। তাছাড়া, একটা ঔপনিবেশিক দেশের বুর্জোয়াশ্রেণীর মধ্যে যেসব স্ববিরোধী মনোভাব এবং ঝোঁক সব সময় কাজ করে এবং সেই নির্দিষ্ট যুগের সামাজিক, আর্থনীতিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বুর্জোয়াশ্রেণীর ভূমিকাকে বিচার না করে পরবর্তীকালের অগ্রসরমান চিন্তাভাবনার আলোকে তাঁদের ভূমিকা যাচাই করতে গেলে যে-বিভ্রান্তি স্বাভাবিক, ভবানীবাবুর ভ্রান্ত সিদ্ধান্তের মূলে সেটাই প্রধানত আমার লক্ষ্যগোচর হয়েছে।

এই সব ভ্রান্তি সত্ত্বেও উপর্যুক্ত প্রবন্ধে ভবানীবাবুই সম্ভবত প্রথম সিপাহী বিদ্রোহসহ নীল-বিদ্রোহ, সাঁওতাল-বিদ্রোহ, ওয়াহাবী-বিদ্রোহ প্রভৃতি কৃষক-বিদ্রোহগুলির শ্রেণীচরিত্র বিচার-বিশ্লেষণ করে এরি পাশাপাশি রচিত দীনবন্ধু-মাইকেল-কালীপ্রসন্ন সিংহ-র সৃষ্টিকর্মের প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে অনুধাবনের জন্য আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। আর, এই সূত্রে তিনিই বোধহয় প্রথম দৃঢ়তার সঙ্গে আমাদের দেশের লোকায়ত সংস্কৃতির অফুরন্ত ঐশ্বর্য ভাণ্ডার থেকে জীবন্ত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য গ্রহণ করে প্রগতি-সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করার আহ্বানও জানান।

ভবানীবাবুর ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত অবশ্যই আমাদের বর্জন করতে হবে, কিন্তু একজন মার্কসবাদী হিসেবে তিনি শিল্প-সাহিত্য তথা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য-বিচারে যে-সদর্থক ভূমিকা পালন করতে চেয়েছিলেন, আত্মসমালোচনার মাধ্যমে নির্বিচার গ্রহণের পরিবর্তে মার্কসবাদী বিশ্ববীক্ষার সাহায্যে সব কিছুকে পুনর্বিচারের যে-মনোভাব আমাদের চিন্তারাজ্যে জাগ্রত করে দিতে সচেষ্ট হয়েছিলেন, তাঁর সেই ইতিবাচক দিকটি আমরা যেন বিস্মৃত না হই, এটাই আজ আমার বিনীত অনুরোধ।

'মার্কসবাদী'-র ষষ্ঠ সংকলনে নবগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ছদ্মনামে গণেন বন্দ্যোপাধ্যায়ও মূলত একই যান্ত্রিক ও ভ্রান্ত দৃষ্টির সাহায্যে 'উনবিংশ শতকের বাঙলায় বঙ্কিম সাহিত্যের ভূমিকা' বিচার-বিশ্লেষণ করেছিলেন। ফলে, তাঁর সিদ্ধান্তও গ্রহণযোগ্য নয়। কিন্তু তাঁর বস্তুনিষ্ঠ আলোচনায় এমন অনেক তথ্য ছিল, যান্ত্রিকতা পরিহার করে যা মার্কসবাদীরা এখনও বঙ্কিম-বিচারে ব্যবহার করতে পারেন বলেই আমার বিশ্বাস।

আমি অতীতের এইসব ভ্রান্তিপূর্ণ রচনাগুলি সংকলিত করার কাজে কেন অগ্রসর হয়েছি, এ-প্রশ্ন সংগতভাবেই উঠতে পারে। প্রথমেই বলে রাখা ভালো, শুধুমাত্র 'মার্কসবাদী' পত্রিকায় প্রকাশিত রচনাগুলির সংকলন প্রকাশের মধ্যেই আমার কাজকে আমি সীমাবদ্ধ রাখি নি। আমার পরিকল্পিত 'মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক'-র প্রথম খণ্ডটি 'মার্কসবাদী'-র রচনাগুলি নিয়ে প্রকাশিত হলেও এর দ্বিতীয় খণ্ডে থাকবে 'মার্কসবাদী'-র রচনাগুলির প্রতিবাদে 'ডাক', 'পরিচয়', 'নতুন সাহিত্য' 'ইস্পাত' প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত স্বদেশ বসু ছদ্মনামে শান্তি বসু, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, নীরেন্দ্রনাথ রায়, শীতাংশু মৈত্র, অনিমেষ রায় ছদ্মনামে অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র, সনৎ বসু, সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী প্রমুখ বিশিষ্ট মার্কসবাদী সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীদের অধুনা দুষ্প্রাপ্য গবেষণাধর্মী অথচ মার্কসীয় দৃষ্টিতে শিল্প-সাহিত্য বিচারের মননশীল প্রবন্ধাবলী। আর, তৃতীয় খণ্ডে থাকবে অক্টোবর বিপ্লবের পরে আজ পর্যন্ত এদেশে উত্থাপিত যেসব মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্কের কথা আমি উল্লেখ করেছি তার সুনির্বাচিত অংশ।

এই প্রসঙ্গে আরও একটা কথা আমার পাঠকদের জানানো কর্তব্য বলে আমি মনে করছি। বাজারে চালু আছে যে, ভবানী সেন তাঁর এই রচনাগুলি নাকি প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন। একথা অবশ্যই স্বীকার্য, ভবানীবাবুর মতো তত্ত্বে ও কর্মে নিবেদিতপ্রাণ মার্কসবাদী তাঁর ভুল সিদ্ধান্তগুলি আমৃত্যু আঁকড়ে ধরে বসে ছিলেন না। এই গ্রন্থের 'পরিশিষ্ট ২'-এ সন্নিবেশিত 'একজন মনস্বী ও একটি শতাব্দী' তার জ্বলন্ত প্রমাণ। কিন্তু ভবানীবাবু তাঁর ঐ রচনাগুলির মাধ্যমে মার্কসীয় পদ্ধতিতে শিল্প-সাহিত্য বিচারে অগ্রসর হয়ে যে বহু অনালোকিত বিষয়কে আলোকিত করেছিলেন, এই বিশ্বাস তিনি তাঁর ঘনিষ্ঠ সহকর্মীদের কাছে অনেক সময়ই ব্যক্ত করেছেন। প্রগতি-সংস্কৃতি আন্দোলনের এককালের প্রবীণ নেতা অনিল কাঞ্জিলাল এই কথা আমাকে জানিয়েছেন। বাস্তব ঘটনাও এর সত্যতা প্রমাণ করছে।

পাঠকেরা লক্ষ্য করবেন, এই গ্রন্থের 'পরিশিষ্ট ১'-এ 'মার্কসবাদী' পত্রিকার শেষ-সংকলন থেকে 'প্রকাশকের বক্তব্য' রূপে একটি ঘোষণাপত্র পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। এটি একটি মামুলী ঘোষণা মাত্র নয়। 'মার্কসবাদী' সংকলনের প্রকাশক প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অন্যতম নেতা সুশীল জানা আমাকে স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন, 'প্রকাশকের বক্তব্য' রূপে সেদিন কমিউনিস্ট

পার্টির গৃহীত সিদ্ধান্তই ঘোষিত হয়েছিল। ঐ সিদ্ধান্ত অনুসারে 'মার্কসবাদী'-তে প্রকাশিত ১২টি প্রবন্ধকে 'মার্কসবাদ-লেনিনবাদ বিরোধী' হওয়ায় 'বিনাশর্তে প্রত্যাহার' করে নেওয়া হয় কিন্তু সাহিত্য ও দর্শন সম্পর্কে বিভিন্ন সংকলনে যে সমস্ত প্রবন্ধ বেরিয়েছিল সেগুলি সম্বন্ধে বলা হয়, "…এখনো আলোচনা ও বিতর্কের অবকাশ আছে। তাই এই অবস্থায় সেগুলির উপর কোন সুস্পষ্ট মতামত দেওয়া সম্ভব নয়।"১ এছাড়া দিল্লীর অজয়-ভবনের মহাফেজখানায় সংরক্ষিত ভবানী সেন-এর 'আত্মসমালোচনামূলক প্রতিবেদন' পুনর্বার পরীক্ষা করে প্রগতি-সংস্কৃতি আন্দোলনের অগ্রজ নেতা চিন্মোহন সেহানবীশ আমাকে জানিয়েছেন যে, ঐ প্রতিবেদনে তাঁর রচনা প্রত্যাহার সম্বন্ধে ভবানীবাবু একটি কথাও উচ্চারণ করেন নি। সুতরাং এ-সম্পর্কে বাজার-চালু 'গুজব'-এর সত্যিই কোনো বাস্তব ভিত্তি নেই।

এই পরিপ্রেক্ষিতে আমার সাধ্যমত সকল দিক বিচার-বিবেচনা করেই আমি 'মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক' নামক সংকলন গ্রন্থের তিনটি খণ্ডের সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছি। 'মার্কসবাদী' পত্রিকায় রচনাগুলি যেভাবে প্রকাশিত হয়েছিল তার যথাযথ পাঠই এই গ্রন্থে পুনর্মুদ্রিত হল। মূল পাঠের মুদ্রণ-প্রমাদগুলির প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য গ্রন্থশেষে একটি 'শুদ্ধিপত্র' সংযোজন করাও আমার কর্তব্য বলে বিবেচনা করেছি। গ্রন্থে সংকলিত রচনাগুলিতে লেখক যেসব প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন কিংবা রচনাংশ উদ্ধৃত করেছেন, তার প্রাসঙ্গিকতা এবং মূল রচনার অনুল্লেখিত উৎসগুলিকে আমি 'পাদটীকা'-য় যথাসাধ্য সংযোজন করে দিয়েছি। গ্রন্থাকারে অসংকলিত রচনার উদ্ধৃতিগুলিই আমি প্রধানত মূল পাঠের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়েছি এবং তার মধ্যে কোনো অসংগতি লক্ষ্য করলে তাও 'পাদটীকা'-য় বলার চেষ্টা করেছি। রামমোহন-মাইকেল-বঙ্কিম-বিবেকানন্দ-রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ মনস্বীদের রচনাবলী এখন সহজলভ্য, সুতরাং তাঁদের রচনার উদ্ধৃতাংশগুলি যথাযথ অনুসৃত হয়েছে কিনা তা মিলিয়ে দেখার ভার আমি নিজে গ্রহণ না করে পাঠকদের উপরেই ন্যস্ত করলাম। প্রসঙ্গক্রমে এটাও বলা প্রয়োজন যে, আমি দেখেছি অধিকাংশ উদ্ধৃতাংশে রচনার মূল পাঠ যথাযথ অনুসৃত হয় নি; কিন্তু এ কথাও সত্যি,

১. বর্তমান গ্রন্থের ১৫৩-৫৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

একটিমাত্র ক্ষেত্র ছাড়া কোনো উদ্ধৃতাংশে অর্থ-বিকৃতিও ঘটে নি। 'বাংলা প্রগতি সাহিত্যের আত্মসমালোচনা' নামক প্রবন্ধের পাদটীকায় প্রকাশ রায় লেনিন-এর 'লিও তলস্তয়' শীর্ষক রচনা থেকে যে উদ্ধৃতি দিয়েছেন সেখানেই একটি অনূদিত অংশে এই অর্থ-বিকৃতির লক্ষণ সুস্পষ্ট মাত্র।[১] আমার অনবধানতাবশত এই গ্রন্থের সম্পাদনায় অন্য কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটে থাকলে তার জন্য আমিই দায়ী এবং সহৃদয় পাঠকের কাছে অবশ্যই ক্ষমাপ্রার্থী।

পরিশেষে আর দু-একটি কথা নিবেদন করেই আমার বক্তব্য এবার শেষ করব। আমি প্রায় দুই বছর ব্যাপী এই সংকলনগ্রন্থ সম্পাদনার কাজে লিপ্ত। 'মার্কসবাদী' সংকলনের ৮টি খণ্ডই এখন দুষ্প্রাপ্য। কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগার সহ কোথাও 'মার্কসবাদী'-র সমস্ত খণ্ডগুলি একত্রে পাওয়া যায় না। আমি 'মার্কসবাদী'-র সকল খণ্ড সংগ্রহে যখন প্রায়-ব্যর্থ এবং হতাশ তখন লক্ষ্ণৌবাসী বন্ধু ও প্রগতি-সংস্কৃতি আন্দোলনের কর্মী দিলীপ বিশ্বাস তাঁর মহৎ ঔদার্যে 'মার্কসবাদী'-র ৮টি খণ্ডই আমার হাতে তুলে দেন। তাঁর সাহায্য ও সহযোগিতা ভিন্ন আমার পরিকল্পনা কোনোদিন কার্যকর হতো না, একথা আজ কৃতজ্ঞতার সঙ্গেই স্বীকার করি।

'মার্কসবাদী' হাতে পাওয়ার পর 'মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক' শিরোনামে সংকলনগ্রন্থ প্রকাশের পরিকল্পনাটি আমি সর্বপ্রথম পেশ করি প্রগতি-সংস্কৃতি আন্দোলনের প্রবীণ নেতা গোপাল হালদার ও চিন্মোহন সেহানবীশ-এর কাছে। অগ্রজপ্রতিম এই দুই নেতা আমার পরিকল্পনাটিকে শুধু সোৎসাহে অনুমোদন করেন নি নানা পরামর্শ দিয়েও আমাকে সাহায্য করেছেন। এঁদের দুজনের কাছে আমি তাই আন্তরিকভাবেই কৃতজ্ঞ। বিশেষ করে চিনুদার ঋণ প্রায় অপরিশোধ্য। তিনি আমাকে তাঁর ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারের দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়ে এমন অনেক দুষ্প্রাপ্য পত্রিকা ও বই দিয়ে সাহায্য করেছেন, যা না পেলে আমার এই কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা কঠিন হয়ে পড়ত। সত্যি কথা বলতে কি, আমার এই দীর্ঘ ভূমিকায় প্রগতি-সংস্কৃতি আন্দোলন এবং সেই প্রসঙ্গে মার্কসবাদী শিবিরের অপ্রকাশ্য বিতর্ক ও মতাদর্শগত সংগ্রামের যে তথ্যনিষ্ঠ বিবরণ আমি তুলে ধরেছি, তার মূল ভিত্তিই হল শ্রদ্ধেয় চিন্মোহন সেহানবীশ-এর ১৯৫২-৫৩ সালে রচিত এবং আজ পর্যন্ত অপ্রকাশিত প্রগতি-সংস্কৃতি

১. বর্তমান গ্রন্থের ৫৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

আন্দোলনের 'আত্মসমালোচনামূলক একটি প্রতিবেদন'। এই 'প্রতিবেদন'টি ব্যবহারের অনুমতি না পেলে আমার ভূমিকা রচনার কাজ অসম্পূর্ণ থাকত, একথা মুক্তকণ্ঠে ও বিনীতভাবেই স্বীকার করছি।

এছাড়া ভূমিকা রচনায় আমি হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়-এর 'তরী হতে তীর', অবিনাশ দাশগুপ্ত-র 'লেনিন, রুশ মহাবিপ্লব ও বাংলা সংবাদ-সাহিত্য', নেপাল মজুমদার-এর 'যুদ্ধ ও ফ্যাসিবিরোধী সংঘ এবং রবীন্দ্রনাথ' আর সত্যপ্রিয় ঘোষ-এর 'বাংলাসাহিত্যে গোর্কির প্রভাব' প্রভৃতি গ্রন্থ ও প্রবন্ধাবলী থেকে প্রভূত সাহায্য গ্রহণ করেছি। এঁদের সকলের কাছেই আমি কৃতজ্ঞ।

ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার ও আলাপ-আলোচনায় সাংস্কৃতিক আন্দোলনের প্রবীণ নেতা হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, অরুণ মিত্র, বিনয় ঘোষ, অনিল কাঞ্জিলাল, সুশীল জানা, নরহরি কবিরাজ, অরুণ রায় প্রমুখ আরও অনেকে আমাকে প্রগতি-সংস্কৃতি আন্দোলন ও মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক সম্পর্কে নানা তথ্য দিয়ে সাহায্য করেছেন। এঁদের কাছেও আমি ঋণী হয়ে রইলাম।

এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি রচনার কাজে বন্ধুবর সতীন্দ্রনাথ মৈত্র, নির্মল সাহা এবং আমার একান্ত স্নেহভাজন শ্রীমান প্রসূন ঘোষ ও সুস্নাত দাশ-এর সহযোগিতার কথাও আমি সানন্দে স্মরণ করছি।

নানা প্রতিকূল অবস্থার মুখোমুখি দাঁড়িয়েও এই পরিকল্পনাকে সফল করার কাজে অগ্রসর হলে আমার যেসব শুভানুধ্যায়ী নিঃস্বার্থভাবে আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন ও পরামর্শ দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে বন্ধুবর মিহির সেন, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভাস্কর মুখোপাধ্যায় এবং আমার সহধর্মিণী শ্রীমতী গীতা দাশ-এর নাম অবশ্যই স্মরণযোগ্য।

যাহোক, যে-উদ্দেশ্যে দীর্ঘকালব্যাপী অক্লান্ত শ্রম, নিষ্ঠা আর কৃচ্ছ্রতাসাধনের মধ্য দিয়ে আমি এই কাজে অগ্রসর হয়েছি তা যদি বিন্দুমাত্র সফল হয়, এ দেশের তরুণ মার্কসবাদীদের চিন্তা-জগতে এ-গ্রন্থ যদি সামান্যতম ঢেউ তোলে, শিল্প-সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য-বিচারে আমাদের অতীত ভ্রান্তি ও ব্যর্থতা দূর করতে আমার এই কাজ যদি এতটুকুও সাহায্য করে, তবেই আমি নিজেকে ধন্য মনে করব।

বাংলা সাহিত্যের কয়েকটি ধারা / বীরেন পাল

"যে কোন যুগে শাসক শ্রেণীর ভাবসম্পদই হয় সেই যুগের ভাবরাজ্যের বিধানকর্তা।" —জার্মান আইডিওলজি, মার্কস

তাই শাসক শ্রেণীর বিরুদ্ধে যখন শ্রমজীবী শ্রেণীর সংঘর্ষ বেধে ওঠে তখন এক শ্রেণীর সঙ্গে অন্য শ্রেণীর ভাবধারার সংঘাতও অনিবার্য।

শ্রেণীবিভক্ত সমাজে সাহিত্য এবং সংস্কৃতি হল শ্রেণী সংগ্রামেরই অভিব্যক্তি। সংস্কৃতির ভিতর দিয়ে শ্রেণী সংগ্রাম যে কেবলমাত্র প্রকট হয়ে ওঠে তাই নয়, সংস্কৃতি কোন একটি বিশেষ শ্রেণীর হাতে সংগ্রাম পরিচালনার অস্ত্র। শ্রেণী সংগ্রামের মূলে থাকে সমাজের ভিতরকার শ্রম-সম্বন্ধ, তার সমস্যা, সংগ্রাম এবং সমাধান। তাই সাহিত্য এবং সংস্কৃতির ভিতর থাকে তারই সূক্ষ্ম অথচ শক্তিশালী প্রচার। কোন লেখক বা শিল্পী এ সম্বন্ধে সচেতন থাকতে পারেন নাও পারেন, কিন্তু তিনি যা সৃষ্টি করেন তা ঐরূপ শ্রেণী সংগ্রামের কারু না কারু অস্ত্র কিংবা কোন না কোন পক্ষভুক্ত হতে বাধ্য। কাজেই শ্রেণী নিরপেক্ষ বা যুগ নিরপেক্ষ কোন শিল্প বা সংস্কৃতি নেই।

মার্কস বলেছেন—

"বাস্তব জীবনের উৎপাদন পদ্ধতি সামাজিক, রাজনৈতিক ও মানসিক জীবনের গতি নির্দেশ করে। চৈতন্য দ্বারা মানুষের বাস্তব জীবন নির্ধারিত হয় না, বরং সামাজিক বাস্তব জীবন দ্বারাই চৈতন্য নির্ধারিত হয়।"

—ক্রিটিক অব্ পলিটিকাল ইকনমি।

বাস্তব জগতের ভিত্তির উপরই ভাবসম্পদ প্রতিষ্ঠিত এবং বাস্তবের বিরোধাত্মক ও আকস্মিকতাপূর্ণ ক্রমবিকাশের সূত্রেই ভাবসম্পদের উৎপত্তি। কিন্তু ভাবজগৎ নিষ্ক্রিয় নহে। বাস্তবের উপর চিন্তার প্রতিক্রিয়া আছে, চিন্তা সক্রিয়, চিন্তাজগৎ বাস্তবের গতির উপর প্রভাব বিস্তার করে। তাই সাহিত্য ও শিল্প শ্রেণী সংগ্রামের উপর প্রভাব বিস্তার করে, শ্রেণী সংগ্রামের অস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হয়।

এঙ্গেলস বলেছেন—

"রাজনীতি, আইন, দর্শন, ধর্ম, সাহিত্য, শিল্প প্রভৃতির ক্রমবিকাশ অর্থনৈতিক ক্রমবিকাশের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু ইহার প্রত্যেকটিরই অপরটির উপর ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া হয় এবং এই সমস্তেরই প্রভাব বিস্তৃত হয় অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর।"—হাইন্‌ৎস স্টারকেনবুর্গের নিকট এঙ্গেলস-এর চিঠি, সিলেক্টেড ওয়ার্কস, কার্ল মার্কস, ১ম খণ্ড, ৩৩০ পৃষ্ঠা

বর্তমান ধনতান্ত্রিক সমাজে ধনিকশ্রেণীই শাসনকর্তা। এই শ্রেণী ধনতান্ত্রিক সমাজকেই চিরস্থায়ী সমাজ মনে করে, এবং ধনিক শ্রেণীকেই সমস্ত মানুষের ট্রাস্টী মনে করে, তার চেষ্টা হল এই সমাজকেই চিরস্থায়ী করে রাখা। তাই ধনিক শ্রেণীর সংস্কৃতিকে তার পুরোহিতেরা যুগ-নিরপেক্ষ এবং শ্রেণী-নিরপেক্ষ স্বাধীন সংস্কৃতি বলে মনে করেন। শ্রমিকের স্বার্থ হল এই সমাজের পরিবর্তন, অর্থাৎ শ্রেণী সমাজের ধ্বংসসাধন। শ্রমিক শ্রেণীর সংস্কৃতি বা প্রলেটারিয়ান আর্ট হল শ্রেণী সমাজ ধ্বংস করবার অন্যতম অস্ত্র। কাজেই রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জগতের মত সংস্কৃতি জগতেও শ্রেণী সংগ্রাম চলছে।

এদেশে বাংলা সংস্কৃতিতে রবীন্দ্রযুগ হল উদীয়মান ধনিক সভ্যতার যুগ থেকে আরম্ভ করে ধনিক সভ্যতার অন্তিম যুগ পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত। রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভিতর তাই আছে সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততান্ত্রিক প্রভুত্ববাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, সেই সঙ্গে ধনতন্ত্রের আভ্যন্তরীণ দৈন্যের আত্মসমালোচনা। এই বিদ্রোহ এবং আত্মসমালোচনা তাঁকে অনেক সময় শ্রমিকস্বার্থের কাছাকাছি এনে ফেলেছে কিন্তু ধনতন্ত্রের ভিতরই তিনি সমস্ত সমস্যার সমাধান খুঁজেছেন। 'শেষের কবিতা'র মূল কথা হল এই যে, সমাজের বাস্তব ব্যবধান নরনারীর স্বাভাবিক মিলনের পথে ব্যবধান রচনা করেছে, সমাজের ব্যবস্থা ব্যক্তির জীবনের স্বাধীন সার্থকতার প্রতিরোধ করছে। কিন্তু তবু ব্যক্তি নিজেকে সার্থক করছে অতীন্দ্রিয় জগতে, বাস্তবের কাছে মাথা নত করে সে সমাজের শ্রেণীগত ব্যবধানকে মেনে চলেছে, সেখানে সে তার প্রিয়র নিকট থেকে চলে যাচ্ছে বহু দূরে, আর অতীন্দ্রিয় জগতে সে নিজেকে সাধনার ভিতর দিয়ে সার্থক করে তুলছে। এমন করে ব্যক্তি ও সমাজের বিরোধ মিটেছে।

শিলং-এ যখন অমিতের বাড়ীর লোকজন এসে পৌছুবার টেলিগ্রাম এল তখন অমিত বলল—

"না মাসি আমার প্যারাডাইস লস্ট। ঐ নগ্ন আসবাবের স্বর্গ থেকে আমার বিদায়। সেই দড়ির খাটিয়ার নীড় থেকে আমার সুখস্বপ্নগুলো উড়ে পালাবে। আমাকেও জায়গা নিতে হবে সেই অতি পরিচ্ছন্ন হোটেলের এক অতি সভ্য কামরায়।" —শেষের কবিতা, ১৬৭ পৃষ্ঠা

তারপর লেখক বলছেন, "কথাটা বিশেষ কিছু নয়, তবু লাবণ্যের মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। এতদিন এ কথাটা ওর মনেও আসেনি যে অমিতর যে সমাজ সে ওদের সমাজ থেকে সহস্র যোজন দূরে। এক মুহূর্তেই সেটা বুঝতে পারলে। অমিত যে আজ কলকাতায় চলে যাচ্ছিল তার মধ্যে বিচ্ছেদের কঠোর মূর্তি ছিল না। কিন্তু এই যে আজ ও হোটেলে যেতে বাধ্য হল এইটেতেই লাবণ্য বুঝল যে-বাসা এতদিন ওরা দু-জনে নানা অদৃশ্য উপকরণে গড়ে তুলেছিল সেটা কোনদিন বুঝি আর দৃশ্য হবে না।" —১৬৭ পৃষ্ঠা।

অমিত তার সমাজ থেকে পালিয়ে এসেও রেহাই পায় নি, তাকে ফিরে যেতে হল। রবীন্দ্রনাথ এখানে ধনতান্ত্রিক বা শ্রেণী সমাজেরই আত্মসমালোচনা করেছেন। কিন্তু তিনি শেষ করেছেন ধনিক সভ্যতার আত্মরক্ষা দিয়ে। সমাজের রীতি অনুযায়ী অমিত বিয়ে করল কেতকীকে, লাবণ্য বিয়ে করল শোভনলালকে এবং শেষ পর্যন্ত কোন ট্রাজেডির সৃষ্টি হল না। দুজনেতেই শান্ত হল। অমিত লিখল—"বিচ্ছেদের হোমবহ্নি হতে পূজামূর্তি ধরি প্রেম দেখা দিল দুঃখের আলোতে।"

লাবণ্য লিখল— "মোর লাগি করিয়ো না শোক,
আমার রয়েছে কর্ম, আমার রয়েছে বিশ্বলোক,
মোর পাত্র রিক্ত হয় নাই,
শূন্যেরে করিব পূর্ণ, এই ব্রত বহিব সদাই।"

শ্রেণী সমাজের শৃঙ্খলকে তারা ছিঁড়ল না, ছিঁড়বার কোন আবশ্যকতা নেই রবীন্দ্রনাথের কাছে, এই সমাজের ভিতরই ব্যক্তি উঠল বাস্তবের সীমাবদ্ধতার ঊর্ধ্বে, বাস্তবকে বাস্তবক্ষেত্রে মেনে নিল, মনোজগতের রোমন্থনে ইচ্ছাশক্তি দ্বারা বাস্তবের সীমার বন্ধনকে জয় করল।

এ হল ধনিক সভ্যতার ব্যক্তিত্ববাদের প্রচার। ধনিক সভ্যতার অন্তর্বিরোধ গোপন করা যায় না, তার শ্রেণী-অনুশাসনের কাছে মানবত্বকে হার মানতেই হবে, তাকে ন্যায্য ও স্বাভাবিক বলে গ্রহণ করতেই হবে—এর জন্য ধনিক

সভ্যতাকে আঘাত কোরো না, নিজের মনোজগতের ইচ্ছাশক্তির প্রাবল্য দিয়ে শান্তিলাভ কর। এই ব্যক্তিত্ববাদ এবং ভাববাদ ধনিক সভ্যতারই রক্ষাকবচ, রাজনীতিক্ষেত্রে এই ব্যক্তিত্ববাদ এবং ভাববাদই শ্রেণীসংগ্রামের গতিরোধ করবার অস্ত্র, ধনিক সভ্যতার অন্তর্বিরোধে যে দরিদ্র সন্তান বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠছে তাকে শ্রমিকের দুষ্ট প্রভাব থেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য এই শিক্ষাই হল ধনিকশ্রেণীর শিক্ষা।

'ঘরে বাইরে'র মূল শিক্ষাও হল এই—ব্যক্তিত্ববাদ এবং ভাববাদের বিজয়-বার্তা। এ ব্যক্তিত্ববাদ প্রভুত্ববাদী সমাজকে অগ্রাহ্য করছে, প্রভুত্ববাদী সমাজের অনুশাসনের উর্ধ্বে ব্যক্তিত্বকে তুলে ধরেছে, ব্যক্তিত্বের স্বাধীন প্রকাশের পথেই সত্য জয়যুক্ত হচ্ছে। উদীয়মান ধনতন্ত্রকে প্রচণ্ড সংগ্রাম করতে হয়েছে সামন্তপ্রথা ও বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে। রবীন্দ্রনাথ সেই সংগ্রামকে বরণ করেছেন এবং তাই প্রভুত্ববাদের বিরুদ্ধে ও কূপমণ্ডূকের বদ্ধমূল কুসংস্কারের বিরুদ্ধে করেছেন আপোষবিহীন বিদ্রোহ। 'গোরা' সেই বিদ্রোহেরই বিভিন্ন দিক। 'গোরা'র ভিতর আনন্দময়ী ও পরেশবাবু হলেন উদীয়মান ধনিক সভ্যতার ব্যক্তিত্ববাদের অকপট সেবক। রবীন্দ্রনাথের সত্যানুসন্ধান এত অকপট যে নতুন সমাজের প্রবর্তক ব্রাহ্মধর্মও যেভাবে প্রাচীন সমাজের সংস্কার-প্রবণ কূপমণ্ডুকতার আশ্রয় গ্রহণ করেছে তারও তিনি মুখোস খুলে ধরেছেন অতি-নির্মমভাবে।

'গোরা' এবং 'ঘরে বাইরে' প্রাচীন সামন্ততান্ত্রিক সমাজনীতিকে যেভাবে আঘাত করেছে তা হল শ্রমিকের নিকটও একটি অমূল্য সম্পদ, রবীন্দ্রনাথের এই বিদ্রোহ হল শ্রমিক সভ্যতার প্রতি তাঁর অমর অবদান।

ধনতান্ত্রিক সমাজের যে কঠোর সমালোচনা রবীন্দ্রনাথ করে গিয়েছেন তাঁর অন্তিমশয্যায় শুয়ে লিখিত ফাশিস্ত বিরোধী কবিতার ভেতর দিয়ে তা সংস্কৃতি জগতে এক নূতন সত্যের দ্বার উন্মোচন, শ্রমিক সংস্কৃতির সৃষ্টিকর্তাদের প্রথম সৃষ্টির প্রথম উপকরণ।

ব্যক্তিত্ববাদই হল রবীন্দ্রনাথের প্রধান সৃষ্টি। এই ব্যক্তিত্ববাদের জয় ঘোষণাই হল ধনিকের অস্ত্র, ধনিকের শ্রেণীসংগ্রাম পরিচালনার ভাবযন্ত্র।

রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী ধনিক সংস্কৃতির সৃষ্টিকর্তারা রবীন্দ্রনাথের প্রথমটি বর্জন করেছেন, দ্বিতীয়টি গ্রহণ করেছেন। ধনিক সভ্যতা আজ সংকটাপন্ন সুতরাং আজ আর ধনিকশ্রেণী সংস্কারাচ্ছন্ন কূপমণ্ডুকতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে অক্ষম, বরং

তার চাই আজ নূতন কূপমণ্ডুকতা। ধনিকসভ্যতার আত্মসমালোচনা আজ তার নিকট অসহ্য, কারণ বুর্জোয়া ব্যক্তিগত সম্পত্তি তাতে বিপদগ্রস্ত হয়। যৌবনের উদারতা বৃদ্ধের নিকট উন্মত্ততা বলে মনে হয় তাই ধনতন্ত্রের প্রতি অন্ধ-সংস্কার বর্তমান ধনিকসংস্কৃতির সৃষ্টিকর্তাদের অর্থাৎ কংগ্রেসী সাহিত্যিকদের মূলমন্ত্র। তাই সজনীকান্ত, বনফুল ও সুবোধ ঘোষের সাহিত্যে রাজনৈতিক প্রচার আত্মগোপন করতে অক্ষম, তাই তাঁদের সাহিত্যে আছে অন্ধ কমিউনিস্ট বিদ্বেষ, অর্থাৎ কমিউনিজমের বিরুদ্ধে অন্ধ কুসংস্কার সৃষ্টি। বনফুল বলেছেন—

"সত্য কি, তা কেউ বলে বোঝাতে পারে না। নিজে সেটা উপলব্ধি করতে হয়। যেটা মিথ্যা বলে মনে হচ্ছে, সেইটে পরিহার করা চলে শুধু। সত্যসন্ধানের সেই একমাত্র উপায়।" —অগ্নি. ৯২ পৃষ্ঠা।

ধনিক সভ্যতার নিকট আজ সত্য অত্যন্ত অপ্রিয়, সুতরাং ধনিক সভ্যতার রক্ষাকর্তার নিকট সত্যের কোন নির্দিষ্ট ব্যাখ্যা নাই, সংস্কারই সত্য, যা নিজের কাছে মিথ্যে বলে মনে হয় তা বর্জন কর, যা সত্য বলে মনে হয় তাই সত্য বলে প্রমাণ কর, যদি প্রমাণের উপযুক্ত তথ্য না জোটে তবে সাহিত্যে সেই তথ্য সৃষ্টি কর। এই হল সজনী-বনফুল-সুবোধ ঘোষ গোষ্ঠীর দর্শনশাস্ত্র। কমিউনিস্টদের লক্ষ্য তাঁদের কাছে অসত্য সুতরাং যেমন করে হোক সাহিত্যে তাদের নিন্দা করা হয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে কাল্পনিক তথ্য সৃষ্টি করা হয়েছে। বনফুল অন্তরার মুখ দিয়ে বলিয়েছেন—

"কাস্তে হাতুড়ির লেবেল মেরে আমাদের মধ্যে অধিকাংশই যা করে বেড়াচ্ছে, তা মনুষ্যত্ব-চর্চা নয়, আত্মবিনোদন। জীবনের বাঁধাধরা পথে চলবার সুযোগ কিংবা সামর্থ্য এদের অনেকের নেই। অধিকাংশই জীবনযুদ্ধে অকৃতী। বিয়ে করে নি, নিজেদের গ্রাসাচ্ছদন জোটাবার সামর্থ্য পর্য্যন্ত নেই। বাবা দাদা বা ঐ জাতীয় কারও ঘাড়ে চড়ে পরশ্রীকাতরতার বিষোদগারণ করে বেড়াচ্ছে কেবল এবং নিজেদের অক্ষমতার দৈন্যটাকে ঢাকতে চেষ্টা করছে কমিউনিজমের ঢক্কানিনাদে।"

বনফুলের এই উক্তির প্রতিটি ছত্র যে সাজানো মিথ্যা তা প্রমাণ করার দরকার হয় না, এমন অজস্র প্রমাণ বনফুলেরও জানা আছে। কিন্তু মিথ্যা সৃষ্টিই তাঁর কাজ, কারণ মিথ্যাসৃষ্টি ছাড়া আজ আর কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিকে তার ধনিক সভ্যতা বাঁচানোর সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে সাহায্য করা যায় না।

ধনিক সভ্যতার মারণাস্ত্র রয়েছে কমিউনিস্টদের ভাবধারায়, সুতরাং কমিউনিস্ট বিদ্বেষের শিক্ষা দেওয়াই এদের সংস্কৃতির ধ্বজাধারীদের প্রধান কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। কমিউনিজমের শক্তি হল দরিদ্র জনগণ, তাই বনফুল এই জনগণের বিরুদ্ধেও কুৎসা রটনা করতে ছাড়েন নি। বনফুলের 'অগ্নি'র প্রধান চরিত্র অংশুমান স্বগত বলছে—

"অন্ধকার। অসংখ্য ক্ষুধিত, পীড়িত, অশিক্ষিত ধূর্ত মিথ্যাচারী বিশ্বাসঘাতক বিলাসলোলুপ, কামনাক্লিষ্ট আতুর জনতা…হিমালয় থেকে কুমারিকা, গুজরাট থেকে আসাম,…কোথাও বাদ নেই। অথচ সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা এই দেশ, রামায়ণ মহাভারত জাতক গীতা এই দেশেরই কাব্য, মহত্ত্বই এ দেশে মেরুদণ্ড, পরার্থ-পরতাই জীবন-মন্ত্র।" —অগ্নি, ২৭ পৃষ্ঠা।

অসংখ্য ক্ষুধিত পীড়িত অশিক্ষিত জনতা হল ধনতন্ত্রের জহ্লাদ তাই ধনতান্ত্রিক ব্যক্তিত্ববাদীর নিকট তারা হল ধূর্ত, মিথ্যাচারী, বিশ্বাসঘাতক এবং বিলাসলোলুপ।

বনফুলের 'অগ্নি'তে অংশুমান এবং অন্তরা পরস্পরের যৌন আকর্ষণে আগস্ট সংগ্রামের সৈনিক হয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত আর কোন ভবিষ্যৎ না দেখে ফাঁসির মঞ্চে পাশাপাশি তাদের মিলন ঘটল। অসংখ্য কামনাক্লিষ্ট জনতার মধ্যে এই দুটি মহৎ নরনারী মৃত্যুতীর্থে দাঁড়িয়ে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির নৈতিক জয় ঘোষণা করল। সমাজের ভিতর এদের মত নরনারীর ব্যক্তিত্বই হল প্রাণশক্তি। আর অসংখ্য জনতা হল বিশ্বাসঘাতক কামনালোলুপ।

বনফুলের এই কমিউনিস্ট বিদ্বেষ ও জনতা বিদ্বেষ হল ধনতান্ত্রিক সমাজের জন্য নূতন কুসংস্কার সৃষ্টি। সজনীকান্ত-বনফুল-সুবোধ ঘোষ সম্প্রদায়ের সাহিত্যে এইটিই হল প্রধান সুর। রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র যে সমাজের জন্য অতীত কুসংস্কারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে গেছেন, সজনী-বনফুল সেই সমাজের জন্য নূতন কুসংস্কার সৃষ্টি করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিত্ববাদের প্রচারক ছিলেন কিন্তু সে ব্যক্তিত্ববাদকে প্রাচীন সমাজের শৃঙ্খল ভেঙে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে হয়েছিল। তাই রবীন্দ্রনাথ করেছিলেন সত্যানুসন্ধান কারণ বাস্তবের ভিতরই ছিল সেই শৃঙ্খল ভাঙার উপাদান। তাই গোঁড়া হিন্দু সমাজের ভিতর তিনি আবিষ্কার করেছিলেন আনন্দময়ীকে, গোঁড়া ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে তিনি আবিষ্কার করেছিলেন পরেশবাবুকে। উদীয়মান ধনতান্ত্রিক উৎপাদন প্রথা প্রাচীন সমাজের শৃঙ্খল

গুলিকে ভেঙে দিচ্ছিল, তাই ব্যক্তিত্ববাদের প্রতিষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথের প্রচেষ্টা ছিল সত্যাশ্রয়ী। সেই সংগ্রামের ভিতর রবীন্দ্রনাথ হয়েছিলেন সত্যধর্মী।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সত্য আংশিক সত্য। ধনতান্ত্রিক সমাজ অধিকাংশ জনতার ব্যক্তিত্বকে চূর্ণবিচূর্ণ করে মুষ্টিমেয় শোষকের ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করে। সেটা আজ এত স্পষ্ট যে ধনিকশ্রেণী আজকের বাস্তবকে অস্বীকার করে মিথ্যার সাহায্যে ধনতান্ত্রিক ব্যক্তিত্ববাদ বাঁচিয়ে রাখতে চায়। তাই বর্তমান যুগের ব্যক্তিত্ববাদীরা সাহিত্যসৃষ্টিতে নিয়েছেন নির্জলা মিথ্যার আশ্রয়, কুৎসাকে বসিয়াছেন রসসৃষ্টির বেদীমূলে। সাহিত্য ও আর্টকে পরিণত করেছেন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির প্রচারপত্রে ও পোস্টারে। শ্রেণীসংগ্রামের ক্ষেত্রে সজনী-বনফুল সম্প্রদায়ের সাহিত্য হল ধনিকশ্রেণীর অস্ত্র।

কিন্তু শ্রেণীবিভাগ সমাজটাকে সম্পূর্ণ দুটি শ্রেণীতে সাফ সাফ ভাগ করতে পারে নি, ধনিক ও শ্রমিক এই দুই শ্রেণীর মধ্যে আছে অসংখ্য খুদে উৎপাদন-কারী যথা কৃষক, কারিগর, মধ্যবিত্ত বাবু, ছোট দোকানদার প্রভৃতি। এদের দৃষ্টি ধনতান্ত্রিক ব্যক্তিগত সম্পত্তির দিকে, অথচ ধনতান্ত্রিক সংকটে এরাও বিপন্ন, ধনিকের শোষণে এরাও পীড়িত। এদের একদিকে হল ধনতান্ত্রিক প্রথার আকর্ষণ অন্যদিকে হল সংগ্রামরত শ্রমিকের আকর্ষণ। সজনী-বনফুলের কুৎসারস এদের সহজে বিভ্রান্ত করতে পারে না।

এদের জন্য ধনিকশ্রেণীর মনোজগতে নূতন রসের উদ্ভব হয়েছে, সে রস হল নৈরাশ্যবাদ। বর্তমান যুগের নৈরাশ্যবাদী প্রাচীন সামন্তপ্রথার বিরুদ্ধে জনতার বিদ্রোহ ও বিক্ষোভকে সমর্থন করে ধনতন্ত্রের অগ্রণী ভূমিকা স্বীকার করে, ধন-তন্ত্রের অন্তর্বিরোধকেও স্বীকার করে নেয়, কিন্তু ভবিষ্যৎ তার কাছে অন্ধকারময়। বর্তমানের মধ্যে ভবিষ্যতের কোন বীজ নেই, বর্তমান শুধু নোংরামিতে ভরা, জনতার মধ্যে, ধনিকের মধ্যে, ছোট-বড় সবার মধ্যে শুধু অত্যাচার, প্রতারণা এবং দুর্নীতি। এই নৈরাশ্যবাদ হল ধনিক সমাজের দৈন্যের ফল, বিপ্লবের দিক থেকে জনতার মুখ ফিরিয়ে রাখার শেষ চেষ্টা, ব্যক্তিত্ববাদীর শেষ আশ্রয়। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' হল এই নৈরাশ্যবাদের একটি উদাহরণ।

হাঁসুলী বাঁকের কাহারদের যে ছবি তারাশঙ্করবাবু এঁকেছেন তা হল তাঁর কল্পনার ছবি। এই পুস্তকের সমালোচনা-সূত্রে শ্রীহিরণ সান্যাল ঠিকই বলেছেন

যে, "যে-আদিম অন্ধকার থেকে কাহারপল্লীর উদ্ভব, সেই অন্ধকারেই হল তার বিলুপ্তি। তারাশঙ্করবাবু মাটির মানুষের ছবি আঁকলেন জমিদারী প্রাসাদের ভগ্নস্তূপ থেকে। কিন্তু এ মাটিই যে দেশের মাটি থেকে বিচ্ছিন্ন। এখানকার ইতিকথা মানিকবাবুর 'পুতুলনাচের ইতিকথা'র মতন সত্যিকারের বাংলাদেশের মানুষের ইতিকথা নয়, এ হল ঠাকুরমার ঝুলি থেকে বের করা ছেলেভোলানো রূপকথা।" —পরিচয়, পৌষ, ১৩৫৪, ৫৭৫ পৃঃ

এই বইখানি মাটির মানুষ নিয়ে লেখা হয়েছে বলেই অনেকে একে প্রগতি সাহিত্যের পর্যায়ে ফেলেন, কিন্তু এই বইখানি প্রতিক্রিয়াশীল সাহিত্যেরই শ্রেণীভুক্ত। এই বইখানির প্রত্যেকটি চরিত্রই হল অতীতের আবর্জনার ভারে ভারাক্রান্ত এবং ভবিষ্যৎশূন্য। জমিদার ঘোষ চৌধুরী, কাহার-সর্দার বনওয়ারী এবং কাহার সমাজের ঐতিহ্য ভঙ্গকারী করালী প্রত্যেকেই হল দুর্নীতির পসরাবাহী, এদের কেউ সমাজ গড়তে পারল না, প্রত্যেকেই ভাঙল। কাহার-পাড়ার যে ঐতিহ্য আরম্ভই হল নীলকর সাহেবদের প্রাসাদলাভে এবং রক্তের সংমিশ্রণে, তার সমাপ্তি ঘটল চন্ননপুরের কারখানা সৃষ্টিতে। শেষকালে কাহার-পাড়ার পাগল গানের ভিতর দিয়ে হাঁসুলি বাঁকের উপকথার মর্ম ব্যাখ্যা করে যায়— "এ সংসার দুদিনের খেলা রে ভাই, চক্ষু মুদলেই অন্ধকার। এ খেলাতে হার জিত, পাপ আর পুণ্যিতে। গত জন্মে পাপ করেছিলাম, এ জন্মে কাহার-কুলে জন্মেছি। জীবনটা গেল নীচ কাজ করে। অনেক দুঃখের মধ্যেও আমরা বাবা ঠাকুরকে আশ্চয় (আশ্রয়) করে 'খানিক আধেক' (অল্পস্বল্প) পুণ্য অর্জ্জন করতে চেষ্টা করেছি। তার ফল অবশ্যি পাবে .....

মনের কালি হিয়ের কলুষ মুছে ফেল রে উদাসী,
যে বাঁশেতে লাঠি হয় সেই বাঁশে হয় বাঁশী

ভদ্রলোকেরা হাসে। কিন্তু চন্ননপুরে যে সব কাহার এসেছে মজুর খাটতে তারা নীরব হয়ে শোনে।"

একেই বলে নিছক নৈরাশ্যবাদ; আশার আলো জ্বালছে ভগবদ্ভক্তি, অন্ধ বিশ্বাস। এর সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে মোগল সম্রাটের নিকট মেবারের পরাজয়ের পর চারণের গান—"গিয়াছে দেশ দুঃখ নাই আবার তোরা মানুষ হ।" এ গান হল বিজেতার নিকট আত্মসমর্পণের ভিতর শান্তি পাবার গান।

'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা'য় তারাশঙ্করবাবু যে শরৎচন্দ্রর মত শুধু সমস্যা দেখিয়েছেন সমাধান দেন নি তা নয়, তিনি সমাধান দিয়েছেন, সে সমাধান হল অগ্রগামী ধনতন্ত্রের নিকট দরিদ্র গ্রামবাসীর আত্মসমর্পণ।

সমস্যারও যে ছবি তারাশঙ্করবাবু এই বইতে এঁকেছেন তাও শরৎচন্দ্রের মত বাস্তব সমস্যা নয়; শরৎবাবু সমাজের অত্যাচারে জর্জরিত ব্যক্তির মধ্যে মহত্বের উপকরণ দেখেছেন, তাঁর প্রশ্ন ছিল কি করে এই মহৎ ব্যক্তিত্বকে সামাজিক কর্তৃত্বের অনুশাসন থেকে মুক্ত করা যায় অথচ সমাজও ভাঙে না। কিন্তু তারাশঙ্করবাবুর হাঁসুলি বাঁকের উপকথায় 'ছোটলোকে'র মধ্যে মহত্বের কোন সন্ধান নেই, 'ছোটলোক'কে দেখিয়েছেন অসভ্য নীচ আকারে। কাহার সমাজের নীতিজ্ঞান বর্ণনা করতে গিয়ে বনওয়ারী বলছে—

"যে ক্ষেপে ঘর ছাড়লে, পাড়া ছাড়লে, গায়ে কাদা মাখলে, আস্তাকুড়ে গড়াগড়ি দিলে, পরনের কাপড় ফেলে দিয়ে দিগম্বরী হ'ল তাকে কি আর পাড়ার ঘরে স্থান দিতে আছে? রন্ন যে রন্ন (অন্ন যে অন্ন) যা হ'ল সাক্ষাৎ লক্ষ্মী, যা থেকে মানুষের জীবন, সেই অন্নই যদি আস্তাকুড়েয় পড়ে যায় কোন রকমে— তবে সে অন্ন কি আর তুলে আনা যায়? সে তুলে যে মুখে দিলে তার অবধারিত মিত্যু (মৃত্যু)। জাতজ্ঞাত কি জাঙলের সদ্‌গোপ কি চন্নপুরের বাবু মহাশয়দের সঙ্গে মেয়েদের রঙ হলে সে আলাদা। জাতজ্ঞাতের এটো অন্ন এ ওর খায়, ও তার খায়, জাঙলের সদ্‌গোপ মহাশয়দের, চন্নপুরের বাবুদের ভোজে কাজে এটোপাত চিরকাল তারা কুড়িয়ে খেয়ে আসছে। তাই বলে বিদেশী কি জাত না কি জাত, তাদের সঙ্গে যে কুল ছাড়বে সে যে হল আস্তাকুড়ের অন্ন।" —হাঁসুলি বাঁকের উপকথা, ১১৮ পৃঃ

চাষীর মেয়ের দেহ এত সহজে অন্যের পণ্য যে তা নিয়েও স্বদেশী-বিদেশী ব্যবধান সৃষ্টি করা হয়েছে, অথচ অত্যাচারীর বিরুদ্ধে ঘৃণা ফুটে ওঠে নি। এটা কোন সত্যকার ছবি নয়, এটা হল তারাশঙ্করবাবুর কল্পনা। অনুন্নত গণ-সমাজের নৈতিক জীবনের দুর্বলতা দেখাতে গিয়ে এত বাড়াবাড়ি করেছেন যে একেবারে কুৎসা রটনা হয়ে গেছে।

'হাঁসুলি বাঁকে'র এই সুর এবং অচিন্ত্য সেনগুপ্তের 'মুচিবায়েনে'র সুর মূলত একই। গণজীবন নিয়ে এই রস সৃষ্টির প্রেরণা বুর্জোয়া সমাজের দৈন্য ও পংকিলতা থেকেই এসেছে। গণজীবন নিয়ে যা খুশী তাই লিখলেই তাকে

গণসাহিত্য বলে না, ধনিকও গণজীবন নিয়ে খেলা করে থাকে। তার খেলার সামগ্রী সৃষ্টি করাকে গণসাহিত্য বলে না, গণ-বিরোধী সাহিত্যই বলে। গণসাহিত্যিক গণজীবনের নৈতিক দুর্বলতা, তার পংকিলতা ও অসভ্যতা যথেষ্ট জোরের সঙ্গেই দেখাবেন কিন্তু তা দেখাবেন স্বজনের আত্মসমালোচনার মত, শত্রুর কুৎসা রটনার মত নয়। অনুন্নত গণসমাজের নৈতিক দুর্বলতা বা অরাজকতার পিছনে যে সামাজিক অবস্থা তার স্বরূপ উদ্ঘাটিত করবেন, জাগিয়ে তুলবেন শোষকের প্রতি ঘৃণা এবং শোষণপ্রথার বিরুদ্ধে অসহনীয় উত্তেজনা। তারাশঙ্কর এবং অচিন্ত্য সেনগুপ্ত তা করেন নি, করেছেন কুৎসারস সৃষ্টি। নিজেদের নৈতিক অসভ্যতার বিরুদ্ধে নিজেদের যে বিদ্রোহ আছে, নৈতিক অধঃপতনের মুহূর্তেও আত্মসমর্পণকারিণীর যে মহত্ত্ব ফুটে উঠে তার কোন ছবি তারাশঙ্কর বা অচিন্ত্যবাবুর চোখে ধরা পড়ে না। তাঁদের অনেক আগে শরৎবাবু তাঁর ভাববাদী চিন্তাধারা নিয়েও 'মহেশে'র ভিতর অনেক অত্যাচারের বিরুদ্ধে যেটুকু বিক্ষোভ সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন এবং 'চরিত্রহীনে'র মধ্যে কিরণময়ীর উচ্ছৃঙ্খল উন্মত্ততার ভিতর দিয়ে অতীত সমাজের প্রভুত্ববাদের বিরুদ্ধে যে প্রত্যাভিযোগ করেছিলেন তারাশঙ্করবাবু ও অচিন্ত্যবাবু গণজীবনের ছবি আঁকতে গিয়ে তার ধার দিয়েও যান নি।

তারাশঙ্করবাবু তাঁর সাহিত্যে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সূক্ষ্মভাবে গান্ধীপন্থী ব্যক্তিত্ববাদেরই মহিমা কীর্তন করেছেন, ইতিহাসের অগ্রগতি এবং ধনতন্ত্রের শোষণ এবং অবিচার সম্বন্ধে তাঁর সাহিত্যে যে চেতনা আছে তা একটিমাত্র মধ্যমণিকে কেন্দ্র করে সাজানো, সেই মধ্যমণিটি হচ্চে মহাত্মার মতো পুরুষ-শ্রেষ্ঠের সৃজনী প্রতিভা এবং অগণিত অসহায় জনগণের করুণ আর্তনাদ।

'কালিন্দী'তে বিমলবাবুর কারখানার শক্তির কাছে জমিদারেরা পরাস্ত হল, কিন্তু কৃষকেরা ষড় করল বিমল সাহেবের সঙ্গেই, সাঁওতালরা উচ্ছন্নে গেল, রেহাই পেল না, প্রাচীন জমিদারবংশই লড়ল এই ধনবাদের সঙ্গে কিন্তু লড়াইয়ের শেষ পর্বে ভোগলিপ্সু জমিদারেরাই মনুষ্যত্বের ধর্মে মহীয়ান হয়ে উঠল, শ্রেণী-স্বার্থের নিকট মানবত্ব হল বিজয়ী। জমিদারের ছেলে অহীন্দ্র কমিউনিস্ট বনে গেল, কিন্তু কমিউনিজম-এর প্রকৃত শক্তি শ্রমিক এবং কৃষকের কোন সন্ধান পাওয়া গেল না, শুধু অসহায় শোষিত জীবন ছাড়া তাদের আর কোন উৎকৃষ্ট পরিচয় মিলল না। তারাশঙ্করের 'কালিন্দী' হল ধনতন্ত্রের গান্ধীবাদী

সমালোচক, কমিউনিস্ট হল গান্ধীবাদীর নূতন সংস্করণ, ব্যক্তি হল শ্রেণীর উর্ধ্বে। তিনি ধনতন্ত্রের সমালোচনা করেছেন জমিদারের পক্ষ থেকে, জমিদারী প্রথার সমালোচনা করেছেন প্রাচীন গোষ্ঠী-সমাজের পক্ষ থেকে, তাঁর দৃষ্টি অতীতমুখী সুতরাং প্রতিক্রিয়াশীল। রুশিয় 'নারদনিকি' সাহিত্যের পূর্ণ প্রভাবসহ গান্ধীবাদের জয়ধ্বনি হল 'কালিন্দী'র মর্মকথা। কালিন্দীচরের সংঘর্ষের ইতিহাস প্রমাণ করল যে শ্রেণীস্বার্থদুষ্ট ইতিহাসের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে শ্রেণীনিরপেক্ষ মানবত্বের উপর। শ্রেণীসংগ্রামের বিরুদ্ধে এই গান্ধীবাদী সুক্ষ্ম প্রচার একটি বিশেষ শ্রেণীরই স্বার্থরক্ষা করে, সে শ্রেণী হল ধনিকশ্রেণী। সমাজ সমস্যার প্রতি দৃষ্টিভঙ্গী হল শোষকের অত্যাচারে অভিভূত বৈজ্ঞানিক সামাজিক দৃষ্টিহীন মধ্যবিত্তের দৃষ্টিভঙ্গী। এই দৃষ্টিভঙ্গীর মূলে শ্রেণীটা গৌণ ব্যক্তিটা মুখ্য। জমিদারের অপরিসীম মহত্ত্ব ফুটে বেরিয়েছে রায়বংশ এবং চক্রবর্তী বংশের মিলনের মধ্যে; কৃষকের লোলুপতার মধ্যে সবচেয়ে বড় হয়ে ফুটে উঠেছে রংলালদের "শৃগালের মত জিভ চাটিতে চাটিতে" কারখানার মালিক বিমল সাহেবের দলে ভিড়বার ভিতর। ইতিহাসের অগ্রগতির ভিতর দেখলাম কারখানা মালিকের বিরুদ্ধে জমিদারের সংগ্রাম, এ সংঘর্ষে জমিদারের সংগ্রামটাই যেন ন্যায্য সংগ্রাম। ইতিহাসের অবাস্তব দৃষ্টি তারাশঙ্করবাবুর সাহিত্যকে অবাস্তব ভাববাদী সাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত করেছে।

'কালিন্দী'র ভিতর যে গান্ধীবাদী দর্শনের সমাজতত্ত্ব দেখি, 'মন্বন্তরে'র ভিতর সেই গান্ধীবাদী দর্শনেরই রাজনীতি দেখতে পাই। 'কালিন্দী'র মত 'মন্বন্তরে'ও ধনতন্ত্রের নিন্দা আছে, ধনতন্ত্রের অনিবার্য গতির নিকট ব্যক্তির জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠছে, মানবত্ব হচ্ছে উৎপীড়িত। কংগ্রেসপন্থী থেকে আরম্ভ করে কমিউনিস্ট পর্যন্ত সবাই ভালো, সবাই চালাচ্ছে ন্যায্য সংগ্রাম, আগস্ট বিপ্লবী থেকে আরম্ভ করে ফ্যাসিস্টবিরোধী জনযুদ্ধওয়ালা সবাই ন্যায়ধর্মী, সবাই মহৎ। বনফুলের মত কুৎসিৎ স্থূল পক্ষপাতিত্ব নেই, কিন্তু সুক্ষ্মভাবে শ্রেণীবিভাগকে অস্বীকার করে ব্যক্তির সর্বতোময় শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা আছে। যুদ্ধ এবং যুদ্ধজনিত সংকটে ও দুর্ভিক্ষে বিজয়দা, কানাই, লীলা, গীতা, গুণদাবাবু সবাই সেই সংকটের বিরুদ্ধে মরিয়া হয়ে লড়ছে, তাদের পাশে সংগ্রামী জনগণের কোন চিহ্ন পর্যন্ত দেখতে পাওয়া যায় না, ভবিষ্যতের ইংগিত তাদের কোন সৃষ্টিশক্তির মধ্যে পাওয়া গেল না, পাওয়া গেল মহাত্মা গান্ধীর

অপার্থিব নৈতিক জয়ের ভিতর। তাই মহাত্মার উপবাসভঙ্গে বিজয়দা লিখলেন—

"মহাযজ্ঞ আবার হবে। যজ্ঞশেষে উঠবে মানুষের মুক্তিচারু। বিশ্বযুদ্ধের সত্যকার সমাপ্তিতে আসবে নববিধান। সে নববিধানের প্রারম্ভে রচিত হবে যে বিশ্বমানবের মহাশাস্ত্র তাতে কেউ আনবে বৈষম্যমুক্ত সমাজ-রচনার সূত্র, কেউ আনবে জড়বিজ্ঞানের মহাজ্ঞান, বিশ্বরূপের পরিচয় কথা—কতজন আনবে কত বাণী। ভারত নিয়ে গিয়ে দাঁড়াবে ভারতের চিরন্তন বাণী—হে মহাত্মা, যা মূর্ত হয়েছে তোমার মধ্যে সেই চিরন্তনরূপে নবকালের পটভূমিকায় যা ধ্বনিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের কল্পসঙ্গীতের সুর-মাধুর্যে। অন্তরলোকের বিজ্ঞান, জীবনের প্রতি প্রেম, জীবনকে শ্রদ্ধা, সত্যের প্রতি আগ্রহ, মোহমুক্ত কল্যাণদৃষ্টি, মিথ্যার প্রতিরোধে অহিংস অনমনীয় দৃঢ়তা। চিরন্তন ভারতের বাণী বিশ্ব শাস্ত্রের সঙ্গে সমন্বিত হবে। অমৃতময় মানবসমাজ রচনা সার্থক হবে।"

—মন্বন্তর, দ্বিতীয় সংস্করণ, ৩৫৭ পৃঃ

অর্থাৎ তারাশঙ্করবাবুর 'মন্বন্তর' হল আসলে ভাবাদর্শের মন্বন্তর, আদর্শ-বাদী ও ভাববাদীর অধ্যাত্মিক ক্ষমতাই ভবিষ্যৎকে জয়যুক্ত করবে। বর্তমানের সংকটের আঘাতে জর্জরিত অস্থির ব্যক্তিসমুদ্র স্থির হবে সেই দিন যেদিন সমস্ত রকম মতবাদের কচকচানিকে চাপা দিয়ে মহাপুরুষের মোহমুক্ত কল্যাণদৃষ্টি অমৃতময় মানব-সমাজ রচনা করতে পারবে। এই অবতারবাদ, এই ব্যক্তিত্ববাদ এবং এই ভাববাদই হল তারাশঙ্করের সাহিত্য-সৃষ্টির মূল কথা।

'কালিন্দী' থেকে আরম্ভ করে 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা' পর্যন্ত তারাশঙ্করবাবুর সাহিত্য সূক্ষ্মভাবে মার্কসবাদের বিরুদ্ধে প্রচার চালিয়েছে, সজনী-বনফুলের সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য হল সচেতন কুৎসা রটনার সঙ্গে অচেতন প্রোপাগাণ্ডার যে পার্থক্য আছে সেই পার্থক্য। কিন্তু আর একটা দিক লক্ষ্য করবার বিষয়, 'কালিন্দী' থেকে 'মন্বন্তর' পর্যন্ত যে আশাবাদ আছে তা 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা'য় নৈরাশ্যবাদে পরিণত হয়েছে। 'কালিন্দী' থেকে 'হাঁসুলি বাঁক'-এর ব্যবধান হল ৭ বৎসরের ব্যবধান, এই ৭ বৎসর হল ভারতের ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা সংঘাতসংকুল সংকটের যুগ, ধনিক সমাজব্যবস্থার ক্রমবর্ধমান দৈন্যের যুগ। আশাবাদী মধ্যবিত্ত এই যুগে নৈরাশ্যবাদী হয়ে উঠেছে, ব্যক্তিত্বের চরম পরাজয় সে দেখছে অথচ শ্রেণীসংগ্রাম বরদাস্ত করতে পারছে না, তাই তার

মন হয়েছে সব কিছুতেই বিবাগী। 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা' এই বিবাগী মনের সৃষ্টি, ধনিকসংস্কৃতির ক্রমবর্ধমান দৈন্যের পরিচয়। 'কালিন্দী' থেকে 'মন্বন্তর', 'মন্বন্তর' থেকে 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা' এমনিভাবে বুর্জোয়া ব্যক্তিত্ববাদ দীন থেকে দীনতর হয়ে উঠেছে। তারাশঙ্করবাবুর দৃষ্টি রয়েছে সম্মুখের দিকে নয়, পিছনের দিকে, শ্রমিকশ্রেণীর দিকে নয়, ধনিকশ্রেণীর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মহাপুরুষের দিকে।

দার্শনিক জগতের শ্রেণীবিভাগের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ও তারাশঙ্করবাবু সমশ্রেণীভুক্ত। উভয়েই দেশ-কাল এবং শ্রেণী নিরপেক্ষ 'মানুষে'র ধ্যান করেছেন, চেয়েছেন, চেয়েছেন ব্যক্তিত্ববাদের প্রতিষ্ঠা। উভয়েই ভাববাদী।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ববাদ ছিল অতীত প্রভুত্ববাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নিযুক্ত, তাই তাঁর ভাববাদের ভিতর আছে আশাবাদের সুর কিন্তু তারাশঙ্করের ব্যক্তিত্ববাদ ভবিষ্যৎ সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে নূতন প্রভুত্ববাদ বা মহাত্মাবাদ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নিযুক্ত তাই তাঁর ভাববাদের ভিতর এসে পড়েছে নৈরাশ্যবাদের সুর। এই ঐতিহাসিক যুগ পরিবর্তনের জন্যই রবীন্দ্রনাথ উচ্চ-মধ্যবিত্তের জীবনের ছবি আঁকতে গিয়েও তাঁর সাহিত্যে বহুক্ষেত্রে বিদ্রোহের সুর দিতে পেরেছেন, কিন্তু তারাশঙ্করবাবু নিম্নমধ্যবিত্ত ও ততোধিক দরিদ্রসমাজের ছবি আঁকতে গিয়েও তাঁর সাহিত্যে পুনঃ পুনঃ দিয়েছেন পরাজয় এবং আত্মহত্যার সুর। তাই 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা'য় "যে অন্ধকার থেকে কাহার পল্লীর উদ্ভব, সেই অন্ধকারেই হল তার বিলুপ্তি।"

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পুতুলনাচের ইতিকথা'ও এমনি এক নৈরাশ্যবাদ এবং নেতিবাদ। 'পুতুলনাচের ইতিকথা'য় যে চরিত্রই স্থিতিলাভ করতে চেয়েছে তারই ব্যক্তিত্বের ঘটেছে বিলুপ্তি। কিন্তু মানিকবাবু গান্ধীবাদী ভাব-বিলাসী ছিলেন না কোন দিন, তিনি গোড়ায় ছিলেন পেটিবুর্জোয়া বিদ্রোহবাদী, তাঁর চোখে ধনতান্ত্রিক সমাজে ব্যক্তির পরাজয় এবং বিলুপ্তি ধরা দিয়েছে, কোন মহাপুরুষের ব্যক্তিত্ব জেঁকে বসতে পারে নি; 'পুতুলনাচের ইতিকথা' তাই সরাসরি নেতিবাচক এবং নৈরাশ্যব্যঞ্জক। জীবনসংগ্রামের ঘূর্ণীপাকে সবাই পড়ল ডিগবাজী খেয়ে, জীবনটাই হল অনিশ্চিত এবং অসার। প্রত্যেকটি ব্যক্তিই তার পারিপার্শ্বিক থেকে মুক্তি চাইছে সার্থকতার অন্বেষণে। শশী "যে আবেষ্টনীতে যেভাবে...বাঁচিতে চায় তার ব্যক্তিগত জীবনে তাহা বিপ্লবের

সমান। এ বিপ্লব তাহাকে আনিতে হইবে একা, তারপর নবসৃষ্ট জগতে বাস করিতে হইবে একা—সেখানে তো এদের স্থান নাই।" কিন্তু সে মুক্তি তার ভাগ্যে জুটল না, তারাও তার মত হতে পারল না। কুসুম বলল, "সাধ আহ্লাদ আমার কিছু নেই, নিজের জন্য কোন সুখ চাই না। বাকী জীবনটা ভাত রেঁধে ঘরের লোকের সেবা করে কাটিয়ে দেব ভেবেছি—আর কোন আশা নেই ইচ্ছে নেই। সব ভোঁতা হয়ে গেছে ছোট বাবু।" কুসুম ভোঁতা হয়েই রইল। 'পুতুলনাচের ইতিকথা'র সুখ পেল শুধু কুমুদ আর মতি সংসারের পারিপার্শ্বিক ছেড়ে যাযাবর জীবনের অবলুপ্তিতে মিশে গিয়ে।

বর্তমান সমাজে ব্যক্তিত্বের এই ব্যর্থতার মধ্যে সত্য আছে এবং সেই সত্যই হল রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ববাদের বিরুদ্ধ সাক্ষ্য, কিন্তু পুতুলনাচের এই নেতিবাদ হল বুর্জোয়া সমাজের মৃত্যুকালীন ক্রন্দন, সমাজতান্ত্রিক সমাজের জন্মকালীন ক্রন্দন নহে। সমাজতান্ত্রিক সমাজের সাহিত্যচর্চায় বা প্রলেটারিয়ান সাহিত্যে সংঘর্ষ থাকে, পরাজয় থাকে, অভিশাপের বিরুদ্ধে অভিশাপ থাকে, নূতন সৃষ্টির ইংগিত থাকে আর থাকে বিপ্লবী শ্রেণীর জীবনযুদ্ধের প্রেরণা। 'পুতুলনাচের ইতিকথা' বর্তমানের প্রতি অনাস্থা জন্মায় কিন্তু ভবিষ্যতের প্রতি আস্থা জন্মায় না, অবসাদ আনে, প্রেরণা জোগায় না। এ সাহিত্যও ব্যক্তিত্ববাদী।

কিন্তু 'পুতুলনাচের ইতিকথা'র পর 'চিহ্ন' পর্যন্ত মানিকবাবু অনেক দূর অগ্রসর হয়েছেন। 'পরিস্থিতি'র গল্পগুলির মধ্যে শোষণকারী অত্যাচারীর ভণ্ডামির মুখোস খুলে ধরেছেন, তাদের বিরুদ্ধে ঘৃণা জাগিয়ে তুলেছেন সর্বসাধারণের নির্যাতীত নরনারীকে অসহায় করে তুলে ধরেন নি, আর বিদ্রোহকেও রূপ দিতে চেষ্টা করেছেন। 'মাসিপিসী' ও 'পেটব্যথা' এমনি ধারার গল্প। সংস্কৃতির যাত্রাপথে মহাত্মার সন্ধান না করে গণসংহতির সন্ধান করেছেন। এই অনুসন্ধানের অন্যতম পরিণতি হল 'চিহ্ন'। প্রকৃত এক মহান সংগ্রামের মধ্যে অসংখ্য মানুষ অসংখ্য দিকে ভবিষ্যৎ সার্থকতার দিকে অগ্রসর হচ্ছে, ব্যক্তির অসহায়তা দূর করছে সংহতি, পরাজয়ের বেদনা নয় সংগ্রামের উন্মাদনাই টেনে তুলছে প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার দৈন্য এবং অপমান থেকে। ট্রাজেডির মধ্যে জীবনের জয়ধ্বনি আছে অক্ষম এবং অশক্তের করুণ কান্না নেই, ক্রন্দনেও জোর আছে দুর্বলতা নেই। 'চিহ্ন'তে অক্ষয় মদের দোকানে ঢুকি ঢুকি করেও ঢুকল না; প্রেয়সীর মুখ নয় সংগ্রামী জনতার প্রতিরোধের কাহিনী

তাকে বাঁচালো। "...অন্য এক ভয়ঙ্কর নেশাতে একেবারে সচেতন অচেতন মন নিয়ে মসগুল হওয়ার মজাও টের পেয়েছে অক্ষয়, বাঁচার জন্য বাঁচাবার জন্য গুলির সামনে বুক পেতে দিয়ে মরা। এই প্রথম ও নতুন নেশা এত সাফ করে দিয়েছে মাথা যে সে জেনে গিয়েছে মদ হয়ত সে খাবে দু-একবার নিজের দুর্বলতায় কিন্তু সেটা দু-একবারের বেশী আর খাবে না, কারণ, ফেনিল গ্লাসে চুমুক দিতে গেলে তার মনে হবে সে জীয়ন্ত তাজা ছেলের রক্ত খাচ্ছে— গেঁজানো রক্ত।" পুলিসের লাঠি চার্জ এবং গুলিচালনার সামনে রসুলের কথা বর্ণনা করে মানিকবাবু লিখেছেন—"আজ ভয় ভাবনা বেশী রকম ক্ষীণ লাগছিল তার কাছে, বেপরোয়া সাহসের সঙ্গে নতুন একটা বিশ্বাসের নির্ভয়ের ভাব অনুভব করছিল। আবদুলের কথায় তার কাছে স্পষ্ট হয়েছে আবদুল ও তার সম-অনুভূতি ; সে একা নয়। আঘাতের বেদনা বা মৃত্যুর সমাপ্তি অনেকের মধ্যে ভাগাভাগি হয়ে যাবে।"

১৯৪৬ সালের গণসংগ্রাম জীবনের এমনি স্পন্দন সৃষ্টি করেছে অসংখ্য অসহায় ব্যক্তির প্রাণে প্রাণে, কিন্তু বনফুল 'অগ্নি'তে আগস্ট সংগ্রামের প্রচ্ছদপটে এমন জীবনের স্পন্দন সৃষ্টি করতে পারেন নি—অংশুমান মৃত্যুর প্রতীক্ষায় বসে ভাবছে সে কি করতে পারে। অংশুমান প্রেরণা খুঁজছে স্বপ্নে আর অক্ষয় ও রসুল প্রেরণা পেয়েছে বাস্তবে, অংশুমান একা, অক্ষয় ও রসুল অনেকের মধ্যে একজন, অংশুমান জীবন থাকতেই মৃত, রসুল মৃত্যুর পরেও জীবনের আলো দেখতে পাচ্ছে। এই পার্থক্য হল দৈন্যগ্রস্ত মৃত্যুমুখী প্রতিক্রিয়াশীল সাহিত্যের সঙ্গে নবজীবনের চারণ প্রগতি-সাহিত্যের পার্থক্য। 'চিহ্ন'তে মানিকবাবু পুলিসের সঙ্গে জনতার সংগ্রামকে কেন্দ্র করে যে নবজীবনের অভিব্যক্তি সৃষ্টি করেছেন তা জীবন-সংগ্রামের প্রতিক্ষেত্রে, প্রতি দৃশ্যে প্রতি অধ্যায়ে সৃষ্টি করা যায় যদি সাহিত্যিকের দৃষ্টি অতীতমুখী না হয়ে ভবিষ্যৎমুখী হয়, যদি সাহিত্যিকের সৃষ্টিপ্রতিভা বুর্জোয়া প্রভুত্ববাদের বন্ধনে সীমাবদ্ধ না হয়। মানিকবাবু এই নূতন দিকে পথ হাতড়াতে হাতড়াতে অগ্রসর হচ্ছেন এবং প্রাণপণে চেষ্টা করছেন, কিন্তু সাফল্য এখনও যে লাভ করতে পারেন নি সে কথা তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন। মানিকবাবু প্রগতি সাহিত্যের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে ঠিকই বলেছেন—"জীবনে ও চেতনায় ওতোপ্রোতভাবে মিশে আছে বলেই সংগ্রাম সত্য। চাষী শুধু তেভাগা করে না আজ, সে নিজেই

ভাবে আর বলে, আগের মত বৌকে মারধর করা আর চলবে না। মন্দির-মসজিদ পুরুত-মোল্লার কাছে আজও সে মাথা নোয়ায়, তেমন আর অভিভূত হয় না। কবিয়ালের মুখে রামায়ণের যুদ্ধ, কুরুক্ষেত্রের গানের বদলে আজকের মানুষের মুক্তি লড়ায়ের গানে তার রোমাঞ্চ হয় বেশী। তার প্রেম, বাৎসল্য, ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, ক্রোধ আজ মাটির নরম সহিষ্ণুতায় গড়া নয়, তাতে কাস্তের কাঠিন্য ও ধার এসেছে।[১] এই সত্য তারাশঙ্করবাবু ধরতে পারেন নি, অচিন্ত্যবাবু এ সত্যকে অস্বীকার করে চলেছেন। সাহিত্যে এই সত্যকে স্থান দিলেই বুর্জোয়া সাহিত্যিকদের রসভঙ্গ হয়। কিন্তু বাস্তব জগতে গণসমাজে যে প্রগতি সত্য সত্যই সুরু হয়েছে তাকে স্বীকার করাটাই হল প্রগতিশীলতার লক্ষণ, তাকে অস্বীকার করাটা প্রতিক্রিয়াশীলতা।

সাহিত্যে আগে জনগণের অস্তিত্ব দেখা যেত না, বিগত মহাযুদ্ধের পর তারা সাহিত্যে স্থান পেয়েছে, সাহিত্যিকদের দৃষ্টি পড়েছে তাদের দিকে। কিন্তু শুধুমাত্র এই কারণেই সাহিত্যকে প্রগতি-সাহিত্য বলা চলে না, জনসাধারণের দিকে যিনিই তাকান তিনিই প্রগতিশীল নন, কী দৃষ্টিতে তাদের দিকে তাকালেন তার ওপর নির্ভর করে তিনি প্রগতিশীল কি না। সজনীকান্তের দল তাদের দিকে তাকাচ্ছে উদীয়মান সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও গণতান্ত্রিক প্রগতিকে বাধা দেবার উপকরণ সংগ্রহের জন্য, তারাশঙ্করবাবু গান্ধীবাদী দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে তাদের শুধু অতীতটা দেখছেন, দেখছেন না তাদের সুস্পষ্ট ভবিষ্যৎ, মানিকবাবু ও ননী ভৌমিক প্রমুখ লেখকেরা তাদের ভবিষ্যৎ দেখতে আরম্ভ করেছেন।

কিন্তু মানিকবাবুর দৃষ্টি এখনও সীমাবদ্ধ, এখনও সাহস করে সত্য উদ্ঘাটনের পথে বেশীদূর পা বাড়াতে পারেন নি। 'পরিস্থিতি' থেকে আরম্ভ করে 'চিহ্ন' পর্যন্ত তিনি নিত্য নূতন ভঙ্গীতে একটি পরম সত্য আবিষ্কার করে চলেছেন—সে সত্য হল ধনিক সমাজের দৈন্য এবং গণসমাজের বিক্ষোভ ও বিদ্রোহ। কিন্তু মানিকবাবুর প্রগতি এখনও "জনসাধারণের নৈর্ব্যক্তিক স্বজাতি প্রীতির দলের" মধ্যে সীমাবদ্ধ, শ্রেণী এখনও তেমন করে ফুটে ওঠে নি,

১. উপর্যুক্ত উদ্ধৃতাংশে শব্দ, বানান ও যতি-চিহ্ন ব্যবহারে প্রবন্ধ-লেখক মূল রচনাটিকে যথাযথ অনুসরণ করেন নি। 'পাঠকগোষ্ঠী', পরিচয়, ফাল্গুন, ১৩৫৪ পৃঃ ২০১ দ্রষ্টব্য। —সম্পাদক

কোটাতে যেন এখনও একটু দ্বিধা আছে। বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে জনগণের আক্রোশ, ধনিক শোষণকারীর মুখোস খুলে ধরে জনগণের সংগ্রামী প্রতিভার রূপ প্রকাশ এবং ব্যক্তিনিষ্ঠতার পরিবর্তে বস্তুনিষ্ঠতা মানিকবাবুর সাহিত্যে আসছে কিন্তু এখনও আসেনি শ্রেণীসংগ্রামের সত্য, শ্রেণীসংগ্রামের সমস্ত দিক, ধনিক-শ্রেণীর বিরুদ্ধে সর্বাঙ্গীন বিদ্রোহ, ধনিক সমাজের ভাঙ্গনের সম্পূর্ণ তথ্য, ধর্মঘটী মজুরের মরণপণ সংগ্রাম, ধর্মঘট নিয়ে ধনিকের প্রচার এবং সব শ্রমিকের স্বার্থ এই দোটানার মধ্যে অচেতন মজুরের আত্মদ্বন্দ্ব, কমিউনিস্ট বিরোধিতার নামে কংগ্রেসীদের স্বদেশভক্তির প্রতারণা এবং জমিদার কৃষকের যে সংঘর্ষ কখনও সশব্দে, কখনও নীরবে গ্রামে গ্রামে নূতন সত্তা সৃষ্টি করছে তার আত্মপরিচয়। 'সমুদ্রের স্বাদে' মানিকবাবু মধ্যবিত্তের যে আত্মপ্রতারণার ছবি বলিষ্ঠ ভঙ্গীতে প্রকাশ করেছেন তা যে আজ আর এক নূতন পর্যায়ে উপস্থিত সে দিকে মানিকবাবু এখনও দৃষ্টিপাত করেননি অথবা দৃষ্টিপাত করেও সাহিত্যে তাকে স্থান দিতে সাহস করেননি। 'সমুদ্রের স্বাদ'-এর মধ্যবিত্ত পারিবারিক জীবনে, বন্ধুমহলে এবং যৌননীতির ক্ষেত্রে ভণ্ডামি ও আত্মপ্রতারণার আশ্রয় নিয়েছে, কিন্তু আজকের মধ্যবিত্ত তার ওপরে নূতন সংকটের সম্মুখীন। মধ্যবিত্ত সমাজ ভেঙে আজ মজুরের সঙ্গে সমতল হয়ে উঠবার উপক্রম করেছে, অতীতের স্বদেশ-ভক্তির আদর্শ আর নূতন শ্রেণী চেতনা তার অন্তরে ও বাহিরে ঘোরতর দ্বন্দ্ব উপস্থিত করেছে, তার ভবিষ্যৎ যে শ্রমিকের শ্রেণীচেতনাতে তা বুঝি বুঝি করেও বুঝে উঠতে পারছে না, কংগ্রেসী আদর্শ বার বার তাকে পিচনে টানছে। সে টানের জোর এত বেশী যে মজুর পর্যন্ত তাতে আকৃষ্ট হচ্ছে, মজুরের সেই দুর্বলতা মধ্যবিত্তকে অতীতমুখী করে রেখে দিচ্ছে। এই বিপ্লব দেখা দিয়েছে কেবল রাজনীতি ক্ষেত্রে নয়, এ বিপ্লব দেখা দিয়েছে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে। মানিকবাবুরা এ পথে পা বাড়াতে সাহস করছেন না এই ভয়ে যে, সাহিত্যে কমিউনিস্টদের দলীয় নীতি প্রচার করা হচ্ছে বলে দিকে দিকে তুমুল প্রতিবাদ উঠবে। যে যুগে "রাজনীতি" প্রতিটি মানুষের জীবনে জড়িয়ে গেছে সে যুগে "রাজনীতি"কে এমনিভাবে এড়িয়ে গেলে সাহিত্যসৃষ্টি দুর্বল হতে বাধ্য। সজনীকান্তরা ধনিক-রাজনীতি সমানে আমদানী করে চলেছেন আর মানিকবাবুদের নিরস্ত করা হচ্ছে—রাজনীতির ভয় দেখিয়ে। এটাই হল ধনিকের কৌশল। ননী ভৌমিক সাহসের সঙ্গে এদিকে আর এক কদম অগ্রসর

হয়েছেন, কিন্তু সাহিত্য জগতে তিনি নূতন আগন্তুক, সংগ্রামের ক্ষেত্র এখনও তাঁর নিকট কয়েকটি ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ। সর্বাঙ্গীন বলিষ্ঠ দৃষ্টি এখনও তাঁর খোলেনি. বাহ্য সংগ্রামের যে প্রভাব মনোজগতের সূক্ষ্মক্ষেত্র নিয়ন্ত্রিত করে তার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা তাঁর এখনও জন্মেনি। কিন্তু সাহসের সঙ্গে তাঁদের আরও এগুতো হবে; তাতে তীব্র প্রতিবাদ এবং প্রতি-আক্রমণ আসবে কেবল শত্রু শিবির থেকে নয়, বন্ধু শিবির থেকেও, কিন্তু সাহিত্যজগতের নতুন সৃষ্টিতে সংঘর্ষ এড়িয়ে গেলে তাঁরাও পিছিয়ে পড়বেন আর নতুন সৃষ্টি করতে পারবেন না। সংঘর্ষের ভিতর দিয়েই হবে রাজনীতি ও সমাজনীতির মত সংস্কৃতিরও বিজয়ী অভিযান।

আয়ুব সাহেব সাহিত্যের এই প্রগতিকে রোধ করবার জন্য সত্য, শিব এবং সুন্দরের ধ্বনি তুলেছেন, সাহিত্যকে করতে চেয়েছেন দল-নিরপেক্ষ।[১] আয়ুব সাহেবের এই দলনিরপেক্ষতার ধ্বনি সাহিত্যজগতেই সীমাবদ্ধ নয়, রাজনীতি-ক্ষেত্রেও শোষকশ্রেণীর সর্বশেষ ধ্বনি হল এই দল-নিরপেক্ষতা, নিজের দলে টানবার সমস্ত সম্ভাবনা শেষ হয়ে আসছে দেখলেই ধনিক নেতারা এই দল-নিরপেক্ষতার পরামর্শ দেয়। দল হচ্ছে শ্রেণীর অংশ, সচেতন ও অগ্রণী অংশ। দল-নিরপেক্ষতার অর্থ হল শ্রেণী-নিরপেক্ষতা। সাহিত্যক্ষেত্রে দলগত মতবাদ অস্বীকার করার অর্থ শ্রেণীভেদ ও শ্রেণীসংগ্রাম অস্বীকার করা, 'মানুষ'কে শ্রেণী-বর্ণহীন 'মানুষ' বলে গণ্য করা। কিন্তু মানুষ শ্রেণী-বর্ণহীন নয়, তার অনুভূতি থেকে আরম্ভ করে বাহ্যিক কর্ম কিছুই শ্রেণী-বর্ণহীন নয়। আয়ুব সাহেবের উপযুক্ত জবাব দিতে গিয়ে অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র ঠিকই বলেছেন—

"মার্কসিস্ট পার্টির নেতৃত্ব লেখককে বলে, দেখছো না বুর্জোয়া সাহিত্য অধঃপাতে গেছে, বুর্জোয়া সাহিত্যিক সাহিত্য সৃষ্টি করতে অক্ষম হয়ে পড়েছেন। বুর্জোয়া সমাজের সামাজিক সম্পর্কের নগ্ন ও ঘৃণিত রূপ পুঁজিতন্ত্রের সাধারণ সংকটের যুগে ক্রমশই প্রকাশ হয়ে পড়ছে। তাই এখন বস্তুজগতের দিকে চোখ পড়লেই বুর্জোয়া সাহিত্যিকের পক্ষে মুশকিল। তাহলেই শ্রেণী-সংগ্রামের চেহারাটি সাহিত্যে এসে পড়বে এবং বুর্জোয়া সাহিত্যিককে বুর্জোয়া

১. পরিচয়, পৌষ, ১৩৫৪-এ প্রকাশিত আবু সয়ীদ আইয়ুব-এর 'সাহিত্যের চরম ও উপকরণ মূল্য' নামক প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য।—সম্পাদক

শ্রেণীর পক্ষ অবলম্বন করে সরাসরি ফাসিস্ট প্রচারবাদী সাহিত্যই রচনা করতে হবে। তাই বুর্জোয়া সাহিত্যিক বাস্তব সম্পর্ককে কল্পনা করেন 'এ্যাবস্ট্রাক্ট' অর্থাৎ বস্তুবিশ্লিষ্ট রূপে, মানুষের সহিত মানুষের সম্পর্কটা হয়ে দাঁড়ায় আইডিয়ার সহিত আইডিযার সম্পর্ক। এই ধরনের রূপান্তর পুঁজিতান্ত্রিক সমাজের একটা বিশেষত্ব। শ্রেণী সংগ্রামটা হয়ে দাঁড়ায় সত্য, শিব, সুন্দর ইত্যাদির চরম মূল্যের সহিত বিরুদ্ধমূল্যের সংগ্রাম। সত্য, শিব ও সুন্দরের জন্য লড়াই করেন বুর্জোয়া সাহিত্যিক বুর্জোয়া শিবিরে থেকেই—যেমন ট্রুম্যান ও ভ্যাণ্ডেনবার্গ মার্শাল প্ল্যান চালু করতে চান গণতন্ত্র, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, মানবমুক্তি, বিশ্বশান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য। অর্থাৎ বুর্জোয়া লেখকের রচিত ডেকাডেণ্ট যুগের তথাকথিত বিশুদ্ধ সাহিত্যটা আদৌ সাহিত্য নয়, সেটা দক্ষিণপন্থী শিবিরের প্রচারবাদী সাহিত্য বা সাহিত্যের বিকৃতি। সেই সাহিত্য সাধারণ মানবের ব্যক্তি-চৈতন্যকে হয় একটা মিথ্যা ও ভিত্তিহীন প্রত্যয়ের দ্বারা বিভ্রান্ত করে ঘুম পাড়িয়ে রাখতে চায়, আর নয়তো বামপন্থী শিবিরের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ জাগিয়ে সম্পূর্ণ প্রতিবিপ্লবী করে তোলে। সত্য-শিব-সুন্দর মার্কা বিশুদ্ধ সাহিত্য দক্ষিণপন্থী শিবিরের একটা হাতিয়ার।"[১]

—পরিচয়, মাঘ, ১৩৫৪, ৯২ পৃঃ

অমরেন্দ্রবাবু এই সঙ্গে মার্কসিস্ট সাহিত্যিকের প্রতি সময়োচিত সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন—

"বহু মার্কসিস্ট সাহিত্যিকের একাগ্র শিল্পসাধনার অভাব আছে। অনেকেই সস্তায় কিস্তিমাৎ করতে চান। টেকনিক ও কলাকৌশল আয়ত্ত করার চেষ্টা অনেকেই করেন না। বস্তুজগত সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ ও প্রগতিশীল অভিজ্ঞতাও অনেকের নেই। অপরের চৈতন্যকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা তাঁরা অনেকেই অর্জন করেন নি।"[২]

সাহিত্যের কলাকৌশল সাহিত্যের মূলনীতি ও মূল উপকরণ থেকে বিচ্ছিন্ন নয় বরং ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। সত্যবস্তুকে উপলক্ষ করেও ভাবনিষ্ঠ ও ব্যক্তিনিষ্ঠ কলাকৌশল সূক্ষ্মভাবে বুর্জোয়া ভাবধারার প্রভাব রক্ষা করে থাকে।

---

১. উদ্ধৃতাংশের দু-একটি শব্দ ও বানানে মূল রচনার পাঠ যথাযথ অনুসৃত হয় নি। 'পরিচয়'-এর পৃষ্ঠা ৯২-৯৩ দ্রষ্টব্য। —সম্পাদক

২. অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র, 'সাহিত্যের চরম ও উপকরণ মূল্য'; পরিচয়, মাঘ ১৩৫৪, পৃঃ ৯৫ দ্রষ্টব্য। —সম্পাদক

তার প্রমাণ শ্রীবিষ্ণু দের কবিতা। তাঁর কলাকৌশল হল কাব্যকে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন রাখবার বা জনগণকে কাব্য থেকে বঞ্চিত রাখবার কলাকৌশল। মার্কসবাদী বস্তুনিষ্ঠ কলাকৌশলের উদ্দেশ্য হল সাহিত্যকে গণমনের উপর প্রভাবশালী করা, সাহিত্যের সত্যকে গণমানবের অনুভূতি জাগাতে সক্ষম করা এবং বক্তব্য-বিষয়কে সহজ সরল সুন্দর ও জোরালো করে তোলা। বিষ্ণুবাবুর কলাকৌশল ঠিক তার বিপরীত। প্রথমত তাঁর কলাকৌশল বক্তব্য-বিষয়কে সহজ ও সরল করে না, যতদূর সম্ভব দুর্বোধ্য ও জটিল করে তোলে। তাঁর কবিতাকে দণ্ডীর ভঙ্গীকাব্যের মত ব্যাকরণ বলে মনে হয়। দ্বিতীয়ত তাঁর কলাকৌশল মনের ভাব বাইরে প্রকাশ করে না বরং বাইরের বস্তু ও ভাবগুলিকে একটা অতীন্দ্রিয় রূপ দিয়ে ভিতরে টেনে নেয়, যা সহজে বুঝি তাকেও 'বুঝি-না'র পর্যায়ে ফেলে দেয়। তৃতীয়ত তাঁর কলাকৌশল ভাবের ঐক্য এবং শৃঙ্খলাকে ভেঙ্গে মনোরাজ্যে অরাজকতা সৃষ্টি করে। স্বপ্নে যেমন নানা বস্তু, নানা স্থান ও নানা কালের স্মৃতি টুকরো টুকরোভাবে একটা বস্তু, একটা স্থান বা একটা কালের সঙ্গে উচ্ছৃঙ্খলভাবে জড়িত থাকে তাঁর প্রসিদ্ধ কবিতাগুলি ঠিক সেই রকম। ভাসা ভাসা অনেকগুলো বিবিধ আইডিয়া ঘোড়দৌড়ের মত একটা আইডিয়ার ওপর দিয়ে এমনভাবে দৌড়ে যায় কার সাধ্যি বুঝতে পারে কোন্ ঘোড়াটা কোন্ দিকে দৌড়োচ্ছে।

এই কলাকৌশল হল—বস্তুনিষ্ঠ নহে ব্যক্তিনিষ্ঠ, গণতান্ত্রিক নহে, আত্মকেন্দ্রিক, গঠনমূলক নহে অরাজক। এ কলাকৌশল হল বুর্জোয়া ভাবধারার দৈন্য ও অরাজকতা থেকে উৎপন্ন। এর সঙ্গে মার্কসবাদের কোন সম্পর্ক নেই।

বিষ্ণুবাবু একজন দক্ষ কলাকৌশলবিদ কিন্তু মার্কসিস্ট নন। তাঁর কলাকৌশল মার্কসবাদকেই হত্যা করে।

কিন্তু একথা মনে করলে ভুল হবে যে, বিষ্ণুবাবুর গলদ শুধু কলাকৌশলেই। কলাকৌশল তাঁর ভাবধারাকেও বিকৃত করে দিয়েছে, অথবা তাঁর ভাবধারারই প্রকৃত প্রতিচ্ছবি হল তাঁর কলাকৌশল। তাঁর কবিতায় বিপ্লব, সমাজতন্ত্র, জনগণ, ধর্মঘট, তেভাগা, এসব সত্যকার মানুষের সত্যকার সংগ্রাম নয়, এসব হচ্ছে কতকগুলি অধ্যাত্মিক আইডিয়া, উপকথার লালকমল আর নীলকমলের মত প্রহেলিকা, মনের একটা আলোড়ন, ভাবের একটা রঙীন নেশা। পাতঞ্জলির সাংখ্যদর্শনের মত 'বস্তু'কে তিনি 'প্রকৃতি'তে পরিণত করেছেন। ভাববাদের

এক মহা সংকটের সময় শঙ্করাচার্য যেমন অদ্বৈত বেদান্তে বস্তুজগতের অস্তিত্ব স্বীকার করে নিয়েই তাকে মায়ায় পরিণত করেছিলেন, বিষ্ণুবাবু তেমনি বস্তুজগতের প্রকৃত সংগ্রাম ও সমস্যাকে মায়াময় করে তুলেছেন। উদাহরণ স্বরূপ—

"চম্পা ! তোমার মায়ার অন্ত নেই.
কতো না পারুল-রাঙানো রাজকুমার
কতো সমুদ্র কতো নদী হল পার
বিরাট বাংলা দেশের কতো না ছেলে
অবহেলে সয় সকল যন্ত্রণাই—
চম্পা কখন জাগবে নয়ন মেলে।"[১]

স্বাধীনতা বা গণবিপ্লব কবির নিকট প্রকৃত মানুষের প্রকৃত জীবনের ব্যাপার নয়, চম্পার মত এক রঙীন ফুল, কল্পলোকের এক অতীন্দ্রিয় সত্তার পার্থিব মূর্তিতে আবির্ভাবের সুদূর সম্ভাবনা। বাহ্যত আশাবাদী হলেও এটা নৈরাশ্যবাদীর সুর, বাহ্যত বস্তুতান্ত্রিক হলেও অধ্যাত্মিকতা।

রাজনৈতিক সংগ্রামে জঙ্গী হল সবচেয়ে অগ্রগামী সংগ্রামী মজুর, কৃষক, বা ছাত্র, সে বস্তুজগতে বাস্তবিক সংগ্রামের বীর সৈনিক। রুশ কবি কনস্তান্তিন্ সিমোনভ তার সম্বন্ধে কবিতা লিখেছেন তারই অনুভূতি ও আকাঙ্ক্ষাকে নিজের বলিষ্ঠ কলাকৌশলের সাহায্যে নিম্নলিখিত ভাষায়—

"প্রতীক্ষায় স্থির থেকো আসব আবার।
অনেক মৃত্যুর মুখে তুড়ি দিয়ে আবার আসব।
ওরা বলে বলুক—জানি কেউ কেউ বলবে,
কি কপালে দেখো ! বেঁচে গেলো শেষ পর্যন্ত।
ওরা কি কখনও বুঝবে—
ওরা তো কখনও প্রতীক্ষায় মন বাঁধেনি—
কেমন করে তুমি আমার ভাগ্য দিলে ঘুরিয়ে
তোমার এই মৃত্যুহীন প্রতীক্ষায়.

১. বিষ্ণু দে, 'সাত ভাই চম্পা'। উদ্ধৃতাংশের একটি শব্দ এবং বানানে ভিন্নতর পাঠ লক্ষিত হয়। দ্র. 'একুশ বাইশ', পৃঃ ৯৫। – সম্পাদক

কেমন করে পেরিয়ে এলুম প্রত্যক্ষ নরক!
সে শুধু জানব তুমি আর আমি
—তুমি, তোমার এই তুলনাহীন প্রতীক্ষায়
বৃষ্টি আর তুষারে, দিনের পর দিন।"

বিষ্ণুবাবুরই অনুবাদ। অথচ এ কবিতা যে কোন জঙ্গী বোঝে, এ তার মনেরই কথা, এ কবিতা শত শত জঙ্গীকে প্রেরণা জোগায়। ভঙ্গী সহজ ও সরল। বাংলায় এ শ্রেণীর কবিতা লিখে গেছে অমর সুকান্ত।

কিন্তু বিষ্ণুবাবু নিজে জঙ্গী সম্বন্ধে যে কবিতা নিজের ভাব ও নিজের ভঙ্গীতে লিখেছেন তার নমুনা—

"দূরে যদি যাবে যাও, মুহূর্তের মুহ্যমান গানে
আকস্মিকে থেমো নাকো, নৈর্ব্যক্তিক আমার প্রয়াস
আশা করি হবে নাকো অস্থির যাত্রায় অবকাশ
তোমার বারেকও। তাই বলি হেসে, তোমার প্রয়াণে
যৌবন বেদনাভারে উচ্ছল তোমার দিনগুলি
রেখে যাবে জীবনের আনন্দের উচ্ছিষ্ট আবেশ
আমার প্রাণের পাত্রে। হৃদয়ের অনশ্বর রেশ
ছড়াল যে স্বচ্ছ সুখ, অক্ষয় সে উদ্ধত অঙ্গুলি।"[১]

বিষ্ণুবাবুর এই কবিতা কোন সত্যকার জঙ্গী মানুষ বোঝে না, তিনি নিজেই বোঝেন, নিজেই উপভোগ করেন। "জঙ্গী" কোন সত্যকার সংগ্রামের কোন সত্যকার সৈনিক নয়, বিষ্ণুবাবুর মনের একটা আইডিয়া, তাঁর চম্পার একটা পাপড়ি, তাঁর "বস্তুতান্ত্রিক" অধ্যাত্মজগতের একটা সত্তা। এর ভিতরও ফুটে বেরুচ্ছে "মুহ্যমান" নৈরাশ্যবাদীর "হৃদয়ের অনশ্বর রেশ"। অন্যত্র কবি বলেছেন—

"প্রেয়সী! যখন তূর্য ভাঙবে তোমার ঘর
জানি সে বিদায়ে ঘর ও বাহির দ্বন্দ্বহীন
বিজয়ী প্রাণের দীপ্তি নয়নে, গভীর স্বর;
তোমার মধুরে নীড় উভয়ত ছন্দলীন।

১. বিষ্ণু দে, 'সাত ভাই চম্পা' / 'জঙ্গী' কবিতা। উদ্ধৃতাংশে কিছু মুদ্রণ-প্রমাদ ও পাঠান্তর প্রত্যক্ষতর। দ্র. 'একুশ বাইশ', পৃঃ ৮০।—সম্পাদক

বন্ধন নয়, বিশ্বব্যাপ্তি তোমার টানে,
ভাবী সমাজের অজেয় ইসারা তোমার গানে।"[১]

ভাবী সমাজের ইসারা জীবন্ত নিপীড়িত মানুষের সংগ্রামে নয়, একটা অতীন্দ্রিয় অনুভূতিতে পাওয়া যায়; এই হেঁয়ালিবাদই হল বিষ্ণুবাবুর 'বস্তুবাদের' ফিলজফি। এর সঙ্গে মার্কসবাদী বস্তুবাদের কোন সম্বন্ধ নেই, এ হল মুমূর্ষু ধনিক সমাজের অল্প মধ্যবিত্তের 'বস্তুবাদ'।

বিষ্ণুবাবুর কলাকৌশল ও দর্শন উভয়ই ক্ষয়িষ্ণু ধনিক সমাজের ক্ষয়েব পরিচয়। কাব্য জগতের এই ক্ষয়িষ্ণুতা ও দৈন্য প্রগতির পথে এক বিষম বাধা, প্রগতির ছদ্মবেশে এই ক্ষয়িষ্ণুতা প্রগতির পথরোধ করছে।

'জার্মান আইডিয়লজি' নামক গ্রন্থে কার্ল মার্কস বলেছেন, "ভাব, মত এবং চেতনা প্রথমত মানুষের বাস্তব সংগ্রাম এবং বাস্তব কর্মের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংবদ্ধ, চেতনা হল বাস্তব জীবনের ভাষা, ···মানুষের সচেতন জীবন এবং প্রকৃত জীবনসংগ্রামে মানুষের অবস্থান, এ ছাড়া চেতনার আর কোন অর্থই হয় না।"

বাংলা কবিতায় বিষ্ণুবাবু-সম্প্রদায় মার্কস-এর এই সংজ্ঞা লঙ্ঘন করে চলেছেন, মার্কসবাদ মানা সত্ত্বেও তাঁদের কবিতায় ভাব, মত এবং চেতনাকে প্রকৃত মানুষের প্রকৃত জীবন এবং প্রকৃত সংগ্রাম থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছে, চেতনাকে বাস্তব জীবনের ভাষা না করে শূন্যে উড়ন্ত অধ্যাত্মিক অনুভূতিতে পরিণত করেছে। তাঁরা যে কলাকৌশল আবিষ্কার করেছেন তা ঠিক এই কাজেরই উপযুক্ত হাতিয়ার। উড়ন্ত আইডিয়াগুলোকে জোর হাওয়া দিয়ে তা বাস্তবের আরো ঊর্ধ্বে শূন্যে উড়িয়ে দেয়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে ভারতে যেমন গণসংগ্রামের জোয়ার দেখা দিল, সাহিত্যজগতেও তেমনি একটি জোয়ার দেখা দিল। এই যুগে স্বাধীনতার সংগ্রামে, গণতান্ত্রিক অধিকারের সংগ্রামে, জমি ও জীবিকার সংগ্রামে মজুর-কৃষক ও প্রগতিশীল ছাত্র নিজের অস্তিত্ব আর সকলকে অনুভব করতে বাধ্য করেছে। তাই প্রত্যেক সাহিত্যিক এই যুগে গণমানুষের কাছে

১. বিষ্ণু দে, সাত ভাই চম্পা / 'সংসার' কবিতা। উদ্ধৃতাংশের তৃতীয় পংক্তি 'একুশ বাইশ' সংকলন গ্রন্থে হয়েছে 'প্রাণের নীলিম দীপ্তি নয়নে, মন্দ্র স্বর', পৃঃ ৭৯ দ্রষ্টব্য।—সম্পাদক

নেমে এসেছেন, তাকে অস্বীকার করা অসম্ভব, তার ছায়া না মাড়িয়ে ব্রাহ্মণ্য আভিজাত্য বাঁচানো দুঃসাধ্য। কিন্তু রাজনীতিক্ষেত্রে যেমন বিভিন্ন দল বিভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে গণমানবের কাছে যায়, সাহিত্য-জগতেও তেমনি বিভিন্ন দল বিভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে গণমানবের পংক্তিতে নেমে এসেছেন। তাঁরা সবাই প্রগতিশীল নন। প্রগতিশীল শুধু তাঁরা যাঁরা গান্ধীবাদ ছেড়ে মার্কসবাদের দিকে অগ্রসর হয়েছেন—তাঁরা সবাই মার্কসবাদ না বুঝে থাকলেও ভাবে, বর্ণনায়, কলাকৌশলে তাঁরা সমাজের বর্তমান সংগ্রামে নির্যাতীতদের পক্ষ নিয়েছেন, ভবিষ্যৎ সমাজের বীজ দেখতে পেয়েছেন বর্তমানের মধ্যে এবং অপরের চোখের সম্মুখে সেই বীজ তুলে ধরেছেন।

মার্কসিস্টের কাজ হল ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা, তাঁর নীতি হল নির্যাতিত শ্রেণীসমূহের জীবনের ভাষায় রূপ দেওয়া, তাঁর ব্রত হল সমাজের ভিতরকার সংঘর্ষকে সাহিত্যে ফুটিয়ে তোলা। তিনি বাস্তবের "নিরপেক্ষ" সংবাদদাতা নন, তিনি নূতন বাস্তবের স্রষ্টিকর্তা, অতীতের মৃত্যু, বর্তমানের প্রলয় এবং অনাগত ভবিষ্যতের সূচনা এই তিনটিই ফুটে উঠবে তাঁর সাহিত্যে। সংস্কৃতি যাতে নির্যাতিত জনগণের প্রেরণার বস্তু হয়, সংস্কৃতিতে যাতে তাদেরই সত্যিকার আশা আকাঙ্ক্ষা স্থান পায়, সংস্কৃতি যাতে তাদেরই জীবনের সত্যকার বহুমুখী দ্বন্দ্ব নিয়ে রচিত হয় সেই প্রচেষ্টাই হল মার্কসবাদী সাহিত্যের লক্ষ্য।

এ কাজ সহজ নয়। উদ্ভট সৃষ্টির পরিকল্পনায় এ লক্ষ্য সাধন করা যাবে না। হঠকারিতায় লক্ষ্য ব্যর্থ হবে। তাই অতীত ঐতিহ্যের মধ্যে যা কিছু শ্রেষ্ঠ সম্পদ আছে তার সাহায্যেই অগ্রসর হতে হবে। প্রতিক্রিয়াশীলেরা অতীত ঐতিহ্যের মৃত অংশকে আঁকড়ে আছেন, মার্কসবাদীকে তার তাজা অংশটা নিয়ে এগুতে হবে। কিন্তু সাহসের সঙ্গে এগুতে হবে। এগুবার ক্ষেত্র হল এখন কয়েকটি :

প্রথমত, শ্রেণীসংগ্রামকে অবলম্বন করতে হবে, শ্রেণী-নিরপেক্ষ জাতির কথা ছাড়তে হবে, শ্রেণীসংগ্রামে মজুরশ্রেণীর পক্ষ নিতে হবে। বাস্তব সংগ্রামে যেমন নিরপেক্ষতা চলে না, সাহিত্য ও সংস্কৃতিতেও তেমনি নিরপেক্ষতা চলে না। বিশেষত সমগ্র সংস্কৃতিজগৎ আজ ধনিকসভ্যতার স্তুতিবাদে পূর্ণ, এক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা মানেই হল ধনিকশ্রেণীর প্রতি পক্ষপাতিত্ব।

দ্বিতীয়ত, সাহিত্যসৃষ্টিতে সাহিত্যিকের নিজের কথা, নিজের ভাব, নিজের অনুভূতিকে মুখ্য স্থান না দিয়ে গণসমাজের অন্তর্ভুক্ত মানুষের নিজের কথা, নিজের ভাব ও নিজের অনুভূতিকে মুখ্য স্থান দিতে হবে। নিজের স্বপ্ন দিয়ে তাদের মন ভোলাবার চেষ্টা না করে তাদের কথা দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করতে হবে।

তৃতীয়ত, সমাজকে যারা পিছনে টানছে, ইতিহাসের চাকা যারা থামিয়ে দিতে চাইছে, নিজেদের সংকীর্ণ শ্রেণীস্বার্থকে যে মুষ্টিমেয় ধনিক অধিকাংশের আদর্শ করে রাখতে চাইছে, তাদের মুখোস খুলে ধরতে হবে, তাদের ভণ্ডামিকে আক্রমণ করতে হবে ধারালো অস্ত্রে জোরালোভাবে।

চতুর্থত, সহজ সরল এবং উদ্দীপনাশীল কলাকৌশলের সাহায্যে সংস্কৃতির সঙ্গে সাধারণ মানুষের ব্যবধান ভেঙে চুরমার করে দিতে হবে, যে কলা-কৌশল সংস্কৃতির দিকে সাধারণ মানুষের মন টেনে নিয়ে আসে, সাধারণ মানুষের ঘুমন্ত অনুভূতিকে জাগিয়ে তোলে সেই কলাকৌশল সৃষ্টি করতে হবে।

পঞ্চমত, পরিবারে, ব্যক্তির জীবনে, সংগ্রামে, সংসারে, যুদ্ধে, প্রেমে সর্বত্র একদিকে ভাঙন আর একদিকে গড়ন চলছে, এই ভাঙন এবং গড়নের ছবি আঁকতে হবে, যা সহজ চোখে ধরা পড়ে না তা ধরিয়ে দিতে হবে, কোন্‌টা অতীত কোন্‌টা ভবিষ্যৎ, কোন্‌টার মৃত্যু আর কোন্‌টার জন্ম অবশ্যম্ভাবী তা জানিয়ে দিতে হবে। অধ্যাত্মবাদের শেষ সীমা ছেড়ে মার্কসবাদের পথে সাহসের সঙ্গে এগুতে হবে।

এর জন্য চাই মার্কসবাদের গভীর চর্চা, মার্কসবাদের বিশ্বস্ত প্রয়োগ এবং নিরবচ্ছিন্ন সমালোচনা ও আত্মসমালোচনা। নূতন বিপ্লবী সাহিত্য একদিনে গজাবে না, নূতন বিপ্লবী সাহিত্য সৃষ্টি সহজ কথা নয়। সমালোচনা এবং আত্মসমালোচনা সৃষ্টির পথ বাধামুক্ত করবে, ভুল পথের ভুল ধরিয়ে দেবে। যাঁরা এতদিনকার ব্যক্তিনিষ্ঠ ও আত্মকেন্দ্রিক সাহিত্যজগতে বড় হয়েছেন তাঁরা সমালোচনা সহ্য করতে পারেন না, সমালোচনার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত বন্ধুত্বের দ্বারা প্রভাবিত হন এবং অপরের সমালোচনাকে নিজের আত্মমর্যাদার হানিকর বলে মনে করেন। যাঁরা নূতন বিপ্লবী সাহিত্যের স্রষ্টা তাঁদের এ বিষয়ে নির্মম হতে হবে। নির্মম সমালোচনা শুনতে হবে, নির্মম সমালোচনা করতে হবে, সমালোচনার সঙ্গে আত্মসমালোচনার মনোভাব দেখাতে হবে।

রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের ঐতিহ্য, বর্তমান যুগে অপর দেশের বিপ্লবী সাহিত্যিকদের আবিষ্কার, স্বদেশের নির্যাতিত জনগণের বাস্তব সংগ্রামের অভিজ্ঞতা এবং মার্কসবাদের জ্ঞান ও উপলব্ধি—এই হল আমাদের বিপ্লবী সাহিত্যিকদের অগ্রগতির পথের মূলধন। এই মূলধনের সাহায্যে তাদের সাহিত্য প্রতিভাকে যুগোপযোগী করে তুলতে হবে। প্রগতির অভিযান তবেই হবে জয়যুক্ত।*

* মার্কসবাদী, প্রথম সংকলন, অক্টোবর, ১৯৪৮, পৃঃ ৭৩-৯৮; বীরেন পাল প্রয়াত কমিউনিস্ট নেতা ভবানী সেন-এর ছদ্মনাম।—সম্পাদক

সাহিত্য বিচারের মার্কসীয় পদ্ধতি / ঊর্মিলা গুহ

"জীবন্ত গাধা মৃত সিংহকে শুধু যে পদাঘাতই করে তাই নয়—আরও জঘন্য ব্যবহার হল এই যে সে তার (সিংহের) ওপর মুরুব্বীয়ানা ফলায় এবং তার (সিংহের) রাসভসুলভ গুণাবলীর প্রশংসায় রাসভ নিনাদে আকাশ বাতাস মুখরিত করে তোলে।"

লেনিনের মৃত্যুর পর হঠাৎ ঘনিয়ে ওঠা লেনিনবাদীদের সম্পর্কে উপরোক্ত মন্তব্য করেছিলেন কমরেড রজনী পাম দত্ত লেনিনের জীবনী-বিষয়ক গ্রন্থে। সম্প্রতি 'শারদীয় সাহিত্যে ছোট গল্প' (পরিচয়, পৌষ, ১৩৫৪) সম্পর্কিত বিতর্ক প্রসংগে[১] এবং বুদ্ধদেব বসুর 'An Acre of Green Grass' শীর্ষক পুস্তকের সমালোচনা প্রসঙ্গে[২] (যদিও সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিকভাবে) মার্কস-এঙ্গেলসের উদ্ধৃতিভূষিত (যদিও আধুনিকভাবে সম্পাদিত) কবি বিষ্ণু দে'র সাহিত্যদর্শন পাঠ করে কমরেড দত্তর উক্তিটি মনে পড়ল।

'সংস্কৃতির লাল রাস্তা' এবং সাহিত্যিক স্পেশ্যাল পাওয়ার্সের খেলা দেখে বিষ্ণুবাবু বুদ্ধদেববাবু এবং মানিকবাবুদের সাথে 'তৃতীয় পক্ষ' সেজেছেন। সেইজন্যই কমিউনিস্টদের ওপর দমননীতি শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে "সাহিত্য সমালোচনায় বিশেষ বিশেষ রাজনীতির স্ব-কপোল প্রযুক্ত মতবাদের বা ব্যক্তিগত কোন নীতির মানদণ্ড পরিচালনা" দেখে বিষ্ণুবাবুরা "কমবেশী বিমূঢ়" হয়ে পড়েছেন এবং অশোক মেহতার মতই যুগান্তকারী ভাবে আবিষ্কার করেছেন যে, "মানিকবাবুরা ভাবেন বাঙালী ও সোভিয়েট মন একই ছন্দে চলছে।" এই নতুন আবিষ্কারের প্রসাদে বিষ্ণুবাবু এতই আত্মহারা হয়ে পড়েছেন যে

১. বিতর্কটি শুরু করেন নীহার দাশগুপ্ত। পরে এই বিতর্কে অংশ গ্রহণ করেন বিষ্ণু দে, নীহার দাশগুপ্ত, অনিলকুমার সিংহ ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। পরিচয়, অগ্রহায়ণ—ফাল্গুন ১৩৫৪ দ্রষ্টব্য। —সঃ

২. সাহিত্যপত্র, পুস্তক পরিচয়, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩৫৫ দ্রষ্টব্য। —সঃ

তাঁর উগ্রতা শালীনতার সীমা অতিক্রম করে গেছে। বিষ্ণুবাবুকে শালীনতা শিক্ষা দেবার ধৃষ্টতা আমার বিন্দুমাত্র নেই। তিনি যদি তাঁর বক্তব্যকে আদি ও অকৃত্রিম মার্কসবাদ বলে দাবী না করতেন তাহলে তাঁর এই অহেতুক উষ্মার জবাব দেবার প্রয়োজনও মনে করতাম না।

মার্কসের উদ্ধৃতি ভূষিত করে বিষ্ণুবাবু যা বলতে চেয়েছেন তার মোদ্দা কথা হল এই যে, মার্কসবাদ বড়জোর শিল্প-সাহিত্যের উৎসের সন্ধান দিতে পারে—কিন্তু শিল্প বিচারের জন্য দ্বারস্থ হতে হবে বুর্জোয়া বিশারদদের কাছে। এরভে এবং গারোদির উল্লেখ করে (যদিও ফরসী কমিউনিস্ট পার্টি তাঁদের মত গ্রহণ করে নি। কমিউনিজম তত্ত্ব ও শিল্প—লেঁার কাসানোভা দ্রষ্টব্য) বিষ্ণুবাবু যে দাবী করেছেন তার আসল তাৎপর্য এই।

ঈসথেটিকসের বিষ্ণুবাবুকৃত সংজ্ঞা জানি না, তিনি কোন সংজ্ঞা নির্দেশও করেননি, তবে বুর্জোয়া অভিধানে এর সংজ্ঞা নিরূপণ করা হয়েছে সৌন্দর্যতত্ত্ব। বিষ্ণুবাবু এই সংজ্ঞাই মানেন মনে হয়, কারণ তিনি লিখেছেন সৌন্দর্যতত্ত্বের প্রথম পরীক্ষাতেই প্রয়োজন নিছক (বিশুদ্ধ?) সৌন্দর্যচেতনা।

এটা বুর্জোয়া বুলি। কডওয়েল বলেছেন, সাধারণত **ভাববাদী পন্থাকেই** কাব্য বিচারের পক্ষে প্রকৃষ্টতম বলে গণ্য করা হয়ে থাকে। এই পন্থাকে ব্যাখ্যা করা হয়ে থাকে সত্য শিব **সুন্দর** ইত্যাদি কথার দ্বারা (ইলিউসন এণ্ড রিয়ালিটি, পৃঃ ৯); আর ভাববাদ বুর্জোয়া দর্শনেরই অঙ্গ। বুর্জোয়া শিল্পীরা নিজেদের দেউলিয়াপনা ও দাসত্বের সাফাই হিসাবে 'আর্টের জন্যই আর্ট' ধুয়ো তুলে থাকেন। এই নিছক সৌন্দর্য চেতনা ঐ বস্তা পচা বুলিরই অপভ্রংশ মাত্র।

আঙ্গিক ও বিষয়বস্তু

সাহিত্যে কাব্যে বিচার্য হল বিষয়বস্তু বা ভাব এবং প্রকাশভঙ্গী বা আঙ্গিক। বিষ্ণুবাবুর মতে, সমালোচনার কর্তব্য হচ্ছে ঐ বিশেষ স্তরের প্রক্রিয়ার ফর্ম পরিবেক্ষণ করা। অর্থাৎ বিষ্ণুবাবু সাহিত্য বিচারে ফর্মকে প্রাধান্য দিতে চান, কন্‌টেণ্ট থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফর্মের বিচার করতে চান। শিল্প বিচারে মার্কসীয় নিয়ম কানুন প্রয়োজ্য নয়—ফর্ম ও কন্‌টেণ্টকে আলাদা করে দেখেন বলেই বিষ্ণুবাবু এই দাবী করেছেন।

আসলে কিন্তু কনটেণ্টরই বাহন হল ফর্ম বা টেকনিক। তাই কনটেণ্টকে

বাদ দিয়ে ফর্মের বিচার চলে না। উন্নততর ফর্মের জন্য সংগ্রাম নিশ্চয়ই করতে হবে। কিন্তু সে সংগ্রাম কনটেন্টকে আরও সুষ্ঠুভাবে, আরও ভাল ও কার্যকরীভাবে প্রকাশের প্রয়োজনেই। মানুষ নিজের প্রয়োজন সিদ্ধির জন্যই উৎপাদনের উন্নততর টেকনিকের জন্য সংগ্রাম করে। তেমনি সাহিত্যক্ষেত্রেও উন্নততর টেকনিকের জন্য সংগ্রাম বক্তব্যকে আরও কার্যকরীভাবে জনমানসে সঞ্চারিত করার প্রয়োজনেই। এই পরিপ্রেক্ষিতেই মার্কসবাদী সমালোচনা ফর্ম ও কনটেন্টের বিচার করে, মূল্য নিরূপণ করে।

বুর্জোয়াদের ভাবের ঘর আজ দেউলে হয়ে গেছে। সুতরাং ফর্মই তাদের একমাত্র উপজীব্য।

সাহিত্য শুধু জীবনের প্রতিলিপি নয়, জীবনের সমালোচনা। সাহিত্যে রূপ পায় সমকালের সামাজিক সত্য, অনুরণিত হয় আগামী কালের প্রাণস্পন্দন।

আজকের সামাজিক সত্য হল এই যে, বুর্জোয়া ব্যবস্থার অন্তিমকাল উপস্থিত। বিপ্লবের শক্তি সংহত। আর আগামী কালের প্রাণস্পন্দন হল বিপ্লবের বজ্রনির্ঘোষ। (না, 'অবান্তর আশার দ্বারা উত্তেজিত করা' নয়— এই সত্য) বুর্জোয়া সাহিত্যিকদের পক্ষে এই সত্যকে রূপ দেওয়ার অর্থ নিজেদের মৃত্যুদণ্ডে স্বাক্ষর করা। সেই জন্যই তাঁরা আজকের সামাজিক সত্যকে গোপন করার চেষ্টা করেন। তাঁদের 'ফর্ম' তাই সত্য গোপননের ফর্ম। এই ফর্মের চটকদার নামাবলী পরে তাঁরা নিজেদের দেউলিয়াপনাকে ঢাকবার চেষ্টা করেন। একথা বিষ্ণুবাবুর কবিতা সম্পর্কেও সত্য। একটা সর্বাধুনিক-নমুনা দিচ্ছি :

> "বিরাট মৃত্যুর ডাঙা, এক ফোঁটা জল নেই, প্রাণ এক ছিটে
> না জানি কি অন্ধকারে কঙ্কালী কোটরে করে গৃধ্নুর মন্ত্রণা
> স্বর্গহীন লুসিফর, বিলজেবর ম্যামনেরা ; মাটির যন্ত্রণা
> থেকে থেকে ফেটে পড়ে বালিতে, কাঁকরে, অভ্রে, লাইনে গ্রানিটে
> নিরন্ন নীরস নগ্ন, শুষে খায় তিলে তিলে নিসর্গ নিষাদ ;
> একটু সবুজ নেই, শুধু সোনা, পোড়া, নেই কীটেরও আভাস
> শ্যাওড়াও মরে যায়, তারও কাঁটা মৃত্যুঞ্জয় প্রাণের আশ্বাস"*
>
> (সাহিত্য পত্র, শ্রাবণ, ১৩৫৫)

* উদ্ধৃতাংশে দুটি মুদ্রণ-প্রমাদ স্পষ্টতর। দ্র. 'একুশ বাইশ'/ শুশুনিয়া', পৃঃ ২০৭।— সঃ

এ কবিতার যদি কোন বক্তব্য থেকে থাকে—তা নৈরাশ্য। পাছে জনসাধারণ বিষ্ণুবাবুর এ নাকি কান্না গ্রহণ না করতে পারে এই জন্যই বিষ্ণুবাবু ফর্মের দেয়াল তুলে আত্মরক্ষা করার প্রয়াস পেয়েছেন। এই ফর্ম হচ্ছে জনতাকে কাব্য থেকে বঞ্চিত করে রাখার ফর্ম। এই ফর্ম অ-গণতান্ত্রিক।

সোভিয়েট সঙ্গীত সম্পর্কে সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্রস্তাবে 'ফর্মালিজমকে অ-গণতান্ত্রিক এবং জনবিরোধী বলে বর্ণনা করা হয়েছে (Masses & Mainstream, April, 1948 দ্রষ্টব্য)। অ-গণতান্ত্রিকের মত একটি রাজনৈতিক শব্দ ব্যবহারের একটু তাৎপর্য আছে।

গল্প-কবিতার যে একটা বক্তব্য আছে, সাহিত্যের 'কনটেণ্ট' যে উদ্দেশ্য-মূলক একথা আজ বুর্জোয়া সমালোচকদেরও মেনে নিতে হয়েছে। প্রগতিমূলক সমালোচনার কাছে এ হল বুর্জোয়া সমালোচনার পশ্চাদাপসরণ। পিছু হটে, তাঁরা তাই সুকৌশলে পেছন থেকে পাল্টা আক্রমণের প্রয়াস পেয়েছেন; এখন আঁকড়ে ধরেছেন ফর্মকে। ফর্মকে তাঁরা শ্রেণী নিরপেক্ষ যুগ নিরপেক্ষ বলে চালাবার চেষ্টা করছেন।

সমাজনীতি ও রাজনীতির ক্ষেত্রেও সমাজতন্ত্রের কাছে সম্মুখ সমরে পরাজিত হয়ে বুর্জোয়া এবং তাদের দালাল দক্ষিণপন্থী সোশ্যালিস্টরা সামাজিক ফর্মকে যুগ নিরপেক্ষ শ্রেণী-নিরপেক্ষ (absolute) এবং চিরন্তন বলে দাবী করছে।

আজ যখন সামাজিক কনটেণ্ট হিসাবে সোশ্যালিজমকে অস্বীকার করা যায় না তখন তাঁরা সমাজের ফর্মকে অর্থাৎ বুর্জোয়া গণতন্ত্রকে নির্বিশেষ এবং চিরন্তন বলে চালাবার চেষ্টা করছেন। সমাজতান্ত্রিক আদর্শের অবিসংবাদী শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হওয়ায় তাঁরা এখন বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক ফর্ম—নির্বাচন এবং পার্লামেণ্টারী কার্যক্রম মারফত সমাজতন্ত্রের ধ্বনি তুলছে। এটা পেছনের দরজা দিয়ে প্রতিক্রিয়াকে বাঁচিয়ে রাখবার কৌশল। কারণ বুর্জোয়া গণতন্ত্র নির্বিশেষ কিছু নয়, শ্রেণী সমাজের বুর্জোয়া স্তরের ফর্ম। এই ফর্ম মারফত সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক ফর্মকে বাঁচিয়ে রাখার প্রচেষ্টা আসলে বুর্জোয়া সমাজকে বাঁচিয়ে রাখার প্রচেষ্টা। দেশে দেশে দক্ষিণপন্থী সমাজতন্ত্রীদের ভূমিকায় এ-সত্য আজ স্পষ্ট হয়ে উঠছেও। ফর্মের শ্রেণী নিরপেক্ষ যুগ নিরপেক্ষতার ধ্বনি কনটেণ্টের শ্রেণী নিরপেক্ষতার ধ্বনিরই নব রূপ।

আসলে ফর্ম বা কনটেণ্ট কোনটাই শ্রেণী নিরপেক্ষ, যুগ নিরপেক্ষ নয়।

সমাজের কনটেণ্ট বদলেছে বলেই তার ফর্মও বদলানো দরকার হয়ে পড়ছে। বুর্জোয়া ফর্মকে বাঁচিয়ে রাখার অর্থ এই কনটেণ্টকে ব্যর্থ (negate) করা। রাজনীতির ক্ষেত্রে দক্ষিণপন্থী সোশ্যালিস্টরা এই কৌশলই গ্রহণ করছে।

সাহিত্য শুধু জীবনের প্রতিফলন নয়, শুধু নিষ্ক্রিয় সমালোচনা নয়, বিষ্ণুবাবুরই ভাষায় তারও একটা চালনা শক্তি আছে আর তাইতো সাহিত্য শ্রমিকশ্রেণীর হাতে বিপ্লবের হাতিয়ার হয়ে ওঠে। বুর্জোয়া সমালোচকরা তাই ফর্মের জটিলতাকে সাহিত্যের উৎকর্ষের একমাত্র নিরিখ বলে প্রচার করে, সাহিত্যিকদের বিভ্রান্ত করে এই হাতিয়ারকে ভোঁতা করে দেবার প্রয়াস পায়। বিষ্ণুবাবু প্রগতির জন্য যতই কুম্ভীরাশ্রু বিসর্জন করুন না কেন, তিনিও এই ভূমিকাই গ্রহণ করেছেন।

মার্কসবাদীরা ফর্মকে তুচ্ছ করেন না। কিন্তু ‘অ-গণতান্ত্রিক’ ফর্মের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক বক্তব্য উপস্থিত করা যায় না। গণতান্ত্রিক বক্তব্য জনসাধারণের কাছে যাতে আরও কার্যকরী ভাবে উপস্থিত করা যায়, তদুপযোগী ফর্ম আয়ত্ত করার জন্য মার্কসবাদী সাহিত্যিক নিশ্চয়ই সাধনা করবেন, আপ্রাণ নিষ্ঠায় সাধনা করবেন। তাঁদের সে সাধনা ভাবপ্রকাশের জন্য, ভাব গোপনের জন্য নয়।

ফর্ম বিচারেরও তা হলে একটা মার্কসিস্ট মানে আছে। তা হল সেই বিশেষ কনটেণ্টকে সেই বিশেষ ফর্ম প্রকাশ করতে পেরেছে কি না। কারণ মানুষ ভাবপ্রকাশের জন্যই ভাষার সৃষ্টি করেছে, ভাব গোপনের জন্য নয়।

এইভাবে দেখতে গেলে একমাত্র মার্কসবাদেরই শিল্প-সাহিত্য বিচারের একটা নির্দিষ্ট বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি আছে, যদিও ক্রোচের মত মার্কস ‘ঈসথেটিকস’ নামধেয় কোন পুস্তক রচনা করেন নি। ‘নিছক সৌন্দর্য চেতনা’ একটা ভাওতা মাত্র, কারণ বিষ্ণুবাবুর ‘নিছক সৌন্দর্য চেতনায়’ যে-লেখক শ্রেষ্ঠ বুদ্ধদেববাবুর ‘নিছক সৌন্দর্য চেতনায়’ সে লেখক নিকৃষ্টতম বলে প্রতীয়মান হলে তাঁর ওপর দোষারোপ করা চলে না।

মার্কসীয় সমালোচনার মানদণ্ড কি? এঙ্গেলসের একটি সমালোচনা আমি এ প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করব :

“বর্ণনার যাথার্থ্যের উপরেও, যথাযথ (typical) চরিত্রকে তার যথাযথ পারিপার্শ্বিকে উপস্থিত করাই আমার মতে ‘রিয়ালিজমে’র অর্থ। আপনি যতখানি বর্ণনা করেছেন তাতে আপনার চরিত্রগুলিকে যথাযথ চরিত্র বলা চলে।

তাদের পারিপার্শ্বিক, যা তাদের ক্রিয়া কলাপে উদ্বুদ্ধ করেছে সে সম্পর্কে কিন্তু ওকথা বলা চলে না। 'শহরের মেয়ে'তে শ্রমিক শ্রেণীকে মনে হয় নিষ্ক্রিয় জনতা, নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে এমন কি দাঁড়াবার চেষ্টা করতেও তারা অক্ষম। শোচনীয় দারিদ্র্য থেকে উদ্ধারের চেষ্টা হল বাইরে থেকে, ওপর থেকে। ১৮০০ বা ১৮১০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে, সাঁৎ সিমোঁ ও রবার্ট আওয়েনের কালে এ বর্ণনা হয়ত সত্য বলে গ্রহণ করা যেত ; কিন্তু ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে, যে মানুষ পঞ্চাশ বছরেরও অধিককাল শ্রমিকশ্রেণীর অধিকাংশ লড়াইয়ে অংশ গ্রহণ করেছে, শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তি শ্রমিকশ্রেণীরই দায়িত্ব এই নীতি দ্বারা পরিচালিত হয়েছে তার পক্ষে এই বর্ণনা সত্য বলে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। চারিপাশের অত্যাচারের বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী সাড়া, মানুষের মত বাঁচবার অধিকার অর্জনের জন্য তাদের সচেতন বা অর্ধসচেতন প্রাণাত্মক প্রয়াস আজ ইতিহাসের অঙ্গীভূত সুতরাং রিয়ালিজমের ক্ষেত্রে তার একটা দাবি নিশ্চয়ই আছে।

"লেখকের সামাজিক ও রাজনৈতিক মতবাদের গুণগানের জন্য খাঁটি সমাজবাদী উপন্যাস, আমরা জার্মানরা যাকে বলি tendenzorman, না লেখবার জন্য কোন দোষ ধরছি না। আমার বক্তব্য মোটেই তা নয়। বরং লেখকের মত প্রচ্ছন্ন থাকলেই সাহিত্যের উৎকর্ষতা বাড়ে। আমি যে রিয়ালিজমের কথা বলছি, লেখকের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও (তার রচনায়) তা বেরিয়ে আসতে পারে।"

(মার্গারেট হার্কনেসের কাছে লেখা এঙ্গেলসের চিঠি ;
লিটারেচার এণ্ড আর্ট, মার্কস ও এঙ্গেলস, পৃঃ ৪১ ও ৪২)

'শহরের মেয়ে' মার্গারেট হার্কনেস প্রণীত একটি উপন্যাস। এই উপন্যাসের এঙ্গেলসকৃত সমালোচনাকে মার্কসবাদী সমালোচনার আদর্শ বলা যেতে পারে। এঙ্গেলস দাবী করছেন, লেখককে বাস্তবানুগ হতে হবে, বাস্তবতার সংজ্ঞাও তিনি নির্দেশ করেছেন : বর্ণনার যাথার্থ্যের উপরেও, যথাযথ চরিত্রকে তার যথাযথ পারিপার্শ্বিকে উপস্থিত করাই আমার মতে রিয়ালিজমের অর্থ।

এই হল মার্কসবাদী সমালোচনার মূলসূত্র। এই কষ্টিপাথরেই 'শহরের মেয়ে'র সমালোচনা করে এঙ্গেলস উক্ত উপন্যাসের ত্রুটি নির্দেশ করে বলেছেন, 'শহরের মেয়ে'তে শ্রমিকশ্রেণীকে মনে হয় নিষ্ক্রিয় জনতা এবং সেই সঙ্গে তিনি বলেছেন যে, শ্রমিকশ্রেণী ঐতিহাসিকভাবে আর নিষ্ক্রিয় দর্শক নেই সুতরাং হার্কনেসের বাস্তবতা সম্পূর্ণাঙ্গ নয়। এঙ্গেলস উক্ত উপন্যাসের চরিত্রগুলিকে

প্রতিনিধিত্বমূলক বলেছেন কিন্তু সেই সঙ্গে দেখিয়েছেন যে চরিত্রগুলির পারিপার্শ্বিকতা সম্বন্ধে ও কথা খাটে না।

বিষ্ণুবাবু বালজাকের কথা তুলেছেন। এঙ্গেলস ঐ একই সূত্র অনুযায়ী বালজাকের সমালোচনা করেছেন: "সাধারণভাবে, বাস্তব সম্বন্ধে গভীর জ্ঞানের জন্য বালজাক সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।" (মার্কস)—এই জন্যই মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন বালজাককে মহৎ স্রষ্টা বলেছেন—তাঁর রাজতন্ত্রী মতবাদের জন্য নয়।

এঙ্গেলস লিখেছেন: "রাজনৈতিক মতের দিক দিয়ে বালজাক একজন রাজতন্ত্রী (legitimist)। তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনায় নিরন্তর অনুরণিত হয়েছে সু-সমাজের অ-প্রতিকার্য (?) ক্ষয়ের বিষাদগাথা। যে শ্রেণীর ধ্বংস অনিবার্য বালজাকের সহানুভূতি তাদের দিকে।" (লিটারেচর এণ্ড আর্ট—মার্কস ও এঙ্গেলস; পৃঃ ৪৩। কিন্তু ক্ষয়িষ্ণু শ্রেণীর প্রতি সহানুভূতির জন্য এঙ্গেলস বালজাকের প্রশংসা করেন নি। বালজাককে তিনি মহৎ স্রষ্টার আসন দিয়েছেন এইজন্যেই যে কিন্তু তা সত্ত্বেও, যখন যাদের প্রতি তিনি সুগভীর সহানুভূতি-সম্পন্ন সেই 'নোব্‌ল্'দের চরিত্র অংকিত করেন তখনকার মত তাঁর ব্যঙ্গ আর কখনও তত তীব্র হয় না। তাঁর বিদ্রূপ আর কখনও তত নির্মম হয়ে ওঠে না। আর একমাত্র যাঁদের সম্পর্কে তিনি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা প্রকাশ করেন, তাঁরা হলেন তাঁর রাজনৈতিক বিরুদ্ধবাদী, Cloitre Saint meonyরা সাধারণতন্ত্রী বীরবৃন্দ। সেই সময়ে (১৮৩০-৩৬) তাঁরা সত্যই ছিলেন জনতার প্রতিনিধি।

"এইভাবে বালজাক যে তাঁর নিজের শ্রেণী সহানুভূতি ও রাজনৈতিক সংস্কারের বিরুদ্ধে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন, তিনি যে তাঁর প্রিয় নোবলদের পতনের প্রয়োজনীয়তা **উপলব্ধি** করেছিলেন এবং তাদের ভাগ্যে এছাড়া আর কিছু হতে পারে না বলে বর্ণনা করেছিলেন, তিনি যে ভবিষ্যতের সত্যকারের মানুষদের (তখন একমাত্র যাদের দেখা গিয়েছিল) **দেখেছিলেন**—আমি একেই রিয়ালিজমের সর্বাপেক্ষা বড় জয় বলে মনে করি আর এই হল প্রবীণ বালজাকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য।" (ঐ, পৃঃ ৪৩)

'তাহলে দেখা যাচ্ছে রাজতন্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও বালজাকের লেখায় রাজতন্ত্রী প্রভুদের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা প্রকাশ পেয়েছে। সে ঘৃণার ছিল একটা সক্রিয় ভূমিকা আর তাই এঙ্গেলস বালজাকের সাহিত্যে রিয়ালিজমের সর্বাপেক্ষা বড়

জয় দেখতে পেয়েছেন। এঙ্গেলসের এই উদ্ধৃতিগুলির মধ্যেই মার্কসবাদী সমালোচনার মূলসূত্র বিবৃত হয়েছে।

অচিন্ত্য সেনগুপ্ত-তারাশঙ্করের সাহিত্য এই নিরিখেই বিচার করতে হবে। অচিন্ত্যের চাষী চরিত্রগুলি কি প্রতিনিধিত্বমূলক চরিত্র? তার পারিপার্শ্বিকতা কি যথাযথ? অচিন্ত্য-তারাশঙ্করের চাষী চরিত্রগুলি কি 'শহরের মেয়ে'র শ্রমিক চরিত্রের মতই নিষ্ক্রিয় এবং নিজের পায়ে দাঁড়াতে অক্ষম নয়? অচিন্ত্যের লেখায় কি 'রাজনৈতিক সংস্কার' সত্ত্বেও তাঁর প্রিয় শাসকশ্রেণীর পতনের প্রয়োজনীয়তা ফুটে উঠেছে? এই মার্কসবাদী নিরিখে বিচার করলে যদি অচিন্ত্যের গল্প উৎরাত তাহলে হাকিম হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে প্রগতিশীল বলতে আমরা এতটুকুও দ্বিধা করতাম না। মার্কসবাদীরা ছুঁৎমার্গে বিশ্বাসী নয়।

বালজাক তাঁর সাহিত্যে নিজের রাজনৈতিক মতবাদকে খণ্ডন করেছিলেন আর অচিন্ত্য প্রচার করেছেন বুর্জোয়া প্রভুদের মিথ্যাচারকে। এ প্রসঙ্গে বিষ্ণুবাবুর জবাবে নীহার দাশগুপ্ত ঠিকই লিখেছিলেন—"সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে গল্পচরিত্রের এই বিচার ও বিশ্লেষণের অভাব একদিকে অচিন্ত্যকুমারের সৃষ্ট গল্পচরিত্রকে যেমন নিষ্প্রাণ ও সেইহেতু অবাস্তব করে তুলেছে, অন্যদিকে তার এই "অ-জ্ঞান" তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীকে স্বচ্ছতা দিতে পারে নি, তাঁর গল্পচরিত্রকে যথার্থ ও সুষ্ঠু পরিণতিতে টেনে নিয়ে যেতে দেয় নি। এক এক সময় তাঁর এই আবিল দৃষ্টিভঙ্গী রীতিমত শঙ্কার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিষ্ণুবাবুর উচ্ছ্বসিত প্রশংসাপ্রাপ্ত কাঠ-খড়-কেরোসিনের গল্পে একথার যাথার্থ্য প্রমাণিত হতে বাধ্য। শঙ্কার কারণ শুধু তাঁর বিকৃত দৃষ্টিভঙ্গী বা অসৎ উদ্দেশ্যের জন্য নয়। পাঠক সাধারণকে বিভ্রান্ত করার সু-কৌশলের জন্য। মঙ্গল চাপরাসী, রমজান বা হাস্থ বিবির মত নিপীড়িত সাধারণ মানুষকে শিখণ্ডীরূপে দাঁড় করিয়ে সমস্ত সমস্যাকে তিনি বিকৃত ও অসৎভাবে চিত্রিত করার প্রয়াস পেয়েছেন।"[১] (পরিচয়, মাঘ, ১৩৫৪)

এ প্রসঙ্গে যা প্রণিধান করা দরকার তা হল এই যে অচিন্ত্যের এই অসৎ প্রয়াস আকস্মিক নয় মোটেই। যুগ পালটেছে—এখন আর রাজনৈতিক মতামতের সঙ্গে সাহিত্য-দর্শনের 'আপাত বৈপরীত্য' সম্ভব নয়। লেনিনের

১. উদ্ধৃতাংশে মূল রচনার দু-একটি শব্দের বর্জন এবং যতিচিহ্ন স্থাপনে কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম লক্ষ্যণীয়। দ্র. পরিচয়, মাঘ, ১৩৫৪ ; পৃঃ ১১৪। — সঃ

ভাষায় এখন এমন একটা যুগ এসেছে যখন 'থিয়োরী' 'প্রাকটিশে' পরিণত হচ্ছে। রাজনীতির মত, এখন আর সাহিত্যেও নিরপেক্ষতার কোন ভূমিকা নেই। এই জন্যই নিজের উদার গান্ধীবাদ (কালিন্দী, গণদেবতা, মন্বন্তর) ছেড়ে দিয়ে তারাশঙ্কর জনতার বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করেছেন 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'য় একথা বলা যায়। তাতে যদি কারো প্রাণে ব্যথা লাগে তো নাচার !

বিষ্ণুবাবু মনে করেন যে, জনতাকে 'সাহিত্যভাত' করাই প্রগতির চরম বিচার। সাহিত্যে 'নিছক সহানুভূতি' (!) বা 'অবান্তর' (?) আশার দ্বারা উত্তেজিত করা, বা 'রাজনৈতিক কাঠামো' থাকার প্রয়োজন নেই। সহানুভূতির প্রশ্ন নয়—শ্রমিকশ্রেণী কতিপয় উন্নাসিক বুদ্ধিজীবীর 'সহানুভূতি'র কাঙাল নয়। কিন্তু আজ রাজনীতি ছাড়া জীবন নেই। পেটভরে খেতে চাইলে বা ভাল করে বাঁচার স্বপ্ন দেখলে আজ স্থান হয় জেলখানায়। সুতরাং নিজের দায়েই সাধু বুদ্ধিজীবীকে শ্রমিকশ্রেণীর পাশে এসে দাঁড়াতে হবে। এ-কোন বিশেষ দলের প্রচার নয়—বিষ্ণুবাবুর দুর্ভাগ্য এই যে, এটাই আজকের দিনের বাস্তব সত্য। তা ছাড়া বিষ্ণুবাবুর সংজ্ঞা মেনে নিলে 'জাতীয়' টি-ইউকেও বিপ্লবী সংস্থা বলতে হয় আর তাহলে সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায় তো নিশ্চয়ই কমিউনিস্ট—কারণ সুরেশবাবু এবং জাতীয় টি-ইউ শ্রমিক নিয়েই বেসাতি করেন। বিষ্ণুবাবুর এই ব্যাপক সংজ্ঞা মোটেই নির্দোষ ঔদার্য নয়—প্রতিক্রিয়াকে পেছনের দরজা দিয়ে ঢোকাবার কৌশল মাত্র। এই জন্য শুধু অচিন্ত্য-তারাশঙ্কর নয়, বিষ্ণুবাবু এলিয়টের মধ্যেও 'জীবনের অঙ্গীকারের স্পষ্ট ছন্দ' দেখতে পেয়েছেন। সেই জন্যই বলছি, তারাশঙ্করকে বিষ্ণুবাবু শ্রদ্ধা করতে চান করুন, অচিন্ত্য সেনগুপ্তের সঙ্গে হেমিংওয়ের তুলনা করতে চান (কারণ প্রগতি বিচারের শেষ মাপকাঠি তো আর হেমিংওয়ে নন) আপত্তি করব না—কিন্তু এদের রচনা প্রগতিশীল বলে চালাবার চেষ্টা করলে নিশ্চয়ই প্রতিবাদ করব।

এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, বিষ্ণুবাবু তাঁর ব্যক্তিগত ভাল লাগা না লাগাকেই সমালোচনার মান ধরে নিয়েছেন এবং যাঁরা তাঁর সঙ্গে একমত নন তাঁদের মধ্যেই তিনি 'লাসালী ভ্রম' ও 'ডুরিং-এর বিচ্যুতি' দেখতে পেয়েছেন। বুর্জোয়া ধারার সমালোচনায় এই সীমাবদ্ধতা অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণ 'নিছক সৌন্দর্যানুভূতি' মানুষে মানুষে প্রভেদ হবেই।

অসাধুভাবে সম্পাদিত মার্কস-এঙ্গেলসের উদ্ধৃতি সাজিয়ে প্রতিপক্ষদের নস্যাৎ করবার চেষ্টার মধ্যে বাহাদুরী থাকতে পারে, মার্কসবাদ নেই। শিল্প বিচারের কোন মার্কসীয় নিয়ম কানুন নেই—বিষ্ণুবাবুর এই দাবীর সঙ্গে যদি কারো মতবাদের সামঞ্জস্য থাকে তবে তা ট্রট্স্কীর। ট্রট্স্কী বলেন: "এ কথা অত্যন্ত ঠিক যে শিল্পকর্ম গ্রহণ বা বর্জন করা সম্পর্কে সব সময় মার্কসবাদী নীতি অনুসরণ করা চলে না। প্রথমত শিল্পকর্মের বিচার করতে হবে তার **নিজের নিয়মে** অর্থাৎ **আর্টের নিয়মে** (বড় হরফ আমার)। [লিটারেচার এণ্ড রেভল্যুশন, পৃঃ ১৭৮]

এ প্রসঙ্গে বিষ্ণুবাবুরা আরও অভিযোগ করেছেন যে, 'পরিচয়' ও কয়েকজন প্রগতি লেখকদের মধ্যে তাঁরা অসহিষ্ণু দলীয়তা দেখে এসেছেন। এই উগ্র মতবাদ সাহিত্যের স্বাধীনতার প্রতিকূল। কারণ সাহিত্য বিচারে সাহিত্য বস্তুই প্রধান বিবেচ্য—লেখকদের ব্যক্তিগত জীবন, রাজনীতি বা পারিপার্শ্বিকতা বিচারের প্রয়োজন নেই। বিষ্ণুবাবুর মতে এই ধরনের বিচার গোয়েন্দাগিরির সামিল। এই ধরনের বিচার যান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক বিচার। কারণ শিল্প সাহিত্যেরও একটা নিজস্ব ইতিহাস আছে। ইত্যাদি।

সাম্যবাদীদের বিরুদ্ধে উগ্রতার অপবাদ এই নতুন নয়—সুতরাং তার জবাব দেওয়া বাহুল্য। বিষ্ণুবাবু মাণিকবাবুদের বিরুদ্ধে যান্ত্রিকতার অপরাধ যত তারস্বরেই প্রচার করুন না কেন—সাহিত্য বিচারে সাহিত্য বস্তুই প্রধান বিষ্ণু-বাবুদের এ তত্ত্ব বুর্জোয়া বুলি। কডওয়েল বলেন:

"ধরে নেওয়া হয় যে, উপায়, টেকনিক এবং শিল্পের যে সব 'শুদ্ধ' (abstract) গুণাবলীকে শিল্পী নিরপেক্ষভাবে বিচার করা যায় তার সবগুলিকে যখন বিশ্লিষ্ট করে তত্ত্বে পবিণত করা হয় তখনই আর্টকে তার **নিজের ভাষায়** (বড় হরফ আমার) বর্ণনা করা হয়। দর্শনের ক্ষেত্রে যান্ত্রিক বস্তুবাদের যা স্থান, তত্ত্বের দিক দিয়ে ঈসথেটিকসের ক্ষেত্রে এই মতেরও সেই একই স্থান।"

(ইলিউসন এণ্ড রিয়ালিটি, ভারতীয় সংস্করণ, পৃঃ ৯)

মার্কসবাদ বলে সমাজ-নিরপেক্ষ সাহিত্য দেহহীন প্রাণের মতই মিথ্যা। শিল্প সাহিত্যের নিজস্ব ইতিহাস নিশ্চয়ই আছে কিন্তু সে ইতিহাসও সমাজ-নিরপেক্ষ স্বয়ম্ভু নয়।

'ক্রিটিক অব পলিটিক্যাল ইকনমি'র ভূমিকায় মার্কস বলেছেন:

“বাস্তব জীবনের উৎপাদন পদ্ধতি সাধারণ ভাবে সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে।”

শিল্প-সাহিত্য আকাশকুসুম নয়, মানসকুসুম। এই ভাবজগত, “ধর্ম, দর্শন প্রভৃতি যা বহু শূন্যে বিচরণ করে” (এঙ্গেলস) তার সঙ্গে অনেক সময় হয়ত সামাজিক ব্যবস্থার প্রত্যক্ষ যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যায় না—কিন্তু তাতে বিষ্ণুবাবুর পুলকিত হবার কোন কারণ নেই। ঐ একই নিবন্ধে এঙ্গেলস বলেছেন, “কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা (ধর্ম, দর্শন ইত্যাদি) নিজেরাই অর্থনৈতিক বিকাশের প্রবল প্রভাবের দ্বারা প্রভাবান্বিত।” (আর্ট এণ্ড লিটারেচর—মার্কস-এঙ্গেলস, পৃঃ ১১)

অর্থনৈতিক বিবর্তনে সমাজ শ্রেণীবিভক্ত। এই শ্রেণীবিভক্ত সমাজে ভাবজগতও তাই শ্রেণীচেতনার বশীভূত। শিল্প-সাহিত্যে এই ভাবজগতেরই অঙ্গীভূত। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে সাহিত্যেও তাই শ্রেণীচেতনা প্রকাশ পায়। লেখক কোন্ শ্রেণীভুক্ত সাহিত্য বিচারে তা জানা প্রয়োজন ; তা গোয়েন্দাগিরি নয়। শিল্প-সাহিত্যের যে নিজস্ব ইতিহাস আছে তা আলোচনা করলেও এই কথাগুলিই প্রকট হয়ে উঠবে (কডওয়েল এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। এ প্রসঙ্গে তার উল্লেখই যথেষ্ট। কারণ স্বল্প পরিসরে সে আলোচনা সম্ভব নয়)। শেকসপীয়রের রচনাতেও উদীয়মান বুর্জোয়া শ্রেণীর জীবনদর্শনই আত্মপ্রকাশ করেছে।

সাহিত্য মাত্রেই লেখকের জীবন-দর্শন প্রতিভাত হয়। দর্শনের দলীয়তা সম্পর্কে এঙ্গেলস বলেছেন :

“উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, দর্শনের ক্ষেত্রে, বুর্জোয়া যুগে এ কথা আরও সহজে প্রমাণ করা যায়। হব্‌স হচ্ছেন প্রথম আধুনিক (অষ্টাদশ শতকের অর্থে) ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী। কিন্তু তিনি এমন একটা সময় স্বৈরতন্ত্রবাদী (absolutist) হয়েছিলেন যখন সারা ইওরোপে স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের স্বর্ণযুগ, যখন ইংল্যাণ্ডে স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র বনাম জনসাধারণের সংগ্রামের সূচনা হচ্ছে। লক্ হচ্ছেন ধর্ম ও রাজনীতি উভয় ক্ষেত্রেই ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের শ্রেণী সমঝওতার সন্তান।”

(পূর্বোক্ত গ্রন্থের ১১ পৃঃ)

তাহলে দেখা যাচ্ছে শ্রেণীচেতনা নিরপেক্ষ কোন দর্শন নেই—সাহিত্যও থাকতে পারে না। প্রত্যক্ষভাবেই হোক আর পরোক্ষভাবেই হোক, সাহিত্য

কোন না কোন শ্রেণীর পক্ষে প্রচার অর্থাৎ সাহিত্য মাত্রই পার্টিজান। সুতরাং সাহিত্য বিচারেও তৃতীয় পক্ষ বলে কোন ভূমিকা নেই। বিপ্লবী সাহিত্যকে ধিক্কার দেবার জন্যই বুর্জোয়া সমালোচকেরা 'তৃতীয় পক্ষ' সেজে থাকেন।

রাজনীতির মত, সাহিত্যক্ষেত্রে যখন প্রতিক্রিয়ার পক্ষে প্রচার অসম্ভব হয়ে পড়ে তখন বুর্জোয়া দালালেরা দল-নিরপেক্ষতার ধ্বনি তোলেন। তাঁদের উদ্দেশ্য প্রগতির পক্ষে প্রচারকে নিরস্ত্র করা। সম্মুখ সমরে পরাজিত হয়ে তাঁরা পেছন থেকে ছুরি মারার চেষ্টা করেন। এই সুকৌশল পাল্টা আক্রমণ আসে নানাভাবে—"নৈরাশ্য প্রচার করে (যেমন এলিয়ট) বুর্জোয়া সাহিত্যিকেরা বিপ্লবী শক্তিকে নিরস্ত্র করবার চেষ্টা করেন। তারা বোঝাবার চেষ্টা করেন প্রতিক্রিয়ার শক্তি এত বেশী যে তাকে পরাজিত করা সম্ভব নয়; বা অলীক মোহ সৃষ্টি করে বিপ্লবী সংগ্রাম থেকে জনতার দৃষ্টিকে বিক্ষিপ্ত করার চেষ্টা করেন—জনতার বিপ্লবী উদ্যোগ নষ্ট করার জন্য বোঝাবার চেষ্টা করেন আপনা আপনিই বিপ্লব জয়যুক্ত হবে এমন কি অনেক সময় স্থানে অস্থানে মাতুলীর মত বিপ্লবী বাক্য জুড়ে দিয়ে নিজেদের প্রতিক্রিয়াশীল বক্তব্যকে উপাদেয় করে তুলবার চেষ্টা করেন। এঁদের মধ্যে 'জীবনের অঙ্গীকারের কোন ছন্দ'ই নেই, এঁরা তৃতীয় পক্ষও নন—এঁরা প্রতিক্রিয়ার ট্রোজান অশ্ব।

এই 'তৃতীয় পক্ষ' সুলভ সমালোচনা কতটা বন্ধ্যা, বিষ্ণুবাবুকৃত 'An Acre of Green Grass'-এর সমালোচনাই তার সাক্ষ্য। বিষ্ণুবাবুর কাছে রবীন্দ্রনাথের দান মার্জিত রুচি, শালীনতাবোধ ইত্যাদি। বিষ্ণুবাবু লিখেছেন, "কবি রোমান্টিকের পরিবর্তন-অভীপ্সা ও রোমান্টিক বিদ্রোহের তেজ ও পুনর্নির্মাণের শক্তি, হৃদয়বৃত্তির সূক্ষ্ম সৌকুমার্য ও পেলবতা তাঁরই দান। সৌন্দর্য-তত্ত্বের প্রথম পরীক্ষাতেই প্রয়োজন **নিছক** সৌন্দর্যচেতনা (বড় হরফ আমার) এই প্রাথমিক অঙ্গীকারও রবীন্দ্রনাথে হল প্রথম প্রতিভাত।"[১] বিষ্ণুবাবুর মতে রবীন্দ্র-প্রতিভা 'স্বয়ংসম্পূর্ণ'—প্রায় কোন প্রাকৃতিক (ভগবানের) মহাত্ম্যের মত। বলাবাহুল্য, বিষ্ণুবাবুর এই সার্টিফিকেটে রবীন্দ্রনাথের মর্যাদা হানি করা হয়েছে। সামন্ততান্ত্রিক প্রভুত্ববাদের বিরুদ্ধে, বুর্জোয়া সমাজের অন্তর্নিহিত গলদের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের প্রবল বিদ্রোহকে তুচ্ছই করা হয়েছে।

১, উদ্ধৃতাংশে কিছু মুদ্রণ-প্রমাদ স্পষ্টতর। উক্ত সমালোচনাটি পরবর্তীকালে বিষ্ণু দে-র 'সাহিত্যের ভবিষ্যৎ' গ্রন্থে 'রাজায়-রাজায়' নামে সংকলিত হয়েছে। দ্র. প্রথম সিগনেট সংস্করণ, পৃঃ ৫২। —সঃ

বুর্জোয়া সমালোচনার দুর্বলতাই এখানে—তাঁরা নিজেদের অতীতের বিপ্লবী ঐতিহ্যকে সাহিত্যের আয়নায় দেখতে ভয় পায়। সেই জন্য তারা শেকসপীয়রের বিদ্রোহকে উড়িয়ে দিয়ে, মহাকবিকে ভদ্রস্থ করে দেবতার আসন দিয়ে শূন্যচারী করে রাখেন। বুর্জোয়া সমালোচনার আর একটি দিক হল, আসল কথা এড়িয়ে খুটিনাটি সমালোচনায় ব্যাপৃত থাকা। বিষ্ণুবাবুর উক্ত সমালোচনাতেও দেখি বাক্যগঠনের ভ্রান্তি নিয়ে বিরক্তিকর দীর্ঘ আলোচনা ; দেখি ধান ভানতে শীবের গীত—'মানিকবাবুদের' বিরুদ্ধে অকারণ গঞ্জনা।

বুর্জোয়াদের অপর ধর্ম মিথ্যাচার। বিষ্ণুবাবু ব্যতিক্রম নন। সেই জন্যই নিজের বুর্জোয়া বক্তব্যকে মার্কসবাদী বলে চালাবার উৎসাহের আধিক্যে এঙ্গেলসের বাক্যাংশ অসাধুভাবে ব্যবহার করতেও বিষ্ণুবাবুর বাধেনি। এঙ্গেলসের যে উদ্ধৃতিটির কথা আমি বলছি সেটি নিম্নরূপ :

"As to the values of idiology which sour still higher in the art, religion, philosophy etc. these have a prehistoric stock found already in existence and taken over in the historic period of what we should call bunk."[১] (লিটারেচার এণ্ড আর্ট, মার্কস ও এঙ্গেলস, পৃঃ ৬)। বিষ্ণুবাবু কিন্তু prehistoric-এর পরই ফুলস্টপ বসিয়ে পূর্ণচ্ছেদ টেনেছেন। দর্শনের দলীয়তা প্রসঙ্গে এই নিবন্ধটিরই পরের অংশ আমি পূর্বে উদ্ধৃত করেছি। এ-থেকেই দেখা যাবে যে, এঙ্গেলস যে অর্থে এটা লিখেছিলেন বিষ্ণুবাবু ঠিক তার বিপরীত অর্থে উদ্ধৃতিকে ব্যবহার করেছেন। আর এই ভাবেই বিষ্ণুবাবু তাঁর অ-মার্কসীয় বক্তব্যকে মার্কস-এঙ্গেলসের উদ্ধৃতি ভূষিত করেছেন।

বিষ্ণুবাবুর এই মহান প্রচেষ্টার তাৎপর্য খুবই সোজা। আজকের বাজারে 'আর্টের জন্যই আর্ট' এই বস্তাপচা বুলির কাটতি হওয়া সম্ভব নয়—তাই মার্কসীয় চিনির প্রলেপ দিয়ে এই রদ্দি মাল কাটাবার চেষ্টা। কিন্তু এই ধরনের সৎ প্রচেষ্টা এই নতুন নয়—মার্কসবাদকে ভদ্রস্থ করার এবংবিধ প্রচেষ্টা সম্পর্কে লেনিন বলেছিলেন :

"তাঁদের (বিপ্লবীদের) মৃত্যুর পর অবশ্য সাধারণত তাঁদের নির্বিষ সাধু

১. উদ্ধৃতাংশে মুদ্রণ-প্রমাদ এবং শব্দের পার্থক্য লক্ষ্যণীয়। দ্র. সাহিত্যের ভবিষ্যৎ ; ঐ, পৃঃ ৬৩।—সং

বানিয়ে ফেলার চেষ্টা হয়, সেইভাবে তাঁদের গুণগান করা হয় এবং নিপীড়িত শ্রেণীর প্রতি 'সান্ত্বনা' এবং ধোঁকা দেবার উদ্দেশ্যে খানিকটা অপ্রাকৃত সম্ভ্রমের সঙ্গে তাঁদের নাম ব্যবহার করা হয়। আবার সেই সঙ্গে সঙ্গেই তাঁদের বিপ্লবী তত্ত্বের সারমর্মকে নির্বীর্য ও বিকৃত করে তার বিপ্লবী ধার ভোঁতা করে দেবার চেষ্টা হয়।" (স্টেট এণ্ড রেভল্যুশন, পৃঃ ১)

যতই নিরপেক্ষতার ভান করুন না না কেন, বিষ্ণুবাবু তৃতীয় পক্ষ নন. তিনি শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধ পক্ষ, তিনি একজন বুর্জোয়া ভাববাদী। এই জন্যই তিনি মার্কসবাদ সংশোধন করার চেষ্টা করেন, মার্কসবাদের বৈপ্লবিক ধার ভোঁতা করে দেবার প্রয়াস পান। এই জন্যই যান্ত্রিক সমালোচনার বিরুদ্ধে তাঁর (বুদ্ধদেব বসুর) প্রতিবাদ 'বিষ্ণুবাবুর সশ্রদ্ধ বিবেচনার যোগ্য। এই জন্যই শুধু অচিন্ত্য নয় এলিয়টের মধ্যেও তিনি জীবনের অঙ্গীকারের স্পষ্ট ছন্দ দেখতে পান। এই জন্যই তাঁর কলা-কৌশল কাব্য থেকে জনগণকে বিচ্ছিন্ন করে রাখার কৌশল। বিষ্ণুবাবু এবং তাঁর সমধর্মীরা নানা রকমের ইজমের ধুয়োয় ফর্মের পাঁচিল তুলে সাহিত্য-কাব্য-সঙ্গীতকে জনসাধারণের নিষিদ্ধ এলাকা করে রাখার জন্য চেষ্টিত। আর এই জন্যই লেনিন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছিলেন—ফিউচারইজম, কিউবইজম ও অন্যান্য ইজমের ফলকে আমি শিল্প-প্রতিভার শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন বলে বিবেচনা করতে পারি না। (লেনিন নঅ আর্ট এণ্ড লিটারেচার, এ. ভি. লুনাচারস্কি সম্পাদিত, পৃঃ ৪২)

'ব্যক্তিনিরপেক্ষ সাহিত্য বিচার,' 'দলীয়তাহীন বুদ্ধি,' 'নিছক সৌন্দর্য-চেতনা' ইত্যাদি বুলির মধ্য দিয়ে বিষ্ণুবাবু সেই অতি পুরাতন বুর্জোয়া তত্ত্ব—আর্টের জন্যই আর্ট—পরিবেশন করেছেন। সেই জন্যই বুদ্ধদেব বসু উপলক্ষ্য হলেও, বিষ্ণুবাবুর আক্রমণের লক্ষ্য মানিকবাবুরাই। বিষ্ণুবাবু মার্কসিস্ট নন, মার্কসবাদের শিবিরে প্রতিক্রিয়ার ট্রোজান অশ্ব।

'সৃষ্টির স্বাধীনতা,' 'শিল্প-সাহিত্যে আজ ব্যক্তি রচয়িতাই প্রাথমিক,' 'এই অনেক মানুষের পথে আজও ওঅন-ওয়ে ট্রাফিকের নিয়ম চলে না—কি দক্ষিণে কি বামে' ইত্যাদি কথার ফুলঝুরি কেটে বিষ্ণুবাবু যা দাবী করছেন, তা হল সাহিত্যিক **Lassez fare,** যা খুশী করার স্বাধীনতা। লেনিনের ভাষায়ই বিষ্ণুবাবুদের এই দাবীর জবাব দেব—"বুর্জোয়া স্বাতন্ত্র্যবাদী ম'শায়েরা, আমরা আপনাদের জানিয়ে দিতে বাধ্য হচ্ছি যে আপনাদের নির্বিশেষ

স্বাধীনতার বুলি ভাওতা ছাড়া আর কিছুই নয়।" (লেনিন অন আর্ট এণ্ড লিটরেচার, পৃঃ ৪৬)

জনগণ বিষ্ণুবাবুর কাছে 'এ্যাবস্ট্রাকসন' হতে পারে—কিন্তু জনগণ কারোরই পকেটবুকের সম্পত্তি নয়—বিষ্ণুবাবু, বুদ্ধদেব বা সজনীচক্রের তো নয়ই এমন কি 'মানিকবাবুদের'ও নয়। বরং 'মানিকবাবুরাই' জনসাধারণের সম্পত্তি। "আর্ট জনসাধারণের সম্পত্তি।" জনতার মর্মস্থলে আর্টের শিকড় প্রসারিত করতে হবে। তাঁদের ভাবনা-কামনা-অনুভূতিকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে, তাঁদের উন্নীত করতে হবে।

সাহিত্যের যে একটা 'চালনা শক্তি' আছে বিষ্ণুবাবুও তা স্বীকার না করে পারেন নি। আর এই জন্যই তো শ্রেণীবিভক্ত সমাজে সাহিত্য কোন না কোন শ্রেণীর হাতিয়ার হয়ে ওঠে। সেই জন্যই লেনিন বলেছিলেন,—"সাহিত্য-ক্ষেত্রে অতি-মানবদের পতন হোক! সাহিত্যকে হতে হবে শ্রমিক আন্দোলনের অংশ, সমগ্রের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। শ্রমিকশ্রেণীর সচেতন পুরোগামীরা সমগ্র সমাজ যন্ত্রে যে গতির সঞ্চার করেছেন সাহিত্য হবে তার অঙ্গীভূত।" (লেনিন অন আর্ট এণ্ড লিটারেচার, পৃঃ ৪৭)

কিন্তু মানিকবাবু এতখানিও দাবী করেন নি। মানিকবাবু শুধু প্রশ্ন করেছেন : "তে-ভাগা আন্দোলন নাই বা এল গল্পে···মুখ বুজে অত্যাচার না সয়ে গিয়ে চাষী মেয়ে পুরুষ আজ সচেতন ভাবে সংগ্রাম করে অত্যাচারের বিরুদ্ধে, এই সত্যকে গল্পের মধ্যে কোন্ আর্টের ধামায় চাপা দেওয়া চলবে?" (পরিচয়, ফাল্গুন, ১৩৫৪)। মানিকবাবুর এই অতিমৃদু প্রশ্নেই বিষ্ণুবাবু সাহিত্যিক স্পেশ্যাল পাওয়ার্সের খেল দেখতে পেয়েছেন—যেখানে তাগিদটা আদর্শগত দায়িত্বের রজতখণ্ডের নয় সেখানে এটা স্বাভাবিক। রূপোর শিকল গলায় পরে বুর্জোয়াদের পোষা কুকুর বনাই তো দালাল সাহিত্যিকদের কাছে স্বাধীনতার চরম মার্গে বিচরণ।

সৃষ্টির স্বাধীনতা নিশ্চয়ই থাকবে, 'কোন বিশেষ দলের' রাজনৈতিক থিসিসকে কাব্যের মধ্যে প্রমাণ করার জন্য কেউই ফরমাস দিচ্ছে না, গল্পের কোন বিশেষ ফর্মূলা তৈরীরও প্রশ্ন আসে না। সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণী আজ জীবনপণ সংগ্রামে লিপ্ত। এই সংগ্রামে সাহিত্যের হাতিয়ার তার প্রয়োজন। সংগ্রামী শ্রমিকশ্রেণী তাই ডাক দিয়েছে—

"আমাদের সাহায্য করুন, শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি কমিন্টার্নকে সাহায্য করুন—সংগ্রামে ব্যবহারের জন্য কবিতা, উপন্যাস, ছোটগল্পের আকারে আমাদের হাতে তুলে দিন সাহিত্যের হাতিয়ার।" (ডিমিট্রভ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত, পৃঃ ১৮১)

না, এ সাহিত্যিক স্পেশ্যাল পাওয়ার্স নয়—এ হল সাহিত্যিকদের প্রতি সংগ্রামী শ্রমিকশ্রেণীর আহ্বান। কোন শিল্পী যদি নিজেকে মার্কসবাদী বলে মনে করেন তাহলে শোষিত মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, সংগ্রামকে রূপায়িত করা তার পবিত্র কর্তব্য। মার্কসবাদী দর্শনের প্রতি আপনার নিষ্ঠা যদি আন্তরিক হয় তা হলে আপনার লেখনী নিয়ে এসে দাঁড়ান রণক্ষেত্রে—আপনার দায়িত্ব পালন করুন।

কিন্তু শুধু মার্কসবাদী কেন, প্রত্যেকটি স্বাধীনতাকামী শিল্পীর উপরই আজ এই দায়িত্ব বর্তেছে। কারণ শ্রেণীসমাজে, ক্ষয়িষ্ণু বুর্জোয়া সভ্যতায় শিল্প-সাহিত্য আজ সত্যই শৃঙ্খলিত। মানুষের মনোজগতের উপরও উঁচিয়ে আছে বেয়নেট—ধর্মের, আইনের, বে-আইনি স্পেশ্যাল পাওয়ার্সের। তাই "বুর্জোয়া প্রভাবিত স্বাধীন সাহিত্যের ভাওতার বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি উৎসর্গীকৃত মতবাদের স্বাধীন সাহিত্য প্রয়োজন।" (লেনিন: পূর্বোক্ত গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত, পৃঃ ৪৭)। কারণ শ্রমিকশ্রেণীই সেই বিপ্লবের অগ্রদূত যা শ্রেণী সমাজের অবসান ঘটাবে, শিল্প-সাহিত্যকে করবে শৃঙ্খলমুক্ত। যাঁরা মার্কসবাদী তাঁরা এই বিপ্লবীশ্রেণীর অংশ সুতরাং তাঁদের দায়িত্ব আরও বেশি।

মার্কসবাদ নৈয়ায়িক তর্কের আসর নয়, মার্কসবাদ হল Guide to action. সুতরাং কর্মের কষ্টিপাথরে যাচাই হয় কে মার্কসবাদী আর কে নয়—রালফ্ ফক্স, কডওয়েল আর আজকের দিনে হাওয়ার্ড ফাস্ট প্রভৃতি শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি সাহিত্যিক কর্তব্য পালন করেই নিজেদের মার্কসবাদের প্রমাণ দিয়েছেন—বাগাড়ম্বরে নয়

বিষ্ণুবাবুর লেখায় এই দায়িত্ব পালনের আগ্রহ তো ফোটেই নি বরং শিল্প-বিচারে মার্কসীয় নিয়মকানুন প্রয়োজ্য নয় বলে তিনি শ্রমিকশ্রেণীর সমালোচনাকে নিরস্ত্র করার প্রয়াস পেয়েছেন। "সমাজ-বিপ্লবের আগে সাহিত্য-বিপ্লব কল্পনা বিলাস মাত্র" (কেন লিখি, পৃঃ ৬৪) বলে সাহিত্যে সংগ্রামী প্রচেষ্টাকে হতাশায় ডুবিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন এবং বুর্জোয়া

উন্মার্গগামিতার 'পবিত্র' অধিকার রক্ষার জন্য সাহিত্যের স্বাধীনতা দাবী করেছেন। সংগ্রামী সাহিত্য রচনার দাবীকে দেখেছেন স্পেশ্যাল পাওয়ার্সে'র খেল হিসাবে। লেনিন এই তথাকথিত মার্কসবাদীদের সম্পর্কে বলেছিলেন :

"আমি বেশ কল্পনা করতে পারছি, একদল বিকারগ্রস্ত বুদ্ধিজীবী এবংবিধ তুলনায় (সাহিত্যক্ষেত্রে মহানাববের পতন হোক শীর্ষক উদ্ধৃতি দ্রষ্টব্য) ক্ষেপে গিয়ে অধঃপতনের চরম বলে (?) তুলবেন। তাদের ধ্বনি হবে, আইডিয়ার স্বাধীন সংগ্রামের উপর, সমালোচনার স্বাধীনতা, সাহিত্য সৃষ্টির স্বাধীনতার উপর, অমলাতান্ত্রিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি। বস্তুত, এর মধ্যে দিয়ে তাঁরা বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীর স্বাতন্ত্র্যবাদেরই পরিচয় দেবেন।"

এই কথা লেনিন বলেছিলেন ১৯০৫ সালে—রুশিয়ায় সোভিয়েটতন্ত্র তখনও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ভারতবর্ষের মত রুশিয়ার মার্কসবাদীরাও তখন সংগ্রাম করছেন নূতন সমাজে ব্যবস্থা গঠনের প্রয়াসে। সুতরাং "মানিকবাবুরা মনে করেন বাঙালী ও সোভেয়েট মন একই ছন্দে চলছে" বিষ্ণুবাবুর এই জয়প্রকাশী গুলিও লক্ষ্যভ্রষ্ট।

বিষ্ণুবাবুদের ছদ্মবেশী প্রতিক্রিয়াকে ব্যর্থ করে প্রগতিবাদীদের আজ অগ্রণী হতে হবে—বুর্জোয়াদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে সাহিত্যের অস্ত্র তুলে দিতে হবে শ্রমিকশ্রেণীর হাতে। ভাবপ্রকাশের জন্য উপযুক্ত ফর্ম আবিষ্কার করে আপ্রাণ প্রয়াস ও নিষ্ঠায় সে অস্ত্রকে শাণিত করে তুলতে হবে—যেন তা শত্রুর মুখোস ছিঁড়ে দিতে পারে—যেন সে-শিল্প সে-সাহিত্য বেয়নেট হয়ে বাজে শত্রুর বুকে।*

* মার্কসবাদী, প্রথম সংকলন, অক্টোবর, ১৯৪৮, পৃঃ ১৩৭-১৫৩.; ঊর্মিলা গুহ সাহিত্যিক-সাংবাদিক প্রদ্যোৎ গুহ-র ছদ্মনাম।—সঃ

বাংলা প্রগতি সাহিত্যের আত্মসমালোচনা / প্রকাশ রায়

"দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসানে সমাজবাদের শক্তিবৃদ্ধি হয়েছে। ইওরোপের অনেকগুলি দেশেই সমাজবাদ প্রতিষ্ঠার প্রশ্ন আশু কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। নানাজাতের সাম্রাজ্যবাদীদের এটা মনঃপূত নয়। তারা সমাজবাদকে ভয় করে। আমাদের সমাজবাদী দেশ সমস্ত প্রগতিশীল মানুষের আদর্শস্থল—তাকে তারা ভয় করে। সাম্রাজ্যবাদী এবং তাদের দার্শনিক ভৃত্যেরা, তাদের বশংবদ সাহিত্যিক এবং সাংবাদিক, তাদের রাজনীতিক এবং কূটনীতিকেরা আমাদের দেশের বিরুদ্ধে কুৎসা, সমাজবাদ সম্পর্কে ভুল ধারণা সৃষ্টি করতে, সমাজবাদের কুৎসা গাইতে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে। এই অবস্থায় সোভিয়েট লেখকের কর্তব্য, **শুধু যে প্রত্যেকটি আঘাতের প্রত্যাঘাত করা তাই নয়, পরন্তু সাহসের সঙ্গে গলিত বিকৃত বুর্জোয়া সংস্কৃতিকে অস্বীকার করা, তাকে আক্রমণ করাও তাদের কর্তব্য**।

(লেনিনগ্রাদ লেখকদের সভায় কমরেড জ্‌দানভের বক্তৃতা, ১৯৪৬)

ভারতীয় মার্কসবাদীদের আত্মসমালোচনার বিবরণীতে দেখা গেছে, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সংস্কারবাদের রূপ ছিল বুর্জোয়া নেতৃত্বের লেজ ধরে চলা, পচা বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের সঙ্গে মার্কসবাদকে খাপ খাইয়ে নেওয়ার চেষ্টা। এই সংস্কারবাদ এত দীর্ঘকাল ধরে সংগোপনে তার ধ্বংসাত্মক কাজ করে গেছে যে তার সর্বনাশা প্রভাব বহুদূর পর্যন্ত ব্যাপ্ত হয়েছে—আন্দোলনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রকে কলুষিত করে গেছে। সংস্কৃতি আন্দোলনও এর ক্ষতিকর প্রভাব থেকে মুক্ত নয়। এ ক্ষেত্রে সংস্কারবাদের রূপ দাঁড়িয়েছে—বুর্জোয়া 'সংস্কৃতিবিদদের' কাছে নতি স্বীকার, বুর্জোয়াদের কলুষিত ঐতিহ্য সম্পর্কে মোহাচ্ছন্নতা; এক কথায়, বুর্জোয়া ভাবাদর্শের কাছে আত্মসমর্পণ, বুর্জোয়াদের কলসীর কানার আঘাতের প্রত্যুত্তরে প্রেম বিলোবার প্রবৃত্তি। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সংস্কারবাদের

বিরুদ্ধে সংগ্রাম অনেকখানি এগিয়েছে বটে, কিন্তু সংস্কৃতি আন্দোলন থেকে-সংস্কারবাদের ক্ষতিকর প্রভাব এখনও কাটেনি।

সমাজবাদের জন্য সংগ্রামে শিল্প-সাহিত্যের একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। কমরেড জ্দানভ বলেছেন :

"আমাদের সোভিয়েট রাষ্ট্র এবং পার্টি সোভিয়েট সাহিত্যের সাহায্যে যুব সমাজকে সাহস এবং আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ ও শিক্ষিত করতে পেরেছে বলেই সমাজবাদ প্রতিষ্ঠার পথের দারুণ বাধা-বিঘ্নকে অতিক্রম করা গেছে। জার্মান এবং জাপানীদের পরাজিত করা সম্ভব হয়েছে।"

(লেনিনগ্রাদ লেখকদের সভায় বক্তৃতা, ১৯৪৬)

উক্ত বক্তৃতাতে তিনি আরও বলেছেন, এর অন্যথা হলে গত মহাযুদ্ধে সোভিয়েট পক্ষের পরাজয়ই ঘটত।

লেখকদের ভূমিকা বিশ্লেষণ করে কমরেড ষ্টালিন বলেছেন, লেখকেরা হচ্ছেন "মানবাত্মার কারুকর্মী"।

শিল্প সাহিত্য সম্পর্কে এত গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে এই কারণেই যে, শ্রেণীবিভক্ত সমাজে শিল্প সাহিত্য শ্রেণী সংগ্রামের হাতিয়ার। যা নিয়ে শ্রমিকশ্রেণী লড়েছেন, লড়বেন তাতেই যদি ঘুণ ধরে—তবে তা যে কি মারাত্মক তা সহজেই অনুমেয়।

সুতরাং সংস্কৃতি আন্দোলনের ক্ষেত্র থেকে, সংস্কারবাদদের মূল উচ্ছেদ করা, এই মুহূর্তের একটি অন্যতম প্রধান ও প্রাথমিক কর্তব্য। কিন্তু রোগ সারাবার আগে রোগটি কি তা জানা দরকার। তার উপসর্গগুলি নির্ণয় করা প্রয়োজন।

বাংলাদেশে নব্য-সংস্কৃতি আন্দোলনের অবিসংবাদী মুখপত্র প্রধানত 'পরিচয়'। 'অগ্রণী', 'লোকনাট্য' এবং আরও কয়েকটি ছোটখাটো পত্রিকা এই লড়াইয়ের অংশীদার। এর মধ্যে সরকারের অকৃপণ দাক্ষিণ্যে (!) সম্প্রতি 'লোকনাট্যে'র কণ্ঠ রুদ্ধ। প্রধানত গল্প-কবিতাই অগ্রণীর উপজীব্য, আর গল্প কবিতা এ প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নয়। সুতরাং অগ্রণী সম্পর্কে আমরা বর্তমানে মোটামুটি নীরবই থাকবো।

যাহোক, এই তিনটি পত্রিকাই নব্য-সংস্কৃতি আন্দোলনের ধারক ও বাহক—নব্য-সংস্কৃতি আন্দোলনের নেতৃবর্গ এবং কর্মীরা এই পত্রিকাগুলির পরিচালনা

ব্যাপারে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। এর মধ্যে 'পরিচয়'ই প্রধান। সুতরাং বর্তমান প্রবন্ধে 'পরিচয়ে'র আলোচনাই বেশী স্থান জুড়ে থাকবে।

গত কার্তিক মাস থেকে নব কলেবরে 'পরিচয়' প্রকাশিত হচ্ছে। আর এই পরিবর্তন শুধু বাহ্যিক নয়, এই রূপান্তরের পিছনে ছিল গুণগত পরিবর্তনের প্রতিশ্রুতি। এই রদবদলের উদ্দেশ্য ছিল এই যে, মার্কসবাদের পতাকাতলে সমবেত হয়ে 'পরিচয়' শুধু যে বুর্জোয়াদের প্রত্যেকটি আঘাতের প্রত্যাঘাত করবে তাই নয়, পরন্তু সাহসের সঙ্গে গলিত বিকৃত বুর্জোয়া সংস্কৃতিকে অস্বীকার করবে, আক্রমণ করবে—বুর্জোয়াদের গলিত সংস্কৃতির জঞ্জালকে বলিষ্ঠ বাহুতে সরিয়ে নব্য প্রাণবন্ত শ্রমিক সংস্কৃতি গঠনে "পরিচয়" হবে অগ্রণী, বুর্জোয়াদের কলুষিত মতবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে 'পরিচয়' হবে শ্রমিক শ্রেণীর হাতিয়ার।

সংস্কৃতি সংকটের রূপ

এইভাবে রূপান্তরিত পরিচয়ের প্রথম সংখ্যার (কার্তিক, ১৩৫৫) প্রথম প্রবন্ধ "সংস্কৃতির সংকট"। পরিচয় সম্পাদক গোপাল হালদার এই প্রবন্ধে "সংস্কৃতির সংকট" সম্পর্কে মনোজ বসু এবং তারাশঙ্করের বক্তব্যের 'জবাব' দিয়েছেন।[১]

মনোজবাবুর চোখে সংকটটা দেশ বিভাগ জনিত—পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার সংস্কৃতির উপর উর্দু ও হিন্দীর আক্রমণ। আর তারাশংকরবাবু সংকট আছে বলেই মানেন না। অর্থাৎ একজন সংকটকে চাপা দিতে চান আর অন্যজনের যুক্তি মূল সংকট থেকে জনতার দৃষ্টিকে বিক্ষিপ্ত করে। আর এঁদের দু'জনের যুক্তিই সংকট সমাধানের প্রচেষ্টাকে নিরস্ত্র করে, করে বিপথগামী। সুতরাং নব্য সংস্কৃতির পুরোধা হিসাবে মার্কসবাদীদের অবশ্য কর্তব্য এই যুক্তিজাল ছিন্ন করা। কিন্তু গোপালবাবু কি সে দায়িত্ব পালন করেছেন ?

একটা বাংলা প্রবাদ মনে পড়ল :

কোন এক গৃহস্থ বাড়ীতে ভিক্ষুক এসেছে। ভিক্ষে দেওয়া হবে না বলে বাড়ীর বৌ তাকে ফিরিয়ে দিল। গৃহিণী তাই শুনে ফের ভিক্ষুককে ডেকে আনালেন। ভিক্ষুক ভাবল তবে বোধহয় ভিক্ষে পাওয়া যাবে। কিন্তু গৃহিণী বললেন—ও বাড়ীর বৌ, ভিক্ষে দেওয়া হবে কি না হবে তা বলবার অধিকার ওর নেই ; সে অধিকার আমার—আমি বলছি ভিক্ষে দেওয়া হবে না।

১. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের 'সংস্কৃতি পরিষদে' 'সংস্কৃতির সংকট' বিষয়ে ৬. ৯ .৪৮ তারিখের বিতর্কিত আলোচনার জবাবে গোপাল হালদার ঐ প্রবন্ধটি রচনা করেন।—সঃ

গোপালবাবুর জবাবটা ঠিক এই রকমের। অর্থাৎ মনোজ বসু ও তারাশংকরের বক্তব্যের সঙ্গে গোপালবাবুর বক্তব্যের কোন তফাৎ নেই, পার্থক্যটা শুধু যুক্তির।

সংকট অস্বীকৃতির যুক্তি ভাববাদী তারাশংকর দিয়েছেন এই বলে যে, সংস্কৃতির মৃত্যু নেই, আর তা কোন শ্রেণী বিশেষেরও নয়। আর 'মার্কসপন্থী' গোপালবাবু লিখেছেন :

"বাঙালী সংস্কৃতির এ 'সংকট' আসলে সংকট নয়, বাঙালী সংস্কৃতির রূপান্তরের দাবী, বাঙালী মজুর-কৃষক-বুদ্ধিজীবীর বিপ্লবী সংস্কৃতিরূপে বিকাশোন্মুখ, বিকাশোন্মুখ তা পৃথিবীর অন্যান্য দেশের বিপ্লবী শ্রেণীর সংস্কৃতির সঙ্গে মানব মহীরুহের খণ্ডিত শাখায়।"*

খুবই চটকদার কথা। আপাতদৃষ্টিতে একে বিপ্লবী সিদ্ধান্ত মনে হলেও এ তারাশংকরেরই যুক্তি আর লড়াই এড়িয়ে যাবারই যুক্তি।

কারণ সংকট সত্যিই আছে। বুর্জোয়া সংস্কৃতির অবকাশ আরম্ভ হয়েছে—শ্রমিকশ্রেণীর সংস্কৃতি গড়ে উঠতে পারছে না। ধনিকের শোষণ শাসনে শ্রমিকশ্রেণী শিক্ষা ও সংস্কৃতির অধিকার থেকে বঞ্চিত—তার অন্তরের আবেগ তাই পুরোপুরি সাহিত্যভাত হতে পারে না। যেটুকুও বা হয় তার উপরও নেমে আসে শাসকের দণ্ড। শোষকের হিংস্র পৈশাচিক হস্ত করে তার কণ্ঠরোধ, বন্ধ হয় শ্রমিক-শ্রেণীর পত্র পত্রিকা, তার সাংস্কৃতিক মুখপত্র হয় রুদ্ধকণ্ঠ, রক্তাক্ত বর্বর হস্ত কেড়ে নেয় তাদের কণ্ঠের গান, তাদের জীবননাট্য। সংস্কৃতি বর্জিত বুর্জোয়া বর্বরেরা সমগ্র মানব সংস্কৃতির বিরুদ্ধেই সুরু করেছে সর্বাত্মক অভিযান। এই হিটলারী অভিযান এমন কি তাদের দীক্ষাগুরু রবীন্দ্রনাথকেও মার্জনা করে না। অন্যদিকে যে সব সংস্কৃতিবিদ শ্রমিকশ্রেণীর শিবিরে এসেছেন তাঁরাও পুরোপুরি শ্রেণীবিচ্যুত হয়ে শ্রমিক-শ্রেণীর সঙ্গে একাত্ম হতে পারেন নি, তাই তাঁরাও সে আবেগকে ভাষা দিতে পারছেন না। বুর্জোয়া শিল্পরীতি, বুর্জোয়া আঙ্গিক প্রগতিচিন্তাকে আড়ষ্ট করে দিচ্ছে, ব্যর্থ করে দিচ্ছে তার আবেদন; অথচ বুর্জোয়া সংস্কৃতি ভাণ্ডার শূন্য, দেয় তার কিছু নেই, আছে শুধু বিকৃতির

* উদ্ধৃতাংশে মূল রচনার দু-একটি শব্দ বর্জিত হয়েছে।
দ্র: পরিচয়, কার্তিক ১৩৫৫; পৃ: ২০।—সঃ

কদাকার—সংকট এই। অর্থাৎ বুর্জোয়া মতাদর্শ শিল্পের আঙ্গিক এবং রীতি সম্পর্কে বুর্জোয়া ধারণাই প্রগতি সাহিত্যকে পিছনে টেনে রাখছে। তাই সংকট সমাধানের পথ হল, বুর্জোয়া মতাদর্শের বিরুদ্ধে, সংস্কৃতির উপর বুর্জোয়া আক্রমণের বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রামের পথ। তাই বলছিলাম সংকটের অস্বীকৃতি আসলে লড়াই এড়িয়ে যাবারই যুক্তি।

লড়াই যাঁদের স্বার্থের পরিপন্থী, সংকটকে চাপা দিতে চান তাঁরাই। অর্থনৈতিক সংকটের অগ্নিগিরির উপর বসেও ট্রুম্যান তাই প্রমাণ করতে চান যে মার্কিন অর্থনীতি সমৃদ্ধির পথেই চলেছে—বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্রীরা পুঁজিবাদের সংকট নেই বলে চিৎকার করে আকাশ বাতাস মুখরিত করে তোলে। তাদের উদ্দেশ্য 'সংকট' নেই বলে ধোঁকা দিয়ে শ্রমিকশ্রেণীর ঘাড়ে সংকটের বোঝা চাপান। সংকট পুঁজিবাদের—সমাজবাদের নয়, বলে যদি কোন সমাজবাদী সংকটের দিকে পিছন করে থাকেন তাহ'লে তিনি পুঁজিবাদীদেরই সাহায্য করবেন। কারণ শ্রমিকশ্রেণী নিজের স্বার্থের অনুকূলে সংকটের সমাধান না করতে পারলে বুর্জোয়া শ্রেণী তাদের সমাধানের বোঝা চাপিয়ে দেবে জনগণের উপর।

কিন্তু সে চেতনা কোথায় গোপালবাবুর লেখায়? তিনি সংস্কৃতি রূপান্তরের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন—কিন্তু সে প্রতিশ্রুতি পূরণের অঙ্গীকার কোথায়? সে কি সংকটের অস্বীকৃতি? উটপাখীর মত মাথা গুঁজে থাকলেই কি ঘূর্ণীঝড় তাঁকে ক্ষমা করবে? মোটেই না। এই সংকট অতিক্রম করতে না পারলে সংস্কৃতির ভবিষ্যত অন্ধকারাচ্ছন্ন—বুর্জোয়া 'সংস্কৃতি'র গলিত শবগন্ধ ব্যর্থ করে দেবে মানুষের সংস্কৃতির জয়যাত্রাকে। অন্ধভাবে ঘুরপাক খাবে অধ্যাত্মবাদ, অনিশ্চয়তাবাদ, ধোঁকাবাদের ঘূর্ণীপাকে। শ্রমিকশ্রেণীর সচেতন প্রচেষ্টাই পারে এই সংকটকে অতিক্রম করতে—মানব সংস্কৃতির উত্তরাধিকার তাদেরই। নব্য সংস্কৃতির ভগীরথ তাই শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রণী অংশ মার্কসবাদীরা—বিকৃতির জটাজাল থেকে মুক্ত করে নব্য প্রাণবন্ত সংস্কৃতির ধারা একমাত্র তারাই প্রবাহিত করতে পারেন। সংস্কৃতির রূপান্তর মানবিক প্রচেষ্টারই প্রসাদ। বুর্জোয়া বিকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রামের গর্ভেই হবে নব্য-সংস্কৃতির উদ্বোধন। সংকট নেই বলে গোপালবাবু এই সংগ্রামকেই অস্বীকার করেছেন।

আবার অন্যদিকে মনোজবাবুর যুক্তিও তিনি মেনে নিয়েছেন—অর্থাৎ মেনে

প্রতিনিধিত্বমূলক বলেছেন কিন্তু সেই সঙ্গে দেখিয়েছেন যে চরিত্রগুলির পারিপার্শ্বিকতা সম্বন্ধে ও কথা খাটে না।

বিষ্ণুবাবু বালজাকের কথা তুলেছেন। এঙ্গেলস ঐ একই সূত্র অনুযায়ী বালজাকের সমালোচনা করেছেন: "সাধারণভাবে, বাস্তব সম্বন্ধে গভীর জ্ঞানের জন্য বালজাক সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।" (মার্কস)—এই জন্যই মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন বালজাককে মহৎ স্রষ্টা বলেছেন—তাঁর রাজতন্ত্রী মতবাদের জন্য নয়।

এঙ্গেলস লিখেছেন: "রাজনৈতিক মতের দিক দিয়ে বালজাক একজন রাজতন্ত্রী (legitimist)। তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনায় নিরন্তর অনুরণিত হয়েছে সু-সমাজের অ-প্রতিকার্য (?) ক্ষয়ের বিষাদগাথা। যে শ্রেণীর ধ্বংস অনিবার্য বালজাকের সহানুভূতি তাদের দিকে।" (লিটারেচর এণ্ড আর্ট—মার্কস ও এঙ্গেলস; পৃ: ৪৩। কিন্তু ক্ষয়িষ্ণু শ্রেণীর প্রতি সহানুভূতির জন্য এঙ্গেলস বালজাকের প্রশংসা করেন নি। বালজাককে তিনি মহৎ স্রষ্টার আসন দিয়েছেন এইজন্যেই যে কিন্তু তা সত্ত্বেও, যখন যাদের প্রতি তিনি সুগভীর সহানুভূতি-সম্পন্ন সেই 'নোব্‌ল্‌'দের চরিত্র অংকিত করেন তখনকার মত তাঁর ব্যঙ্গ আর কখনও তত তীব্র হয় না। তাঁর বিদ্রূপ আর কখনও তত নির্মম হয়ে ওঠে না। আর একমাত্র যাঁদের সম্পর্কে তিনি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা প্রকাশ করেন, তাঁরা হলেন তাঁর রাজনৈতিক বিরুদ্ধবাদী, Cloitre Saint meonyরা সাধারণতন্ত্রী বীরবৃন্দ। সেই সময়ে (১৮৩০-৩৬) তাঁরা সত্যই ছিলেন জনতার প্রতিনিধি।

"এইভাবে বালজাক যে তাঁর নিজের শ্রেণী সহানুভূতি ও রাজনৈতিক সংস্কারের বিরুদ্ধে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন, তিনি যে তাঁর প্রিয় নোবলদের পতনের প্রয়োজনীয়তা **উপলব্ধি** করেছিলেন এবং তাদের ভাগ্যে এছাড়া আর কিছু হতে পারে না বলে বর্ণনা করেছিলেন, তিনি যে ভবিষ্যতের সত্যকারের মানুষদের (তখন একমাত্র যাদের দেখা গিয়েছিল) **দেখেছিলেন**—আমি একেই রিয়ালিজমের সর্বাপেক্ষা বড় জয় বলে মনে করি আর এই হল প্রবীণ বালজাকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য।" (ঐ, পৃ: ৪৩)

তাহলে দেখা যাচ্ছে রাজতন্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও বালজাকের লেখায় রাজতন্ত্রী প্রভুদের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা প্রকাশ পেয়েছে। সে ঘৃণার ছিল একটা সক্রিয় ভূমিকা আর তাই এঙ্গেলস বালজাকের সাহিত্যে রিয়ালিজমের সর্বাপেক্ষা বড়

জয় দেখতে পেয়েছেন। এঙ্গেলসের এই উদ্ধৃতিগুলির মধ্যেই মার্কসবাদী সমালোচনার মূলসূত্র বিবৃত হয়েছে।

অচিন্ত্য সেনগুপ্ত-তারাশঙ্করের সাহিত্য এই নিরিখেই বিচার করতে হবে। অচিন্ত্যের চাষী চরিত্রগুলি কি প্রতিনিধিত্বমূলক চরিত্র? তার পারিপার্শ্বিকতা কি যথাযথ? অচিন্ত্য-তারাশঙ্করের চাষী চরিত্রগুলি কি 'শহরের মেয়ে'র শ্রমিক চরিত্রের মতই নিষ্ক্রিয় এবং নিজের পায়ে দাঁড়াতে অক্ষম নয়? অচিন্ত্যের লেখায় কি 'রাজনৈতিক সংস্কার' সত্ত্বেও তাঁর প্রিয় শাসকশ্রেণীর পতনের প্রয়োজনীয়তা ফুটে উঠেছে? এই মার্কসবাদী নিরিখে বিচার করলে যদি অচিন্ত্যের গল্প উৎরাত তাহলে হাকিম হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে প্রগতিশীল বলতে আমরা এতটুকুও দ্বিধা করতাম না। মার্কসবাদীরা ছুঁৎমার্গে বিশ্বাসী নয়।

বালজাক তাঁর সাহিত্যে নিজের রাজনৈতিক মতবাদকে খণ্ডন করেছিলেন আর অচিন্ত্য প্রচার করেছেন বুর্জোয়া প্রভুদের মিথ্যাচারকে। এ প্রসঙ্গে বিষ্ণুবাবুর জবাবে নীহার দাশগুপ্ত ঠিকই লিখেছিলেন—"সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে গল্পচরিত্রের এই বিচার ও বিশ্লেষণের অভাব একদিকে অচিন্ত্য-কুমারের সৃষ্ট গল্পচরিত্রকে যেমন নিষ্প্রাণ ও সেইহেতু অবাস্তব করে তুলেছে, অন্যদিকে তার এই "অ-জ্ঞান" তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীকে স্বচ্ছতা দিতে পারে নি, তাঁর গল্পচরিত্রকে যথার্থ ও সুষ্ঠু পরিণতিতে টেনে নিয়ে যেতে দেয় নি। এক এক সময় তাঁর এই আবিল দৃষ্টিভঙ্গী রীতিমত শঙ্কার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিষ্ণুবাবুর উচ্ছ্বসিত প্রশংসাপ্রাপ্ত কাঠ-খড়-কেরোসিনের গল্পে একথার যাথার্থ্য প্রমাণিত হতে বাধ্য। শঙ্কার কারণ শুধু তাঁর বিকৃত দৃষ্টিভঙ্গী বা অসৎ উদ্দেশ্যের জন্য নয়। পাঠক সাধারণকে বিভ্রান্ত করার সু-কৌশলের জন্য। মঙ্গল চাপরাসী, রমজান বা হাস্ত বিবির মত নিপীড়িত সাধারণ মানুষকে শিখণ্ডীরূপে দাঁড় করিয়ে সমস্ত সমস্যাকে তিনি বিকৃত ও অসৎভাবে চিত্রিত করার প্রয়াস পেয়েছেন।"[১] (পরিচয়, মাঘ, ১৩৫৪)

এ প্রসঙ্গে যা প্রণিধান করা দরকার তা হল এই যে অচিন্ত্যের এই অসৎ প্রয়াস আকস্মিক নয় মোটেই। যুগ পালটেছে—এখন আর রাজনৈতিক মতামতের সঙ্গে সাহিত্য-দর্শনের 'আপাত বৈপরীত্য' সম্ভব নয়। লেনিনের

১. উদ্ধৃতাংশে মূল রচনার দু-একটি শব্দের বর্জন এবং যতিচিহ্ন স্থাপনে কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম লক্ষ্যণীয়। দ্র. পরিচয়, মাঘ, ১৩৫৪ ; পৃঃ ১১৪। – সঃ

ভাষায় এখন এমন একটা যুগ এসেছে যখন 'থিয়োরী' 'প্রাকটিশে' পরিণত হচ্ছে। রাজনীতির মত, এখন আর সাহিত্যেও নিরপেক্ষতার কোন ভূমিকা নেই। এই জন্যই নিজের উদার গান্ধীবাদ (কালিন্দী, গণদেবতা, মন্বন্তর) ছেড়ে দিয়ে তারাশঙ্কর জনতার বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করেছেন 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'য় একথা বলা যায়। তাতে যদি কারো প্রাণে ব্যথা লাগে তো নাচার!

বিষ্ণুবাবু মনে করেন যে, জনতাকে 'সাহিত্যভাত' করাই প্রগতির চরম বিচার। সাহিত্যে 'নিছক সহানুভূতি' (!) বা 'অবান্তর' (?) আশার দ্বারা উত্তেজিত করা, বা 'রাজনৈতিক কাঠামো' থাকার প্রয়োজন নেই। সহানুভূতির প্রশ্ন নয়—শ্রমিকশ্রেণী কতিপয় উন্নাসিক বুদ্ধিজীবীর 'সহানুভূতি'র কাঙাল নয়। কিন্তু আজ রাজনীতি ছাড়া জীবন নেই। পেটভরে খেতে চাইলে বা ভাল করে বাঁচার স্বপ্ন দেখলে আজ স্থান হয় জেলখানায়। সুতরাং নিজের দায়েই সাধু বুদ্ধিজীবীকে শ্রমিকশ্রেণীর পাশে এসে দাঁড়াতে হবে। এ-কোন বিশেষ দলের প্রচার নয়—বিষ্ণুবাবুর দুর্ভাগ্য এই যে, এটাই আজকের দিনের বাস্তব সত্য। তা ছাড়া বিষ্ণুবাবুর সংজ্ঞা মেনে নিলে 'জাতীয়' টি-ইউকেও বিপ্লবী সংস্থা বলতে হয় আর তাহলে সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায় তো নিশ্চয়ই কমিউনিস্ট—কারণ সুরেশবাবু এবং জাতীয় টি-ইউ শ্রমিক নিয়েই বেসাতি করেন। বিষ্ণুবাবুর এই ব্যাপক সংজ্ঞা মোটেই নির্দোষ ঔদার্য নয়—প্রতিক্রিয়াকে পেছনের দরজা দিয়ে ঢোকাবার কৌশল মাত্র। এই জন্য শুধু অচিন্ত্য-তারাশঙ্কর নয়, বিষ্ণুবাবু এলিয়টের মধ্যেও 'জীবনের অঙ্গীকারের স্পষ্ট ছন্দ' দেখতে পেয়েছেন। সেই জন্যই বলছি, তারাশঙ্করকে বিষ্ণুবাবু শ্রদ্ধা করতে চান করুন, অচিন্ত্য সেনগুপ্তের সঙ্গে হেমিংওয়ের তুলনা করতে চান (কারণ প্রগতি বিচারের শেষ মাপকাঠি তো আর হেমিংওয়ে নন) আপত্তি করব না—কিন্তু এদের রচনা প্রগতিশীল বলে চালাবার চেষ্টা করলে নিশ্চয়ই প্রতিবাদ করব।

এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, বিষ্ণুবাবু তাঁর ব্যক্তিগত ভাল লাগা না লাগাকেই সমালোচনার মান ধরে নিয়েছেন এবং যাঁরা তাঁর সঙ্গে একমত নন তাঁদের মধ্যেই তিনি 'লাসালী ভ্রম' ও 'ডুরিং-এর বিচ্যুতি' দেখতে পেয়েছেন। বুর্জোয়া ধারার সমালোচনার এই সীমাবদ্ধতা অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণ 'নিছক সৌন্দর্যানুভূতি' মানুষে মানুষে প্রভেদ হবেই।

অসাধুভাবে সম্পাদিত মার্কস-এঙ্গেলসের উদ্ধৃতি সাজিয়ে প্রতিপক্ষদের নস্যাৎ করবার চেষ্টার মধ্যে বাহাদুরী থাকতে পারে, মার্কসবাদ নেই। শিল্প বিচারের কোন মার্কসীয় নিয়ম কানুন নেই—বিষ্ণুবাবুর এই দাবীর সঙ্গে যদি কারো মতবাদের সামঞ্জস্য থাকে তবে তা ট্রট্স্কীর। ট্রট্স্কী বলেন: "এ কথা অত্যন্ত ঠিক যে শিল্পকর্ম গ্রহণ বা বর্জন করা সম্পর্কে সব সময় মার্কসবাদী নীতি অনুসরণ করা চলে না। প্রথমত শিল্পকর্মের বিচার করতে হবে তার **নিজের নিয়মে** অর্থাৎ **আর্টের নিয়মে** (বড় হরফ আমার)। [লিটারেচার এণ্ড রেভল্যুশন, পৃঃ ১৭৮]

এ প্রসঙ্গে বিষ্ণুবাবুরা আরও অভিযোগ করেছেন যে, 'পরিচয়' ও কয়েকজন প্রগতি লেখকদের মধ্যে তাঁরা অসহিষ্ণু দলীয়তা দেখে এসেছেন। এই উগ্র মতবাদ সাহিত্যের স্বাধীনতার প্রতিকূল। কারণ সাহিত্য বিচারে সাহিত্য বস্তুই প্রধান বিবেচ্য—লেখকদের ব্যক্তিগত জীবন, রাজনীতি বা পারিপার্শ্বিকতা বিচারের প্রয়োজন নেই। বিষ্ণুবাবুর মতে এই ধরনের বিচার গোয়েন্দাগিরির সামিল। এই ধরনের বিচার যান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক বিচার। কারণ শিল্প সাহিত্যেরও একটা নিজস্ব ইতিহাস আছে। ইত্যাদি।

সাম্যবাদীদের বিরুদ্ধে উগ্রতার অপবাদ এই নতুন নয়—সুতরাং তার জবাব দেওয়া বাহুল্য। বিষ্ণুবাবু মাণিকবাবুদের বিরুদ্ধে যান্ত্রিকতার অপরাধ যত তারস্বরেই প্রচার করুন না কেন—সাহিত্য বিচারে সাহিত্য বস্তুই প্রধান বিষ্ণু-বাবুদের এ তত্ত্ব বুর্জোয়া বুলি। কডওয়েল বলেন:

"ধরে নেওয়া হয় যে, উপায়, টেকনিক এবং শিল্পের যে সব 'শুদ্ধ' (abstract) গুণাবলীকে শিল্পী নিরপেক্ষভাবে বিচার করা যায় তার সবগুলিকে যখন বিশ্লিষ্ট করে তত্ত্বে পরিণত করা হয় তখনই আর্টকে তার **নিজের ভাষায়** (বড় হরফ আমার) বর্ণনা করা হয়। দর্শনের ক্ষেত্রে যান্ত্রিক বস্তুবাদের যা স্থান, তত্ত্বের দিক দিয়ে ঈসথেটিকসের ক্ষেত্রে এই মতেরও সেই একই স্থান।"

(ইলিউসন এণ্ড রিয়ালিটি, ভারতীয় সংস্করণ, পৃঃ ৯)

মার্কসবাদ বলে সমাজ-নিরপেক্ষ সাহিত্য দেহহীন প্রাণের মতই মিথ্যা। শিল্প সাহিত্যের নিজস্ব ইতিহাস নিশ্চয়ই আছে কিন্তু সে ইতিহাসও সমাজ-নিরপেক্ষ স্বয়ম্ভু নয়।

'ক্রিটিক অব পলিটিক্যাল ইকনমি'র ভূমিকায় মার্কস বলেছেন:

"বাস্তব জীবনের উৎপাদন পদ্ধতি সাধারণ ভাবে সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে।"

শিল্প-সাহিত্য আকাশকুসুম নয়, মানসকুসুম। এই ভাবজগত, "ধর্ম, দর্শন প্রভৃতি যা বহু শূন্যে বিচরণ করে" (এঙ্গেলস) তার সঙ্গে অনেক সময় হয়ত সামাজিক ব্যবস্থার প্রত্যক্ষ যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যায় না—কিন্তু তাতে বিষ্ণুবাবুর পুলকিত হবার কোন কারণ নেই। ঐ একই নিবন্ধে এঙ্গেলস বলেছেন, "কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা (ধর্ম, দর্শন ইত্যাদি) নিজেরাই অর্থনৈতিক বিকাশের প্রবল প্রভাবের দ্বারা প্রভাবান্বিত।" (আর্ট এণ্ড লিটারেচর—মার্কস-এঙ্গেলস, পৃঃ ১১)

অর্থনৈতিক বিবর্তনে সমাজ শ্রেণীবিভক্ত। এই শ্রেণীবিভক্ত সমাজে ভাবজগতও তাই শ্রেণীচেতনার বশীভূত। শিল্প-সাহিত্যে এই ভাবজগতেরই অঙ্গীভূত। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে সাহিত্যেও তাই শ্রেণীচেতনা প্রকাশ পায়। লেখক কোন্ শ্রেণীভুক্ত সাহিত্য বিচারে তা জানা প্রয়োজন ; তা গোয়েন্দাগিরি নয়। শিল্প-সাহিত্যের যে নিজস্ব ইতিহাস আছে তা আলোচনা করলেও এই কথাগুলিই প্রকট হয়ে উঠবে (কডওয়েল এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। এ প্রসঙ্গে তার উল্লেখই যথেষ্ট। কারণ স্বল্প পরিসরে সে আলোচনা সম্ভব নয়)। শেকসপীয়রের রচনাতেও উদীয়মান বুর্জোয়া শ্রেণীর জীবনদর্শনই আত্মপ্রকাশ করেছে।

সাহিত্য মাত্রেই লেখকের জীবন-দর্শন প্রতিভাত হয়। দর্শনের দলীয়তা সম্পর্কে এঙ্গেলস বলেছেন :

"উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, দর্শনের ক্ষেত্রে, বুর্জোয়া যুগে এ কথা আরও সহজে প্রমাণ করা যায়। হব্স হচ্ছেন প্রথম আধুনিক (অষ্টাদশ শতকের অর্থে) ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী। কিন্তু তিনি এমন একটা সময় স্বৈরতন্ত্রবাদী (absolutist) হয়েছিলেন যখন সারা ইওরোপে স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের স্বর্ণযুগ, যখন ইংল্যাণ্ডে স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র বনাম জনসাধারণের সংগ্রামের সূচনা হচ্ছে। লক্ হচ্ছেন ধর্ম ও রাজনীতি উভয় ক্ষেত্রেই ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের শ্রেণী সমঝওতার সন্তান।"

(পূর্বোক্ত গ্রন্থের ১১ পৃঃ)

তাহলে দেখা যাচ্ছে শ্রেণীচেতনা নিরপেক্ষ কোন দর্শন নেই—সাহিত্যও থাকতে পারে না। প্রত্যক্ষভাবেই হোক আর পরোক্ষভাবেই হোক, সাহিত্য

কোন না কোন শ্রেণীর পক্ষে প্রচার অর্থাৎ সাহিত্য মাত্রই পার্টিজান। সুতরাং সাহিত্য বিচারেও তৃতীয় পক্ষ বলে কোন ভূমিকা নেই। বিপ্লবী সাহিত্যকে ধিক্কার দেবার জন্যই বুর্জোয়া সমালোচকেরা 'তৃতীয় পক্ষ' সেজে থাকেন।

রাজনীতির মত, সাহিত্যক্ষেত্রে যখন প্রতিক্রিয়ার পক্ষে প্রচার অসম্ভব হয়ে পড়ে তখন বুর্জোয়া দালালেরা দল-নিরপেক্ষতার ধ্বনি তোলেন। তাঁদের উদ্দেশ্য প্রগতির পক্ষে প্রচারকে নিরস্ত্র করা। সম্মুখ সমরে পরাজিত হয়ে তারা পেছন থেকে ছুরি মারার চেষ্টা করেন। এই সুকৌশল পাল্টা আক্রমণ আসে নানাভাবে—"নৈরাশ্য প্রচার করে (যেমন এলিয়ট) বুর্জোয়া সাহিত্যিকেরা বিপ্লবী শক্তিকে নিরস্ত্র করবার চেষ্টা করেন। তারা বোঝাবার চেষ্টা করেন প্রতিক্রিয়ার শক্তি এত বেশী যে তাকে পরাজিত করা সম্ভব নয় ; বা অলীক মোহ সৃষ্টি করে বিপ্লবী সংগ্রাম থেকে জনতার দৃষ্টিকে বিক্ষিপ্ত করার চেষ্টা করেন—জনতার বিপ্লবী উদ্যোগ নষ্ট করার জন্য বোঝাবার চেষ্টা করেন আপনা আপনিই বিপ্লব জয়যুক্ত হবে এমন কি অনেক সময় স্থানে অস্থানে মাদুলীর মত বিপ্লবী বাক্য জুড়ে দিয়ে নিজেদের প্রতিক্রিয়াশীল বক্তব্যকে উপাদেয় করে তুলবার চেষ্টা করেন। এঁদের মধ্যে 'জীবনের অঙ্গীকারের কোন ছন্দ'ই নেই, এঁরা তৃতীয় পক্ষও নন—এঁরা প্রতিক্রিয়ার ট্রোজান অশ্ব।

এই 'তৃতীয় পক্ষ' সুলভ সমালোচনা কতটা বন্ধ্যা, বিষ্ণুবাবুকৃত 'An Acre of Green Grass'-এর সমালোচনাই তার সাক্ষ্য। বিষ্ণুবাবুর কাছে রবীন্দ্রনাথের দান মার্জিত রুচি, শালীনতাবোধ ইত্যাদি। বিষ্ণুবাবু লিখেছেন, "কবি রোমান্টিকের পরিবর্তন-অভীপ্সা ও রোমান্টিক বিদ্রোহের তেজ ও পুনর্নির্মাণের শক্তি, হৃদয়বৃত্তির সূক্ষ্ম সৌকুমার্য ও পেলবতা তাঁরই দান। সৌন্দর্য-তত্ত্বের প্রথম পরীক্ষাতেই প্রয়োজন **নিছক** সৌন্দর্যচেতনা (বড় হরফ আমার) এই প্রাথমিক অঙ্গীকারও রবীন্দ্রনাথে হল প্রথম প্রতিভাত।"[১] বিষ্ণুবাবুর মতে রবীন্দ্র-প্রতিভা 'স্বয়ংসম্পূর্ণ'—প্রায় কোন প্রাকৃতিক (ভগবানের) মহাত্ম্যের মত। বলাবাহুল্য, বিষ্ণুবাবুর এই সার্টিফিকেটে রবীন্দ্রনাথের মর্যাদা হানি করা হয়েছে। সামন্ততান্ত্রিক প্রভুত্ববাদের বিরুদ্ধে, বুর্জোয়া সমাজের অন্তর্নিহিত গলদের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের প্রবল বিদ্রোহকে তুচ্ছই করা হয়েছে।

১, উদ্ধৃতাংশে কিছু মুদ্রণ-প্রমাদ স্পষ্টতর। উক্ত সমালোচনাটি পরবর্তীকালে বিষ্ণু দে-র 'সাহিত্যের ভবিষ্যৎ' গ্রন্থে 'রাজায়-রাজায়' নামে সংকলিত হয়েছে। দ্র. প্রথম সিগনেট সংস্করণ, পৃঃ ৫২। —সঃ

বুর্জোয়া সমালোচনার দুর্বলতাই এখানে—তাঁরা নিজেদের অতীতের বিপ্লবী ঐতিহ্যকে সাহিত্যের আয়নায় দেখতে ভয় পায়। সেই জন্য তারা শেকসপীয়রের বিদ্রোহকে উড়িয়ে দিয়ে, মহাকবিকে ভ্রষ্ট করে দেবতার আসন দিয়ে শূন্যচারী করে রাখেন! বুর্জোয়া সমালোচনার আর একটি দিক হল, আসল কথা এড়িয়ে খুটিনাটি সমালোচনায় ব্যাপৃত থাকা। বিষ্ণুবাবুর উক্ত সমালোচনাতেও দেখি বাক্যগঠনের ভ্রান্তি নিয়ে বিরক্তিকর দীর্ঘ আলোচনা; দেখি ধান ভানতে শীবের গীত—'মানিকবাবুদের' বিরুদ্ধে অকারণ গঞ্জনা।

বুর্জোয়াদের অপর ধর্ম মিথ্যাচার। বিষ্ণুবাবু ব্যতিক্রম নন। সেই জন্যই নিজের বুর্জোয়া বক্তব্যকে মার্কসবাদী বলে চালাবার উৎসাহের আধিক্যে এঙ্গেলসের বাক্যাংশ অসাধুভাবে ব্যবহার করতেও বিষ্ণুবাবুর বাধেনি। এঙ্গেলসের যে উদ্ধৃতিটির কথা আমি বলছি সেটি নিম্নরূপ:

"As to the values of idiology which sour still higher in the art, religion, philosophy etc. these have a prehistoric stock found already in existence and taken over in the historic period of what we should call bunk."[১] (লিটারেচার এণ্ড আর্ট, মার্কস ও এঙ্গেলস, পৃঃ ৬)। বিষ্ণুবাবু কিন্তু prehistoric-এর পরই ফুলস্টপ বসিয়ে পূর্ণচ্ছেদ টেনেছেন। দর্শনের দলীয়তা প্রসঙ্গে এই নিবন্ধটিরই পরের অংশ আমি পূর্বে উদ্ধৃত করেছি। এ-থেকেই দেখা যাবে যে, এঙ্গেলস যে অর্থে এটা লিখেছিলেন.বিষ্ণুবাবু ঠিক তার বিপরীত অর্থে উদ্ধৃতিকে ব্যবহার করেছেন। আর এই ভাবেই বিষ্ণুবাবু তাঁর অ-মার্কসীয় বক্তব্যকে মার্কস-এঙ্গেলসের উদ্ধৃতি ভূষিত করেছেন।

বিষ্ণুবাবুর এই মহান প্রচেষ্টার তাৎপর্য খুবই সোজা। আজকের বাজারে 'আর্টের জন্যই আর্ট' এই বস্তাপচা বুলির কাটতি হওয়া সম্ভব নয়—তাই মার্কসীয় চিনির প্রলেপ দিয়ে এই রদ্দি মাল কাটাবার চেষ্টা। কিন্তু এই ধরনের সৎ প্রচেষ্টা এই নতুন নয়—মার্কসবাদকে ভ্রষ্ট করার এবংবিধ প্রচেষ্টা সম্পর্কে লেনিন বলেছিলেন:

"তাঁদের (বিপ্লবীদের) মৃত্যুর পর অবশ্য সাধারণত তাঁদের নির্বিষ সাধু

১. উদ্ধৃতাংশে মুদ্রণ-প্রমাদ এবং শব্দের পার্থক্য লক্ষ্যণীয়। দ্র. সাহিত্যের ভবিষ্যৎ; ঐ, পৃঃ ৬৩।—সঃ

বানিয়ে ফেলার চেষ্টা হয়, সেইভাবে তাঁদের গুণগান করা হয় এবং নিপীড়িত শ্রেণীর প্রতি 'সান্ত্বনা' এবং ধোঁকা দেবার উদ্দেশ্যে খানিকটা অপ্রাকৃত সম্ভ্রমের সঙ্গে তাঁদের নাম ব্যবহার করা হয়। আবার সেই সঙ্গে সঙ্গেই তাঁদের বিপ্লবী তত্ত্বের সারমর্মকে নির্বীর্য ও বিকৃত করে তার বিপ্লবী ধার ভোঁতা করে দেবার চেষ্টা হয়।" (স্টেট এণ্ড রেভল্যুশন, পৃঃ ১)

যতই নিরপেক্ষতার ভান করুন না না কেন, বিষ্ণুবাবু তৃতীয় পক্ষ নন. তিনি শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধ পক্ষ, তিনি একজন বুর্জোয়া ভাববাদী। এই জন্যই তিনি মার্কসবাদ সংশোধন করার চেষ্টা করেন, মার্কসবাদের বৈপ্লবিক ধার ভোঁতা করে দেবার প্রয়াস পান। এই জন্যই যান্ত্রিক সমালোচনার বিরুদ্ধে তাঁর (বুদ্ধদেব বসুর) প্রতিবাদ 'বিষ্ণুবাবুর সশ্রদ্ধ বিবেচনার যোগ্য। এই জন্যই শুধু অচিন্ত্য নয় এলিয়টের মধ্যেও তিনি জীবনের অঙ্গীকারের স্পষ্ট ছন্দ দেখতে পান। এই জন্যই তাঁর কলা-কৌশল কাব্য থেকে জনগণকে বিচ্ছিন্ন করে রাখার কৌশল। বিষ্ণুবাবু এবং তাঁর সমধর্মীরা নানা রকমের ইজমের ধুয়োস ফর্মের পাঁচিল তুলে সাহিত্য-কাব্য-সঙ্গীতকে জনসাধারণের নিষিদ্ধ এলাকা করে রাখার জন্য চেষ্টিত। আর এই জন্যই লেনিন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছিলেন—ফিউচারইজম, কিউবইজম ও অন্যান্য ইজমের ফলকে আমি শিল্প-প্রতিভার শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন বলে বিবেচনা করতে পারি না। (লেনিন. নঅ আর্ট এণ্ড লিটারেচার, এ. ভি. লুনাচারস্কি সম্পাদিত, পৃঃ ৪২)

'ব্যক্তিনিরপেক্ষ সাহিত্য বিচার,' 'দলীয়তাহীন বুদ্ধি,' 'নিছক সৌন্দর্য-চেতনা' ইত্যাদি বুলির মধ্য দিয়ে বিষ্ণুবাবু সেই অতি পুরাতন বুর্জোয়া তত্ত্ব—আর্টের জন্যই আর্ট—পরিবেশন করেছেন। সেই জন্যই বুদ্ধদেব বসু উপলক্ষ্য হলেও, বিষ্ণুবাবুর আক্রমণের লক্ষ্য মানিকবাবুরাই। বিষ্ণুবাবু মার্কসিস্ট নন, মার্কসবাদের শিবিরে প্রতিক্রিয়ার ট্রোজান অশ্ব।

'সৃষ্টির স্বাধীনতা,' 'শিল্প-সাহিত্যে আজ ব্যক্তি রচয়িতাই প্রাথমিক,' 'এই অনেক মানুষের পথে আজও ওঅন-ওয়ে ট্রাফিকের নিয়ম চলে না—কি দক্ষিণে কি বামে' ইত্যাদি কথার ফুলঝুরি কেটে বিষ্ণুবাবু যা দাবী করছেন, তা হল সাহিত্যিক Lassez fare, যা খুশী করার স্বাধীনতা। লেনিনের ভাষায়ই বিষ্ণুবাবুদের এই দাবীর জবাব দেব—"বুর্জোয়া স্বাতন্ত্র্যবাদী ম'শায়েরা, আমরা আপনাদের জানিয়ে দিতে বাধ্য হচ্ছি যে আপনাদের নির্বিশেষ

স্বাধীনতার বুলি ভাওতা ছাড়া আর কিছুই নয়।" (লেনিন অন আর্ট এণ্ড লিটরেচার, পৃঃ ৪৬)

জনগণ বিষ্ণুবাবুর কাছে 'এ্যাবস্ট্রাকসন' হতে পারে—কিন্তু জনগণ কারোরই পকেটবুকের সম্পত্তি নয়—বিষ্ণুবাবু, বুদ্ধদেব বা সজনীচক্রের তো নয়ই এমন কি 'মানিকবাবুদের'ও নয়। বরং 'মানিকবাবুরাই' জনসাধারণের সম্পত্তি। "আর্ট জনসাধারণের সম্পত্তি।" জনতার মর্মস্থলে আর্টের শিকড় প্রসারিত করতে হবে। তাঁদের ভাবনা-কামনা-অনুভূতিকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে, তাঁদের উন্নীত করতে হবে।

সাহিত্যের যে একটা 'চালনা শক্তি' আছে বিষ্ণুবাবুও তা স্বীকার না করে পারেন নি। আর এই জন্যই তো শ্রেণীবিভক্ত সমাজে সাহিত্য কোন না কোন শ্রেণীর হাতিয়ার হয়ে ওঠে। সেই জন্যই লেনিন বলেছিলেন,—"সাহিত্য-ক্ষেত্রে অতি-মানবদের পতন হোক! সাহিত্যকে হতে হবে শ্রমিক আন্দোলনের অংশ, সমগ্রের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। শ্রমিকশ্রেণীর সচেতন পুরোগামীরা সমগ্র সমাজ যন্ত্রে যে গতির সঞ্চার করেছেন সাহিত্য হবে তার অঙ্গীভূত।" (লেনিন অন আর্ট এণ্ড লিটারেচার, পৃঃ ৪৭)

কিন্তু মানিকবাবু এতখানিও দাবী করেন নি। মানিকবাবু শুধু প্রশ্ন করেছেন: "তে-ভাগা আন্দোলন নাই বা এল গল্পে…মুখ বুজে অত্যাচার না সয়ে গিয়ে চাষী মেয়ে পুরুষ আজ সচেতন ভাবে সংগ্রাম করে অত্যাচারের বিরুদ্ধে, এই সত্যকে গল্পের মধ্যে কোন্ আর্টের ধামায় চাপা দেওয়া চলবে?" (পরিচয়, ফাল্গুন, ১৩৫৪)। মানিকবাবুর এই অতিমৃদু প্রশ্নেই বিষ্ণুবাবু সাহিত্যিক স্পেশ্যাল পাওয়াসে'র খেল দেখতে পেয়েছেন—যেখানে তাগিদটা আদর্শগত দায়িত্বের রজতখণ্ডের নয় সেখানে এটা স্বাভাবিক। রূপোর শিকল গলায় পরে বুর্জোয়াদের পোষা কুকুর বনাই তো দালাল সাহিত্যিকদের কাছে স্বাধীনতার চরম মার্গে বিচরণ।

সৃষ্টির স্বাধীনতা নিশ্চয়ই থাকবে, 'কোন বিশেষ দলের' রাজনৈতিক থিসিসকে কাব্যের মধ্যে প্রমাণ করার জন্য কেউই ফরমাস দিচ্ছে না, গল্পের কোন বিশেষ ফর্মুলা তৈরীরও প্রশ্ন আসে না। সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণী আজ জীবনপণ সংগ্রামে লিপ্ত। এই সংগ্রামে সাহিত্যের হাতিয়ার তার প্রয়োজন। সংগ্রামী শ্রমিকশ্রেণী তাই ডাক দিয়েছে—

"আমাদের সাহায্য করুন; শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি কমিণ্টার্নকে সাহায্য করুন—সংগ্রামে ব্যবহারের জন্য কবিতা, উপন্যাস, ছোটগল্পের আকারে আমাদের হাতে তুলে দিন সাহিত্যের হাতিয়ার।" (ডিমিট্রভ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত, পৃঃ ১৮১)

না, এ সাহিত্যিক স্পেশ্যাল পাওয়ার্স নয়—এ হল সাহিত্যিকদের প্রতি সংগ্রামী শ্রমিকশ্রেণীর আহ্বান। কোন শিল্পী যদি নিজেকে মার্কসবাদী বলে মনে করেন তাহলে শোষিত মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, সংগ্রামকে রূপায়িত করা তার পবিত্র কর্তব্য। মার্কসবাদী দর্শনের প্রতি আপনার নিষ্ঠা যদি আন্তরিক হয় তা হলে আপনার লেখনী নিয়ে এসে দাঁড়ান রণক্ষেত্রে—আপনার দায়িত্ব পালন করুন।

কিন্তু শুধু মার্কসবাদী কেন, প্রত্যেকটি স্বাধীনতাকামী শিল্পীর উপরই আজ এই দায়িত্ব বর্তেছে। কারণ শ্রেণীসমাজে, ক্ষয়িষ্ণু বুর্জোয়া সভ্যতায় শিল্প-সাহিত্য আজ সত্যই শৃঙ্খলিত। মানুষের মনোজগতের উপরও উঁচিয়ে আছে বেয়নেট—ধর্মের, আইনের, বে-আইনি স্পেশ্যাল পাওয়ার্সের। তাই "বুর্জোয়া প্রভাবিত স্বাধীন সাহিত্যের ভাওতার বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি উৎসর্গীকৃত মতবাদের স্বাধীন সাহিত্য প্রয়োজন।" (লেনিন : পূর্বোক্ত গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত, পৃঃ ৪৭)। কারণ শ্রমিকশ্রেণীই সেই বিপ্লবের অগ্রদূত যা শ্রেণী সমাজের অবসান ঘটাবে, শিল্প-সাহিত্যকে করবে শৃঙ্খলমুক্ত। যাঁরা মার্কসবাদী তাঁরা এই বিপ্লবীশ্রেণীর অংশ সুতরাং তাঁদের দায়িত্ব আরও বেশি।

মার্কসবাদ নৈয়াকিক তর্কের আসর নয়, মার্কসবাদ হল Guide to action. সুতরাং কর্মের কষ্টিপাথরে যাচাই হয় কে মার্কসবাদী আর কে নয়—রালফ্ ফক্স, কডওয়েল আর আজকের দিনে হাওয়ার্ড ফাস্ট প্রভৃতি শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি সাহিত্যিক কর্তব্য পালন করেই নিজেদের মার্কসবাদের প্রমাণ দিয়েছেন—বাগাড়ম্বরে নয়

বিষ্ণুবাবুর লেখায় এই দায়িত্ব পালনের আগ্রহ তো ফোটেই নি বরং শিল্প-বিচারে মার্কসীয় নিয়মকানুন প্রয়োজ্য নয় বলে তিনি শ্রমিকশ্রেণীর সমালোচনাকে নিরস্ত্র করার প্রয়াস পেয়েছেন। "সমাজ-বিপ্লবের আগে সাহিত্য-বিপ্লব কল্পনা বিলাস মাত্র" (কেন লিখি, পৃঃ ৬৪) বলে সাহিত্যে সংগ্রামী প্রচেষ্টাকে হতাশায় ডুবিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন এবং বুর্জোয়া

উন্মার্গগামিতার ‘পবিত্র’ অধিকার রক্ষার জন্য সাহিত্যের স্বাধীনতা দাবী করেছেন। সংগ্রামী সাহিত্য রচনার দাবীকে দেখেছেন স্পেশ্যাল পাওয়ার্সে'র খেল হিসাবে। লেনিন এই তথাকথিত মার্কসবাদীদের সম্পর্কে বলেছিলেন :

“আমি বেশ কল্পনা করতে পারছি, একদল বিকারগ্রস্ত বুদ্ধিজীবী এবংবিধ তুলনায় (সাহিত্যক্ষেত্রে মহানাববের পতন হোক শীর্ষক উদ্ধৃতি দ্রষ্টব্য) ক্ষেপে গিয়ে অধঃপতনের চরম বলে (?) তুলবেন। তাদের ধ্বনি হবে, আইডিয়ার স্বাধীন সংগ্রামের উপর, সমালোচনার স্বাধীনতা, সাহিত্য সৃষ্টির স্বাধীনতার উপর, অমলাতান্ত্রিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি। বস্তুত, এর মধ্যে দিয়ে তাঁরা বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীর স্বাতন্ত্র্যবাদেরই পরিচয় দেবেন।”

এই কথা লেনিন বলেছিলেন ১৯০৫ সালে—রুশিয়ায় সোভিয়েটতন্ত্র তখনও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ভারতবর্ষের মত রুশিয়ার মার্কসবাদীরাও তখন সংগ্রাম করছেন নূতন সমাজে ব্যবস্থা গঠনের প্রয়াসে। সুতরাং “মানিকবাবুরা মনে করেন বাঙালী ও সোভেয়েট মন একই ছন্দে চলছে” বিষ্ণুবাবুর এই জয়প্রকাশী গুলিও লক্ষ্যভ্রষ্ট।

বিষ্ণুবাবুদের ছদ্মবেশী প্রতিক্রিয়াকে ব্যর্থ করে প্রগতিবাদীদের আজ অগ্রণী হতে হবে—বুর্জোয়াদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে সাহিত্যের অস্ত্র তুলে দিতে হবে শ্রমিকশ্রেণীর হাতে। ভাবপ্রকাশের জন্য উপযুক্ত ফর্ম আবিষ্কার করে আপ্রাণ প্রয়াস ও নিষ্ঠায় সে অস্ত্রকে শাণিত করে তুলতে হবে—যেন তা শত্রুর মুখোস ছিঁড়ে দিতে পারে—যেন সে-শিল্প সে-সাহিত্য বেয়নেট হয়ে বাজে শত্রুর বুকে।*

* মার্কসবাদী, প্রথম সংকলন, অক্টোবর, ১৯৪৮, পৃঃ ১৩৭-১৫৩. ; উর্মিলা গুহ সাহিত্যিক-- সাংবাদিক প্রদ্যোৎ গুহ-র ছদ্মনাম।—সঃ

বাংলা প্রগতি সাহিত্যের আত্মসমালোচনা / প্রকাশ রায়

"দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসানে সমাজবাদের শক্তিবৃদ্ধি হয়েছে। ইওরোপের অনেকগুলি দেশেই সমাজবাদ প্রতিষ্ঠার প্রশ্ন আশু কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। নানাজাতের সাম্রাজ্যবাদীদের এটা মনঃপূত নয়। তারা সমাজবাদকে ভয় করে। আমাদের সমাজবাদী দেশ সমস্ত প্রগতিশীল মানুষের আদর্শস্থল—তাকে তারা ভয় করে। সাম্রাজ্যবাদী এবং তাদের দার্শনিক ভৃত্যেরা, তাদের বশংবদ সাহিত্যিক এবং সাংবাদিক, তাদের রাজনীতিক এবং কূটনীতিকেরা আমাদের দেশের বিরুদ্ধে কুৎসা, সমাজবাদ সম্পর্কে ভুল ধারণা সৃষ্টি করতে, সমাজবাদের কুৎসা গাইতে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে। এই অবস্থায় সোভিয়েট লেখকের কর্তব্য, **শুধু যে প্রত্যেকটি আঘাতের প্রত্যাঘাত করা তাই নয়, পরন্তু সাহসের সঙ্গে গলিত বিকৃত বুর্জোয়া সংস্কৃতিকে অস্বীকার করা, তাকে আক্রমণ করাও তাদের কর্তব্য**।

(লেনিনগ্রাদ লেখকদের সভায় কমরেড জ্‌দানভের বক্তৃতা, ১৯৪৬)

ভারতীয় মার্কসবাদীদের আত্মসমালোচনার বিবরণীতে দেখা গেছে, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সংস্কারবাদের রূপ ছিল বুর্জোয়া নেতৃত্বের লেজ ধরে চলা, পচা বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের সঙ্গে মার্কসবাদকে খাপ খাইয়ে নেওয়ার চেষ্টা। এই সংস্কারবাদ এত দীর্ঘকাল ধরে সংগোপনে তার ধ্বংসাত্মক কাজ করে গেছে যে তার সর্বনাশা প্রভাব বহুদূর পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হয়েছে—আন্দোলনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রকে কলুষিত করে গেছে। সংস্কৃতি আন্দোলনও এর ক্ষতিকর প্রভাব থেকে মুক্ত নয়। এ ক্ষেত্রে সংস্কারবাদের রূপ দাঁড়িয়েছে—বুর্জোয়া 'সংস্কৃতিবিদদের' কাছে নতি স্বীকার, বুর্জোয়াদের কলুষিত ঐতিহ্য সম্পর্কে মোহাচ্ছন্নতা ; এক কথায়, বুর্জোয়া ভাবাদর্শের কাছে আত্মসমর্পণ, বুর্জোয়াদের কলসীর কানার আঘাতের প্রত্যুত্তরে প্রেম বিলোবার প্রবৃত্তি। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সংস্কারবাদের

বিরুদ্ধে সংগ্রাম অনেকখানি এগিয়েছে বটে, কিন্তু সংস্কৃতি আন্দোলন থেকে সংস্কারবাদের ক্ষতিকর প্রভাব এখনও কাটেনি।

সমাজবাদের জন্য সংগ্রামে শিল্প-সাহিত্যের একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। কমরেড জ্দানভ বলেছেন :

"আমাদের সোভিয়েট রাষ্ট্র এবং পার্টি সোভিয়েট সাহিত্যের সাহায্যে যুব সমাজকে সাহস এবং আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ ও শিক্ষিত করতে পেরেছে বলেই সমাজবাদ প্রতিষ্ঠার পথের দারুণ বাধা-বিঘ্নকে অতিক্রম করা গেছে। জার্মান এবং জাপানীদের পরাজিত করা সম্ভব হয়েছে।"

(লেনিনগ্রাদ লেখকদের সভায় বক্তৃতা, ১৯৪৬)

উক্ত বক্তৃতাতে তিনি আরও বলেছেন, এর অন্যথা হলে গত মহাযুদ্ধে সোভিয়েট পক্ষের পরাজয়ই ঘটত।

লেখকদের ভূমিকা বিশ্লেষণ করে কডরেড ষ্টালিন বলেছেন, লেখকেরা হচ্ছেন "মানবাত্মার কারুকর্মী"।

শিল্প সাহিত্য সম্পর্কে এত গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে এই কারণেই যে, শ্রেণীবিভক্ত সমাজে শিল্প সাহিত্য শ্রেণী সংগ্রামের হাতিয়ার। যা নিয়ে শ্রমিকশ্রেণী লড়েছেন, লডবেন তাতেই যদি ঘুণ ধরে—তবে তা যে কি মারাত্মক তা সহজেই অনুমেয়।

সুতরাং সংস্কৃতি আন্দোলনের ক্ষেত্র থেকে, সংস্কারবাদদের মূল উচ্ছেদ করা, এই মুহূর্তের একটি অন্যতম প্রধান ও প্রাথমিক কর্তব্য। কিন্তু রোগ সারাবার আগে রোগটি কি তা জানা দরকার। তার উপসর্গগুলি নির্ণয় করা প্রয়োজন।

বাংলাদেশে নব্য-সংস্কৃতি আন্দোলনের অবিসংবাদী মুখপত্র প্রধানত 'পরিচয়'। 'অগ্রণী', 'লোকনাট্য' এবং আরও কয়েকটি ছোটখাটো পত্রিকা এই লড়াইয়ের অংশীদার। এর মধ্যে সরকারের অকৃপণ দাক্ষিণ্যে (!) সম্প্রতি 'লোকনাট্যে'র কণ্ঠ রুদ্ধ। প্রধানত গল্প-কবিতাই অগ্রণীর উপজীব্য, আর গল্প কবিতা এ প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নয়। সুতরাং অগ্রণী সম্পর্কে আমরা বর্তমানে মোটামুটি নীরবই থাকবো।

যাহোক, এই তিনটি পত্রিকাই নব্য-সংস্কৃতি আন্দোলনের ধারক ও বাহক— নব্য-সংস্কৃতি আন্দোলনের নেতৃবর্গ এবং কর্মীরা এই পত্রিকাগুলির পরিচালনা

ব্যাপারে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। এর মধ্যে 'পরিচয়'ই প্রধান। সুতরাং বর্তমান প্রবন্ধে 'পরিচয়ে'র আলোচনাই বেশী স্থান জুড়ে থাকবে।

গত কার্তিক মাস থেকে নব কলেবরে 'পরিচয়' প্রকাশিত হচ্ছে। আর এই পরিবর্তন শুধু বাহ্যিক নয়, এই রূপান্তরের পিছনে ছিল গুণগত পরিবর্তনের প্রতিশ্রুতি। এই রদবদলের উদ্দেশ্য ছিল এই যে, মার্কসবাদের পতাকাতলে সমবেত হয়ে 'পরিচয়' শুধু যে বুর্জোয়াদের প্রত্যেকটি আঘাতের প্রত্যাঘাত করবে তাই নয়, পরন্তু সাহসের সঙ্গে গলিত বিকৃত বুর্জোয়া সংস্কৃতিকে অস্বীকার করবে, আক্রমণ করবে—বুর্জোয়াদের গলিত সংস্কৃতির জঞ্জালকে বলিষ্ঠ বাহুতে সরিয়ে নব্য প্রাণবন্ত শ্রমিক সংস্কৃতি গঠনে "পরিচয়" হবে অগ্রণী, বুর্জোয়াদের কলুষিত মতবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে 'পরিচয়' হবে শ্রমিক শ্রেণীর হাতিয়ার।

সংস্কৃতি সংকটের রূপ

এইভাবে রূপান্তরিত পরিচয়ের প্রথম সংখ্যার (কার্তিক, ১৩৫৫) প্রথম প্রবন্ধ "সংস্কৃতির সংকট"। পরিচয় সম্পাদক গোপাল হালদার এই প্রবন্ধে "সংস্কৃতির সংকট" সম্পর্কে মনোজ বসু এবং তারাশঙ্করের বক্তব্যের 'জবাব' দিয়েছেন।[১]

মনোজবাবুর চোখে সংকটটা দেশ বিভাগ জনিত—পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার সংস্কৃতির উপর উর্দু ও হিন্দীর আক্রমণ। আর তারাশংকরবাবু সংকট আছে বলেই মানেন না। অর্থাৎ একজন সংকটকে চাপা দিতে চান আর অন্যজনের যুক্তি মূল সংকট থেকে জনতার দৃষ্টিকে বিক্ষিপ্ত কর। আর এঁদের দু'জনের যুক্তিই সংকট সমাধানের প্রচেষ্টাকে নিরস্ত্র করে, করে বিপথগামী। সুতরাং নব্য সংস্কৃতির পুরোধা হিসাবে মার্কসবাদীদের অবশ্য কর্তব্য এই যুক্তিজাল ছিন্ন করা। কিন্তু গোপালবাবু কি সে দায়িত্ব পালন করেছেন?

একটা বাংলা প্রবাদ মনে পড়ল :

কোন এক গৃহস্থ বাড়ীতে ভিক্ষুক এসেছে। ভিক্ষে দেওয়া হবে না বলে বাড়ীর বৌ তাকে ফিরিয়ে দিল। গৃহিণী তাই শুনে ফের ভিক্ষুককে ডেকে আনালেন। ভিক্ষুক ভাবল তবে বোধহয় ভিক্ষে পাওয়া যাবে। কিন্তু গৃহিণী বললেন—ও বাড়ীর বৌ, ভিক্ষে দেওয়া হবে কি না হবে তা বলবার অধিকার ওর নেই ; সে অধিকার আমার—আমি বলছি ভিক্ষে দেওয়া হবে না।

১. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের 'সংস্কৃতি পরিষদে' 'সংস্কৃতির সংকট' বিষয়ে ৬. ৯ .৪৮ তারিখের বিতর্কিত আলোচনায় জবাবে গোপাল হালদার ঐ প্রবন্ধটি রচনা করেন।—সঃ

গোপালবাবুর জবাবটা ঠিক এই রকমের। অর্থাৎ মনোজ বসু ও তারাশংকরের বক্তব্যের সঙ্গে গোপালবাবুর বক্তব্যের কোন তফাৎ নেই, পার্থক্যটা শুধু যুক্তির।

সংকট অস্বীকৃতির যুক্তি ভাববাদী তারাশংকর দিয়েছেন এই বলে যে, সংস্কৃতির মৃত্যু নেই, আর তা কোন শ্রেণী বিশেষেরও নয়। আর 'মার্কসপন্থী' গোপালবাবু লিখেছেন :

"বাঙালী সংস্কৃতির এ 'সংকট' আসলে সংকট নয়, বাঙালী সংস্কৃতির রূপান্তরের দাবী, বাঙালী মজুর-কৃষক-বুদ্ধিজীবীর বিপ্লবী সংস্কৃতিরূপে বিকাশোন্মুখ, বিকাশোন্মুখ তা পৃথিবীর অন্যান্য দেশের বিপ্লবী শ্রেণীর সংস্কৃতির সঙ্গে মানব মহীরুহের খণ্ডিত শাখায়।"*

খুবই চটকদার কথা। আপাতদৃষ্টিতে একে বিপ্লবী সিদ্ধান্ত মনে হলেও এ তারাশংকরেরই যুক্তি আর লড়াই এড়িয়ে যাবারই যুক্তি।

কারণ সংকট সত্যিই আছে। বুর্জোয়া সংস্কৃতির অবকাশ আরম্ভ হয়েছে—শ্রমিকশ্রেণীর সংস্কৃতি গড়ে উঠতে পারছে না। ধনিকের শোষণ শাসনে শ্রমিকশ্রেণী শিক্ষা ও সংস্কৃতির অধিকার থেকে বঞ্চিত—তার অন্তরের আবেগ তাই পুরোপুরি সাহিত্যভাত হতে পারে না। যেটুকুও বা হয় তার উপরও নেমে আসে শাসকের দণ্ড। শোষকের হিংস্র পৈশাচিক হস্ত করে তার কণ্ঠরোধ, বন্ধ হয় শ্রমিক-শ্রেণীর পত্র পত্রিকা, তার সাংস্কৃতিক মুখপত্র হয় রুদ্ধকণ্ঠ, রক্তাক্ত বর্বর হস্ত কেড়ে নেয় তাদের কণ্ঠের গান, তাদের জীবননাট্য। সংস্কৃতি বর্জিত বুর্জোয়া বর্বরেরা সমগ্র মানব সংস্কৃতির বিরুদ্ধেই সুরু করেছে সর্বাত্মক অভিযান। এই হিটলারী অভিযান এমন কি তাদের দীক্ষাগুরু রবীন্দ্রনাথকেও মার্জনা করে না। অন্যদিকে যে সব সংস্কৃতিবিদ শ্রমিকশ্রেণীর শিবিরে এসেছেন তাঁরাও পুরোপুরি শ্রেণীবিচ্যুত হয়ে শ্রমিক-শ্রেণীর সঙ্গে একাত্ম হতে পারেন নি, তাই তাঁরাও সে আবেগকে ভাষা দিতে পারছেন না। বুর্জোয়া শিল্পরীতি, বুর্জোয়া আঙ্গিক প্রগতিচিন্তাকে আড়ষ্ট করে দিচ্ছে, ব্যর্থ করে দিচ্ছে তার আবেদন; অথচ বুর্জোয়া সংস্কৃতি ভাণ্ডার শূন্য, দেয় তার কিছু নেই, আছে শুধু বিকৃতির

* উদ্ধৃতাংশে মূল রচনার দু-একটি শব্দ বর্জিত হয়েছে।

দ্র. পরিচয়, কার্তিক ১৩৫৫; পৃ: ২০।—সঃ

কদাকার—সংকট এই। অর্থাৎ বুর্জোয়া মতাদর্শ শিল্পের আঙ্গিক এবং রীতি সম্পর্কে বুর্জোয়া ধারণাই প্রগতি সাহিত্যকে পিছনে টেনে রাখছে। তাই সংকট সমাধানের পথ হল, বুর্জোয়া মতাদর্শের বিরুদ্ধে, সংস্কৃতির উপর বুর্জোয়া আক্রমণের বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রামের পথ। তাই বলছিলাম সংকটের অস্বীকৃতি আসলে লড়াই এড়িয়ে যাবারই যুক্তি।

লড়াই যাঁদের স্বার্থের পরিপন্থী, সংকটকে চাপা দিতে চান তাঁরাই। অর্থনৈতিক সংকটের অগ্নিগিরির উপর বসেও ট্রুম্যান তাই প্রমাণ করতে চান যে মার্কিন অর্থনীতি সমৃদ্ধির পথেই চলেছে—বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্রীরা পুঁজিবাদের সংকট নেই বলে চিৎকার করে আকাশ বাতাস মুখরিত করে তোলে। তাদের উদ্দেশ্য 'সংকট' নেই বলে ধোঁকা দিয়ে শ্রমিকশ্রেণীর ঘাড়ে সংকটের বোঝা চাপান। সংকট পুঁজিবাদের—সমাজবাদের নয়, বলে যদি কোন সমাজবাদী সংকটের দিকে পিছন করে থাকেন তাহ'লে তিনি পুঁজিবাদীদেরই সাহায্য করবেন। কারণ শ্রমিকশ্রেণী নিজের স্বার্থের অনুকূলে সংকটের সমাধান না করতে পারলে বুর্জোয়া শ্রেণী তাদের সমাধানের বোঝা চাপিয়ে দেবে জনগণের উপর।

কিন্তু সে চেতনা কোথায় গোপালবাবুর লেখায়? তিনি সংস্কৃতি রূপান্তরের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন—কিন্তু সে প্রতিশ্রুতি পূরণের অঙ্গীকার কোথায়? সে কি সংকটের অস্বীকৃতি? উটপাখীর মত মাথা গুঁজে থাকলেই কি ঘূর্ণীঝড় তাঁকে ক্ষমা করবে? মোটেই না। এই সংকট অতিক্রম করতে না পারলে সংস্কৃতির ভবিষ্যত অন্ধকারাচ্ছন্ন—বুর্জোয়া 'সংস্কৃতি'র গলিত শবগন্ধ ব্যর্থ করে দেবে মানুষের সংস্কৃতির জয়যাত্রাকে। অন্ধভাবে ঘুরপাক খাবে অধ্যাত্মবাদ, অনিশ্চয়তাবাদ, ধোঁকাবাদের ঘূর্ণীপাকে। শ্রমিকশ্রেণীর সচেতন প্রচেষ্টাই পারে এই সংকটকে অতিক্রম করতে—মানব সংস্কৃতির উত্তরাধিকার তাদেরই। নব্য সংস্কৃতির ভগীরথ তাই শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রণী অংশ মার্কস্‌বাদীরা—বিকৃতির জটাজাল থেকে মুক্ত করে নব্য প্রাণবন্ত সংস্কৃতির ধারা একমাত্র তারাই প্রবাহিত করতে পারেন। সংস্কৃতির রূপান্তর মানবিক প্রচেষ্টারই প্রসাদ। বুর্জোয়া বিকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রামের গর্ভেই হবে নব্য-সংস্কৃতির উদ্বোধন। সংকট নেই বলে গোপালবাবু এই সংগ্রামকেই অস্বীকার করেছেন।

আবার অন্যদিকে মনোজবাবুর যুক্তিও তিনি মেনে নিয়েছেন—অর্থাৎ মেনে

নিয়েছেন, সংকট যা আছে তা ঐ দেশ-বিভাগ জনিত—বাংলা সংস্কৃতির উপর হিন্দী-উর্দুর আক্রমণ। হিন্দী-উর্দুর আক্রমণে বাংলা সংস্কৃতির বিপদের আলোচনাই তাঁর প্রবন্ধের অধিকাংশ স্থান জুড়ে আছে—যদিও এটা একটা নিতান্ত গৌণ দিক।

অবশ্য এ কথা ঠিকই, বুর্জোয়া শ্রেণীর মধ্যে যে অংশ প্রবল তারা তাদের 'সংস্কৃতি'কে অন্যান্য জাতীয় ইউনিটের উপর চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করে—এ দেশেও তার সূচনা দেখা যাচ্ছে। কিন্তু এ প্রচেষ্টা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থও হয়, যেমন ব্যর্থ হয়েছিল প্রাক্-বিপ্লব রুশ সাম্রাজ্যে রুশীয়-করণের প্রচেষ্টা। ব্যর্থ হবে এ দেশেও—তার সূচনাও দেখা যাচ্ছে পূর্ব বাংলার জনতার প্রতিরোধে, পশ্চিম বাংলার জনসাধারণের ধূমায়িত বিক্ষোভে। কিন্তু জনশক্তির এই জাগরণ সম্পর্কেই রয়েছে গোপালবাবুর অনাস্থা। আর সেই জন্যই তিনি লিখতে পারেন, "কতকটা চাকরীর প্রলোভনে, কতকটা শাসকদের পীড়নে, কতকটা বাঙালীর সংস্কৃতির প্রতি মমতার অভাবে, কতকটা পশ্চিম বাংলার সংস্কৃতিধারীদের সংস্কৃতগন্ধী বাড়াবাড়ির প্রতিক্রিয়ায়—আর সর্বোপরি তাদের ইসলামিক রাষ্ট্র গঠনের মোহে পূর্ব বাংলার মুসলমানদের পক্ষে বাংলা ভাষার উপর উর্দুকে স্থান দেওয়া অসম্ভব নয়।"[১] তিনি মনে করেন, জওহরলালজীর সামনে মুখ খোলবার সাহসও নেই পশ্চিম বাংলার 'শিক্ষিত সমাজের'। তাঁর চেতনাকে আচ্ছন্ন করে আছে শাসক শ্রেণীর কার্যকলাপ—জনসাধারণকে তিনি মনে করেন শাসক শ্রেণীর রাজনৈতিক দাবাখেলার ঘুঁটি। তাই তিনি লেখেন, "...শিল্প সৃষ্টিতে বা দর্শন বিজ্ঞানের অনুশীলনেই বা দু' বাংলা একত্রে চলবে কেন—সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় শাসন-শক্তি কেবলই যদি একদিকে জন-জীবনকে বিভক্ত করে রাখে, অন্যদিকে ভিন্ন জীবনাদর্শ তাদের বিভ্রান্ত করে?"[২]

অর্থাৎ সমস্যাকে তিনিও দেখেছেন তথাকথিত শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টিতে—'জীবন-যাত্রায় যারা বন্দী ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার নাগপাশে আর মানসিক ক্ষেত্রে যারা বুর্জোয়া সংস্কৃতিতে বিমুগ্ধ'—মার্কস্‌বাদীর দৃষ্টিতে নয়। তাই এমন কি সাম্প্রদায়িকতাগন্ধী সিদ্ধান্তও তিনি করতে পারেন—ভাষাগত এই সংকটকে

১. উদ্ধৃতাংশে মূল রচনার পাঠ যথাযথ অনুসৃত হয় নি।
দ্র. পরিচয়, কার্তিক ১৩৫৫, পৃঃ ৪।—সঃ

২. ঐ, পৃঃ ৫-৬।—সঃ

তিনি দেখেন হিন্দু-মুসলমানের সমস্যা হিসাবে—আসলে যা শ্রেণীগত সমস্যা। তাই তিনি অবলীলাক্রমে সিদ্ধান্ত করেন, পূর্ব বাংলার বাঙালী হিন্দুর পক্ষে বাঙালী সংস্কৃতিতে আর কোন বড় দান যোগান সম্ভব হবে না। কারণ, তার মেরুদণ্ড ভেঙে গিয়েছে—আর মুসলমানদের তো বাঙালী সংস্কৃতির প্রতি মমতাই নেই।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে গোপালবাবুর এই প্রবন্ধে মনোজ বসু বা তারাশংকরের জবাব নেই—ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আছে তাঁদের মতের সমর্থন। পূর্বেই বলেছি, তাঁদের এই যুক্তি সংকট সমাধানের প্রচেষ্টাকে নিরস্ত্র করে, করে বিপথগামী। গোপালবাবু এই অপপ্রচেষ্টারই হাতিয়ার বনেছেন। আদর্শগত সংগ্রামই গোপালবাবুর এই ট্র্যাজেডির মূল।

গোপালবাবু পা দিয়েছেন শ্রমিকশ্রেণীর শিবিরে ঠিকই; কিন্তু মাথা রয়ে গেছে বুর্জোয়া শিবিরেই। তাই গোপালবাবু এই প্রবন্ধে বুর্জোয়া রাজনীতিকদের সম্পর্কে যতখানি নির্মম হতে পেরেছেন—এই রাজনীতিকদের সাংস্কৃতিক মুখপাত্রদের সম্পর্কে তার সিকিমাত্র কঠিন হতে পারেন নি। নেহরু-প্যাটেল-কিরণ-বিধানচন্দ্রকে গোপালবাবু সঙ্গতভাবেই ব্যঙ্গ বিদ্রূপের তীব্র কষাঘাতে জর্জরিত করেছেন, কিন্তু তারাশংকরের 'ফিউডাল আধারের মোহ' এবং বনফুলের 'ন্যাশনালিজমের প্রতারণা'র উল্লেখ করেছেন মাত্র একবার, তাও বন্ধনীর মধ্যে ক্ষীণ কণ্ঠে। এ কোন আকস্মিক ঘটনা নয়, বুর্জোয়া ঐতিহ্যের মোহ। বুর্জোয়া ভাবধারা তাঁর চেতনাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে বলেই বুর্জোয়া সংস্কৃতিবিদদের সম্পর্কে তাঁর লেখনী শাণিত হয়ে ওঠে না, সে সময় তাঁর কণ্ঠ ক্ষীণ হয়ে আসে। অথচ এই সংস্কৃতি আন্দোলনই তাঁর সংগ্রাম ক্ষেত্র। এখানকার শত্রুদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ না করে সাধারণভাবে সরকারের রাজনৈতিক সমালোচনা করা আসলে সংগ্রাম এড়িয়ে যাবারই একটা কায়দা। এই আস্ফালনে বীরত্ব কিছু নেই, আসলে তা সংগ্রাম বর্জন।

তাই গোপালবাবুর জবাব বুর্জোয়া যুক্তির কাছেই আত্মসমর্পণ—তাঁর সিদ্ধান্ত আদর্শগত সংগ্রাম বর্জনেরই সিদ্ধান্ত।

ঐতিহ্য বিলাস

কার্তিক সংখ্যার আর একটি প্রবন্ধ নরহরি কবিরাজের 'বিবেকানন্দের মত ও

পথ'।[১] এই প্রবন্ধে বিবেকানন্দের ভূমিকা বিশ্লেষণ করে তিনি লিখেছেন :

"প্রথমেই বলতে হয়, যুগধর্মের প্রতি সহানুভূতি বিবেকানন্দের মনের শ্রেষ্ঠ বৃত্তি। তাঁর ইতিহাসবোধ, তাঁর গণতন্ত্রবোধ, তাঁর প্রজাশক্তির উপর বিশ্বাস—তাঁর সচেতন ও প্রগতিশীল মনের নির্ভুল পরিচয় দেয়। ফরাসী বিপ্লবের নায়ক রোবস্পীয়ার সম্পর্কে তাঁর উচ্চ ধারণা, কলম্বিয়াকে (আমেরিকা) স্বাধীনতার পীঠভূমি বলে তাঁর সম্বোধন তাঁর যুগধর্মী মনের আর এক বলিষ্ঠ পরিচয়।"[২]

অর্থাৎ নরহরিবাবুর মতে বিবেকানন্দ সে যুগের প্রগতিবাদীদের পুরোধা। বিবেকানন্দের 'সচেতন প্রগতিশীল মনের নির্ভুল পরিচয়' কি করে পেলেন—নরহরিবাবু তার 'আসল কথাটিও' বেশ পরিষ্কার করেই বলেছেন পৃষ্ঠান্তরে। তা হল এই :

আসল কথা, গণতান্ত্রিক জীবনধর্মের প্রতি ঐকান্তিক আগ্রহ, প্রজাশক্তির উপর বিশ্বাস ও স্বেচ্ছাতন্ত্রের প্রতি বৈরাগ্য বিবেকানন্দের মনে বিরাট আসন জুড়ে বসেছিল।[৩]

কিন্তু বিবেকানন্দের কার্যকলাপ সম্পর্কে নরহরিবাবু অন্যত্র লিখেছেন :

"তবে বিবেকানন্দের মনের গণতান্ত্রিকতা ও স্বাদেশিকতা বরাবর প্রকাশ পায় ধর্মের ভাষায়। বঙ্কিমের মত বিবেকানন্দও সে দিনের রাজনীতিকে কটাক্ষ করতেন মিথ্যা বাগাড়ম্বর বলে। রামমোহনের মত তিনিও জাতির অসন্তোষকে, 'বিক্ষোভকে' প্রকাশের অপেক্ষাকৃত নিরাপদ অথচ বলিষ্ঠ রাস্তা বলে বেছে নেন ধর্মান্দোলনকে'।"[৪]

এ রকম হল কেন ? নরহরিবাবু দেখিয়েছেন :

"কিন্তু এই ইতিহাসবোধ, এই অন্তর্দৃষ্টি থাকা সত্ত্বেও বিবেকানন্দের চিন্তাধারা অধ্যাত্মবাদের অন্ধগলিতে আত্মপ্রকাশের চেষ্টা অনেকাংশে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে যায়। পরাধীনতার অভিশাপে আবেদন নিবেদনের পথে রাজনীতির ফুসফাসের সংকীর্ণতায় বিবেকানন্দের প্রতিভা ও স্বাধীনতাস্পৃহা বোধহয় আড়ষ্ট হয়ে থাকতে চায় নি। তাই তা অন্যপথে আত্মপ্রকাশের সুযোগ খুঁজেছে—যে পথে

১. দ্র. পরিচয়, কার্তিক ১৩৫৫, পৃঃ ৩১-৪২। —সঃ

২. ঐ, পৃঃ ৩৫। —সঃ

৩. ঐ, পৃঃ ৩৬। —সঃ

৪. ঐ, পৃঃ ৪০। —সঃ

শাসকের দণ্ড উদ্যত নাই। সেখানে বহিঃপ্রকাশের স্বাধীনতা অপেক্ষাকৃত প্রবল।"[১]

'লক্ষ্যভ্রষ্ট' বিবেকানন্দ হননি মোটেই—বিবেকানন্দের লক্ষ্যটাই অধ্যাত্মবাদ। লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছেন নরহরিবাবু নিজে মার্কসবাদের পথ থেকে—তাঁর এবংবিধ যুক্তি থেকেই এই আসল কথাটা পরিষ্কার হয়ে ওঠে। নইলে অবশ্যই প্রশ্ন উঠত, বিবেকানন্দের এই 'নিরাপদ অথচ বলিষ্ঠ রাস্তাটি' আসলে কার রাস্তা? কেন এ পথে 'শাসকের দণ্ড উদ্যত নাই'? এ পথে শাসকের দণ্ড উদ্যত ছিল না এই কারণেই যে, বিবেকানন্দ রাজনীতিকে কটাক্ষ করতেন 'মিথ্যা বাগাড়ম্বর' বলে, তাঁরা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বিক্ষোভকে চালিত করতেন ধর্ম-সংস্কারের বিপথে। এ পথ নিরাপদ হবে না তো, হবে কোন্ পথ?

বিশেষ বিশেষ ঐতিহাসিক অবস্থায় ধর্ম আন্দোলনও প্রগতিশীল হয়ে উঠতে পারে তা ঠিক, কিন্তু তখন সে ধর্মের পথ আর নিরাপদ থাকে না—'শাসকের দণ্ড' তখন ধর্মের বিরুদ্ধেই উদ্যত হয়। কারণ, ধর্ম আন্দোলন তখন হয়ে ওঠে রাজশক্তির বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ, যেমন হয়েছিল জার্মানীর কৃষক বিদ্রোহে। অর্থাৎ ধর্ম তখন জনসাধারণকে রাজনীতি থেকে দূরে সরিয়ে রাখে না, উদ্বুদ্ধ করে রাজশক্তির বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, বিবেকানন্দের এই 'নিরাপদ অথচ বলিষ্ঠ' রাস্তাটি—শাসক শ্রেণীকেই নিরাপদ করে। এই 'বলিষ্ঠ' পথটি প্রতিক্রিয়ারই পথ। জন-বিক্ষোভকে বিপথগামী করার জন্য শাসক শ্রেণী ধর্মকে, এ ভাবেই ব্যবহার করে থাকে। লেনিনের Religion is the opium of the people (জনতাকে ঘুম পাড়িয়ে রাখার মাদক দ্রব্যই ধর্ম) কথাটির যদি কোন তাৎপর্য থাকে তবে তা এই।

বুর্জোয়া ঐতিহ্যের মোহে 'লক্ষ্যভ্রষ্ট' না হলে নরহরিবাবুও তা দেখতে পেতেন। তা হ'লে বিবেকানন্দের যুগের রাজনৈতিক ইতিহাসের বর্ণনা দিতে গিয়ে বুর্জোয়া ঐতিহাসিকদের মত ভারতের রাজ রাজড়াদের বৃটিশের চক্রান্তে ফকির হওয়া বা পশ্চিমী সভ্যতার রাজধানীতে বৃটিশ প্ল্যান্টার ও বণিকদের

---

১. উদ্ধৃতাংশে মূল রচনার পাঠ যথাযথ অনুসৃত হয় নি।
দ্র. ঐ, পৃঃ ৪২। —সঃ

পৈশাচিক আক্রমণে নিরীহ কৃষক ও তাঁতীদের দলে দলে মরতে বসাটাই দেখতেন না—জনতার প্রতিরোধটাও তাঁর চোখে পড়ত।

বিবেকানন্দের যুগের ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতের বর্ণনা দিতে গিয়ে নরহরিবাবু লিখেছেন: উনিশ শতকের মধ্যাহ্ন যতই অপরাহ্নের দিকে ঢলে পড়তে লাগল, ততই যেন বহু বিজ্ঞাপিত ইওরোপীয় সভ্যতার দেউলিয়াপনা লোকের সামনে উদ্ঘাটিত হয়ে পড়ল। বৃটিশের যে ন্যায্যতার প্রতি ভারতবাসী গভীর বিশ্বাস স্থাপন করেছিল তা যেন রূঢ় আঘাতে দিনের পর দিন ভেঙে পড়তে লাগল। মানুষের চোখের উপর দিয়ে ভারতের রাজ-রাজড়ারা ফকিরে পরিণত হতে লাগল। পশ্চিমী সভ্যতার ধ্বজাধারী বৃটিশ প্ল্যাণ্টার ও বণিকদের পৈশাচিক আক্রমণে নিরীহ কৃষক ও তাঁতীর দল মরতে বসল। বৃটিশ বড় কর্তাদের চরিত্রহীনতা ও ঘৃণ্য প্রবৃত্তি পরায়ণতায় ভারতের নীতিশীল মানুষ শিউরে উঠল। শিক্ষিত বাঙালী কেরানী ও মাষ্টারী জীবনের ক্ষুদ্রতায় আড়ষ্ট হয়ে লজ্জায় ঘৃণায় অধোবদন হয়ে দিন কাটাতে বাধ্য হল। মহারাণী ভিক্টোরিয়া কায়েম হয়ে বসে ভারতবাসীকে বৃটিশ আমলের মৌরসী পাট্টা স্থাপনের কথা জানিয়ে দিল।[১]

নরহরিবাবুর বর্ণিত ইতিহাস যদি সত্য হত, অর্থাৎ 'মরতে বসা' 'শিউরে ওঠা' 'অধোবদন হয়ে দিন কাটান' এটাই যদি তখনকার দিনের সত্যকার রাজনৈতিক ইতিহাস হত তাহলে, বৃটিশের বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিবাদ হিসাবে বিবেকানন্দের ধর্ম আন্দোলনকেও প্রগতিশীল আখ্যা দিতে কোন মার্কসবাদীই আপত্তি করত না। কিন্তু ঘটনা আসলে অন্যরূপ। নরহরিবাবু বিবেকানন্দের ইতিহাসবোধের প্রশস্তি গাইতে গিয়ে নিজের ইতিহাসবোধ জলাঞ্জলি দিয়েছেন বলেই তাঁর মনে পড়েনি যে ঠিক এরই পূর্ব মুহূর্তে হয়ে গেছে সিপাহী বিদ্রোহ। নীলচাষীদের বিদ্রোহ বৃটিশ বণিককুলের অন্তরাত্মা কাঁপিয়ে দিয়ে গেছে—সাত সমুদ্র তের নদীর পারে গিয়ে পৌঁছেছে তার ঢেউ, বৃটিশ রাজের সিংহাসন টলমলিয়ে উঠেছে। সন্ত্রস্ত ইংরেজ শাসককুল বুঝতে পারল যে এদেশে রাজ্যপাট বজায় রাখতে হলে দেশীয় প্রতিক্রিয়াই পারবে মোহসৃষ্টি করে জন-বিক্ষোভকে প্রশমিত করতে, তাই যাদের কাছ থেকে তারা ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়েছিল

১. দ্র. ঐ, পৃঃ ৩১। —সঃ

সেই সমস্ত প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে তারা সমঝওতা করল। এই নয়া শ্রেণী-আঁতাতেরই কবুলিয়তনামা মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণা-পত্র। এতে কাজও হয়েছিল কিছুটা—জন-আন্দোলনের উত্তাল তরঙ্গ প্রশমিত হয়েছিল। আর এই রকম সময়ে প্রতিক্রিয়া নিজের শক্তিকে সংহত করার চেষ্টা করে নানাবিধ উপায়ে। "ভগবান সৃষ্টি", "ধর্ম সংস্কার"—প্রতিক্রিয়ার এই প্রচেষ্টারই অঙ্গ। বিবেকানন্দ ছিলেন এই প্রতিক্রিয়ারই ক্রীড়নক। ঐতিহাসিকভাবে বিবেকানন্দ এই ভূমিকাই অভিনয় করে গেছেন।

নরহরিবাবু এদিকটা যে দেখেন নি তা নয়—দেখেও তিনি তা ব্যাখ্যা করে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন। তিনি লিখেছেন :

"পুঁজিবাদের অন্তর্নিহিত বিরোধ এই সময় আত্মপ্রকাশ করতে আরম্ভ করেছে ইওরোপে। তাই পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রগতিশীলতার পাশে তার প্রতিক্রিয়াশীলতার রূপ যতই স্পষ্ট হতে থাকে, ভারতের চিন্তাবীর বঙ্কিমচন্দ্র ও বিবেকানন্দ ততই হতাশ হতে থাকেন। হতাশায় তাঁরা ভারতের অধ্যাত্মবাদকে, ত্যাগধর্মকে শ্রেয় বলে প্রচার করতে জোর দেন।"[১]

শুধু বিবেকানন্দ কেন, সংস্কারবাদী আবিলতা বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারাকে এতই আচ্ছন্ন করে রেখেছে যে, রামমোহন থেকে বিদ্যাসাগর, মাইকেল, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র প্রভৃতি সকলেই সংস্কৃতি আন্দোলনের নেতাদের কাছে 'চিরস্মরণীয়' হয়ে উঠেছেন (মাঘ, ১৩৫৫—পুস্তক পরিচয় দ্রষ্টব্য)। অর্থাৎ, একবাক্যে বুর্জোয়া সংস্কৃতির সব ক'জন প্রতিনিধির শিষ্যত্বই তাঁরা বরণ করে নিয়েছেন নির্বিচারে।

বিবেকানন্দের মত ও পথকে মার্কসবাদের দৃষ্টিতে বিচার করে দেখলে নরহরিবাবুরা কখনই শ্রমিকশ্রেণীকে বুর্জোয়া ঐতিহ্যের এই জঞ্জাল বহনের পরামর্শ দিতেন না। শ্রমিকশ্রেণী এই জঞ্জাল বয়ে বেড়াতে রাজী নয়—এর যথাযোগ্য স্থান ইতিহাসের ডাষ্টবিন। তার মানে এই নয় যে, শ্রমিকশ্রেণী এত দিনকার সব ঐতিহ্যই বর্জন করবেন।

শ্রমিকশ্রেণী মানবেতিহাসের শ্রেষ্ঠ ঐতিহ্য নিশ্চয়ই গ্রহণ করবেন। হাওয়ার উপর কোন সংস্কৃতিই গড়ে উঠতে পারে না। কিন্তু তাই বলে নির্বিচারে

১. ঐ, পৃঃ ৪০ দ্রষ্টব্য।—সঃ

গ্রহণও সে করবে না। জাতীয় ঐতিহ্য সম্পর্কে শ্রমিকশ্রেণী নিশ্চয়ই গর্ব অনুভব করবে—কিন্তু সে জাতীয় ঐতিহ্যের রূপ কি? লেনিন এ প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন দ্ব্যর্থহীন ভাষায়:

"প্রত্যেকটি আধুনিক জাতির মধ্যে নিহিত আছে দু'টি জাতি...প্রত্যেকটি জাতীয় সংস্কৃতির মধ্যে নিহিত আছে দু'টি জাতীয় সংস্কৃতি। পুরিসকেভিকো, গুচকভ এবং ষ্ট্রুভের উচ্চাঙ্গের রুশ সংস্কৃতি আছে আবার চের্নিশেভস্কি প্লেখানভের নাম বিজড়িত আর একটি উচ্চাঙ্গের রুশ সংস্কৃতিও বর্তমান।"

লেনিন এই শেষোক্তদেরই ঐতিহ্য গ্রহণের পরামর্শ দিয়েছেন, কারণ চের্নিশেভস্কি প্রমুখ অবাস্তব সমাজবাদী হলেও তাঁদের প্রত্যেকটি রচনা শ্রেণী-সংগ্রামের প্রেরণায় প্রাণবন্ত। তাহলে লেনিনের শিক্ষা অনুযায়ী শ্রমিকশ্রেণী হবে বিপ্লবী গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যেরই রক্ষাকর্তা।

লেনিনের শিক্ষানুযায়ী রুশ সাহিত্যের ঐতিহ্য বিচার করতে গিয়ে জ্‌দানভ বলেছেন:

"আমাদের রুশীয় বিপ্লবী গণতান্ত্রিক বিশ্লেষণশীল প্রত্যেকটি রচনায় স্পন্দিত জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে **প্রাণাত্মক ঘৃণা**। (বড় হরপ আমার—লেখক) জনতার মৌলিক স্বার্থ, তাদের শিক্ষা, তাদের সংস্কৃতি জারতন্ত্রের শৃঙ্খল থেকে তাদের মুক্তির জন্য সংগ্রামের মহান প্রেরণায় প্রত্যেকটি রচনা সমুজ্জ্বল।

(লেনিনগ্রাদ লেখকদের সভায় বক্তৃতা)

জ্‌দানভের এই উক্তির মধ্যেই আমাদের দেশের ঐতিহ্য বিচারেরও নির্দেশ পাওয়া যায়। অতীতের কোন্ ঐতিহ্য আমরা গ্রহণ করবো শ্রমিক-সংস্কৃতির ভিত্তিভূমি হিসাবে, তার নিরিখ হবে—কার রচনায় মূর্ত হয়ে উঠেছে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জ্বলন্ত ঘৃণা, জনতার মৌলিক স্বার্থ রক্ষার জন্য সংগ্রামের মহৎব্রত গ্রহণ করেছেন কে? গ্রহণ বা বর্জনের মাপকাঠি হবে কার শিল্পকর্ম 'শ্রেণী সংগ্রামের প্রেরণায় প্রাণবন্ত'। এ ঐতিহ্য খুঁজতে হবে ১৮২৫-৭১ সালে ভারতের যে সব গণ-বিদ্রোহ ঘটেছে তার নায়কদের মধ্যে। এই নিরিখেই যাচাই করে নিতে হবে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম, বিবেকানন্দ থেকে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র—সবাইকে।

টলষ্টয় প্রসঙ্গ

এ প্রসঙ্গে টলষ্টয় সম্পর্কে লেনিনের সমালোচনা উদ্ধৃত করলে বিষয়টা আরও একটু পরিষ্কার হবে।

লেনিন টলষ্টয়কে 'বিপ্লবের দর্শন' আখ্যা দিয়েই আবার সতর্ক করে দিয়েছিলেন, টলষ্টয়ের দর্শন শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে ক্ষতিকর (১) শ্রমিক-শ্রেণী সাহসের সঙ্গে গ্রহণ করবে টলষ্টয়ের সাহসী বস্তুবাদকে, আর বর্জন করবে তার প্রতিক্রিয়াশীল অবাস্তব দর্শনকে (২)। এখানে মূল আলোচনার পক্ষে কিছুটা অপ্রাসঙ্গিক হলেও একটা কথা স্মরণীয়—লেনিন দার্শনিক টলষ্টয় আর শিল্পী টলষ্টয়কে আলাদা করে দেখেননি ; দেখা যায়ও না। লেখকের জীবন-দর্শনই প্রতিফলিত হয় সাহিত্যে, শিল্পে—এই হল মার্কসবাদী শিল্পতত্ত্বের প্রথম প্রতিজ্ঞা। কিন্তু তবু লেনিন টলষ্টয়ের যে মূল্য বিচার করেছেন তা আপাত-বিরোধী নয়। কারণ তখন বিপ্লবের শিবিরই ছিল প্রগতি ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে দোদুল্যমান। সবে তখন পুরোন সামন্ত ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে, বুর্জোয়া ব্যবস্থার রূপ স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি। পুরোন কায়দায় ভাবতে অভ্যস্ত কৃষক ও ভূমিদাসেরা বিক্ষুব্ধ, কিন্তু পথ খুঁজে পাচ্ছে না। বাস্তববাদী টলষ্টয়ের লেখায় এই দ্বিধা-দ্বন্দ্বই প্রতিফলিত হয়েছে (৩)—কিন্তু তাঁর নিষ্ক্রিয়তার দর্শন সত্ত্বেও তাঁর হতাশা

(১) টলষ্টয়ের শিক্ষা যে অবাস্তব এবং প্রতিক্রিয়ার যথার্থ ও অন্তর্নিহিত অর্থ যা, ঠিক সেই অর্থেই সে শিক্ষা প্রতিক্রিয়াশীল এ সম্পর্কে কোনই সন্দেহের অবকাশ নেই।

('লেনিন অন আর্ট এণ্ড লিটারেচার' হইতে উদ্ধৃত)

(২) লেনিন শিল্পী হিসাবে টলষ্টয়ের চমৎকারিত্ব দেখিয়ে দিয়েছেন। জমিদার-স্বৈরতন্ত্রী সমাজের নির্মম সমালোচক হিসাবে টলষ্টয়ের ভূমিকা তুলে ধরে এবং টলষ্টয়ের সৃষ্টি যে মানুষের শিল্প বিকাশের পথে একটি অগ্রপদক্ষেপ তাও লেনিন দেখিয়েছেন। আবার অন্যদিকে, টলষ্টয়ের দার্শনিক তত্ত্ব যে সমাজবাদের জন্য শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামের পক্ষে ক্ষতিকর, নীতি হিসাবে সে কথাও লেনিন জোরের সঙ্গে ঘোষণা করেছেন।

(সোভিয়েট লিটারেচার, তৃতীয় সংখ্যা, ১৯৪৯ পৃঃ ১৩৬)

(৩) মানবতার মুক্তির নূতন দাওয়াই আবিষ্কর্তা যুগাবতার হিসাবে টলষ্টয় হাস্যকর—আর এই কারণেই রুশীয় এবং অন্যান্য দেশের 'টলষ্টয়বাদীরা' তাঁর নীতির সবচেয়ে দুর্বল দিকটাকেই অনুশাসনে পরিণত করতে চাচ্ছে—এদের সত্যিই করুণা করতে হয়। টলষ্টয় মহৎ এই হিসাবেই যে, বুর্জোয়া বিপ্লবের আত্মপ্রকাশের যুগে রুশিয়ার লক্ষ লক্ষ কৃষক-জনতার মনোভাব এবং ভাবনাকে

এবং অন্যায় প্রতিরোধ না করার মনোভাবকে ছাপিয়ে উঠেছে "পুঞ্জীভূত ঘৃণা, অতীতকে ঝেড়ে ফেলে উন্নততর জীবনযাত্রার পরিণত প্রয়াস।"

টলষ্টয়ের সাহিত্যে এইটাই বড় কথা, আর এইজন্যই লেনিন তাঁকে 'বিপ্লবের দর্শন' বলে বর্ণনা করেছেন।*

টলষ্টয় সম্পর্কে এত কথা বলতে হল এই কারণেই যে, আমাদের সমালোচকরা টলষ্টয় সম্পর্কে লেনিনের উক্তি অনেক সময়ই যান্ত্রিকভাবে ব্যবহার করেন। কোন প্রতিক্রিয়াবাদী যুগপ্রভাবে যদি দু'একটা ভালকথা বলে ফেলেন অমনি টলষ্টয়ের নজীর তুলে তার পিছনে ছুটবার ঝোঁক দেখা যায়। বিবেকানন্দ বঙ্কিমের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে।

কিন্তু এঁরা আসলে বিপ্লবের-পরিপন্থী বুর্জোয়া সংস্কৃতিরই ধারক। এঁদের পাশে পাশে বিপ্লবী গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির একটি ধারাও অব্যাহতভাবে বয়ে এসেছে দীনবন্ধু থেকে নজরুল ও সে দিনের সুকান্তের লেখনীর ভিতর দিয়ে—আর এই ধারাটিই হবে শ্রমিক-সংস্কৃতির ভিত্তিভূমি, শ্রমিক-সংস্কৃতির প্রথম উপাদান। এই ধারাটির সম্যক পরিচয় আজ লুপ্ত, অবহেলিত—ইংরেজ সাম্রাজ্য-

তিনি ব্যক্ত করেছেন। টলষ্টয়ের প্রতিভা মৌলিক, কারণ তাঁর সমগ্র দৃষ্টিভঙ্গী ক্ষতিকর হলেও তা আমাদের বিপ্লবের বৈশিষ্ট্যকেই প্রকাশ করে। আমাদের বিপ্লবের বৈশিষ্ট্যই ছিল এই যে, তা কৃষক-বুর্জোয়া বিপ্লব। (পৃঃ ৩৭)

.. টলষ্টয়ের মতবাদ এবং নীতির এই পরস্পর বিরোধিতা মোটেই আকস্মিক নয়। উনবিংশ শতকের শেষার্ধে রুশীয় জীবনধারায় যে আত্ম-বিরোধিতার প্রকাশ হয়েছিল এ তারই অভিব্যক্তি। শাসনতন্ত্রের নাগপাশ থেকে সদ্য মুক্ত গোষ্ঠীকেন্দ্রিক গ্রাম তখন পুঁজি এবং অর্থের লুণ্ঠনক্ষেত্র। কৃষি-অর্থনীতি এবং জীবনধারার পুরান বনিয়াদ বহু যুগ ধরে যা চলে আসছিল, অতিক্রত তা লুপ্ত হয়ে গেল...নতুন যে ব্যবস্থা থিতিয়ে বসছিল, জনতার অধিকাংশের কাছেই তা অজানা, অপরিচিত, তাদের বুদ্ধির অগম্য। (পৃঃ ৩৭)

.. যখন পুরান ব্যবস্থা উলট-পালট হয়ে গেছে তখন পুরান ব্যবস্থায় শিক্ষিত জনতা, মাতৃতন্ত্রের সঙ্গে যে সব নীতি, আচার-আচরণ বিশ্বাসে সংক্রামিত জনতা, যে নতুন ব্যবস্থা "থিতিয়ে বসছে" তা দেখে না, দেখতে পারে না...তখন অবশ্যম্ভাবীরূপেই নেতিবাদ, আত্মসমর্পণ, 'আত্মার' কাছে আবেদন—ভাবাদর্শ হিসাবে জন্মলাভ করে। (অন আর্ট এণ্ড লিটারেচার পৃঃ ৩৫)

* 'বিপ্লবের দর্শন' কথাটা সম্ভবত মুদ্রণ-প্রমাদের ফল। লেনিন তলস্তয়কে 'রুশ বিপ্লবের দর্পণ' আখ্যায় ভূষিত করেন।—সম্পাদক

বাদী এবং দেশী ধনিকদের চক্রান্তে বিকৃত, অবজ্ঞাত। এই লুপ্ত, অবজ্ঞাত ঐতিহ্যের ধারাটিকে উদ্ধার করতে হবে—মার্কসবাদী ঐতিহাসিকদের উপরেই এই গুরু দায়িত্ব ন্যস্ত। নরহরিবাবু প্রমুখ ইতিহাসের উৎসাহী ছাত্রেই একাজ করতে পারেন—এ কাজ তাঁদেরই করতে হবে; বুর্জোয়া ঐতিহ্যের মোহে আচ্ছন্ন হয়ে থাকা তাঁদের সাজে না।

লেজুড় মনোবৃত্তি

কিন্তু শুধু বুর্জোয়া 'স্বর্ণযুগ' কেন—বুর্জোয়া-বর্তমান সম্পর্কেই কি মোহ নেই?

'টি. এস. এলিয়ট ও নোবেল পুরস্কার' শীর্ষক নিবন্ধটিই ধরা যাক (পরিচয়, অগ্রহায়ণ ১৩৫৫)।[১] এই নিবন্ধটিতে অবশ্য এলিয়ট সম্পর্কে লেখা হয়েছে "প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় প্রগতির মুখোস পরিয়া এলিয়টের মত কবির কাব্যে।" কিন্তু সমস্ত রচনাটির মধ্যে যে সুরটি প্রবল হয়ে উঠেছে তা এই যে, এলিয়ট প্রতিক্রিয়ার সচেতন পোষা কুকুর নয়, অচেতন শিকার মাত্র। "পরাজিত মনের আত্মগ্লানির" বশবর্তী হয়েই তিনি "জীবনকে ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে প্রাধান্য দিয়া তাহাকে অকিঞ্চিৎকর প্রতিপন্ন করিবার" চেষ্টা করেন। কিন্তু এ সত্ত্বেও এলিয়ট লেখকের "দৃষ্টি ও প্রশংসা" আকর্ষণ করেছে, এই কারণে যে, তিনি এলিয়টের লেখায় পেয়েছেন—"তাঁহার (এলিয়টের) বাস্তব দৃষ্টির, চক্ষের সম্মুখে যাহা দেখিতেছি তাহার প্রতি তাঁহার অবিচলিত নিষ্ঠার।" লেখক যে এলিয়টের গুণমুগ্ধ হয়েছেন তার অন্য কারণ এই যে, এলিয়ট "সত্যকে প্রকাশ করিলেন সুন্দর বলিয়া নয়, শিব বলিয়া নয়, এই বলিয়া যে ইহা বাস্তব। এলিয়টের এই তথাকথিত 'বাস্তবনিষ্ঠা' পরিচয়ের উক্ত লেখককে এতই মুগ্ধ করেছে যে গলদশ্রু-লোচনে 'পুরোন' এলিয়টকে শ্রদ্ধার্ঘ দিয়ে বলেন —"আজ কোথায় সেই এলিয়ট যিনি আর কিছু আমাদের না দিন, দিয়েছিলেন অবিমুগ্ধ বাস্তবদৃষ্টি, যিনি অসুন্দরকে সুন্দর বলেন নাই, রূপহীনকে অপরূপ বলেন নাই?" উক্ত লেখকের এই মতের সঙ্গে বিষ্ণু দের বক্তব্যের কি কোন মূলগত পার্থক্য আছে? বিষ্ণু দের মত এও কি এলিয়টের কাব্যে "জীবনের স্পষ্ট অঙ্গীকার" আবিষ্কারের প্রচেষ্টা নয়? আসলে এলিয়টের 'সত্য' অর্ধসত্য।

১. নিবন্ধটির লেখক ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ। পরিচয়-এর 'সংস্কৃতি সংবাদ' বিভাগে রচনাটি প্রকাশিত হয়। - সম্পাদক

আর অর্ধসত্যও সত্য নয়। কারণ আজ বুর্জোয়া সমাজের ভাঙনটাই একমাত্র সত্য নয় বরং আরো বেশী সত্য নব-সমাজ গঠনের শক্তির অভ্যুদয়। আর সে শক্তি দেশে দেশে জয়যুক্ত হচ্ছেও। এলিয়ট এই শক্তিকে ইচ্ছা করে দেখেন না, দেখাটা তাঁর বুর্জোয়া প্রভুরা পছন্দ করেন না। বুর্জোয়া প্রভুদেরই স্বার্থ এলিয়ট তাঁর কাব্যের মাধ্যমে প্রচার করেন, এ সমাজ অসুন্দর তা সত্য, কিন্তু যেহেতু সমাজ অপরিবর্তনীয় সুতরাং এর সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নাও—ভগবানে আত্মসমর্পণ কর। জনতা যাতে পরিবর্তন প্রয়াসী না হয়, সে জন্য তিনি অতীতের গুণকীর্তন করে জনতার মনকে অতীত অভিমুখী করতে চান। ভবিষ্যতটা এলিয়টের বুর্জোয়া প্রভুদের পক্ষে সুখের প্রতিশ্রুতি নয় বলেই এলিয়টেরও কোন ভবিষ্যৎ নেই। সুতরাং এলিয়টের বাস্তব দৃষ্টি মোটেই 'অবিমুগ্ধ' নয়— বুর্জোয়া সংস্কারের অজ্ঞানে অত্যন্ত বেশী পরিমাণে বিমুগ্ধ। আর এই জন্যই ফাদায়েভ এলিয়টকে হায়নার সংগে তুলনা করেন। কিন্তু এই সমালোচকের কাছে সে সব কথার কোনও মূল্য নেই।

কথা উঠতে পারে যে, উক্ত লেখকের মত 'পরিচয়ের' সম্পাদকীয় বক্তব্য নাও হতে পারে। এ নিতান্তই টেকনিকাল আপত্তি। উক্ত লেখকের এই মতকে ক্ষতিকর মনে করলে, পরিচয়ের সম্পাদক-মণ্ডলী তার প্রতিবাদ করেন নি কেন? এ ধরনের বিকৃত চিন্তার জঞ্জালে 'পরিচয়ে'র পৃষ্ঠা ভারাক্রান্তই বা করলেন কেন?

বৈশাখের (১৩৫৬) পরিচয়ে সরোজিনী নাইডুর কবিতা সম্পর্কে যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে তাতেও বুর্জোয়া সংস্কৃতি সম্পর্কে এই মিথ্যা মোহই প্রকট হয়ে ওঠে। সরোজিনীর ঘুম পাড়ানিয়া গানের প্রশস্তিতে 'পরিচয়ের' ছ'টি মূল্যবান পৃষ্ঠা বাজে খরচ করবার অন্য কি যুক্তি থাকতে পারে? প্রবন্ধটির উদ্বোধনী বাক্যে বলা হয়েছে—সরোজিনী নাইডুর মৃত্যুতে ভারতীয় নারী সমাজের ক্ষতি অপূরণীয়। মানুষ মৃতের সঙ্গে লড়াই করে না তা ঠিক—কিন্তু একথা কি ভুলে যাওয়া সম্ভব যে, সরোজিনী নাইডু যখন যুক্ত প্রদেশের গবর্নর পদে অধিষ্ঠিতা ছিলেন সে সময়ে সেখানকার শ্রমিক কৃষকের উপর অবর্ণনীয় অত্যাচার হয়েছে, আর এই অত্যাচার থেকে শ্রমিক-কৃষক মেয়েরাও অব্যাহতি পান নি? শ্রমিক-কৃষক মেয়েরা বুঝি ভারতীয় 'নারী সমাজে'র অন্তর্ভুক্ত নন? লেখকের এই উদ্বোধনী বাক্যের আসল তাৎপর্যই এই যে—

নারী সমাজে কোন শ্রেণীভেদ নেই।

লেজুড় মনোভাবের কদর্য এবং উৎকট প্রকাশ হয়েছে নরেন্দ্রনাথ মিত্রের দীপপুঞ্জ উপন্যাসের সমালোচনায় (ফাল্গুন, ১৩৫৫)।১

নরেন্দ্র মিত্র নিজেকে যতই 'উদ্দেশ্যহীন' বিশুদ্ধ সাহিত্যিক বলে মনে করুন না কেন, 'দীপপুঞ্জ' উপন্যাসেরও একটা বক্তব্য আছে, থাকবেই—কোন রচনাই উদ্দেশ্যহীন হয় না, হতে পারে না। প্রথমত আলোচ্য উপন্যাসটি গ্রাম সম্পর্কে একটি রোমান্টিক পরিবেশ সৃষ্টি করে গ্রাম-জীবনের বাস্তবতা থেকে মানুষের মনকে সরিয়ে রাখে। বাংলার গ্রামগুলি যেন মন দেওয়া নেওয়ার কেন্দ্র, এই নিয়েই যেন সেখানে যত বিরোধ দ্বন্দ্ব।

উপন্যাসটি অবশ্য রচিত হয়েছিল ৭।৮ বছর আগে (যদিও তা প্রকাশ হয়েছে ১৯৪৭ সালে এবং লেখক মূল কাহিনীর যথেষ্ট পরিবর্তন পরিবর্ধন করার সুযোগ পেয়েছেন এবং করেছেনও)। তখন হয়ত গ্রামে গ্রামে আজকের মত এমন রক্তাক্ত সংঘর্ষ সৃষ্টি হয় নি; কিন্তু সংঘর্ষের মূল কারণগুলি তখনও ছিল এবং অতিমাত্রায়ই ছিল। সে সমস্যাগুলিকে বাদ দিয়ে গ্রাম জীবন সম্পর্কে এ ধরনের অবাস্তব রোমান্টিকতা সৃষ্টি বুর্জোয়া অপপ্রচারেরই অঙ্গ। নরেন্দ্র মিত্রের উক্ত উপন্যাসেও এই প্রচেষ্টাই হয়েছে, তা লেখকের জ্ঞাতসারেই হোক আর অজ্ঞাতসারেই হোক। সুতরাং আপাত-বিশুদ্ধ-গল্পটি যা প্রচার করে তা মোটেই বিশুদ্ধ নয়।

নারী-চরিত্রগুলির ট্রিটমেণ্টেও নরেনবাবুর বিকৃত বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গীরই পরিচয় পাওয়া যায়। এই উপন্যাসে নারী-চরিত্রগুলিকে দেখি পুরুষের বিকৃত যৌন-লালসার ইন্ধন রূপে। নারী সে যতই শক্তিমতী হোন না কেন পুরুষের কলুষিত কামনার অগ্নিতে তাঁকে আত্মসমর্পণ করতেই হবে—এ ছাড়া মুরলীর কাছে মঙ্গলার আত্মসমর্পণের আর কি যুক্তি থাকতে পারে?

কিন্তু পরিচয়ের সমালোচক উপন্যাসটিকে দেখেছেন বিশুদ্ধ গল্প হিসাবে। তিনি অবশ্য জানেন—"লেখক (নরেন্দ্র মিত্র) জীবনের রূঢ়তাকে অনেকখানি অযথা স্তিমিত করে আমাদের কাছে পরিবেশন করেন—আমরা যারা জীবনের

১. পরিচয়-এর 'পুস্তক-পরিচয়' বিভাগে এই সমালোচনাটি লেখেন সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়। উপন্যাসটির নাম 'দ্বীপপুঞ্জ'। —সম্পাদক

রূঢ়তায় দীপ্ত"।[১] কিন্তু তাহলে কি হয়, মার্কসবাদী বিবেকের দংশনকে উড়িয়ে দিতেও তাঁর কিছুমাত্র দেরী হয় না, পরমহূর্তেই তিনি লেখেন—"লেখক (নরেন্দ্র মিত্র) আমাদের বিশ্বাস করাতে কিছু চান নি, কেবল গল্প বলতেই চেয়েছেন।" মঙ্গলাও পরিচয়ের এই সমালোচকটিকে একেবারে বিমুগ্ধ করেছে।

নরেন্দ্র মিত্র বা তাঁর উপন্যাস বাংলা সাহিত্যের ভীড়ে কোন বিশিষ্টতাই দাবী করতে পারে না, তবু তাঁর সম্পর্কে আলোচনায় এতখানি স্থানের অপব্যয় করতে হল এই কারণেই যে, তথাকথিত 'বিশুদ্ধ' গল্প সম্পর্কে আমাদের মোহটা যে কি মারাত্মক রূপ নিয়েছে, এই সমালোচনার মধ্যেই তা প্রকট।

ফুচিকের বই

পুস্তক সমালোচনার মধ্যে অধিকাংশই এই ধরনের আবিলতায় তরল। উপভোগ্য কিনা তা নির্ণয় করেই সমালোচকেরা অবসর গ্রহণ করেন। দেখিয়ে দেন না বইয়ের দোষ-ত্রুটি, বিকৃত মতবাদের বিরুদ্ধে শাণিত হয়ে ওঠে না তাদের লেখনী, যুগোপযোগী শিক্ষাটুকু পাঠকের সামনে তুলে ধরার দায়িত্বও তাঁরা বিস্মৃত হন। এর চরম নিদর্শন ফুচিকের 'Notes from the Gallows' ('ফাঁসীর মঞ্চ থেকে')-এর সমালোচনা।*

এখানে সমালোচকের অধিকাংশ সময়ই ব্যয়িত হয়েছে বইয়ের সাহিত্যিক গুণাগুণ বিচারে। বুকের রক্ত দিয়ে লেখা বইয়ের সাহিত্যিক গুণাগুণই যেন বড় কথা। ফাশিষ্ট নির্যাতন উপেক্ষা করে, মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, গোপনে সংগৃহীত কাগজ-পেন্সিলে লিখে ফুচিক যে তাঁর জবানবন্দী বাইরে পাঠাবার তাগিদ অনুভব করেছিলেন—সে কি সাহিত্য যশের আকাঙ্ক্ষায়? না, বুকের রক্ত দিয়ে ফুচিক এই কথাটাই প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন এবং প্রমাণ করতে পেরেছেনও—কমিউনিজম মানুষকে কতখানি মহৎ করে তোলে, শ্রমিকশ্রেণীর মতবাদ মানুষকে দেয় কি বিপুল প্রাণশক্তি, কি অপরিসীম আত্মবিশ্বাস—কমিউনিজম মানুষকে করে মৃত্যুঞ্জয়। ফুচিকের জবানবন্দী বুর্জোয়া জল্লাদদের চ্যালেঞ্জ করে বলে—পারবে না, রক্তের বন্যায় কমিউনিজমকে তোমরা ভাসিয়ে দিতে পারবে না; কমিউনিজম শ্রমিকশ্রেণীকে যে দুর্বার শক্তি

১, দ্র. পরিচয়, ফাল্গুন ১৩৫৫।—সম্পাদক

* অনিমেষ রায়, 'পুস্তক পরিচয়', পরিচয়, অগ্রহায়ণ ১৩৫৫ দ্রষ্টব্য।—সম্পাদক

দেয় তার সামনে তুচ্ছ তোমাদের মারণমন্ত্র। কমিউনিজম পৃথিবীর যৌবনমন্ত্র—পারবে না তোমাদের রক্তচক্ষু ভ্রুকুটি তার গতিরোধ করতে। অনিবার্যভাবে পৃথিবী এগিয়ে চলেছে কমিউনিজমের দিকে—ইতিহাসের এই অমোঘ বিধান ফুচিক সমস্ত সত্তা দিয়ে অনুভব করেছিলেন—মানুষের মত বাঁচতে চেয়ে তাই ফুচিক মানুষের মতই প্রাণ দিলেন। প্রাণ দিয়েছেন গ্যাব্রিয়েল পেরীও, ফাঁসীর মঞ্চে দাড়িয়েও এতটুকু বিচলিত হন নি তাঁরা—কমিউনিজমই তাঁদের দিয়েছে এই অপরাজেয় আত্মবিশ্বাস। তাই প্রাণ দিচ্ছেন ভরদ্বাজ, প্রাণ দিচ্ছেন মাদ্রাজের অখ্যাতনামা মজুর সন্তান, প্রাণ দিচ্ছেন কাকদ্বীপ-চন্দনপীড়ির কৃষকরা—প্রাণ দিলেন কলকাতার রাজপথে চারজন বীরকন্যা।[১] এ কোন অতি-নাটকীয় বীরপণা নয়—কমিউনিজমই তাঁদের প্রাণদানকে মহনীয় করেছে। এর মধ্যে নেই কোন সন্ত্রাসবাদী ভাববিলাসিতা—কমিউনিজমের জয় হবেই, এই আত্মবিশ্বাসের জোরেই মৃত্যুকে তাঁরা তুচ্ছ করেছেন। তাঁদের এই মহান প্রাণদানের মধ্য দিয়ে এ কথাটাই পরিষ্কার হয়ে ওঠে, কত ঘৃণ্য নীচ নারকীয় জীব তারা, নিজের চামড়া বাঁচাবার জন্য, যারা কমিউনিজমের পথ থেকে বিচ্যুত হয়, শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে। সমালোচকের উচিত ছিল, প্রাণদানের এই শিক্ষাটিকে সমুজ্জ্বল করে তোলা—যেন তা পাথেয় হয়ে ওঠে এদেশের বিপ্লবী জনতার—শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্তের। আজকের দিনে এই পাথেয়ই তো দরকার। ফুচিকের বইয়ে আছে সে পাথেয়—সার্থক তাই এ ফুচিকের জবানবন্দী, সার্থক তা সাহিত্য হিসাবেও।

এই গ্রন্থটির সমালোচনা সোভিয়েট লিটারেচারেও প্রকাশিত হয়েছে (সোভিয়েট লিটারেচার, প্রথম সংখ্যা ১৯৪৯)। সমালোচক সেখানে পরিষ্কার দেখিয়ে দিয়েছেন, শান্তির জন্য সংগ্রামের হাতিয়ার হিসাবে কি ভাবে ব্যবহার করতে হবে ফুচিকের বইকে। এইটাই সমালোচকের কর্তব্য। আমরা সাহিত্যিকদের কাছে দাবী করছি, এমন সাহিত্য রচনা কর যা হবে শ্রমিকশ্রেণীর হাতিয়ার—প্রাণের বিনিময়ে যখন সে হাতিয়ার তৈরী করে দিয়ে যান লেখক তখন সমালোচক যদি তা ব্যবহারের মন্ত্রটি তুলে না ধরেন—সে কি অপরাধ

১. ১৯৪৯ সালে কলকাতায় বন্দী-মুক্তির দাবীতে যে মিছিল বের হয় তাতে পুলিশের গুলিতে শহীদ হন অমিয়া, গীতা, লতিকা ও প্রভা। —সম্পাদক

নয়? কারণ ফুচিকের এই বই সত্যিই সংগ্রামী মানুষকে নূতন আত্মবিশ্বাসে উদ্দীপ্ত করতে পারে, করবেও।

আত্মশক্তিতে অনাস্থা

'কমিউনিজম' 'শ্রমিক-শ্রেণী' এই সব কথা ব্যবহার করতে পরিচয়ের এই সমালোচকের কেমন এক অহেতুক সংকোচ সারা সমালোচনার মধ্যে অতি-মাত্রায় প্রকট। এই সংকোচটা যে আসলে আত্মবিশ্বাসের অভাবেরই ফল, তা আরও পরিষ্কার হয়ে ওঠে চিন্মোহন সেহানবীশের 'সংস্কৃতির আহ্বান' (অগ্রহায়ণ ১৩৫৫) প্রবন্ধে। পোল্যাণ্ডের ভেরস্লাভ শহরে ৪৫টি দেশের বুদ্ধিজীবীদের যে শান্তি সম্মেলন হয়ে গেল, এই প্রবন্ধে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। কমিউনিষ্টরা এই সম্মেলনে ছিলেন এবং নেতৃত্বও নিয়েছিলেন—এজন্য কত না কৈফিয়ৎ দেওয়া হয়েছে এ প্রবন্ধে। ভাবখানা এই যে, কমিউনিষ্টদের থাকাটা যেন এখানে গোপন করাই দরকার। তাঁরা যেন বাস্তবিকই বড় অপরাধ করে ফেলেছেন।

চিন্মোহনবাবু লিখেছেন: "যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে অন্য-মতাবলম্বীদের পাশাপাশি কমিউনিষ্টরাও **অবশ্য** ছিলেন। কিন্তু কোন আন্তর্জাতিক সংস্কৃতি সম্মেলনে আজ ঐ অজুহাতে জোলিও কুরী, হলডেন, প্রেনা, টার্ল, বার্নাল, ওয়ালসের মত বৈজ্ঞানিক; পিকাসো, লেজর, পুডোভকিনের মত শিল্পী বা পল এলুয়ার, ফাদায়েভ, শলোকভ, এণ্ডারসন নেকেসা, আনা সেগারস, ইলিয়া এরেনবুর্গ, আমাডো বা লিওনভকে বাদ দেওয়া চলে?"

'কমিউনিষ্ট শো'—সম্মেলনের বিরুদ্ধে বুর্জোয়াদের এই মিথ্যা প্রচারের জবাব নিশ্চয়ই দিতে হবে এবং চিন্মোহনবাবু এর জবাবে অত্যন্ত সংগত ভাবেই উল্লেখযোগ্য অ-কমিউনিষ্ট সংস্কৃতি নায়কদের উপস্থিতি উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এ মিথ্যা প্রচারের জবাব দিতে হবে বলেই কি 'অবশ্য' রূপ পেছনের দরজা দিয়ে কমিউনিষ্টদের ঢুকতে হবে? তা কি বুর্জোয়া প্রচারের কাছে আত্ম-সমর্পণেরই নামান্তর নয়? যুদ্ধ বিরোধী লড়াইয়ে কমিউনিষ্টরা নেতৃত্ব নিতে সক্ষম, নিচ্ছেন এবং নেবেনও—এ সত্যকে 'অবশ্যে'র ধামায় চাপা দিতে হবে কেন? পুঁজিবাদ আর যুদ্ধ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত—যুদ্ধের মূল কারণই পুঁজিবাদ—পুঁজিবাদের উচ্ছেদই চিরস্থায়ী শান্তির অঙ্গীকার। সুতরাং শান্তির লড়াইয়ে কমিউনিষ্টরা

নেতৃত্ব নেবে এইটাইতো স্বাভাবিক। এটা কি কোন পাপকর্ম যে গোপনতার আশ্রয় নিতে হবে?

যুদ্ধ এবং পুঁজিবাদ শতকরা ৯০ জন মানুষের স্বার্থের পরিপন্থী। যুদ্ধের বীভৎসতা এখনও তাঁদের মনে তাজা রয়েছে—পুঁজিবাদের স্বার্থে কামানের খাদ্য হতে তারা রাজী নন। এই জন্যই তারা আসছেন শান্তি সম্মেলনে, আসছেন বিপুল সংখ্যায়—যুদ্ধের বিরুদ্ধে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে গড়ে উঠছে ব্যাপকতম ঐক্য। স্বভাবতই এই সম্মেলনে 'অ-কমিউনিষ্টরা' সংখ্যায় প্রচুর। এই সব সম্মেলনে কমিউনিষ্ট নেতৃত্বও যেমন সত্য তেমনি সত্য অধিক সংখ্যায় অ-কমিউনিষ্ট উপস্থিতি। বুর্জোয়া মিথ্যার জবাবে এই সত্যকেই তুলে ধরতে হবে। আর এ সত্যকে বুর্জোয়া মিথ্যাবাদীরা শত রয়টারী ঢক্কা নিনাদেও চাপা দিতে পারবে না। কারণ জোলিও কুরীর ভাষায়—সত্য বিনা পাসপোর্টেই পরিভ্রমণ করে। চিন্মোহনবাবুর এই অবগুণ্ঠের প্যাঁচ আত্মশক্তিতে অনাস্থারই পরিচায়ক।

আত্মশক্তিতে এই ধরনের অনাস্থা থেকেই হতাশার জন্ম। তাই আজ দিকে দিকে জনশক্তি জাগ্রত, যখন তাঁরা পুঁজিবাদের সঙ্গে সম্মুখ সমরে রত, যখন পুঁজিবাদের সশস্ত্র দাপটকে অগ্রাহ্য করে নিরস্ত্র জনশক্তি এগিয়ে চলেছে, পুঁজিবাদের অস্ত্র কেড়ে নিয়ে সশস্ত্র হয়ে উঠছে, তখনও ননী ভৌমিক হতাশার গল্প লিখতে পারেন, ('বাদা' কার্তিক, ১৩৫৫)। গল্প কবিতাকে আমাদের এই স্বল্প পরিসর আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করবো না, তবু ননী ভৌমিকের গল্পটির উল্লেখ না করে পারছি না এই কারণেই যে, সংগ্রামশীল গল্প রচনা করে ননীবাবু ইতিমধ্যেই বাংলা সাহিত্যে একটা আসন করে নিয়েছেন—'সলিমের মা', 'চোর', 'ভলান্টিয়ার' প্রভৃতি গল্পের লেখক যখন হতাশার বাদায় আটকে পড়েন তখন এইটাই পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে, বাংলা সংস্কৃতি জগতে বুর্জোয়া প্রচার কত প্রবল—নূতন সংস্কৃতি গঠনের সমস্যা কত জটিল।

সুন্দরবনের কৃষক আন্দোলনকে ননীবাবু রূপায়িত করলেন তিনটি ছন্নছাড়া লোককে কেন্দ্র করে—একজন ভয় পাওয়া কৃষক ঈশ্বর, তার অন্ধ অবলা বোন কামিনী আর ফেরারী কেদার। ননীবাবুর ঈশ্বর বলে—"সাহস কোথা আমাদের! সাহস কোথা!" সাহস কেদারও তাকে দিতে পারে না, কারণ নিজেই সে হতাশাছন্ন। নিজের চামড়াটুকু বাঁচাবার জন্য নিজের অন্ধ বোনকে

নায়েবের বিকৃত লালসার কাছে সমর্পণ করতে যাচ্ছে ঈশ্বর—বাধা দিতে গিয়েও শেষ অবধি বাধা দেয় না কেদার—আত্মবিশ্বাস যে সে নিজেই খুইয়ে বসে আছে। সমস্ত গল্প থেকে এই স্বরই প্রবল হয়ে ওঠে যে, শেষ হয়ে গেছে আন্দোলন, আর আশা নেই।

গল্পটি প্রকাশিত হয়েছে কার্তিক মাসে। তার পরের ঘটনাবলী অন্যরূপ: সুন্দরবনের কৃষকেরা মাথা নত করে নি, নিজের চামড়া বাঁচাবার জন্য কাকদ্বীপের ঈশ্বরেরা নিজের বোনকে নায়েবের বিকৃত কামনার অগ্নিতে আহুতি দেয় নি। আজও তারা লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে।

আজকের বাস্তব অবস্থা এমনই যে সংগ্রাম শেষ হলেও শেষ হয় না—দমন-নীতির সামনে জনতা সাময়িকভাবে পিছু হঠতে বাধ্য হন অনেক সময়—কিন্তু যেহেতু যে বাস্তব সমস্যা তাদের সংগ্রামের পথে ঠেলে দেয় তার কোন সমাধান হয় না সেইজন্য দ্বিগুণ শক্তিতে আন্দোলন আবার ফেটে পড়ে। সাময়িক পরাজয়টা সত্য, কিন্তু আরো বেশী সত্য আন্দোলনের এই নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ। আন্দোলন শেষ হয় নি—এই সুপ্ত সত্যটিকে তুলে ধরাইতো সমাজবাদী লেখকের কাজ। 'সমাজবাদী বাস্তবতা' কথাটির যদি কোন তাৎপর্য থাকে তো এই। কিন্তু আমাদের লেখকেরা এসেছেন মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে—সাময়িক পরাজয়টা তাঁদের একেবারে অভিভূত করে ফেলে। আর এই জন্যই দরকার আদর্শগত প্রস্তুতির।

আদর্শগত সংগ্রামে অনিচ্ছা

কিন্তু এদিক থেকে 'পরিচয়' চরম দায়িত্বহীনতারই পরিচয় দিয়েছে। সংস্কৃতি ক্ষেত্রে অবিলতার বিরুদ্ধে সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি যে সংগ্রাম সুরু করেছেন পরিচয়ের পরিচালকবৃন্দ তার থেকে কোন শিক্ষাই গ্রহণ করেছেন বলে মনে হয় না। জ্‌দানভ ও ফাদায়েভের সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা ছাপাবার স্থান হয় না 'পরিচয়ে'। জ্‌দানভের লেখাকে সংক্ষিপ্ত করার মত (কার্তিক, ১৩৫৫) ধৃষ্টতারও অভাব হয় না।[১] 'বেশ লিখেছে ছোকরা' সুরে জ্‌দানভের লেখাকে সংক্ষিপ্ত করার অধিকার তাদের কে দিল? জ্‌দানভের লেখা যথেষ্ট প্রাঞ্জল—তার কোন টীকার দরকার হয় না। পরিচয়ে

১. দেবকুমার চক্রবর্তী, 'সোভিয়েট সাহিত্যের মূল্য বিচার'; পরিচয়, কার্তিক ১৩৫৫, পৃঃ ৮০-৯১ দ্রষ্টব্য। —সম্পাদক

সব জিনিস পত্রস্থ হয় নি—অথচ এই সব দলিলগুলিই সংস্কারবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সবচেয়ে শাণিত হাতিয়ার। আদর্শগত সংগ্রাম সম্পর্কে পরিচয়ের অতীত সম্পাদকবর্গের বিরূপ মনোভাবের ঐতিহ্য এখনও বিলুপ্ত হয় নি। তাই বিষ্ণু দে-র কুৎসা প্রচারের জবাব দেবার কথা তাঁদের সাতমাস পরে মনে হয়। অথচ মার্কসবাদের উপর আক্রমণ বিষ্ণুবাবু সুরু করেছিলেন পরিচয়কে কেন্দ্র করেই।

মাত্র এই কয়টি দৃষ্টান্তের মধ্য দিয়েই পরিষ্কার হয়ে ওঠে সাংস্কৃতিক ফ্রণ্টে বুর্জোয়া ভাবাদর্শের বিরুদ্ধে সংগ্রামের গুরুত্ব কতখানি!

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে সমাজবাদের প্রতিষ্ঠা বেড়েছে অভূতপুর্বভাবে—জনবল, আর্থিক ও প্রাকৃতিক সম্পদের বিপুল ক্ষয়ক্ষতি সত্ত্বেও সোভিয়েট ইউনিয়নের শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে। তার প্রভাব ও প্রতিষ্ঠা আজ অনন্যসাধারণ। যুদ্ধের মধ্যে ফাশিজমের বিরুদ্ধে সাফল্যমণ্ডিত লড়াইয়ে এবং যুদ্ধশেষে আর্থিক পুনর্গঠনের সাফল্যে সোভিয়েট রাষ্ট্রাদর্শ এবং মতবাদের অবিসংবাদী শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত। অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদ আজ ক্ষীণবল আর যুদ্ধান্তে সমাজবাদের রণক্ষেত্র প্রসারিত হয়েছে পৃথিবীর প্রতিটি দেশে—অন্ধকারাচ্ছন্ন মহাদেশ আফ্রিকা থেকে আরম্ভ করে প্রতিক্রিয়ার মর্মকেন্দ্র আমেরিকা ও বৃটেন অবধি। দেশে দেশে তা সশস্ত্র সংগ্রামের রূপও নিচ্ছে। চীনের মুক্তিফৌজ ক্যাণ্টনের দ্বারদেশে উপস্থিত, বর্মা-মালয়-ভিয়েৎনামে জনবাহিনী দুর্বার, গ্রীসে মুক্তিফৌজ আজও অপরাজিত। ভারতীয় ধনিক সর্দাররাই কি আর নিশ্চিন্তে থাকতে পারছে? দুনিয়া জুড়ে শাসকশ্রেণীর চোখে আজ ঘুম নেই। "আমরা আজ এমন একটা যুগে বাস করছি যখন সব পথই শেষ হয়েছে কমিউনিজমে" (মলোটভ)।

কিন্তু নাভিশ্বাসগ্রস্ত হলেও সাম্রাজ্যবাদ এখনও নিশ্চিহ্ন হয় নি—বাঁচবার প্রয়াসে আজ সে মরীয়া হয়ে উঠেছে। অর্থনৈতিক সংকট তাকে গ্রাস করছে। জনশক্তির আক্রমণে সে জর্জরিত—সাম্রাজ্যবাদ আজ তাই তৃতীয় মহাযুদ্ধের রণাঙ্গনে শেষ মোকাবিলার জন্য পাঁয়তারা কষছে, অবশ্য যদি শক্তিতে কুলোয়। কিন্তু যুদ্ধ বাধাতে চাইলেই কি আর বাধান যায়? রণক্লান্ত মানুষ ধনিকের মুনাফা রক্ষার জন্য আবার কামানের খাদ্য হতে রাজী নয়। তৃতীয় মহাযুদ্ধের জন্য সাম্রাজ্যবাদ আজ তাই দীর্ঘমেয়াদী প্রস্তুতি সুরু করেছে।

যুদ্ধঘাঁটি স্থাপিত হচ্ছে দেশে দেশে। তাদের বৈজ্ঞানিক ক্রীতদাসেরা আণবিক মারণমন্ত্রের পিশাচ সাধনায় উর্ধ্বনেত্র। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ আশ্বস্ত হতে পারছে না। কারণ তারা জানে শত আনবিক বোমার থেকেও শক্তিমান শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী মতবাদ—মার্কসবাদ। তাই বুর্জোয়ারা তাদের ভাঙা তলোয়ার নিয়ে নেমে গেছে মতবাদের লড়াইয়ে—বারট্রাণ্ড রাসেল থেকে রাধাকৃষ্ণণে, বুর্জোয়াদের বশংবদ যত দার্শনিক জারজ সন্তানেরা (অবশ্য বিনা পারিশ্রমিকে নয়, নগদ পরমার্থিক মোক্ষের প্রতিশ্রুতিতে—তা সে কোন পররাষ্ট্র দপ্তরেই হোক, আর অন্য কোথাও হোক) এলিয়ট-মলরো-সার্ত্র থেকে বনফুল অবধি দেশী-বিদেশী সাহিত্যিক পোষাকুকুরেরা, লুই-ফিসার থেকে এম-এন-রায় অবধি বিগত-যৌবন সাংবাদিকবারবণিতারা এই আদর্শগত ভাড়াটিয়া বাহিনীতে নাম লিখিয়েছে। এই সব বীরপুঙ্গবদের ডন কুইক্সোটি বীরত্ব শেষ পর্যন্ত ইতিহাস-নাটকে হাস্যরসেরই সঞ্চার করবে সন্দেহ নেই। কিন্তু তবু এদের ভাঙা তলোয়ারের ধারে না কাটুক আস্ফালনের বনেদী কায়দায় বিভ্রান্তি সৃষ্টি হতে পারে। বিভ্রান্তির সম্ভাবনা এই কারণেই যে বুদ্ধিজীবীরা বেশীর ভাগই আসেন ধনিক-শ্রমিক দোটানায় দোদুল্যমান মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে। তারা যখন মার্কসবাদের শিবিরে আসেন তখন তাদের সঙ্গে পচা বুর্জোয়া মতবাদ এবং সংস্কারও কিছু পরিমাণে চলে আসে। আর এই বুর্জোয়া সংস্কারের ধ্বংসাবশেষই পঞ্চমবাহিনীর ভূমিকা অভিনয় করে—তাঁদের অভ্যস্ত চিন্তা বুর্জোয়া প্রচারের বিষে সংক্রামিত হয়ে পড়ে, তাঁদের যথেষ্ট চেষ্টা সত্ত্বেও। আর এই জন্যইতো জ্দানভ আদর্শগত সংগ্রামের উপর এত জোর দিয়ে বলেছেন, বুর্জোয়াদের প্রত্যেকটি আঘাতের শুধু প্রত্যাঘাতই নয়, সাহসের সঙ্গে গলিত বিকৃত বুর্জোয়া সংস্কৃতিকে অস্বীকার করতে হবে, তাকে ধিক্কার দিতে হবে।

এ কাজ যারা না করবেন সংস্কৃতি আন্দোলনের নেতৃত্বের পদে অধিষ্ঠিত থাকার অধিকার তাদের নেই। লেনিনগ্রাদ লেখক সংঘের সভাপতিপদ থেকে টিখনভকে অপসারণের কারণ এই।

সংগ্রামী ধারা

পরিচয়কেও আদর্শগত সংগ্রামের পথে এগুতে হবে, প্রয়োজন হলে নতুন

নেতৃত্বে। মার্কসবাদের অপরিমেয় প্রাণশক্তিই এই নেতৃত্ব সৃষ্টি করবে, করছেও। সংস্কারবাদী আবিলতার পাশাপাশি একটি সংগ্রামী ধারাও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে পরিচয়ের পৃষ্ঠায়।

এ প্রসঙ্গে সবার আগে উল্লেখযোগ্য অনিমেশ রায়ের[১] "বুদ্ধিবিলাসীর ডায়ালেকটিক" নিবন্ধটি। এই স্বল্প পরিসর নিবন্ধটিতে 'নিরপেক্ষ' আইয়ুবের ছদ্মবেশ ছিঁড়ে অনিমেশবাবু তাঁর ডলারী আত্মাকে নগ্ন করে দেখিয়ে দিয়েছেন। ব্যাঙ্গে বিদ্রূপে এবং সুতীক্ষ্ণ যুক্তিতে মার্কসবাদী বিপ্লবী নীতিটি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে এই প্রবন্ধে।

মার্কসবাদী বিতর্কনীতি আত্মরক্ষামূলক নয়, সর্বদাই আক্রমণাত্মক। লেনিন কখনও অধ্যাপকসুলভ মুরুব্বীয়ানায় প্রতিপক্ষের ভুল ধরিয়ে দিয়ে ক্ষান্ত হননি—ব্যাঙ্গ-বিদ্রূপের তীব্র কষাঘাতে তাদের ধরাশায়ী করেছেন, প্রতিপক্ষের হাঁটু ভেঙে দিয়েছেন যাতে তারা কখনও আর উঠে দাঁড়াতে না পারে। আর এই ভাবেই লেনিন তাঁর স্বমত প্রতিষ্ঠা করেছেন। মার্কসবাদীরা নখদন্তহীন তৃণভোজী বা নপুংসক অহিংসবাদী নয়, প্রত্যেকটি আঘাতকে দ্বিগুণ জোরে ফিরিয়ে দেওয়াই তাদের নীতি। কারণ (অনিমেশবাবুর ভাষায়) মানুষ ভুলিয়ে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাওয়া যে সব দার্শনিকদের পেশা তাদের প্রতি সম্পূর্ণ নিষ্করুণ হওয়া প্রত্যেক মানব হিতৈষীর প্রয়োজন।

সাতমাস পর হলেও, সংগ্রামশীল লেখকেরা বিষ্ণু দের কুৎসার জবাব দিতে পেরেছেন পরিচয়ের পৃষ্ঠায় (বৈশাখ ১৩৫৬, "মার্কসবাদের নয়া ভাষ্য"—নরহরি কবিরাজ)। মার্কসবাদের সংগ্রামী পতাকার নীচে দাঁড়িয়ে বিষ্ণু দের মার্কসবাদী সিংহচর্ম ছিঁড়ে বুর্জোয়া ছাগশিশু রূপটিকে নগ্ন করে ধরে দিয়েছেন নরহরিবাবু। অসংখ্য উদ্ধৃতির সাহায্যে তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন 'মার্কসবাদী' বিষ্ণু দে আর 'সৌন্দর্যবাদী' বুদ্ধদেব বসু পচা বুর্জোয়া ভাববাদেরই এ-পিঠ আর ও-পিঠ।

কিন্তু এ প্রসংগে একটি প্রশ্ন উত্থাপন না করে পারছি না। নরহরিবাবু এক জায়গায় লিখেছেন: "অচিন্ত্যকুমারকে দেখেছি বুর্জোয়া আদালতের হাকিম-সুলভ উদ্দেশ্যহীনতা নিয়ে শ্রমিক-কৃষকের জীবন নিয়ে পুতুল নাচের আসর জমাতে।"

১. নামের বানানটি সঠিক নয়। অনিমেষ রায় প্রখ্যাত মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবী অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্রের ছদ্মনাম। ১৩৫৫-৫৬ সালের 'পরিচয়' দ্রষ্টব্য। সম্পাদক

কিন্তু উদ্দেশ্যহীনতার মিথ্যা অপবাদ কোন ক্ষেত্রেই কি অচিন্ত্যকুমার সম্পর্কে প্রয়োগ করা চলে? তাঁর প্রত্যেকটি গল্প উপন্যাসই কি জনজীবনকে বিকৃত করে দেখানর অসদুদ্দেশ্য প্রণোদিত নয়? 'কাঠ খড় কেরোসিন' থেকে এই সেদিনকার (আজগুবী?) 'একটি গ্রাম্য প্রেমের কাহিনী'—এর মধ্যে উদ্দেশ্যহীন কোনটা? অবশ্য একথা সত্য "কাঠ খড় কেরোসিন" বা "যে যাই বলুক" এর প্রত্যক্ষ কমিউনিষ্ট বিরোধিতা বা 'রাজনীতি' চর্চা একটি "গ্রাম্য প্রেমের কাহিনীতে" নেই—কিন্তু তাই বলেই কি তা উদ্দেশ্যহীন? নরেন্দ্রমিত্রের 'দীপপুঞ্জ' সম্পর্কে যে সমালোচনা করা হয়েছে 'একটি গ্রাম্য প্রেমের কাহিনী' সম্পর্কেও তা প্রয়োজ্য। 'একটি গ্রাম্য প্রেমের কাহিনী'র প্রাকৃতিক বর্ণনাটা গ্রামেরই, তার পাত্র পাত্রীরা গ্রাম্য কৃষকের ভাষায়ই কথা বলে, তবু তারা কেউ গ্রামের লোক নয়, কৃষকের ছদ্মবেশে বুর্জোয়া বিকৃতির প্রতীক। বর্ণনাটা গ্রামের হলেও গল্পটি মোটেই গ্রাম্য কাহিনী নয়—শহরের জলো রোমান্টিক গাঁথুনীর উপর গ্রাম্য মাটির প্রলেপ। এ গ্রামে কোন সমস্যা নেই—আছে শুধু প্রেমের লীলাখেলা। আর গ্রামকে এভাবে দেখানটা মোটেই উদ্দেশ্যহীন নয়, একটি বিশুদ্ধ অসদুদ্দেশ্য রয়েছে এর মূলে। তা হচ্ছে, গ্রামে আসলে কোন সমস্যা নেই, জোতদার নেই, পুলিস ক্যাম্প নেই—রক্তপাত যা তা কমিউনিষ্ট কারসাজি—নলিনী-বিধান চক্রের এই মিথ্যা প্রচারকে সাহিত্য-ভাত করা। তথাকথিত উদ্দেশ্যহীনতাটা একটা ভংগী মাত্র—উদ্দেশ্যহীনতার প্রসাধনে জনতার মন ভুলাবার প্রয়াস। সুতরাং অচিন্ত্যকুমারকে উদ্দেশ্যহীনতার সার্টিফিকেট দেওয়া আসলে তার সুপরিকল্পিত ফাঁদে পা দেওয়া।

সংগ্রামী ঐতিহ্যে উজ্জল আর একটি প্রবন্ধ হল, পিনাকীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সোভিয়েট বায়োলজী' (চৈত্র, ১৩৫৭)।[১] সোভিয়েট জীববিজ্ঞানী লাইসেঙ্কোর একটি যুগান্তকারী আবিষ্কারকে উপলক্ষ্য করে সোভিয়েট-বিরোধী কুৎসার এক নতুন ঝড় উঠেছে। বিলেত আমেরিকার ভাড়াটে বৈজ্ঞানিক থেকে এদেশে সাম্রাজ্যবাদের অতি পুরাতন ভৃত্য 'স্টেটসম্যান' পর্যন্ত বিজ্ঞানের ভবিষ্যত নিয়ে নাকিকান্নায় একেবারে আকাশ বাতাস মুখরিত করে তুলেছে। পিনাকীবাবুর প্রবন্ধ এই সব কুৎসার স্পষ্ট জবাব। তিনি দেখিয়েছেন লাইসেঙ্কোর অপরাধ

১. সালের উল্লেখ সঠিক নয়। দ্র. পরিচয়, চৈত্র ১৩৫৫।—সম্পাদক

তিনি মানুষকে দেবের অসহায় মুখাপেক্ষী করে রাখতে রাজী নন, তিনি মানুষের হাতে এমন হাতিয়ার তুলে দিয়েছেন যার ফলে প্রকৃতিকে পরিবর্তিত করা সম্ভব হবে। সোভিয়েট সরকারের অপরাধ তাঁরা বিজ্ঞানকে মানব নিধনের পিশাচতন্ত্রে নিয়োগ করাকে অপরাধ বলে মনে করেন—তাঁরা মনে করেন প্রকৃতিকে জয় করার হাতিয়ারই বিজ্ঞান। প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রামেই বিজ্ঞানের জন্ম আর এইভাবেই বিজ্ঞান অগ্রগতির পথ বেয়ে এগিয়ে যাবে নব নব আবিষ্কারের জয়রথে, কুসংস্কারাচ্ছন্ন উপ-মানবদের নাকি কান্না সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে। গোর্কীর ভাষায়—'History is zealous and no patron of loafers !'

লোক নাট্য

সংস্কৃতি আন্দোলনে এই সংগ্রামশীল ধারাটি যে ক্রমশই শক্তিশালী হয়ে উঠছে—'লোকনাট্য'[১] তারই স্বাক্ষর। শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামী-আদর্শ লোকনাট্যের প্রতিটি পৃষ্ঠায় সমুজ্জ্বল। সংগ্রামী চেতনায় তার দৃষ্টি অনেক সুস্থির, আবিলতাহীন, সহজ ও স্বচ্ছ। প্রতিক্রিয়ার দুর্গকে সে সোজাসুজি আক্রমণ করেছে আর সে আঘাত যে যথাস্থানে পৌঁছেছে তার প্রমাণ, দু'মাসের মধ্যেই লোক নাট্যের কণ্ঠরোধ। কিন্তু দু'মাস আয়ুষ্কালের মধ্যেই 'লোকনাট্য' সংগ্রামী সংস্কৃতির যে আদর্শটিকে উজ্জ্বল করে তুলে ধরতে পেরেছে তা নিজেকে প্রতিষ্ঠা করবেই—শত সরকারী হামলা তার পথরোধ করতে পারবে না।

প্রধানত গণনাট্য আন্দোলনের মুখপত্র লোকনাট্য। সংগ্রামের প্রয়োজনেই সৃষ্টি হয়েছিল গণনাট্য আন্দোলনের—তার মূল মন্ত্র ছিল Peoples Theatre Stars the People (গণনাট্য জনতাকে তারকায়িত করে)—স্বভাবতই সচেতন মার্কসবাদী শিল্পীরাই ছিলেন এই আন্দোলনের ভগীরথ। মার্কসবাদীদের সংস্কারবাদী বিভ্রান্তি এই আন্দোলনকেও বিপথগামী করে। জনতার আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সার্থক গণনাট্য রচনার চেষ্টা হয় ষ্টুডিওতে বসে। 'সার্থক' শিল্প রচনার মিথ্যা মোহে জনতার আঙ্গিককে বর্জন করে 'ফর্মালিজমে'র

১. 'লোকনাট্য' ১৯৪৯ সালের ফেব্রুয়ারী-মার্চ মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়। দুই সংখ্যা প্রকাশের পরেই সরকার এর কণ্ঠরোধ করেন। —সম্পাদক

বদ্ধ জলায় গাঁজিয়ে ওঠে আন্দোলন। গণনাট্য আন্দোলনের এই মর্মান্তিক অবস্থার বাস্তব বিবরণ ফুটে উঠেছে মৃত্যুঞ্জয় অধিকারীর[১] 'গণনাট্য সংগঠন (১)' শীর্ষক আত্মসমালোচনামূলক প্রবন্ধে— "...মরা শহুরে শিল্পীরা হলেন মাষ্টার আর নবনাট্য আন্দোলনের স্রষ্টারা হলেন ছাত্র।

প্রযোজিত হল নবান্ন, নবজীবনের গান, ভারতের মর্মবাণী, অমর ভারত, আরও কত কি। পেশাদারী রঙ্গমঞ্চ ভাড়া করা হল, অনুষ্ঠান হল পেশাদারী কায়দায়। কৃষক-শ্রমিক-ছাত্র আন্দোলনের সেই বিরাট বৈপ্লবিক শিল্প সৃষ্টির ক্ষেত্র থেকে গণনাট্য সংঘ বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে বসলো। রিহার্শাল হল শো, শো হল রিহার্শাল—এই ঘূর্ণীপাক থেকে আন্দোলনের ব্যাপক ক্ষেত্রে যাবার সময় কোথায়?"

লোকনাট্যের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধও হল এই 'গণনাট্য সংগঠন (১)' ও সলিল চৌধুরীর 'আধুনিক বাংলা গানের ভবিষ্যৎ।'

শেষোক্ত প্রবন্ধটি সম্পর্কেই আমরা প্রথমে আলোচনা করবো। চাঁদ-চামেলী সংক্রান্ত যে নির্জলা ন্যাকামী আধুনিক বাংলা গান নামে এদেশে পরিচিত তা যে ক্রমশ সংগীত-শিল্পকেই স্বাভাবিক অবনতির পথে নিয়ে যাচ্ছে—সলিলবাবু তা সুন্দরভাবে দেখিয়ে দিয়েছেন। তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন যে, এ পথে সংগীতের মৃত্যু অনিবার্য—কারণ, সমস্যা কন্টকিত সংগ্রামোন্মুখ মানুষ বেশীদিন এ ঘুম-পাড়ানিয়া গান বরদাস্ত করবে না। এ পথ শিল্পীর পথ নয়—সংগীত ব্যবসায়ী বুর্জোয়াশ্রেণীর পথ। জনতার সংগ্রামী চেতনাকে ঘুম পাড়িয়ে রাখাটাই তাদের কাছে বড় আর তারি জন্য সংগীত তারা বিকৃত করছে, তাতে সংগীতের মৃত্যু হলে তাদের কিছু যায় আসে না। শিল্পীদের তাই সলিলবাবু স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন: "শিল্পীদের মনে রাখতে হবে তাদের শ্রোতা মুষ্টিমেয় ধনিক নয়, সংগ্রামশীল জনতা।" সুতরাং জনতার আশা আকাংক্ষার সঙ্গে একাত্মকরণ, তাদের সংগ্রামে অংশগ্রহণের মধ্যেই রয়েছে সংগীত-শিল্পের মুক্তি, শিল্পীরও। তাই শিল্পীদের নিছক পেশার খাতিরেও রেডিও-রেকর্ড-সিনেমা মালিকদের প্রতিরোধ চূর্ণ করে সংগীতকে এই পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

---

১. এটি ছদ্মনাম। গণনাট্য সংঘের তৎকালীন সম্পাদক সজল রায়চৌধুরীই ছদ্মনামে রচনাটি লেখেন। —সম্পাদক

তবে সলিলবাবু এক জায়গায় লিখেছেন, "চ্যাংড়া, চোরাবাজারির পয়সায় উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপনে অভ্যস্তদের জীবন-দর্শন আছে এই সমস্ত গানে।" বোঝা দরকার এই 'চ্যাংড়া দর্শনই' আজকের বুর্জোয়াশ্রেণীর জীবন-দর্শন। এই চ্যাংড়ামিই বুর্জোয়া শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। সলিলবাবুর উক্তির মধ্যে এই উপলব্ধি পরিস্ফুট নয়।

পূর্বেই বলেছি মৃত্যুঞ্জয়বাবুর প্রবন্ধ গণনাট্য আন্দোলনের আত্ম-সমালোচনা। সার্থক শিল্পের বুর্জোয়া বুলির ভাওতায় গণনাট্য আন্দোলন কিভাবে লক্ষ্যভ্রষ্ট হল, কি ভাবে গণনাট্য আন্দোলনের নেতৃত্ব বুর্জোয়া-শিল্পীদের লেজুড় হয়ে উঠলো—মৃত্যুঞ্জয়বাবু নির্মমভাবে তা দেখিয়ে দিয়েছেন। এবং এই আত্ম-সমালোচনার মধ্য দিয়ে মোটামুটি সঠিক পথের নির্দেশও তিনি তুলে ধরতে পেরেছেন—ষ্টুডিওতে বসে শিল্প রচনা নয় "প্রতিটি লড়াইয়ের ব্যারিকেডে যে সংস্কৃতি রচিত হচ্ছে তাকেই সর্বাপেক্ষা অধিক মূল্য দিতে হবে।" পেশাদারী শিল্পীদের নয়, "এই সমস্ত সংগ্রামের শিল্পী কর্মীদের নেতৃত্বের পদে আনতে হবে।"

কিন্তু মৃত্যুঞ্জয়বাবুর প্রবন্ধে কতকগুলি ত্রুটি থেকে গেছে। আর তারি ছিদ্রপক্ষে সংস্কারবাদ তার আক্রমণ চালাচ্ছে। তাঁর প্রবন্ধ পড়ে মনে হবে, গণনাট্য আন্দোলন বিপথগামী হবার জন্য সবটা দোষই যেন পেশাদারী শিল্পীদের। আসলে মার্কসবাদী নেতাদের মার্কসবাদ থেকে বিচ্যুতি ও বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের কাছে আত্মসমর্পণই এর জন্য দায়ী। আর এই লেজুড় মনোবৃত্তির জন্যই পেশাদারী শিল্পীদের শিক্ষিত করার পরিবর্তে গণনাট্য আন্দোলনের নেতৃত্ব এদের বুর্জোয়া কুসংস্কারের তোয়াজ করেছেন—না হলে কি সাধ্য গুটিকয়েক পেশাদারী শিল্পীর যে তারা গণনাট্য আন্দোলনকে বিপথগামী করবে? নেতৃত্বের নিজেদের দুর্বলতা স্বীকার না করলে আত্মসমালোচনা কখনই ফলপ্রসূ হতে পারে না।

সংস্কারবাদের ভূত

এলাহাবাদ সম্মেলনে[১] গণনাট্য আন্দোলন সংস্কারবাদের যে ভূতটাকে কাঁধ

১, ১৯৪৯ সালের ৪ ফেব্রুয়ারী থেকে ৯ ফেব্রুয়ারী এলাহাবাদে গণনাট্য সংঘের ষষ্ঠ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলন সম্পর্কে 'পরিচয়' পত্রিকায় হেমাঙ্গ বিশ্বাসের "গণনাট্য সম্মেলন" শীর্ষক নিবন্ধটি উল্লেখ্য।. [পরিচয়, ফাল্গুন ১৩৫৫, পৃঃ ৪৭৫-৭৮ দ্রষ্টব্য]—সম্পাদক

থেকে নামিয়ে রেখে এসেছে, তা যে এখনও তাদের সঙ্গ ছাড়ে নি, পুনরায় কাঁধে চড়ার সুযোগের সন্ধানে আছে তারি প্রমাণ ফাল্গুন-চৈত্রের 'লোকনাট্যে' প্রকাশিত সুরপতি নন্দীর আলোচনা, 'গণনাট্য সংগঠন (২)'। মৃত্যুঞ্জয়বাবুর প্রবন্ধের যে দুর্বলতা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি, সেই দুর্বল স্থান থেকেই সুরপতিবাবু সংস্কারবাদী প্রতি-আক্রমণ সুরু করেছেন। তিনি লিখেছেন—"কি করে মুষ্টিমেয় কয়েকজন শিল্পী এসে এত বড় আন্দোলনকে ভুলপথে চালিত করে দিল তা ধারণাতীত।" সুরপতিবাবুর এই প্রশ্ন খুবই সঙ্গত হত যদি এর থেকে তিনি সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছাবার চেষ্টা করতেন। কিন্তু তিনি তা করেন নি। মৃত্যুঞ্জয়বাবুর দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তিনি তার সংস্কারবাদী দৃষ্টিকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, গণনাট্য আন্দোলন মোটেই বিপথগামী হয় নি, "গণনাট্য সংঘ কোনদিনই নিজেদেরকে পেশাদারী শিল্পী দাদাদের কাছে বিক্রী করেনি।" তাঁর মতে, "গণনাট্য সংঘের অতীতের বিভিন্ন শিল্প সৃষ্টিকে গণনাট্য সংঘের ভুল পথে চলার দৃষ্টান্ত হিসাবে তুলে ধরাও অত্যন্ত মারাত্মক রকমের ভুল।" এর পর পাছে তাকে সংস্কারবাদী বলা হয়, এ জন্য তিনি গণনাট্য আন্দোলনের 'দুর্বলতা'ও (ভুল নয়) দেখিয়ে দিয়েছেন এবং এই 'দুর্বলতা' দূর করার জন্য একটা 'কর্মসূচী'ও উপস্থিত করেছেন। সুরপতিবাবুর মতে গণনাট্য সংঘের 'দুর্বলতা' ছিল যে তারা "নিরক্ষর শ্রমিক-কৃষকদের মধ্যে নিজেদের অনুষ্ঠান পরিবেশন করল না।"

এখন দেখা যাক, গণনাট্য সংঘের এই অতীত 'শিল্প সৃষ্টি' যাকে 'ভুল বলে দেখান মারাত্মক ভুল'—তার আসল চরিত্রটা কি। সুরপতিবাবু এ প্রসঙ্গে গণনাট্য সংঘের 'গৌরবময়' ঐতিহ্য হিসাবে নবান্ন, নবজীবনের গান ইত্যাদির উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ এগুলো নিরক্ষর শ্রমিক কৃষকের মধ্যে পরিবেশন করলেই গণনাট্য সংঘের আর কোন 'দুর্বলতা' থাকত না।

গণনাট্য সংঘের এই তথাকথিত ঐতিহ্য প্রথমে খতিয়ে দেখা যাক। 'অগ্রণীর' জনৈক সমালোচকও 'লোকনাট্যে' 'নবান্নের' অবদানের স্বীকৃতি না থাকায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। সুতরাং প্রথমে 'নবান্ন'রই আলোচনা করা যাক।

'নবান্ন' নাটকে যে কৃষককে আমরা দেখি, দুর্ভিক্ষপীড়িত সে কৃষক মরে কিন্তু লড়ে না, লড়াইয়ের চিন্তাও করে না। 'নবান্ন' নাটক কাঁদায়, কিন্তু দুর্ভিক্ষ

শস্তিকারীদের বিরুদ্ধে ক্রোধ উদ্দীপ্ত করে না। কি করে করবে? দুর্ভিক্ষের জন্ত দায়ী প্রধান আসামী বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদই যে সেখানে অনুপস্থিত। যাদের দেখি—মজুতদার, নারী-ব্যবসায়ী—তারা ঘৃণ্য বটে কিন্তু তারা বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিমাত্র, কোন শ্রেণীর প্রতিভূ নয়। আর বাঁচবার পথ?—(যা নাটকের শেষে জোর করে জুড়ে দেওয়া একটা ক্রোড়দৃশ্য) সব জমি এক করে চাষ করো তাহলেই সব দুঃখ কষ্ট মিটে যাবে। অর্থাৎ কোন লড়াইয়ের দরকার নেই, শ্রেণী-সংগ্রাম মিছে কথা। অল্প কথায়, এই হল নবান্ন নাটকের বিষয়বস্তু। এর মধ্যে বিপ্লবটা কোথায়? কৃষক পাত্রপাত্রী নবান্ন নাটকে পাদপ্রদীপের সামনে এসেছেন তা সত্যি, তাঁরা কৃষকের ভাষায় কথা বলেছেন এটাও ঠিক; কিন্তু তবু কি তাঁরা কৃষকের কথা বলেছেন? শ্রমিক কৃষক নিয়ে নাটক রচনাই কি গণনাট্যের শেষ কথা? তাহলে 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা'কে গণসাহিত্য বলতে দোষ কি? আসলে জনতাকে নিয়ে লিখলেই বিপ্লবী নাটক বা বিপ্লবী উপন্যাস হয় না। জনতাকে নিয়ে কি লেখা হল, সে জনতার শ্রেণীচরিত্র যথার্থভাবে ফুটেছে কি না, শত্রুর বিরুদ্ধে সে নাটক হাতিয়ার হয়ে ওঠে কিনা—এইটাই বিপ্লবী নাটকের মূল কথা। এই ভাবে বিচার করলে, নবান্নকে কি বিপ্লবী নাটক বলা যায়? না তা নিয়ে গর্ব করা শোভা পায়? তার উপর আঙ্গিকের দিক থেকেও নাটকটি এমনভাবে রচিত যে নাটমঞ্চের বাইরে তার অভিনয় এক প্রকার অসম্ভব।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, এই ত্রুটির জন্য লেখকদের দোষ দেওয়া যায় না, কারণ এইটাই ছিল সে সময় মার্কসবাদীদের রাজনীতি। লেখকদের দোষ দিতে কেউ বলছে না। তাই বলে, যে ভুল রাজনীতিকে বর্জন করা হয়েছে, যে রাজনীতিকে ধিক্কার দেওয়া হচ্ছে—লেখকদের দোষ নেই অজুহাতে তার প্রচারটাকে আঁকড়ে থাকতে হবে, তা নিয়ে গর্ব করতে হবে?

কিংবা ধরা যাক, বহুকথিত 'ভারতের মর্মবাণী'র দৃষ্টান্ত। এই নৃত্যনাট্যের 'মর্মবাণী' আসলে জওহরলাল 'আবিষ্কৃত' ভারতেরই প্রেতাত্মা। এই নৃত্যনাট্যেরও বক্তব্য, ভারতের মর্মবাণী অপরিবর্তনীয়—ভারতেতিহাসের অব্যাহত স্রোতের মধ্য দিয়ে তা যুগে যুগে সত্য হয়ে উঠেছে। একে ইতিহাসের অপব্যাখ্যা ছাড়া আর কি বলা যায়? ভারতের ইতিহাসে যেন কোন উত্থান-পতন নেই, শ্রেণী-দ্বন্দ্ব নেই, মসৃণ পথ বেয়ে যেন যুগ থেকে যুগান্তরে

তা প্রবাহিত। ইংরেজদের শাসনই শুধু যা কিছু ব্যাঘাত সৃষ্টি করেছে, তাতেও ভারতের মর্মবাণী লুপ্ত হয়নি, হয়েছে অন্তঃসলিলা। ভারতের সেই মর্মবাণীকে উদ্ধার করার জন্যই সব সংগ্রাম—কিন্তু সে মর্মের বাণীটি কি? তা শ্রেণী-সাম্যের বাণী, শ্রেণী-সমঝওতার বাণী। অর্থাৎ, কি ছিল সেই ভারত বলে হাপুস নয়নে কাঁদতে হবে, জওহরলাল আবিষ্কৃত প্রেতাত্মার প্রতিষ্ঠার জন্যই। অর্থাৎ ঐতিহাসিক বস্তুবাদ ভারত সম্পর্কে প্রয়োজ্য নয়—মার্কসবাদ এদেশে অচল।

ইতিহাসের এই বুর্জোয়া বিকৃতির পুংখানুপুংখ জবাব কমরেড ডাঙ্গের বই। কমরেড ডাঙ্গে বিভিন্ন সংস্কৃত গ্রন্থ এবং প্রধানত রামায়ণ-মহাভারত বিশ্লেষণ করে দেখিয়ে দিয়েছেন, ভারতেতিহাসের বুর্জোয়া ভাষ্যে আর যাই থাক ইতিহাস নেই। ভারতেতিহাসও আদিম সমাজবাদ, মাতৃতন্ত্র, পিতৃতন্ত্র, গোষ্ঠী সমাজ থেকে দাসতন্ত্র—এই সব পরিচিত পথ ধরেই অগ্রসর হয়েছে—এই অগ্রসরের ধারাটিও অব্যাহত নয়। সংঘর্ষের মধ্য দিয়েই তা উৎক্রান্ত হয়েছে এক স্তর থেকে আর এক স্তরে। ভারতের মর্মবাণীও তাই শাশ্বত নয়—রূপান্তরিত হয়েছে তা যুগে যুগে, রূপান্তরিত হচ্ছে তা আজও। সেই রূপান্তরিত মর্মবাণী আজ সমাজবাদ। সুতরাং নৃত্যনাট্য 'ভারতের মর্মবাণী' আসলে জওহরলাল প্যাটেলের মর্মকথা, বিড়লা গোয়েঙ্কার বাণী— ভারতের সঙ্গে তার কোন সম্পর্কে নেই।

এই সমস্ত "শিল্প সৃষ্টি" নিরক্ষর শ্রমিক-কৃষকের মধ্যে পরিবেশন করলেই কি সব দোষ খণ্ডিত হয়ে যেত? বরং ফল উলটোই হত—শ্রমিক-কৃষকের সুস্থ শ্রেণী-চেতনাকে তা কলুষিত করত। সে দিক থেকে এই না দেখানটাকে শাপে বরই বলতে হবে।

গণনাট্য সংঘের 'দুর্বলতা' সম্পর্কে যার ধারণা এরূপ—তার উপস্থাপিত কর্মসূচী যে কি হবে তা সহজেই অনুমেয়। সুরপতিবাবু যে তিনদফা কর্মসূচী উপস্থিত করেছেন তার মোদ্দা কথা এই যে, ভবিষ্যতে 'সুপরিকল্পিত' (?) ভাবে এবং অধিকাংশ অনুষ্ঠানই শ্রমিকদের মধ্যে করতে হবে, যেখানে গণনাট্য সংঘ অনুষ্ঠান করবে সেখানে শাখা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করতে হবে—সেখানকার কোন 'একক প্রতিভা'কে সংঘের অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করতে হবে। এই শাখা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ট্রেড ইউনিয়ন, কিসান সভা, ছাত্র ফেডারেশন প্রভৃতির সঙ্গে বসে একসঙ্গে পরিকল্পনা করা যেতে পারে। নতুন সৃষ্টি ও স্রষ্টার জন্য সব সময়

নজর দিতে হবে। যাত্রার দল, কবি গান, কাজরী ইত্যাদি গানের দলকে সংঘের মধ্যে আনার জন্য সংগঠক প্রেরণ করতে হবে। এবং জনতার জীবন থেকে 'নিরলসভাবে' শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। এই হল স্বরপতিবাবুর পাল্‌টা 'কর্মসূচী'।

অর্থাৎ তিনি অনুষ্ঠান করবেন শ্রমিকদের মধ্যে—শ্রমিকদের নিয়ে নয়। শিল্প রচনার ব্যাপারে তিনি গণপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বসে পরিকল্পনা করবেন না—গণ-প্রতিষ্ঠানগুলি শুধু তাঁদের লোক ধরে দেবে। যাত্রা দল, কবিয়াল ইত্যাদির মধ্যেই তিনি 'নতুন সৃষ্টি ও স্রষ্টার' সম্ভাবনা খুঁজবেন—আন্দোলনের মধ্যে নয়, 'নিরক্ষর শ্রমিক-কৃষকের মধ্যে নয়।' জনসাধারণের জীবন থেকে তিনি নিরলস ভাবে শিক্ষা নেবেন (অবশ্য দূরে থেকে—ষ্টুডিওতে বসে)—এটুকু 'কনশেসন' তিনি মৃত্যুঞ্জয়বাবুকে দিতে প্রস্তুত আছেন।

কিন্তু এ 'কনশেসন' দেওয়াও যে আসলে তাঁর অভিপ্রেত নয়—নিচের উদ্ধৃতি থেকেই তা বোঝা যাবে। তিনি লিখেছেন :

"ভবিষ্যতের কার্যক্রম সম্বন্ধে তিনি (মৃত্যুঞ্জয়বাবু) বলেছেন যে, 'শ্রমিক-কৃষকের মধ্যে যেতে হবে,' 'গণনাট্য সংঘে শ্রমিক-কৃষক নেতৃত্ব গড়তে হবে', 'রক্তের স্বাক্ষরে যে সংস্কৃতি রচিত হচ্ছে তাকেই সর্বাপেক্ষা অধিক মূল্য দিতে হবে', 'প্রতিটি শোষিত মানুষের জীবন ও লড়াইকে মূর্ত করে প্রতিক্রিয়ার সামনে বুক ফুলিয়ে দাড়াও', 'প্রতিটি রাজনৈতিক সংগ্রামে অংশগ্রহণ করতে হবে' ইত্যাদি। কথাগুলি বড়ই অনির্দিষ্ট ও এ ধরনের কথা আমরা বহুবার শুনেছি। কথাগুলি অনেকটা গ্রামে ফিরে যাও বা 'গো ব্যাক টু দি পিপল'-এর মতন।"

দুর্ভাগ্য স্বরপতিবাবুর যে, মার্কসবাদটাই একশ' বছরের পুরোন—বহু শতবার তা শুনতে হচ্ছে। স্বরপতিবাবুর আরও দুর্ভাগ্য যে, গণসংস্কৃতি রচনার পথ এইটাই। দূরে বসে জনতার জীবন থেকে শিক্ষা নেওয়া যায় না—তার জন্য শ্রমিক-কৃষকের জীবনের সরিক হতে হয়, তাদের প্রতিদিনের রাজনৈতিক সংগ্রামে অংশগ্রহণ করতে হয়। গণসংস্কৃতি রচনার স্থান ষ্টুডিও নয়—লড়াইয়ের ময়দান।

এলাহাবাদ সম্মেলনে গণনাট্য সংঘ এই সঠিক কর্মসূচীই গ্রহণ করেছেন। তাঁরা ঘোষণা করেছেন :

…প্রত্যেকটি (গণনাট্য আন্দোলনের) কর্মী হবে সংগ্রামী আন্দোলনের

সাংস্কৃতিক সৈনিক, আর হতে হবে বৃহত্তর লড়াইয়েরও সৈনিক।

হাঁ, এইটাই সত্যকারের গণসংস্কৃতি রচনার পথ। গণসংস্কৃতি রচনা নিভৃত সাধনা নয়—সে সংস্কৃতি রচিত হবে লড়াইয়ের ময়দানে, বুর্জোয়া শ্রেণীর ধ্বংস-স্তূপের উপর। আর এর চেতনাই দিয়েছে 'লোকনাট্যকে' ইস্পাতের তীক্ষ্ণতা। প্রবন্ধ কবিতা থেকে পত্রিকা প্রসঙ্গ সর্বত্রই রয়েছে এই সংগ্রামশীল চেতনার ছাপ। আর তাই তো, 'লোকনাট্যে'র লোককবি[১] সহজ কথাকে সহজ করেই বলতে পেরেছেন ঃ

> নির্বিচারে নরনারী ছাত্র ছাত্রী হত্যা
> এই যদি হয় শিশুরাষ্ট্রের আইন নিরাপত্তা
> তবে আমি সভার মাঝে উচ্চকণ্ঠে কহি
> পাঁচশো হাজার অসংখ্যবার আমি রাজদ্রোহী।

বিষ্ণু দের মত তথাকথিত 'ভদ্র' কবিরা রচনা করুনতো দেখি এমন কবিতা, তাঁদের মুরোদ বুঝি! কিন্তু বিষ্ণুবাবুদের তা সাধ্যাতীত—কোথায় পাবে বুর্জোয়াদের বশংবদ সংস্কৃতিবিদেরা এই প্রাণশক্তি?*

১. এই লোককবির নাম: গুরুদাস পাল। —সম্পাদক

* মার্কসবাদী, চতুর্থ সংকলন, জুলাই ১৯৪৯, পৃ: ১০৯-১৪০; উর্মিলা গুহ ও প্রকাশ রায় একই ব্যক্তি। প্রকাশ রায় বিশিষ্ট সাহিত্যিক-সাংবাদিক প্রদ্যোৎ গুহ-র অন্য ছদ্মনাম। —সম্পাদক

"বাংলা প্রগতি সাহিত্যের আত্মসমালোচনা" / রবীন্দ্র

৪নং মার্কস্‌বাদীতে বাংলা প্রগতি সাহিত্যের যে আত্মসমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল, তার বিরুদ্ধে 'পরিচয়'-এর সম্পাদকমণ্ডলী এবং প্রধান প্রধান লেখকগণ তীব্র প্রতিবাদ তুলেছেন। এই বাদ প্রতিবাদের মধ্যে দু'টি মূল ধারণার বিরোধ দেখা গিয়েছে।

মার্কস্‌বাদীর প্রবন্ধে বলা হয়েছে যে, প্রগতির উৎস খুঁজতে হবে সিপাহী বিদ্রোহ, নীল বিদ্রেহ এবং সাঁওতাল বিদ্রোহ প্রভৃতি যে গণ-বিদ্রোহ দেখা গিয়েছে তার ভিতর। কয়েকজন লেখক মার্কস্‌বাদীতে প্রকাশিত ঐ প্রবন্ধের প্রতিবাদ করে বলেছেন যে, প্রগতির উৎস খুঁজতে হবে বঙ্কিম-বিবেকানন্দ-রবীন্দ্রনাথের ভিতর। উক্ত লেখকগণ সিপাহী বিদ্রোহ, নীল বিদ্রোহ এবং সাঁওতাল বিদ্রোহ প্রভৃতি গণ-বিদ্রোহের বিপ্লবী ভূমিকা অস্বীকার করেছেন। তাঁরা মন্তব্য করেছেন যে, মার্কস্‌বাদীর ঐ চিন্তাধারা "'অতি বামপন্থী" এবং মার্কস্‌বাদ বিরোধী। মার্কস্‌বাদী ঘোষণা করছে যে, এই লেখকগণের চিন্তাধারা বুর্জোয়া-সংস্কারপন্থী এবং হিন্দু 'রিভাইভালিস্ট'। ৪নং মার্কস্‌বাদীতে প্রকাশ রায় 'বাংলা প্রগতি সাহিত্যের আত্মসমালোচনা'য় যা যা লিখেছেন তার সমস্ত খুটিনাটিই যে নির্ভুল তা নয়, কিন্তু তাঁর প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি সঠিক।

শ্রীমঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় এক পত্রে লিখেছেন:

"কিন্তু সত্যিই কি আমরা ১৮২৫-৭৫ সালের গণ-বিদ্রোহের ঐতিহ্যকে নির্বাচারে গ্রহণ করতে পারি? ওয়াহাবি ও সিপাহী বিদ্রোহের বৃটিশ বিরোধী চেহারা যেমন সত্যি, তেমনি তাদের নেতৃত্বের ফিউডাল রিভাইভালিস্ট প্রতিক্রিয়াশীল চেহারাটাও সত্যি এবং বেশী সত্যি নয় কি? এক কথায় এদের form (আকৃতি) বৃটিশ বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও এদের content (প্রকৃতি) যে প্রতিক্রিয়াশীল একথা বলা চলে না কি? অথচ ব্যাপক গণ-বিদ্রোহের রূপ নেওয়া সত্ত্বেও, এদের চেয়ে বঙ্কিম-

বিবেকানন্দের হিন্দু রিভাইভালিস্ট আন্দোলন কত মূলগতভাবে পৃথক। এই শেষোক্ত আন্দোলন, বঙ্কিম-বিবেকানন্দের ব্যক্তিগত সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও, মূলত প্রগতিশীল। এর form (আকৃতি) হিন্দু রিভাইভালিজম্ হওয়া সত্ত্বেও content (প্রকৃতি) বৃটিশ বিরোধী বুর্জোয়া জাতীয়তাবোধের দ্বারা উদ্দীপিত।"

রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার জন্য জনতার সশস্ত্র সংগ্রাম হল একটি 'ফর্ম' মাত্র, একটা খোলস ছাড়া আর কিছু নয়। মঙ্গলাবাবুর এই মতের সমর্থনে শ্রীনরহরি কবিরাজ লিখেছেন :

"সিপাহী বিদ্রোহে, নীল বিদ্রোহে, সাঁওতাল বিদ্রোহে এবং ওয়াহাবী বিদ্রোহে ভারতের কৃষকশ্রেণী যে শ্রেষ্ঠ মনুষ্যত্ববোধ, বীরত্ব ও মহত্ত্বের পরিচয় দিয়েছিল, তা কোন্ মার্কসবাদী ঐতিহাসিক অস্বীকার করবে (এই বিষয়ে আমি একাধিক প্রবন্ধ লিখেছি)? কিন্তু মার্কস্‌বাদী ইতিহাসের ছাত্রের এখানেই কর্তব্য শেষ নয়। তাদের দেখতে হবে এই সব বিদ্রোহের নেতৃত্বের মতাদর্শ কোন্ শ্রেণীর মতাদর্শ এবং এই সব বিদ্রোহে কৃষকশ্রেণীর শ্রেণী-চেতনা কোন্ স্তরের?"

এই উপলক্ষে নরহরিবাবু রজনী পাম দত্তের **আজিকার ভারত** নামক বই থেকে উদ্ধৃতির সাহায্যে দেখিয়েছেন যে, সিপাহী বিদ্রোহের নেতৃত্ব ছিল ফিউডাল রক্ষণশীল শ্রেণীর হাতে অর্থাৎ রাজা-মহারাজা-নবাব-উজীর-জমিদারদের হাতে।

এই ইতিহাসটি মিথ্যা ইতিহাস—ইংরেজ শাসকবর্গের শেখানো কথা। বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে সব বিদ্রোহ ও গণ-সংগ্রাম সংঘটিত হয়েছিল তার নেতৃত্ব ফিউডাল জমিদার শ্রেণীর হাতে ছিল না। যদিও তাদের কোন কোন অংশ কোথাও কোথাও বিদ্রোহীদের পক্ষ সমর্থন করেছিল, তাদের প্রধান অংশটা সমর্থন করেছিল ইংরেজ শাসনকে। ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র কৃষক বিদ্রোহ এবং নীলকরওয়ালা সাহেবদের বিরুদ্ধে খেতমজুর ধর্মঘটের ভিতর দিয়েই ভারতে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির ঐতিহ্য তৈরী হয়েছিল—এই সত্যকথাটা অস্বীকার ক'রে, সে গৌরব ইংরেজ-শাসনের অনুগত এবং বঙ্কিম-বিবেকানন্দের উপর চাপালে শুধু মার্কস্‌বাদ বর্জন করা হয় না, ভারতীয় জনসাধারণের নিকট ইতিহাস বিকৃত করার অপরাধে

অপরাধী হতে হয়। মার্কস্‌বাদের মহান প্রবর্তনকারী কার্ল মার্কস্‌ নিজে ভারতীয় ইতিহাসের যে কাঠামো রচনা ক'রে গেছেন তাতেই তিনি এই মূলনীতি ঘোষণা করে গেছেন :

"১৮৫৩ সালে, 'ভারতে বৃটিশ শাসনের ভবিষ্যৎ ফল' নামক প্রসিদ্ধ প্রবন্ধে মার্কস্‌ ঘোষণা করেন যে, ভারতীয় জনসাধারণের সমগ্র ইতিহাস তাদের সামনে এই একটি প্রধান কর্তব্য উপস্থিত করেছে– সে কর্তব্য হচ্ছে বিদেশীর ঔপনিবেশিক শাসন বলপূর্বক উচ্ছেদ করা। জাতীয় স্বাধীনতা অর্জন—এই যে প্রধান কর্তব্যটি ভারতীয় জনসাধারণের সামনে আগেও ছিল এবং এখনও আছে—এই কর্তব্যের দাঁড়িপাল্লাতেই মার্কস্‌ ইতিহাসে মানুষ এবং ঘটনার প্রকৃতি বিচার করে গেছেন।"

(**সোভিয়েট ল্যাণ্ড**—৩ নং, পৃঃ ৫)

এই উক্তি করেছেন সোভিয়েটের জনৈক ঐতিহাসিক, প্রফেসার মাইকেলোভিচ—১৯৪৮ সালের ডিসেম্বর মাসে মস্কো শহরে ভারতীয় ইতিহাস আলোচনার জন্য আহূত এক সম্মেলনে।

পরিচয়ের পরিচালকগণ খুব সঙ্গত প্রশ্নই তুলেছেন—সিপাহী বিদ্রোহের শ্রেণীভিত্তি কি ছিল—কোন্‌ শ্রেণীর কোন্‌ আদর্শ এই বিদ্রোহের নায়ক এবং বাহক ছিল? ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের সময় কার্ল মার্কস তার গতিবিধি বিশ্লেষণ করে তার সঠিক বিবরণ নিজের এক পাণ্ডুলিপিতে লিখে রেখে গেছেন—ভারতের সেই অগ্নিযুগের সত্যকার ইতিহাস তাতেই লিপিবদ্ধ আছে। তারই বিবরণ দিয়ে প্রফেসার মাইকেলোভিচ বলেছেন :

"যে স্বদেশভক্তেরা বীরত্বের সঙ্গে দেশরক্ষা করেছিল তাদের মহৎ খ্যাতির পুনরুদ্ধার সাধন ক'রে মার্কস্‌ অত্যন্ত রাগ এবং ঘৃণার সঙ্গে দেশীয় রাজন্যবর্গের বিশ্বাসঘাতকতার স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করে গেছেন। এরা ১৮৫৭-৫৯ সালের জাতীয় বিদ্রোহের সময় বৃটিশের পক্ষ নিয়েছিল, তারা বৃটিশকে সাহায্য করেছিল তাদের স্বদেশবাসীর উপর বৃটিশের শাসনভার চাপাতে। সিন্দিয়া 'বৃটিশ কুকুর'দের প্রতি বিশ্বস্ত ছিল কিন্তু তার সিপাহীরা তা ছিল না। আর কি অপমানের কথা, পাতিয়ালার মহারাজা বৃটিশের সাহায্যের জন্য 'একটি বৃহৎ বাহিনী পাঠিয়ে দিয়েছিল'। তার পর বৎসর ১৮৫৮ সালের ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করে তাঁর নোটে মার্কস্‌ লিখেছেন,

'২রা জুন যুবক সিন্দিয়া (বৃটিশের বিশ্বস্ত কুকুর) তার নিজের সৈন্যগণ কর্তৃক ঘোরতর যুদ্ধের পর গোয়ালিয়র থেকে বিতাড়িত হয়েছিল এবং নিজের জান বাঁচাবার জন্য সে পালিয়ে গিয়েছিল আগ্রায়'।

(**সোভিয়েট ল্যাণ্ড—৩ নং, পৃঃ ৫**)

১৮৫৩ সালেই মার্কস্ ভারতের তৎকালীন ইতিহাসের ঘটনাবলী পরীক্ষা ক'রে এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হয়েছিলেন যে, "দেশীয় রাজারা অত্যাচারী বৃটিশ শাসনের অত্যন্ত শক্তিশালী স্তম্ভ এবং ভারতীয় প্রগতির প্রচণ্ড বাধা।"

সিপাহী বিদ্রোহের নেতৃত্ব শ্রেণী হিসাবে ফিউডাল প্রতিক্রিয়াশীলদের হাতে ছিল না, ফিউডাল প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণীর প্রধান অশংটা ১৮৫৩ সালেই বৃটিশ শাসনের স্তম্ভ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ভারতীয় প্রগতির প্রধান শত্রু বৃটিশ শাসন এবং তার স্তম্ভ ফিউডাল রাজন্যবর্গ। ভারতে প্রগতির উৎস খুলে দিয়েছিল সেই বীর গণ-বিদ্রোহীরা যারা ছিল যোদ্ধার বেশ পরিহিত কৃষক।

আমাদের দেশের মার্কস্‌বাদী থিওরিস্টদের মনে সবচেয়ে বড় গোলযোগ দেখা দিয়েছিল এই জন্য যে, বিদ্রোহী সিপাহীরা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র স্থাপনের চেষ্টা করেনি, তারা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল বাহাদুর শাহ্‌কে বাদশার মসনদে বসিয়ে। মার্কস্ কিন্তু এ ব্যাপারে মোটেই বিচলিত হননি। বরং তিনি এই দেখে উৎসাহিত হয়েছিলেন যে, বিদ্রোহী হিন্দু সিপাহীরা মুসলমান বাদশাহ্‌কে বাদশাহ্ বলে মেনে মুসলমান সিপাহীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করেছিল। এটাই সিপাহী বিদ্রোহের সবচেয়ে বড় বিপ্লবী প্রকৃতি। বাহাদুর শাহ্‌-এর বাদশাহী সত্ত্বেও সে অভ্যুত্থানের প্রকৃতি ছিল প্রগতিশীল, কারণ বিদেশী শাসনের উচ্ছেদ এবং হিন্দু-মুসলমান ঐক্য ছিল তার বাস্তব উপকরণ। বৃটিশ বিরোধী সংগ্রামের এই ঐতিহ্যকেই বহন করে চলেছিল বাঙলার নীল বিদ্রোহ ও সাঁওতাল বিদ্রোহ। যে "মতাদর্শ" নিয়ে বিদ্রোহীরা লড়েছিল তা নিশ্চয়ই "ইংরেজের পদলেহী কুকুর" সিন্দিয়া-পাতিয়ালার ফিউডাল রাজন্যবর্গের মতাদর্শ নয়, তা নবজাগ্রত বুর্জোয়া শ্রেণীর—কৃষক-বুর্জোয়ার মতাদর্শ।

পরিচয়ের কয়েকজন লেখক সিপাহী বিদ্রোহকে প্রগতিশীল বলে মেনে নিতে রাজী নন যেহেতু সিপাহীদের প্রোগ্রামে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের উল্লেখ ছিল না এবং যেহেতু সিপাহীরা একজন বাদশাহ্‌কে সিংহাসনে বসাবার পরিকল্পনা গ্রহণ

করেছিল। এই জন্য তাঁরা বলেন যে, বিপ্লবটা হোল ওর 'ফর্ম' মাত্র, ওর 'কনটেণ্ট' হোল প্রতিক্রিয়াশীল। বিপ্লবের চরিত্র বিচারের এই নীতি সম্পূর্ণ লেনিনবাদ বিরোধী। কমরেড স্টালিন বলেছেন :

> "সাম্রাজ্যবাদী অত্যাচারের মধ্যে জাতীয় আন্দোলনের প্রকৃতি বৈপ্লবিক হলেই তা থেকে ধরে নেওয়া যায় না যে, ঐ আন্দোলনের মধ্যে শ্রমিকশ্রেণী আছে, ঐ আন্দোলনের বৈপ্লবিক বা সাধারণতান্ত্রিক কর্মসূচী আছে কিংবা ঐ আন্দোলনের গণতান্ত্রিক ভিত্তি আছে। আফগানিস্তানের আমীর আর তাঁর সঙ্গীদের রাজতন্ত্রী দৃষ্টিভঙ্গি সত্ত্বেও তিনি আফগানিস্তানের স্বাধীনতার জন্য যে লড়াই চালাচ্ছেন, বাস্তব অবস্থা বিচারে সেটা **বিপ্লবী** লড়াই ; কারণ তাতে সাম্রাজ্যবাদ দুর্বল হচ্ছে, ভেঙে পড়ছে, তার ভিৎ নড়ে উঠছে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের সময় কেরেনস্কি আর জেরিটেলি, রেনোডেল আর শিডম্যান, চের্নভ আর ড্যান, হেণ্ডারসন আর ক্লাইনেসের মত "বাঘা" গণতন্ত্রী, "সমাজতন্ত্রী", "বিপ্লবী" ও সাধারণতন্ত্রীরা যে লড়াই চালিয়েছিল তা ছিল **প্রতিক্রিয়াশীল** লড়াই ; কারণ তাতে সাম্রাজ্যবাদের উপর চূণকাম করা হয়েছিল, তাকে জোরদার এবং জয়ী করা হয়েছিল।"
>
> (**লেনিনবাদের ভিত্তি**—বাংলা সংস্করণ, পৃঃ ৮৮-৮৯।
> বড় হরফ স্টালিনের নিজের।)

কমরেড স্টালিনের এই বৈজ্ঞানিক নীতি অনুসারে সিপাহী বিদ্রোহ এবং নীল বিদ্রোহই ছিল বাস্তবিক পক্ষে বিপ্লবী কারণ তা বিদেশী শাসনের গায় ফাটল ধরিয়ে দিয়েছিল আর রামমোহন-বঙ্কিম-বিবেকানন্দের আন্দোলনই ছিল প্রতিক্রিয়াশীল, কারণ তার ফল হল বিদেশী শাসনের গায়ে আস্তর লাগিয়ে তাকে শক্তিশালী করা।

সিপাহী বিদ্রোহ এবং নীল বিদ্রোহ প্রভৃতি সংগ্রামের ঢেউ সৃষ্টি করল এমন একটা প্রগতিশীল অধ্যায় যার প্রভাব এবং যার মর্মবাণী নিয়েই রচিত হয়েছে বাঙলার প্রগতিশীল সাহিত্য।

এই প্রগতিশীল সাহিত্যিকদের মধ্যে দুজন প্রধান—তাঁদের নাম কালীপ্রসন্ন সিংহ এবং দীনবন্ধু মিত্র।

ইংরেজ শাসনের যাঁরা সমর্থনকারী ছিলেন কালীপ্রসন্ন সিংহের সাহিত্যে তাঁদের বিরুদ্ধে বিদ্রূপ ফুটে ওঠে এবং ব্যক্তিগত ভাবে তিনি নীল বিদ্রোহের প্রতি

মহানুভূতি ঘোষণা করেছিলেন। সিপাহী বিদ্রোহের সময় শিক্ষিত বাঙালী মধ্যবিত্ত সরকারের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করলে তার স্বরূপ উদ্ঘাটিত করে কালীপ্রসন্ন সিংহ তার 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা'য় লেখেন :

"লক্ষৌয়ের বাদশাকে কেল্লায় পোরা হলো, গোরারা সময় পেয়ে দুচার বড় বড় ঘরে লুটতরাজ আরম্ভ কল্লে, মার্শাল ল জারি হল, যে ছাপা যন্ত্রের কল্যাণে হুতোম নির্ভয়ে এত কথা অক্লেশে কইতে পাচ্চেন সে ছাপা যন্ত্র কি রাজা, কি প্রজা, কি সেপাই পাহারা,—কি খেলার ঘর, সকলকে একরকম দেখে, ব্রিটিশকুলের সেই চিরপরিচিত ছাপাযন্ত্রের স্বাধীনতা, মিউটীনি উপলক্ষে, কিছুকাল শিকলি পরলেন। বাঙ্গালীরে ক্রমে বেগতিক দেখে গোপাল মল্লিকের বাড়ীতে সভা করে, সাহেবদের বুঝিয়ে দিলেন যে,—'যদিও একশ বছর হয়ে গেল, তবু তাঁরা আজও সেই হতভাগা ম্যাড়া বাঙ্গালীই আছেন—বহু দিন ব্রিটিশ সহবাসে, ব্রিটিশ শিক্ষায় ও ব্যবহারেও আমেরিকানদের মত হতে পারেন নি। (পারবেন কিনা তারও বড় সন্দেহ)! ...'।"

'হুতোম প্যাঁচার নক্সা' প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৬২ সালে। এই বইখানি সাহিত্য জগতে এক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। সিপাহী বিদ্রোহের প্রতি যে বাঙালী শিক্ষিতেরা বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন তাঁদের এত বড় বিদ্রূপ এর পর কোন নামজাদা সাহিত্যিক করেননি। বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে যে জঙ্গী মনোভাব এতে প্রকাশিত হয়েছে তারই প্রভাবে বাঙলার সাহিত্য বিকশিত হয়ে উঠেছে।

'হুতোম প্যাচার নক্সা'য় নীল বিদ্রোহের প্রসঙ্গ উল্লেখ ক'রে বলা হয়েছে :

"প্যায়াদারা পর্যন্ত ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হয়ে মফস্বলে চললেন। তুমুল কাণ্ড বেধে উঠ্‌লো। বাদাবুনে বাঘ (প্লান্‌টারস্ এসোসিয়েসন) বেগতিক দেখে নাম বদলে (ল্যাণ্ডহোল্ডারস্ এসোসিয়েসন) তুলসীবনে ঢুকলেন। হরিশ মলেন। লংএর মেয়াদ হলো। ওয়েলস ধমক খেলেন। গ্রাণ্ট রিজাইন দিলেন—তবু হুজুক মিটলো না।"

বিদেশী শাসকদের অত্যাচারের মুখোশ খুলে ধরে এবং সহজ বাংলা ভাষায় সাধারণ মানুষের জীবনের কাহিনী ব্যক্ত করে কালীপ্রসন্ন প্রগতির স্রোত প্রবাহিত করেছিলেন। জমিদারদের দুর্নীতি এবং ভণ্ডামি সাহিত্যের ভিতর কালীপ্রসন্ন যেভাবে নগ্ন করে ধরেছিলেন তা আজকালকার প্রগতিশীল

সাহিত্যিকদের পক্ষে শিক্ষণীয়। 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা'য় কালীপ্রসন্ন সিংহ লিখেছেন :

"অনেক পাড়াগেঁয়ে জমিদার ও রাজারা মধ্যে মধ্যে কলিকাতায় পদার্পণ ক'রে থাকেন। নেজামত আদালতে নম্বরওয়ারী ও মৎফরেক্কার তদ্বির কত্তে হ'লে, ভবানীপুরেই বাসার ঠিকানা হয়। কলিকাতার হাওয়া পাড়াগাঁয়ের পক্ষে বড় গরম। পূর্বে পাড়াগেঁয়ে কলিকাতা এলে লোণা লাগ্‌ত, এখন লোণা লাগার বদলে আর একটি বড় জিনিস লেগে থাকে—অনেকে তার দরুণ একেবারে আঁৎকে পড়েন; ঘাগিগোচের পাল্লায় প'ড়ে শেষ সর্বস্বান্ত হয়ে বাড়ি যেতে হয়। পাড়াগেঁয়ে তুই একজন জমিদার প্রায় বারোমাস এইখানেই কাটান; তুপুর বেলা ফেটিং গাড়ি চড়া, পাঁচালী বা চণ্ডীর গানের ছেলেদের মতন চেহারা, মাথায় ক্রেপের চাদর জড়ান, জন দশ বারো মো-সাহেব সঙ্গে, বাইজানের ভেড়ুয়ার মত পোষাক, গলায় মুক্তার মালা; দেখলেই চেনা যায়, ইনি একজন বনগাঁর শিয়াল রাজা, বুদ্ধিতে কাশ্মিরী গাধার বেহদ্দ—বিদ্যায় মূর্তিমান মা!"

৮৭ বছর আগে কালীপ্রসন্ন সিংহ ২২ বছর বয়সে এই কথা লিখেছিলেন জমিদারশ্রেণীর সম্বন্ধে।

রাজনীতিক্ষেত্রে বাংলায় তখন শিক্ষিত সমাজে তুটি দল ছিল—একদল বিনাবাক্যব্যয়ে সরকারকে সমর্থন করত আর একদল সাহেবদের যৎকিঞ্চিৎ সমালোচনা করে "দেশসেবক" সাজত। এদের স্বরূপ নগ্ন করে 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা'য় কালীপ্রসন্ন সিংহ লিখেছেন :

"আজকাল সহরে ইংরেজী কেতার বাবুরা তুটি দল হয়েছেন; প্রথম দল উঁচুকেতা সাহেবের গোবরের গস্ত, দ্বিতীয় ফিরিঙ্গীর জঘন্য প্রতিরূপ।"

এই প্রগতিশীল ভাবধারা নিয়ে কালীপ্রসন্ন সিংহ বাঙলায় প্রথম নাট্যশালা প্রতিষ্ঠা করেন।

দীনবন্ধু মিত্র রচনা করেন 'নীলদর্পণ'। 'নীলদর্পণ' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৬১ খৃস্টাব্দে। নীল বিদ্রোহের কাহিনী নিয়ে সহজ ভাষায় লিখিত 'নীলদর্পণ' তখন বাঙলার সাহিত্য জগতে এক নবযুগ সৃষ্টি করেছিল। বাস্তবভিত্তির উপর সাহিত্য রচনার ভিতর দিয়েই বাংলা সাহিত্যের নবযুগ আরম্ভ হয়। ১৮৭৩ সালের ৭ই নভেম্বর **'ভারত সংস্কারক'** পত্রিকা 'নীলদর্পণে'র উল্লেখ করে

লিখেছিল :

"নীলকর পীড়িত নিরাশ্রয় প্রজাদের জন্য তিনি যাহা করিয়াছেন, তজ্জন্য বঙ্গভূমি তাঁহার নিকট চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকিবে।"

(**সাহিত্য চরিতমালা**—১৮, ১৯, ২১ নম্বর ; পৃঃ ১৬০)

মাইকেল মধুসূদন দত্ত 'নীলদর্পণ' ইংরেজিতে অনুবাদ করেছিলেন। এই অনুবাদখানি পাদ্রী লঙ্ সাহেবের নামে প্রকাশিত হয়েছিল। আদালতে এই অপরাধে লঙ্ সাহেবের ১০০০ টাকা জরিমানা হয়। এই জরিমানার টাকা দিয়েছিলেন কালীপ্রসন্ন সিংহ। কালীপ্রসন্নের মত দীনবন্ধুও তাঁর সাহিত্যে সমাজের প্রতিক্রিয়াশীল কায়েমীস্বার্থের স্বরূপ নগ্ন করে ধরতেন।

'হুতোম প্যাঁচার নক্সা' এবং 'নীলদর্পণ' এই দুইখানিই বাংলা সাহিত্যে যুগান্তকারী রচনা, যার মর্মবাণী ছিল পরাধীন সমাজের স্বরূপ উদ্ঘাটন।

মাইকেল মধুসূদন দত্তও এঁদের মতই বাস্তব এবং প্রগতিশীল সাহিত্য রচনা করে গেছেন। মধুসূদনের 'বুড়ো শালিকের ঘড়ে রোঁ' জমিদারের স্বরূপ যেভাবে নগ্ন করে ধরেছে তাতে হুতোম প্যাঁচার ধারাই বিকশিত হয়ে উঠেছে। তাঁর কাব্যগ্রন্থগুলি দুদিক থেকে প্রাচীন সংস্কৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে—প্রথমত পুরাণের দেবদেবীদের চরিত্র নিয়ে মানুষের মত করে আধুনিক যুগের ভাবধারায় সন্নিবেশিত করা হয়েছে, দ্বিতীয়ত কাব্য রচনার প্রাচীন বাঁধাধরা অনুশাসন অগ্রাহ্য ক'রে তিনি অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্তন করেছেন।

এঁদের সাহিত্যে প্রগতিশীল বুর্জোয়া সংস্কৃতি আত্মপ্রকাশ করেছিল বলিষ্ঠভাবে ; হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য, স্ত্রী-পুরুষের সমান অধিকার এবং বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধাচার—এই ছিল তাঁদের সাহিত্যের বিশেষত্ব। হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে কৃষকের জীবনকাহিনী 'নীলদর্পণে' এবং 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'তে যেভাবে ফুটে উঠেছে তা এদের পর আর কারও সাহিত্যে স্থান পায়নি, পেয়েছে কেবল কাজী নজরুল ইসলাম এবং আধুনিক প্রগতিশীল সাহিত্যিকদের লেখায়। কাজী নজরুল ইসলামের সাম্যের গান এবং বিদ্রোহী কবিতা আদিযুগের এই নবীন সাহিত্যিকদের ধারাকেই বলিষ্ঠতর করে উপস্থিত করেছে। শরৎচন্দ্রের সাহিত্যেরও অধিকাংশ মূলত এই শ্রেণীর অন্তর্গত, কারণ তিনিও জাতীয় স্বাধীনতার আদর্শ, সমাজে প্রাচীন প্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং স্ত্রী-পুরুষের সমানাধিকার বজ্রকণ্ঠে প্রচার করেছেন। শরৎচন্দ্র ছিলেন জাতীয়

বিপ্লবী আন্দোলনের একজন উৎসাহী সমর্থক। কংগ্রেসের ভিতর চরম বামপন্থীদেরই তিনি সমর্থক। এঁরাই হলেন বুর্জোয়া প্রগতির নায়ক, বুর্জোয়া প্রগতির উর্ধ্বে তাঁরা উঠতে পারেননি, কিন্তু বুর্জোয়া প্রগতির বলিষ্ঠতর ধারারই তাঁরা প্রতিনিধি। শরৎচন্দ্র তার শেষ জীবনে বিপ্লবী আদর্শের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলেন, কারণ জাতীয় বিপ্লবের ভবিষ্যৎ পরিণিতি সম্পর্কে তাঁর মনে উন্নততর আদর্শ আর কিছু জাগে না। তাই সাহিত্যক্ষেত্রেও তাঁর শেষ জীবনে প্রতিক্রিয়া আত্মপ্রকাশ করে। এমন কি বাস্তবতা পর্যন্ত নষ্ট হয়ে যায়।

বঙ্কিমচন্দ্র এনেছিলেন কালীপ্রসন্ন-দীনবন্ধুর বিপরীত ধারা। বাস্তবমুখী সাহিত্যের পরিবর্তে তিনি সৃষ্টি করলেন আত্মমুখী ধারা। 'আনন্দমঠ' লেখার জন্য তিনি দেশাত্মবোধের সৃষ্টিকর্তা বলে অভিহিত হয়ে থাকেন। 'আনন্দমঠে'র দেশাত্মবোধ হল আধ্যাত্মিক দেশাত্মবোধ, 'নীলদর্পণে'র দেশাত্মবোধ হল বাস্তব দেশাত্মবোধ। 'আনন্দমঠে'র দেশ শুধু হিন্দুধর্মের দেশ, 'নীলদর্পণে'র দেশে সকল ধর্মের সমান স্থান। 'আনন্দমঠে' ধর্মের স্থান রাজনীতির উপরে, 'নীলদর্পণে' রাজনৈতিক সংগ্রামই মুখ্য।

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যকে বাংলা ভাষার নবযুগ বলে ধরা হয় বাংলা ভাষার অতীত ইতিহাসকে অস্বীকার করা হয় বলে।

ভারতের ইতিহাসে সিপাহী বিদ্রোহ এবং নীল বিদ্রোহ ঘটবার আগে বঙ্কিম সাহিত্য সৃষ্ট হলে তার যে ঐতিহাসিক মূল্য হত, সিপাহী বিদ্রোহ এবং নীল বিদ্রোহের পর তার সে মূল্য হতে পারে না। মার্কস্ এবং এঙ্গেলসের ঐতিহাসিক বস্তুবাদ এই শিক্ষাই দেয় যে, একযুগে যা প্রগতিশীল অন্যযুগে তাই হয়ে দাঁড়ায় প্রতিক্রিয়াশীল। "বিপ্লবই ইতিহাসের চলমান যান" এই কথা বলেছিলেন লেনিন ঐতিহাসিক ঘটনার মূল্য নির্ধারণ করতে গিয়ে। সিপাহী বিদ্রোহ এবং নীল বিদ্রোহ হল এ দেশের প্রথম বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব।

এর পর ভারতের তথা বাঙলার সংস্কৃতি ক্ষেত্রে যে দুটো ধারার সংঘাত দেখা যায় তা হল এই নিয়ে যে, কোন্ পথে ভারতের বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক অগ্রগতি হবে—ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে এবং তাকে অস্বীকার করে অথবা ইংরেজ শাসনের সাহায্যে এবং তার সঙ্গে আপস করে?

কালীপ্রসন্ন সিংহ এবং দীনবন্ধুর সাহিত্য হল প্রথম ধারার বাহক;

বঙ্কিম সাহিত্য হল দ্বিতীয় ধারার নায়ক।

প্রথম ধারাটি মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে অমান্য না করলেও ইংরেজ-রাজের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত বিদ্রোহী কৃষকদের পক্ষ সমর্থন করেছিলেন। তাঁরা বিদ্রোহী না হলেও বিদ্রোহীদের শিবিরেরই পার্টিসান হয়েছিলেন।

দ্বিতীয় ধারাটি হল বিদ্রোহী শিবিরের পরাজয়ের পর বিজেতার শিবিরের পার্টিসান।

ইংরেজ অধিকারের আগে সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতেই বাংলা ভাষায় নূতন গণতান্ত্রিক সাহিত্য তৈরী হচ্ছিল। ভারতচন্দ্র এবং আল্‌ওয়াল যে সাহিত্য রচনা করেছিলেন তার নূতন বৈশিষ্ট্য হল এই যে, হিন্দু এবং মুসলমানের আচার ব্যবহার তার ভিতর সমান সমাদর পেয়েছিল, সাধারণ কৃষকের গান স্থান পেয়েছিল লিখিত সাহিত্যে, পুরাণের দেবদেবীগণ এই সাহিত্যে কৃষক সমাজের সাধারণ নরনারীর চরিত্রে রূপান্তরিত হয়েছিল, গোঁড়া সামাজিক নিয়ম ভেঙে পুরুষ-রমণীর সমান অধিকার ঘোষিত হয়েছিল। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর এবং আল্‌ওয়ালের পদ্মাবতী থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, সমাজে তখন হিন্দু-মুসলমান ভেদ ভেঙে নবজাতি গঠনের পর্যায় সুরু হয়ে গেছে, পুরুষ-স্ত্রীর সমান অধিকার সগৌরবে ঘোষিত হচ্ছে, প্রাচীন অভিজাত শ্রেণীর বদলে কৃষকসমাজ হয়ে উঠেছে সাহিত্য এবং সংস্কৃতিতে প্রভাবশালী। সামাজিক প্রগতির এই ধারা ভারতচন্দ্র এবং আল্‌ওয়ালের কাব্যে সম্পূর্ণ প্রতিফলিত হয়েছে। সংস্কৃত এবং পারসী থেকে আরম্ভ করে কৃষকের কথ্য ভাষা সমস্ত মিলিয়ে নতুন বাংলা ভাষা তখন গড়ে উঠতে আরম্ভ করেছিল। পুরাণ এবং ধর্মগ্রন্থ থেকে লেখকেরা তাঁদের মালমশলা গ্রহণ করলেও পুরাণ এবং ধর্মশাস্ত্রকে তাঁরা নতুন ছাঁচে ঢালাই করছিলেন, চরিত্রগুলিকে সৃষ্টি করছিলেন নতুন ভাবে নতুন সমাজসৃষ্টির উপযোগী করে। তাঁরাই হলেন বাঙলায় আদিম গণতান্ত্রিক সাহিত্যের স্রষ্টা। এই নবসৃষ্টির প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়েছিল পঞ্চদশ এবং ষোড়শ শতাব্দীতেই, তখন সে সৃষ্টি চলেছিল নানারকম ধর্মমতের লড়াইয়ের ভিতর দিয়ে।

সৃষ্টির এই ধারা বাধাপ্রাপ্ত হল ইংরেজ অধিকারে। তারপর ইংরেজি শিক্ষিত নব্য সাহিত্যিকেরা আরম্ভ করলেন সংস্কৃত ভাষার ঐতিহ্যের পুনরুদ্ধার। ভারতচন্দ্র এবং আল্‌ওয়ালের ঐতিহ্য বিসর্জন করে গোঁড়া হিন্দু সংস্কৃতির

বিশুদ্ধতার দিকে ঝোঁক গেল। ইংরেজ শাসকগণের শিক্ষাই প্রাচীন গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যকে ডুবিয়ে দিয়েছিল। তার পর ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে গণ-সংগ্রামের ধাক্কায় জোয়ারের স্রোতের মত আবার গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির নব অভ্যুদয় দেখা দিল। তারই পরিচয় পাই প্রথম কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোমের নক্সা'য় এবং দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণে'। ভারতচন্দ্র এবং আল্‌ওয়ালের লুপ্ত ঐতিহ্য নতুন অবস্থায় নতুন সমাজে রাজদ্রোহের সংস্পর্শে বিকশিত হয়ে উঠল নতুন পুঁজি নিয়ে। আলালী সাহিত্যে স্থান গেল অভিজাত-শ্রেণীর বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ জনমত, 'নীলদর্পণে' স্থান পেল কৃষকের রাজদ্রোহ, 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ।' জমিদার-শ্রেণীর বিরুদ্ধে ঘৃণা জাগিয়ে তুলল, 'মেঘনাদবধ কাব্য' হিন্দু পুরাণের অবতারবাদকে আঘাত করল শক্ত হাতে। হিন্দু-মুসলানের ভেদজ্ঞান যথেষ্ট শিথিল করা হল। 'হুতোম প্যাচার নক্সা'য় ইংরেজি শিক্ষিত নব্যযুবকদের প্রতি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ স্বাধীনতার যে চেতনার সৃষ্টি করে তা 'নীলদর্পণের'ই পরিপূরক। ফরাসী বিপ্লবের যা মর্মবাণী—অভিজাত শ্রেণীর বিরুদ্ধতা এবং স্বাধীন-জাতীয় চেতা—তা এঁদের সাহিত্যেই ফুটে ওঠে।

প্রগতি সাহিত্যের উৎস কোথায় তা খুঁজতে হলে বিচার করতে হবে এই কথাটা যে, এ দেশে স্বাধীন জাতি গঠনের উপাদান সৃষ্টি করতে আরম্ভ করেছে কোন্ সাহিত্য। ইংরেজ শাসনের উচ্ছেদ চাই এ কথা বলার মত স্পষ্ট চেতনা দীনবন্ধু-মধুসূদন-কালীপ্রসন্নের না থাকলেও, দেখতে হবে তাঁদের সাহিত্য সমাজে কোন্ ভাবধারাকে এবং কোন্ শক্তিকে বলশালী করেছে। এঁদের সাহিত্য শাসক শ্রেণী ও অভিজাত শ্রেণীকে আঘাত করেছে, ফিউডাল সমাজের কুসংস্কারকে ব্যঙ্গ করেছে, ধর্মের গোঁড়ামি নষ্ট করে দিয়েছে সাহিত্যে নতুন আদর্শ প্রচার করে।

যদি খুঁজে পাওয়া যায় এমন কোন অজ্ঞাত সাহিত্যিকদের, যাঁরা অকুণ্ঠ চিত্তে সিপাহী বিদ্রোহকে সমর্থন দিয়েছিলেন তবে প্রগতির উৎস হিসেবে তাঁরাই ইতিহাসে স্থান পাবেন, দীনবন্ধু ও মধুসূদন পাবেন না।

বঙ্কিমের সাহিত্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, তার আবেদন শুধু গোঁড়া হিন্দুর কাছে, মানুষের মনে তা গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াই সৃষ্টি করেছে। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা, হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য, স্ত্রী-পুরুষের সমান অধিকার, এক-বিবাহ, প্রাচীন সমাজের ন্যায় অন্যায় বোধের বিরুদ্ধতা, এইগুলিই হল গণতান্ত্রিক

সাহিত্য সৃষ্টির প্রথম উপকরণ। এই সমস্ত উপকরণই বর্জিত হয়েছে বঙ্কিমের সাহিত্যে। কৃষ্ণকান্তের উইল প্রমাণ করতে চেয়েছে যে, স্ত্রীলোক তার স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করতে চাইলেই সংসারে ট্রাজেডি দেখা দেয়, একমাত্র ধর্মের স্মরণাপন্ন হওয়া ছাড়া সে ট্রাজেডি থেকে আর উদ্ধার নেই। সীতারাম এবং দুর্গেশ-নন্দিনী প্রমাণ করতে চেয়েছে যে, বহুবিবাহের মধ্যেও প্রেম কি করে বিজয়ী হতে পারে। বিষবৃক্ষের ট্রাজেডির ভিতর দিয়ে বঙ্কিম হিন্দু একান্নবর্তী পরিবারের শান্তি রক্ষার জন্য কামনার বীজ গোড়াতেই টেনে উপড়ে ফেলবার আবেদন জানিয়েছেন। তাই গোঁড়া হিন্দুসমাজে বঙ্কিম এত সমাদৃত হয়েছিলেন। জাতিভেদ এবং আভিজাত্যের রক্তমাহাত্ম্য বঙ্কিমের উপন্যাসের ছত্রে ছত্রে ফুটে বেরিয়েছে। গণতন্ত্রের প্রত্যেকটি উপাদানকে তিনি সমাজের প্রতিকূল শক্তি হিসেবে খাড়া করেছেন। এ সাহিত্যকে গণতান্ত্রিক সাহিত্য কিছুতেই বলা যেতে পারে না। সাহিত্যক্ষেত্রে বঙ্কিম রসসৃষ্টি করেছেন সন্দেহ নেই, কিন্তু সে রস অভিজাত শ্রেণীরই উপভোগ্য, গণতন্ত্রী জনসাধারণের কাছে তা বিষের সমতুল্য।

বঙ্কিমচন্দ্রের সংস্কৃতি সমাজে কোন্ শ্রেণীর মনে কি মনোভাব সৃষ্টি করেছে তা যদি বিচার করেন তা হলেও তার ঐতিহাসিক ভূমিকা সহজেই বুঝতে পারেন। বঙ্কিম সাহিত্য সমাদর লাভ করেছিল সমাজের অভিজাত শ্রেণীর নিকট। সাহিত্যে তিনি সমাজের অভিজাত শ্রেণীকেই বড় করে তুলেছেন। এই অভিজাত শ্রেণীই তখন ইংরেজ শাসনের প্রধান স্তম্ভ। ফরাসী বিপ্লবের প্রধান মর্মই ছিল অভিজাত শ্রেণীর বিরুদ্ধে বুর্জোয়া পরিচালিত গণ-অভিযান। বঙ্কিমের সাহিত্যে যাঁরা ফরাসী বিপ্লবের ঐতিহ্য দেখেন তাঁরা ফরাসী বিপ্লবকে বিচার করেন তার শ্রেণীচরিত্র বাদ দিয়ে।

নরহরিবাবুরা বিবেকানন্দকে একজন প্রগতিশীল ঐতিহ্য সৃষ্টিকারী বলে বর্ণনা করেছেন।

বিবেকানন্দের কর্মজীবন হোল উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশ বৎসর। বিংশ শতাব্দী যখন আগতপ্রায় তখনও বিবেকানন্দ ভারতে ইংরেজ শাসন সম্বন্ধে কি প্রচার করেছেন? তিনি বলেছেন:

"ভারতবর্ষের বর্তমান শাসন প্রণালীতে কতকগুলি দোষ বিদ্যমান, কতকগুলি প্রবল গুণও আছে। সর্বাপেক্ষা কল্যাণ ইহা যে, পাটলিপুত্র সাম্রাজ্যের

অধঃপতন হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত এ প্রকার শক্তিমান ও সর্বব্যাপী শাসনযন্ত্র অস্মদ্দেশে পরিচালিত হয় নাই। বৈশ্যাধিকারের যে চেষ্টায় এক প্রান্তের পণ্যদ্রব্য অন্য প্রান্তে উপনীত হইতেছে, সেই চেষ্টারই ফলে, দেশদেশান্তরের ভাবরাশি ভারতের অস্থিমজ্জায় প্রকাশ করিতেছে।"

(**বর্তমান ভারত**—পৃঃ ৪১)

ভারতে ইংরেজ শাসনের এই কল্যাণ বন্দনা কেবলমাত্র বিশুদ্ধ ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে আসেনি, এসেছে ভারতে ইংরেজ শাসনের ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তার উপলব্ধি থেকে। বিবেকানন্দ ভারতে ইংরেজ শাসনের যা কিছু দোষ দেখেছেন তার কারণ হিসাবে তিনি ইংল্যাণ্ডের প্রজাতন্ত্রকেই দায়ী করেছেন, ইংল্যাণ্ডে প্রজাতন্ত্র না থেকে যদি স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্র থাকত তা হলে আর ভারতে ইংরেজ শাসন ক্ষতিকর হত না। বিবেকানন্দ বলেছেন:

"সম্পূর্ণ স্বাধীন স্বেচ্ছাচারী রাজার অধীনে বিজিত জাতি বিশেষ ঘৃণার পাত্র হয় না। অপ্রতিহত শক্তি সম্রাটের সকল প্রজারই সমান অধিকার, অর্থাৎ কোনও প্রজারই রাজশক্তির নিয়মনে কিছু মাত্র অধিকার নাই। সে স্থলে জাত্যাভিমান জনিত বিশেষাধিকার অল্পই থাকে। কিন্তু যেখানে প্রজানিয়মিত রাজা বা প্রজাতন্ত্র বিজিত জাতির শাসন করে, সে স্থানে বিজয়ী ও বিজিতের মধ্যে অতি বিস্তীর্ণ ব্যবধান নির্মিত হয়, এবং যে শক্তি বিজিতদিগের কল্যাণে সম্পূর্ণ নিযুক্ত হইলে অত্যল্পকালে বিজিত জাতির বহুকল্যাণ সাধনে সমর্থ, সে শক্তির অধিকাংশই বিজিত জাতিকে স্ববশে রাখিবার চেষ্টায় ও আয়োজনে প্রযুক্ত হইয়া বৃথা ব্যয়িত হয়। প্রজাতন্ত্র রোমাপেক্ষা, সম্রাড়ধিষ্ঠিত রোমকশাসনে বিজাতীয় প্রজাদের সুখ অধিক এজন্যই হইয়াছিল।" (**বর্তমান ভারত**—পৃঃ ৫৩)

ইতিহাসের এ রকম প্রতিক্রিয়াশীল ব্যাখ্যা এবং ইংরেজ শাসন সংশোধনের এমন প্রতিক্রিয়াশীল রাস্তা ভারতের অন্য কোন প্রতিক্রিয়াশীল নেতা দিয়েছেন বলে জানি না।

রাজনীতি সম্পর্কে বিবেকানন্দের মনোভাব আমেরিকা থেকে লিখিত এক চিঠিতে নিম্নলিখিত কথায় প্রকাশিত হয়েছে:

"কল্‌কাতা থেকে আমার বক্তৃতা ও কথাবার্তা সম্বন্ধে যে সব বই ছাপা হয়েছে, তাতে একটা জিনিস আমি দেখতে পাচ্ছি। তাদের মধ্যে

কতকগুলি এরূপভাবে প্রকাশ করা হয়েছে যে, পড়লে বোধ হয় যেন আমি রাজনীতি নিয়ে আন্দোলন কচ্ছি। প্রকৃত পক্ষে কিন্তু আমি একজন রাজনীতিজ্ঞ নই অথবা রাজনৈতিক আন্দোলনকারীও নই। আমার লক্ষ্য কেবল ভেতরের আত্মতত্ত্বের দিকে—সেইটে যদি ঠিক হয়ে যায়, তবে অপর সব ঠিক হয়ে যাবে।—এই আমার মত।"

(**পত্রাবলী**—১ম ভাগ, পৃঃ ২৩৫)

এই যুগে বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে নিম্নতম প্রগতিশীল কাজ হত—ধর্ম থেকে রাজনীতিকে বড় করে প্রচার করা ; বিবেকানন্দ করেছেন তার উল্টো।

রাজনীতির বিরুদ্ধে এই যুক্তি এসেছে বিবেকানন্দের এই বিশ্বাস থেকে যে, ভারতের যুবশক্তিকে রাজনীতি বর্জন করে ধর্মকে আশ্রয় করতে হবে। এ কথা তিনি স্পষ্ট করেই ব্যাখ্যা করেছেন :

"পাশ্চাত্যে উদ্দেশ্য—ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, ভাষা—অর্থকরী বিদ্যা, উপায়—রাষ্ট্রনীতি। ভারতে উদ্দেশ্য—মুক্তি, ভাষা—বেদ, উপায়—ত্যাগ।"

(**বর্তমান ভারত**—পৃঃ ৪৭)

রাজনীতির কথা ছাড়াও, ভারতে নব্যশিক্ষিত সমাজে প্রগতির যেটুকু ধারা প্রবাহিত হয়েছিল, বিবেকানন্দ তার পক্ষে ছিলেন না, ছিলেন বিপক্ষে। ব্রাহ্মধর্ম পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টি করেছিল, বিবেকানন্দ পৌত্তলিকতার যৌক্তিক ব্যাখ্যা দিয়ে সে বিশ্বাস ফিরিয়ে আনেন, পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে বিবাহে পতি-পত্নীর স্বাধীন নির্বাচনের প্রথা যখন সমাদর পেতে আরম্ভ করে বিবেকান্দান তখন বললেন :

"প্রাচীন ভারত আদেশ করিতেছেন, বিবাহ ইন্দ্রিয়সুখের জন্য নহে, প্রজোৎপাদনের জন্য। ইহাই এদেশের ধারণা। প্রজোৎপাদনের দ্বারা ভাবী মঙ্গলামঙ্গলের তুমি ভাগী, অতএব যে প্রণালীতে বিবাহ করিলে সমাজের সর্বাপেক্ষা কল্যাণ সম্ভব, তাহাই সমাজে প্রচলিত, তুমি বহুজনের হিতের জন্য নিজের সুখ ভোগেচ্ছা ত্যাগ কর।

(**বর্তমান ভারত**—পৃঃ ৪৭)

বিবেকানন্দের যে কথাটার জন্য তাঁকে "প্রগতিশীল" বলা হয়ে থাকে সে কথাটা হচ্ছে এই :

"ভুলিও না—নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার

ভাই। হে বীর সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই; বল মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই।" (**বর্তমান ভারত**—পৃঃ ৫২)

লক্ষ্য করবার বিষয় যে, মুসলমান ভারতবাসীকে ভাই বলার উপদেশ এখানে নেই। অথচ বিবেকানন্দের প্রায় ৫০০ বছর আগে চৈতন্য মুসলমানকেও ভাই বলে আহ্বান করেছিলেন এবং করতে শিখিয়েছিলেন। চৈতন্যের চেয়ে বেশী "প্রগতি" বিবেকানন্দ আনেননি। চৈতন্যের ৫০০ বছর পর নব্যশিক্ষিত যুবকেরা যেটুকু "প্রগতি" এনেছিলেন সে সম্বন্ধে তাঁর অবজ্ঞা কত গভীর ছিল তার প্রমাণ বিবেকানন্দের নিম্নলিখিত কথা:

"মূর্তিপূজা থাকিবে কিংবা থাকিবে না, কতজন বিধবার পুনর্বার বিবাহ হইবে, জাতিভেদ প্রথা ভাল কি মন্দ তাহা লইয়া মাথা ঘামাইবার আমার প্রয়োজন নাই।" (**পত্রাবলী**—১ম ভাগ, পৃঃ ১৭৪)

বিবেকানন্দকে উনবিংশ শতাব্দীর বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রতিনিধি বলা ভুল। তিনি ছিলেন ঐ যুগের ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু ফিউডাল শ্রেণীর প্রতিনিধি। সে যুগে এই শ্রেণীর মতাদর্শই বিবেকানন্দের মতাদর্শ, এই শ্রেণীর মধ্যে ঐতিহাসিক প্রয়োজনে যতটুকু সমাজসংস্কার প্রয়োজনীয় হয়েছিল শুধুমাত্র সেইটুকুই বিবেকানন্দের মধ্যে ছিল। জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার এবং রামকৃষ্ণ পরমহংসের ধর্মপ্রচার—এই ছিল কর্মীদের প্রতি তাঁর নির্দেশ। তাঁর প্রথম পৃষ্ঠপোষক ছিল দক্ষিণ-ভারতের রাজা, মহারাজা এবং তাদের দেওয়ানেরা। আমেরিকায় তিনি যখন হিন্দুধর্ম প্রচারে ব্যস্ত তখন ভারতের শিক্ষিত সমাজের কাছে কিরূপ অবজ্ঞা এবং তাচ্ছিল্য পেয়েছিলেন তার প্রমাণ তাঁর নিম্নলিখিত কথা:

"হায়! যদি ভারতে একটা মাথাওয়ালা কাজের লোক আমার সহায়তা করবার জন্য পেতাম! কিন্তু তাঁর ইচ্ছাই পূর্ণ হবে—আমি এদেশে জুয়াচোর বলে গণ্য হলাম। আমারই আহাম্মকি হয়েছিল, কোন নিদর্শন পত্র না নিয়ে ধর্ম মহাসভায় যাওয়া—আশা করেছিলাম, অনেক আসবে। এখন দেখছি, আমাকে একলা ধীরে ধীরে কাজ করতে হবে। মোটের ওপর, আমেরিকানরা হিন্দুদের চেয়ে লাখোগুণ ভাল, আর আমি অকৃতজ্ঞ ও হৃদয়হীন দেশ অপেক্ষা এখানে অনেক ভাল কাজ করতে পারি।"

(**পত্রাবলী**—১ম ভাগ, পৃঃ ১৯৩)

অস্পৃশ্যতা ও ছুঁৎমার্গের বিরুদ্ধে বিবেকানন্দের যে শক্তিশালী আবেদন ছিল তাও যে চৈতন্যের আবেদনের উপরে উঠতে পারেনি শুধু তাই নয়, গোঁড়া হিন্দুদের সংস্কারসাধনই ছিল তাঁর একমাত্র লক্ষ্য। নীচ জাতকে জাতে তুলে নাও, ধর্মের ভণ্ডামি ছেড়ে ধর্মের অনুগত হও, গরীবদের শিক্ষা দাও—এই ছিল বিবেকানন্দের সমগ্র আন্দোলনের প্রধান স্লোগান। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে বাঙলার গ্রামে কৃষকদের মধ্যে এ স্লোগান নতুন কোন জাগরণ সৃষ্টি করতে পারেনি, কারণ তাদের সংগ্রাম তার অনেক আগেই অনেক দূর এগিয়ে গেছে।

তৎকালীন সমাজ-সংস্কারকদের মধ্যে বিবেকানন্দই ছিলেন সবচেয়ে নরমপন্থী। 'বিবেকানন্দ চরিতে' শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার এক জায়গায় লিখেছেন:

> "একদিন এই সভায় সমাজসংস্কার সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে স্বামীজী বলিয়াছিলেন যে, সমাজের মস্তকে অগ্নিময় অভিশাপ বর্ষণ করিয়া এবং প্রত্যেক আচার ব্যবহারের তীব্র বিরুদ্ধ সমালোচনা করিয়া কোন প্রকার সংস্কার সম্ভব নহে। অসীম প্রেম ও অনন্ত ধৈর্যের সহিত শিক্ষা-বিস্তারের মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে ভিতরের দিক হইতে জাতিকে উন্নত করিতে হইবে।" (**বিবেকানন্দ চরিত**—পৃঃ ৯৬)

বিবেকানন্দের নিকট জাতি মানে ছিল শুধু হিন্দু, সমাজ-সংস্কারের আন্দোলন ছিল শুধু শিক্ষাবিস্তার এবং ধর্মপ্রচার, রাজনীতি ছিল বর্জনীয়, ইংরেজ শাসন ছিল শতদোষ সত্ত্বেও কল্যাণজনক, ইংল্যাণ্ডে বুর্জোয়া-গণতন্ত্রের চেয়ে স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্র ছিল ভারতের স্বার্থে অধিকতর কাম্য।

তাই আজ ভারতের ফাশিস্ট রাষ্ট্র-সেবকসংঘের নেতা গোলওয়ালকর যে, বিবেকানন্দকেই গুরু বলে ঘোষণা করবেন তাতে আশ্চর্য হই না, আশ্চর্য হই যখন এ দেশের মার্কস্‌বাদীরাও ঘোষণা করেন যে, বিবেকানন্দের "মতাদর্শটি"কে প্রগতিশীল বলে গণ্য করতে হবে।

পরিচয়ের সম্পাদক এবং খ্যাতনামা লেখকেরা একদিকে দীনবন্ধুর খুঁত বের করে বলছেন—তারা তো মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে অস্বীকার করেনি, কাজেই তারা কি করে প্রগতিশীল হয়, আবার বলছেন বঙ্কিম-বিবেকানন্দ "ব্যক্তিগত সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও মূলত প্রগতিশীল।" এরই নাম সুবিধাবাদ। সুবিধাবাদের

নিয়মই হল বিপ্লবের খুঁত বেছে বেছে বের করা এবং সেই খুঁত দেখিয়ে বিপ্লবকে অ-বিপ্লব বলে প্রচার করা, আর প্রতিক্রিয়ার ভিতর থেকে ভালো ভালো রং বেছে বেছে বের করা এবং তাই দেখিয়ে তাকে প্রগতি বলে জাহির করা। ১৮৫৭-৬০ সালের বিদ্রোহে কৃষকদের শ্রেণীচেতনা কোন্ স্তরের ছিল সে প্রশ্ন তুলে নরহরিবাবুরা যখন বিদ্রোহী কৃষকদের চেয়েও রামমোহম-বঙ্কিমের শ্রেণী-চেতনা উন্নত স্তরের বলে ঘোষণা করেন, তখন এই সুবিধাবাদের অপরাধেই তাঁরা অপরাধী হন ; জ্ঞানে কিংবা অজ্ঞানে—সে কথা আলাদা। ১৮৫৭-৬০ সালের বিদ্রোহী কৃষকদের বুর্জোয়া শ্রেণীচেতনা রামমোহন-বঙ্কিম-বিবেকানন্দের চেয়ে উচ্চস্তরের ছিল নিশ্চয়ই, কারণ তাদের চেতনায় ছিল বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে অবিশ্বাস এবং ঘৃণা আর রামমোহন-বঙ্কিম-বিবেকানন্দের চেতনায় ছিল বিদেশী শাসনের প্রতি আস্থা। বিদ্রোহী কৃষকেরা রাজনীতি এবং অর্থনীতিকে স্থান দিয়েছিল ধর্মের উপরে আর রামমোহন-বঙ্কিম-বিবেকানন্দ ধর্মকে স্থান দিয়েছিলেন রাজনীতি এবং অর্থনীতির উপরে। তারা মেনেছিল এক স্বদেশী রাজাকে আর এঁরা মেনেছিলেন এক বিদেশী রাজাকে।

ভারতের ইতিহাসে অবশ্যই এমন একটা যুগ ছিল যখন গণতন্ত্রের সংগ্রাম এক ধর্মমতের বিরুদ্ধে অপর ধর্মমতের সংগ্রাম হিসাবে দেখা দিত। পঞ্চদশ এবং ষোড়শ শতাব্দীতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এবং ভারতেও ধর্ম-সংস্কারের ভিতর দিয়ে জনসাধারণের গণতান্ত্রিক চেতনা প্রকাশ পেত। কিন্তু বিবেকানন্দের যুগ হল ধনতন্ত্রের উদীয়মান যুগ, সুস্পষ্ট শ্রেণীসংগ্রামের যুগ। ১৮৬০-৭০ সালের মধ্যে ভারতে ধনবাদের ক্রমবিকাশ আরম্ভ হয় এবং তাছাড়া সমগ্র পৃথিবীতে তখন মার্কস্ এবং এঙ্গেলসের নেতৃত্বে সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলন জোরালো হয়ে উঠেছে। এদিকে ভারতে ভূমিহীন কৃষকদের বিদ্রোহের যুগের অবসান ঘটেছে, অন্য দিকে নতুন শ্রমিক শক্তির আবির্ভাব ঘটছে। এই রকম ঐতিহাসিক অবস্থায় হল বিবেকানন্দের আবির্ভাব—তিনি ধর্মের নামে যে অভিযান আরম্ভ করলেন তার সুর হল ৫০০ বছর আগেকার সুর। উনবিংশ শতাব্দীতে প্রগতির সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই।

এই যুগে ধর্ম সংস্কারকের ভূমিকা যে প্রতিক্রিয়াশীল সে কথা লেনিন স্পষ্ট করেই জানিয়েছিলেন গোর্কির নিকট লেখা এক চিঠিতে। এই চিঠিতে লেনিন লেখেন :

"(ঐতিহাসিকভাবে এবং ব্যবহারিকভাবে) **ঈশ্বর মূলত** এমন কতকগুলি ধারণার জটিল সমষ্টি যার উৎপত্তি ঘটেছে মানুষের চূড়ান্ত আত্মসমর্পণ থেকে, এবং প্রকৃতির ও শ্রেণীর শোষণ থেকে—এই ধারণাগুলি মানুষের আত্মসমর্পণ-প্রবৃত্তি বাড়িযে তোলে, শ্রেণী-সংগ্রামের শক্তিকে পঙ্গু করে দেয়। ইতিহাসে এমন একটা যুগ ছিল যখন ঈশ্বরের এই সত্যকার অর্থ এবং তার উৎপত্তি সত্ত্বেও গণতন্ত্রের এবং প্রলিটারিয়েটের সংগ্রাম এক ধর্মমতের বিরুদ্ধে অন্য ধর্মমতের সংগ্রামের আকারে দেখা দিত।

"কিন্তু এই যুগ বহুদিন আগে গত হয়ে গেছে।

"এখন ইওরোপে এবং রুশিয়ার সর্বত্রই ভগবানের ধারণার প্রত্যেকটি সমর্থন এমন কি খুব সৎ ইচ্ছাদ্বারা প্রণোদিত তার সূক্ষ্ম সমর্থনও প্রতিক্রিয়ার সমর্থন।" (লেনিন: **নির্বাচিত রচনাবলী**—১১শ খণ্ড, পৃঃ ৬৭৯)

কিন্তু নরহরিবাবু তাঁর পত্রে লিখেছেন:

"১৯০৫ সালের স্বদেশী আন্দোলনকে যদি প্রগতিশীল বলা যায়, তবে রাজনারায়ণ-বঙ্কিম-বিবেকানন্দের মতাদর্শে যার সূত্রপাত, তা যে কেন প্রগতিশীল হবে না তা বোঝা শক্ত।"

নরহরিবাবুর মুশকিল হয়েছে এইখানে যে, অতীত ইতিহাসের একটা যুগকে তিনি অস্বীকার করছেন। তাঁর কাছে ১৯০৫ সালের আন্দোলন সোজাসুজি রাজনারায়ণ-বঙ্কিম-বিবেকানন্দের মতাদর্শ থেকে উৎপন্ন, তার আর কোন অতীত ঐতিহ্য নেই। কিন্তু মার্কস্‌বাদী বিজ্ঞান ইতিহাসের অন্যরূপ শিক্ষা দেয়। সিপাহী বিদ্রোহ-নীল বিদ্রোহ যে স্বাধীনতা-সংগ্রামের ঐতিহ্য তৈরী করেছিল তারই একটা দুর্বলতর পুনরভিনয় হয় ১৯০৫ সালে—এই অধ্যায়টির দুর্বলতাই ছিল বঙ্কিম-বিবেকানন্দের ধর্মশিক্ষা এবং হিন্দুয়ানী। বঙ্কিম-বিবেকানন্দের আদর্শ যে কত প্রতিক্রিয়াশীল ছিল তার পরিচয় পাওয়া যায় ইতিহাসের এই পরিণতিতে।

নরহরিবাবুর ইতিহাসের মূল্যবোধটা একেবারেই মার্কস্‌বাদ বিরোধী। দোষটা অবশ্য নরহরিবাবুর একার নয়, ভারতীয় মার্কস্‌পন্থীরা সকলেই এই মার্কস্‌বাদ বিরোধিতার পঙ্কে নিমগ্ন ছিলেন। নরহরিবাবু এবং মঙ্গলাচরণ যে মতবাদটা উপস্থিত করেছেন সেটা অনেক মার্কস্‌পন্থীর অনেক দিনের সঞ্চিত কুসংস্কার। এই মতবাদের গলদ কোথায় দেখুন—

কমরেড রজনী পাম দত্তের বচন উদ্ধৃত করে নরহরিবাবু লিখেছেন:

"নীল বিদ্রোহে, সাঁওতাল বিদ্রোহে বিদ্রোহী কৃষকের শ্রেণীচেতনা আদিম স্তরে থাকায় এই সব বিদ্রোহের সামনে কোন প্রগতিশীল রাজনৈতিক মতাদর্শ দানা বেঁধে ওঠেনি, শ্রেণীচেতনার আদিম স্তর থেকে এই বিদ্রোহ সংগঠিত রাজনৈতিক চেতনার স্তরে উন্নীত হতে পারেনি। এটা ঐতিহাসিক সত্য।"

আর—

"প্রকাশবাবু যে রামমোহন, মাইকেল, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতিকে চিরস্মরণীয় বলতে আপত্তি জানিয়েছেন, তাদের ছাড়া উপরোক্ত শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীর প্রতিভূ বাঙলা দেশে আর আছে কি? এই জন্যই বৃটিশের বিরুদ্ধে জ্বলন্ত ঘৃণার পরিবর্তে পরিপূর্ণ আস্থা থাকা সত্ত্বেও রামমোহন ও ব্রাহ্ম আন্দোলনের ভূমিকাকে সেদিনের সবচেয়ে প্রগতিশীল আন্দোলন বলতে পাম দত্ত বাধ্য হয়েছেন। এই শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীই বাঙলা দেশকে সজাগ করে সব প্রথম—উনবিংশ শতাব্দীর গণ-চেতনার পথে।"

এই ইতিহাস হ'ল একতরফা—বুর্জোয়াশ্রেণীর শেখানো মিথ্যা ইতিহাস। এই মিথ্যা ইতিহাস আমাদের প্রতারিত করেছে। নীল বিদ্রোহ এবং সাঁওতাল বিদ্রে'হ ধর্মনিরপেক্ষ শ্রেণী-সংগ্রাম, এবং বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম। তথাপি এঁদের মতে তার "শ্রেণী চেতনা আদিম স্তরের" এবং তাদের "রাজনৈতিক মতাদর্শ দানা বেঁধে ওঠেনি"—আর "বৃটিশের বিরুদ্ধে জ্বলন্ত ঘৃণার পরিবর্তে পরিপূর্ণ আস্থা থাকা সত্ত্বেও" রামমোহন-বঙ্কিম-বিবেকানন্দের আন্দোলনই হ'ল প্রগতিশীল, এই শিক্ষিত হিন্দু রিভাইভালিস্ট মধ্যম শ্রেণীই বাঙলা দেশকে নাকি সজাগ করে সর্বপ্রথম। কোন্ বিষয়ে সজাগ করে? স্বাধীনতা-সংগ্রামে না ধর্মসংস্কারে? জাতি গঠনে না হিন্দুধর্মের পুনরভ্যুত্থানে?

"বৃটিশের বিরুদ্ধে জ্বলন্ত ঘৃণা"—সেটা হল মূর্খ চাষীদের প্রাথমিক শ্রেণী-চেতনা মাত্র, আর বৃটিশের প্রতি পরিপূর্ণ আস্থা থাকা সত্ত্বেও ধর্ম প্রচারক বুদ্ধিজীবীরাই হলেন আসল প্রগতিশীল। ইতিহাসের এ ব্যাখ্যা হ'ল সম্পূর্ণ মার্কস্‌বাদ বিরোধী।

ভারতের ইতিহাসে বিভিন্ন ব্যক্তি এবং বিভিন্ন ঘটনাকে বিচার করবার মার্কসীয় পদ্ধতি কি? সোভিয়েট ঐতিহাসিকের কথায়: "বলপূর্বক বৃটিশ শাসনের উচ্ছেদ—এই ঐতিহাসিক কর্তব্যের দাঁড়িপাল্লা দিয়ে মার্কস্ ভারতীয়

ইতিহাসের ঘটনা ও ব্যক্তির ভূমিকা বিচার করেছেন।" এই নীতি অনুসারে নীলকর সাহেবদের জমিতে খেতমজুরদের সাধারণ ধর্মঘট এবং সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্যে যে "প্রাথমিক শ্রেণীচেতনা" ছিল, বিপ্লবের ইতিহাসে তারই মূল্য আছে—স্বামী বিবেকানন্দের রামকৃষ্ণ মঠের কোন মূল্য নেই।

বিবেকানন্দের অভিযান ছিল বস্তুবাদের বিরুদ্ধে। "শূদ্রশক্তি"র জয় হবে একদিন—এই ভবিষ্যদ্বাণী তিনি করেছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁর লক্ষ্য ছিল "শূদ্রশক্তি"কে বস্তুবাদের প্রভাব থেকে মুক্ত ক'রে রাখা। তাঁর 'ভাববার কথা' এবং 'বর্তমান ভারত' এই দুখানি বইয়ের মানে বুঝতে হবে 'জ্ঞানযোগ,' 'কর্মযোগ', 'ভক্তিযোগ' এবং 'রাজযোগ' এই চারখানি বই পড়ে। 'ভাববার কথা' এবং 'বর্তমান ভারতে'ও এ কথা স্পষ্ট যে, হিন্দুধর্মের পুনঃসংস্কারের জন্যই এবং পাশ্চাত্য থেকে যে বস্তুবাদের ঢেউ আসছে তা থেকে জনতাকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যই বিবেকানন্দ বুদ্ধিজীবীকে আহ্বান করেছিলেন দরিদ্র স্বদেশবাসী হিন্দু গরীবদের প্রতি তাকাতে, ধর্মের আশ্রয়ে তাদের সমান করে টেনে নিতে। তিনি ভারতবাসীকে হিন্দুধর্ম থেকে জাতীয়তার দিকে টেনে নিয়ে যাননি, জাতীয়তার দিক থেকে টেনে ধর্মের দিকে এনেছিলেন।

বিবেকানন্দ চিকাগো শহরে যে বিশ্ব-ধর্ম সম্মেলনে বেদান্তের মহিমা ঘোষণা করেছিলেন সেই বিশ্ব-ধর্ম সম্মেলন বুর্জোয়া সংস্কৃতির এক মহাসংকটের মূহূর্তে আহূত হয়েছিল। মার্কস্ এবং এঙ্গেলসের বস্তুবাদ তখন উদ্দাম বেগে এগিয়ে চলেছে। দুনিয়ার সংগঠিত শ্রমিক-আন্দোলন তখন চ্যালেঞ্জ করেছে বুর্জোয়ার রাষ্ট্র, দর্শন এবং সমাজকে। চিকাগোর বিশ্ব-ধর্ম সম্মেলন ছিল এই নবশক্তির বিরুদ্ধে ধনিক শক্তির সমাবেশ। বিবেকানন্দ ছিলেন সেই সমাবেশের একজন পার্টিসান (পক্ষভুক্ত সৈনিক)। এ কথা ভুলে গিয়ে বিবেকানন্দকে প্রগতিশীল বলে ঘোষণা করে মিথ্যা কথাই বলা হয়। এরূপ মূল্যবোধের মূলে রয়েছে ভারতকে বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্নভাবে বিবেচনা করা। এরূপ বিবেচনার ধারা আসছে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদ থেকে। বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের দৃষ্টি দিয়ে যাঁরা ভারতের ইতিহাসকে বিচার করেন তাঁরাই এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেন যে, ভারতে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের ঐতিহ্য সিপাহী বিদ্রোহ নীল বিদ্রোহ নয়—বঙ্কিম-বিবেকানন্দ।

রুশিয়ায় চার্নিশেভ্স্কি তাঁর কর্মজীবন আরম্ভ করেছিলেন বিবেকানন্দেরও

আগে, সমাজের আরো অনুন্নত অবস্থায়। লেনিন চার্নিশেভ্স্কিকে প্রগতিশীল বলে বর্ণনা করেছিলেন, কারণ চার্নিশেভ্স্কি জারের প্রবল বাধা সত্ত্বেও প্রচার করেছিলেন ফয়্যারবাকের বস্তুবাদ। জারের স্বৈর শাসনকে তিনি আক্রমণ করেছিলেন তাঁর সাহিত্যে। তাই চার্নিশেভ্স্কি মার্কস্‌বাদী না হলেও প্রগতিশীল, কারণ তাঁর মতবাদ বিপ্লবের অভিমুখী ছিল। কিন্তু ভারতে বিবেকানন্দের মতবাদ ছিল বিপ্লবের প্রতিকূল। কারণ তাঁর মূল উদ্দেশ্য ছিল বস্তুবাদের প্রতিরোধ।

বাঙলার ইতিহাসে যাঁরা মনস্বী বলে বিখ্যাত তাঁদের প্রগতিশীল ভূমিকা এমনি করে অস্বীকার করলে প্রগতি-সাহিত্যিকরা ক্ষুণ্ণ হন—তবে কি আমাদের ইতিহাসে প্রগতির কোন ঐতিহ্যই নেই? থাকবে না কেন—আছে। খুঁজে বার করতে হবে। অবস্থাপন্ন ইংরেজি-শিক্ষিত "মনস্বীরা" সে ঐতিহ্য তৈরী করেননি—তাতে আমাদের ক্ষোভের কিছু নেই। আমরা বরং সগৌরবে এই দাবি করতে পারি—তোমরা বুর্জোয়াশ্রেণীর লোক, তোমরা কি দিয়েছ দেশকে এবং জাতিকে? তোমরা জাতীয়তা প্রবর্তনের গর্ব কর, কিন্তু সে গৌরবের অধিকারী তোমরাও নও। সে গৌরবের যারা সত্যকার অধিকারী তাদের স্মৃতি তোমরা ইতিহাস থেকে মুছে দিয়েছ। তাদের খুঁজলে পাওয়া যাবে গ্রাম্য কৃষক এবং গ্রাম্য ক্ষেতমজুরদের চারণ কবিদের মধ্যে, যারা সর্বপ্রথম পরাধীনতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের গান গেয়েছিল। সে গান তোমরা যে শুধু গাইতে পারনি তা নয়, সে গান তোমাদের ঐতিহাসিকেরা সহ্য পর্যন্ত করতে পারেনি। ইংরেজ সরকারের প্রসাদপুষ্ট তোমরা, তোমরাই তো সরকারী অনুগ্রহে প্রচারযন্ত্রের মালিক হয়ে তাদের ভাষা দাবিয়ে দিয়েছ। আমাদের গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির ঐতিহ্য বহনকারী সেই বিস্মৃত শহীদদের আমরা স্মরণ করি আর প্রগতি সাহিত্য সৃষ্টির প্রেরণা পাই। বাঙলার গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি জন্মগ্রহণ করেছিল ডেভিড হেয়ার এবং ডিরোজিও'র স্কুল নয়, তা জন্মগ্রহণ করেছিল সিপাহীর ব্যারাকে, নীলের খেতে, নদীর চরে এবং বিলের ধারে। তা জন্মগ্রহণ করেছিল প্রচণ্ড শ্রেণীসংগ্রাম এবং রাষ্ট্রবিপ্লবের অগ্নিবর্ষণের ভিতর দিয়ে। তাই আমরা যে ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী তা বঙ্কিম-বিবেকানন্দের চেয়ে অনেক বেশী শক্তিশালী, তাই "আর্টের জন্য আর্ট" এ কথা আমাদের কাছে একেবারেই অর্থহীন। আমাদের গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির পূর্বপুরুষেরা ছিলেন

রাষ্ট্রবিপ্লব তথা শ্রেণীসংগ্রামের প্রত্যক্ষ পার্টিসান। তাঁদের সে অমর সংগীতের প্রভাব সরকারী সেন্সর ভেদ করে কিছুটা কিছুটা ছিটকে এসে পড়েছে দীনবন্ধু-মধুস্থদন-কালীপ্রসন্নের সাহিত্যে। সেই জন্য তাঁদেরও নাম আমরা প্রগতিশীল বলে স্মরণ করি। এঁদের সমস্ত ত্রুটি সত্ত্বেও শুধু এঁদেরই মারফৎ আমরা সেই সব অজ্ঞাতনামা চারণদের অস্তিত্বের কিছু পরিচয় পাই, যে চারণদের গানে ও ব্যাখ্যানে হাজার হাজার কৃষক ক্ষেতমজুর ও সিপাহীর রক্ত তপ্ত হয়ে উঠত, তারা ভুলে যেত বর্বর ধর্মগত ভেদ-বিভেদের কথা, ছুটে যেত লড়াইয়ের ময়দানে শহীদ হবার জন্য। তাদের ভুলে গিয়ে, তাদেরই ঐতিহ্যের হত্যাকারী বঙ্কিম-বিবেকানন্দকে প্রগতির প্রতিষ্ঠাতা বলে জাহির করলে ইতিহাসের উপর কুৎসিৎভাবে ব্যাভিচার করা হয়।

এই দৃষ্টি দিয়েই রবীন্দ্রনাথের বিচার করতে হবে। প্রথমেই রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক মত বিচার করা দরকার, কারণ তিনি রাজনীতি-নিরপেক্ষ ছিলেন না, রাজনৈতিক আন্দোলনে তাঁর সক্রিয় অংশ ছিল।

"দেশের টাকা নানা পথ দিয়া নানা আকারে বিদেশের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে বলিয়া আমরা আক্ষেপ করি—কিন্তু দেশের হৃদয় যদি যায়, দেশের সহিত যতকিছু কল্যাণ সম্বন্ধ একে একে সমস্তই যদি বিদেশী গভর্নমেণ্টেরই করায়ত্ত হয়, আমাদের আর কিছুই অবশিষ্ট না থাকে, তবে সেটা কি বিদেশ-গামী টাকার স্রোতের চেয়ে অল্প আক্ষেপের বিষয় হইবে? এই জন্যই কি আমরা সভা করি, দরখাস্ত করি, ও এইরূপে দেশকে অন্তরে বাহিরে সম্পূর্ণ-ভাবে পরের হাতে তুলিয়া দিবার চেষ্টাকেই বলে দেশহিতৈষিতা? ইহা কদাচ হইতে পারে না। ইহা কখনোই চিরদিন এ দেশে প্রশ্রয় পাইবে না—কারণ, ইহা ভারতবর্ষের ধর্ম নহে।"

(**আত্মশক্তি**, রবীন্দ্র রচনাবলী—৩য় খণ্ড, পৃঃ ৫৩৯)

তবে ভারতবর্ষের ধর্ম কি?

"আমাদের দেশে কল্যাণশক্তি সমাজের মধ্যে। তাহা ধর্মরূপে আমাদের সমাজের সর্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া আছে। সেই জন্যই এতকাল ধর্মকে সমাজকে বাঁচানোই ভারতবর্ষ একমাত্র আত্মরক্ষার উপায় বলিয়া জানিয়া আসিয়াছে।·রাজত্বের দিকে তাকায় নাই, সমাজের দিকেই দৃষ্টি রাখিয়াছে। এই জন্য সমাজের স্বাধীনতাই যথার্থভাবে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা। কারণ,

মঙ্গল করিবার স্বাধীনতাই স্বাধীনতা, ধর্মরক্ষার স্বাধীনতাই স্বাধীনতা।"
(ঐ—পৃঃ ৫৫৩)

অর্থাৎ রাষ্ট্রশক্তির জন্য সংগ্রাম না করাই ভারতের স্বধর্ম, রাষ্ট্র ইংরেজের অধীনে থাকুক, আমরা তার অধীনে সমাজ শাসন করব, ধর্মরক্ষা করব, লোকহিতকর কাজ করব।

"আমি বলিতেছি, গভর্নমেণ্টের সঙ্গে আমাদের ভদ্ররূপ সম্বন্ধ স্থাপনেরই সদুপায় করা উচিত। ভদ্রসম্বন্ধ মাত্রেরই মাঝখানে একটা স্বাধীনতা আছে। যে-সম্বন্ধ আমার ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোন অপেক্ষাই রাখে না, তাহা দাসত্বের সম্বন্ধ, তাহা ক্রমশ ক্ষয় হইতে এবং একদিন ছিন্ন হইতে বাধ্য। কিন্তু স্বাধীন আদান-প্রদানের সম্বন্ধ ক্রমশই ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠে।" (ঐ—পৃঃ ৫৭২)

বৃটিশ কমনওয়েলথের মধ্যে আজ ভারত যে ভাবে আবদ্ধ আছে এই বন্ধনই রবীন্দ্রনাথের কাছে স্বাধীনতা, সুতরাং নেহরুর রাজনৈতিক দীক্ষাগুরু রবীন্দ্রনাথ—একথা নিশ্চয়ই বলা চলে।

'আত্মশক্তি'র এই প্রবন্ধগুলি বাংলা ১৩০৮ সাল থেকে ১৩১২ সালের মধ্যে প্রকাশিত হয়। অর্থাৎ এটা হল ইংরেজী ১৯০১ খ্রীঃ থেকে ১৯০৫ খ্রীঃ-এর মধ্যে।

এই সময় বাংলার বিপ্লবীদলের আবির্ভাব হয়; তাদের নীতি ছিল আগে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল তারপর সমাজ-সংস্কার. রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তাদের বিরোধী. তাঁর নীতি ছিল রাষ্ট্রক্ষমতা ইংরেজেরই থাক, আমরা লোকহিতকর কাজের স্বাধীনতা গ্রহণ করি। রবীন্দ্রনাথ এই বিপ্লবীদের কি চোখে দেখতেন তা বর্ণনা করেছেন তাঁর 'চার অধ্যায়ে'। ভুমিকাতেই ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের মুখ দিয়ে বলিয়ে নিয়েছেন যে, ওদের "পতন ঘটেছে"।

রবীন্দ্রনাথের এই রাজনৈতিক আদর্শ যা রাষ্ট্রের উপর ধর্মকে স্থান দিয়েছে, যা রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের চেয়ে লোকহিকতর কাজকেই একমাত্র শ্রেয়ঃ বিবেচনা করেছে—এ হল প্রতিক্রিয়াশীল আদর্শ, তখনকার যুগোপযোগী অবস্থাতেই।

বঙ্গভঙ্গের সময় স্বদেশী আন্দোলনকে তিনি কিভাবে দেখেছেন তা প্রকাশ করেছেন এক কথাতে:

"এই উপলক্ষে আমাদের চিত্ত সর্বদা স্বদেশের অভিমুখ হইয়া থাকিবে। আমরা ত্যাগের দ্বারা, দুঃখ স্বীকারের দ্বারা আপন দেশকে যথার্থভাবে আপনার করিয়া লইব।" (ঐ—পৃঃ ৬০৮)

এর বেশি কিছু রবীন্দ্রনাথের কাম্য ছিল না।

রবীন্দ্রনাথের সুদীর্ঘ জীবনে এই রাজনৈতিক ধারণার কোন মৌলিক পরিবর্তন হয় নি। রাষ্ট্রীয় গণসংগ্রাম মাঝে মাঝে তাঁর মনের উপর রেখাপাত করেছে, বৃটিশ শাসনের অত্যাচারের বিরুদ্ধে তিনি মাঝে মাঝে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেছেন, কিন্তু রাজনীতিক্ষেত্রে তাঁর দর্শন ছিল 'গঠনমূলক কাজ', তাই সবসময়ই তিনি ছিলেন কংগ্রেসের বামপন্থীদের বিরোধী।

এবার দেখা যাক রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক মতটা কি ছিল।

"মানুষের গভীরতম ঐক্যটি যেখানে, সেখানে কোন সংজ্ঞা পৌছতে পারে না—কারণ সেই ঐক্যটি জড়বস্তু নহে তাহা জীবনধর্মী। সুতরাং তাহার মধ্যে যেমন একটা স্থিতি আছে তেমনি একটা গতিও আছে। কেবলমাত্র স্থিতির দিকে যখন সংজ্ঞাকে খাড়া করিতে যাই তখন তাহার গতির ইতিহাস তাহার প্রতিবাদ করে—কেবলমাত্র গতির উপরে সংজ্ঞাকে স্থাপন করাই যায় না, সেখানে সে পা রাখিবার জায়গাই পায় না।"

(**পরিচয়,** রবীন্দ্র রচনাবলী—১৮শ খণ্ড, পৃঃ ৪৬৭)

অর্থাৎ উপনিষদের মায়াবাদ হোল রবীন্দ্র দর্শনের সারমর্ম। এই দর্শনই শ্রেণীসংগ্রামে বুর্জোয়াশ্রেণীর সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী হাতিয়ার। মজুরশ্রেণীকে শ্রেণীসংগ্রাম ভুলিয়ে দেবার মত এত বড় শক্তিশালী হাতিয়ার ধনিকশ্রেণীও আবিষ্কার করতে পারেনি।

ধর্মের দিক থেকে রবীন্দ্রনাথ উদারমতাবলম্বী। নিজের ধর্মমত ব্যাখ্যা করে তিনি বলছেন:

"মনে রাখা দরকার, ধর্ম আর ধর্মতন্ত্র এক জিনিস নয়। ও যেন আগুন আর ছাই। ধর্মতন্ত্রের কাছে ধর্ম যখন খাটো হয় তখন নদীর বালি নদীর জলের উপর মোড়লি করিতে থাকে। তখন স্রোত চলে না, মরুভূমি ধূ ধূ করে। তার উপরে, সেই অচলতাটাকে লইয়াই যখন মানুষ বুক ফোলায় তখন গণ্ডস্যোপরি বিস্ফোটকং।"

রবীন্দ্রনাথ ফিউডাল ধর্মের গোঁড়ামি থেকে মুক্ত। তিনি বিশুদ্ধ বুর্জোয়া ধর্মমতাবলম্বী। কিন্তু তাই বলে তিনি ধর্মগত সংকীর্ণতার উর্ধ্বে ছিলেন মনে করলে ভুল হবে। দার্শনিক বচনবিন্যাসের আড়ালে সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা কি ভাবে উঁকি ঝুঁকি মারত তা হিন্দুমুসলমানের ঐক্য সম্বন্ধে তাঁর মত দেখলেই

বোঝা যায়। সোজা কথায় তিনি হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যে বিশ্বাসী ছিলেন না; হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার মধ্যে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের চক্রান্ত না দেখে তিনি দেখেছিলেন এই যে মুসলমানেরা মারতে পারে এবং হিন্দুরা শুধু পড়ে পড়ে মার খায়। তাই হিন্দু-মুসলমানের মিলন হয় না।

"হিন্দুতে মুসলমানে কেবল যে এই ধর্মগত ভেদ তা নয়, তাদের উভয়ের মধ্যে একটা সামাজিক শক্তির অসমকক্ষতা ঘটেছে। মুসলমানের ধর্ম-সমাজের চিরাগত নিয়মের জোরেই তার আপনার মধ্যে একটা নিবিড় ঐক্য জমে উঠেছে, আর হিন্দুর ধর্মসমাজের সনাতন অনুশাসনের প্রভাবেই তার আপনার মধ্যে একটা প্রবল অনৈক্য ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে। এর ফল এই যে, কোন বিশেষ প্রয়োজন না ঘটলেও হিন্দু নিজেকেই মারে, আর প্রয়োজন থাকলেও হিন্দু অন্যকে মারতে পারে না। আর মুসলমান কোন বিশেষ প্রয়োজন না ঘটলেও নিজেকে দৃঢ়ভাবে রক্ষা করে, আর প্রয়োজন ঘটলে অন্যকে বেদম মার দিতে পারে।" (**কালান্তর**—পৃঃ ২৩৯)

রবীন্দ্রনাথের এই উক্তির সরল অর্থ এই যে, মুসলমানেরা ঘোরতর সাম্প্রদায়িক এবং হিন্দুরা ঘোরতর অসাম্প্রদায়িক, তাই সমানে সমানে যে ঐক্য সম্ভব হিন্দু-মুসলমানে সে ঐক্য সম্ভব নয়। বলা বাহুল্য হিন্দু মহাসভা এবং রাষ্ট্রীয় সেবক সংঘের মতের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এই মতের কোন পার্থক্য নেই।

বৃটিশের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার জন্য হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের ব্যঙ্গ করে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :

"একটা জায়গায় দুই পক্ষ ক্ষণে ক্ষণে মেলবার চেষ্টা করে, সে হচ্ছে তৃতীয় পক্ষের বিরুদ্ধে। শিবঠাকুরের ছড়াটা যদি আজ সম্পূর্ণ পাওয়া যেত তা হলে দেখা যেত, ঐ যে প্রথমা কন্যাটি রাঁধেন বাড়েন অথচ খেতে পান না, আর সেই যে তৃতীয়া কন্যাটি না খেয়ে বাপের বাড়ি যান, এদের উভয়ের মধ্যে একটা সন্ধি ছিল—সেই হচ্ছে ঐ মধ্যমা কন্যাটির বিরুদ্ধে। কিন্তু যেদিন মধ্যমা কন্যা বাপের বাড়ি চলে যেত সেদিন অবশিষ্ট দুই সতিন, এই দুই পোলিটিকাল ally-দের মধ্যে চুলোচুলি বেধে উঠত।"

(**কালান্তর**—পৃঃ ২৩৮)

রবীন্দ্রনাথের এ মতটা তাঁকে গান্ধীর চেয়েও প্রতিক্রিয়াশীল করে তুলেছে, একেবারে তাঁকে সাভারকরের দীক্ষাগুরুতে পরিণত করেছে।

তবে ভারতবর্ষের হবে কি? উপায় একমাত্র ভগবানের নিকট প্রার্থনা।

"ভারতবর্ষের সেই পুরাতন প্রার্থনাকে আজ আবার সমস্ত প্রাণমন দিয়ে উচ্চারণ করবার সময় এসেছে, শুধু কণ্ঠ দিয়ে নয়, চিন্তা দিয়ে, কর্ম দিয়ে, শ্রদ্ধা দিয়ে, পরস্পরের প্রতি ব্যবহার দিয়ে: য একঃ অবর্ণঃ, যিনি এক এবং সকল বর্ণভেদের অতীত, স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু, তিনিই আমাদের শুভবুদ্ধি দিয়ে পরস্পর সংযুক্ত করুন।" (**কালান্তর**—পৃঃ ২৪৪)

সামাজিক, রাজনৈতিক ও দার্শনিক মতবাদে রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতপক্ষে বিবেকানন্দেরই উত্তরাধিকারী।

রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক ও রাজনৈতিক মত যে শ্রেণী সমাজের অনুকূল মত তা একেবারে দিনের আলোর মত স্পষ্ট হয়ে ওঠে জমিদারি প্রথা সম্বন্ধে তাঁর মতামত দেখলে। প্রমথ চৌধুরীর 'রায়তের কথা'র জবাবে তিনি যা লিখেছেন তা পড়লে তাঁকে আর কেউ টলস্টয়ের সঙ্গে তুলনা করবেন না। রায়তের কথা'য় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন:

"আমার জন্মগত পেশা জমিদারি, কিন্তু আমার স্বভাবগত পেশা আস্‌মান্‌দারি। এই কারণেই জমিদারির জমি আঁকাড়ে থাকতে আমার প্রবৃত্তি নেই। এই জিনিসটার 'পরে আমার শ্রদ্ধার একান্ত অভাব। আমি জানি, জমিদার জমির জোঁক, সে প্যারাসাইট্, পরাশ্রিত জীব।" (**কালান্তর**—পৃঃ ২৯৭)

এইটুকু পড়ে মনে হয় রবীন্দ্রনাথ খুব প্রগতিশীল। জমিদারকে বলছেন প্যারাসাইট্। কিন্তু তার পর মুহূর্তে কি বলছেন শুনুন:

"এমন জমিদারি ছেড়ে দিলেই ত হয়? কিন্তু, কাকে ছেড়ে দেব? অন্য এক জমিদারকে? গোলাম চোর খেলায় গোলাম যাকেই গছিয়ে দিই, তাব দ্বারা গোলাম-চোরকে ঠেকানো হয় না। প্রজাকে ছেড়ে দেব? তখন দেখতে দেখতে এক বড়ো জমিদারের জায়গায় দশ ছোট জমিদার গজিয়ে উঠ্‌বে।...তুমি বলেছ, জমি চাষ করে যে জমি তারই হওয়া উচিত। কেমন করে তা হবে জমি যদি হয় পণ্য দ্রব্য, যদি তার হস্তান্তরে বাধা না থাকে?" (**কালান্তর**—পৃঃ ২৯৮)

যেহেতু জমি পণ্য দ্রব্য সুতরাং কৃষককে জমি দিলেও তা থাকবে না। সুতরাং মার্কস্‌বাদীর লক্ষ্য হচ্ছে—সমাজতন্ত্র, সমাজতন্ত্রে পৌছতে হলে পয়লা নম্বর

জমিদারি খতম করে কৃষককে জমি দিতে হবে। কিন্তু সমাজতন্ত্র রবীন্দ্রনাথের দর্শনের বিরোধী তাই পণ্য বিনিময় ব্যবস্থা তাঁর মতে চিরস্থায়ী ব্যবস্থা, সুতরাং পণ্যের মত জমি বিক্রি হবেই, আর তা যদি হয় তবে জমিদারি প্রথা তুলে দিয়ে লাভ নেই। এ বিষয়ে তাঁর মূল কথাটা হোল এই :

"মূল কথাটা হ'ল এই—রায়তের বুদ্ধি নেই, বিদ্যা নেই, শক্তি নেই, আর ধনস্থানে শনি। তারা কোন মতে নিজেকে রক্ষা করতে জানে না। তাদের মধ্যে যারা জানে তাদের মতো ভয়ংকর জীব আর নেই। রায়ত-খাদক রায়তের ক্ষুধা যে কত সর্বনেশে তার পরিচয় আমার জানা আছে। তারা যে প্রণালীর ভিতর দিয়ে স্ফীত হয়ে জমিদার হয়ে ওঠে তার মধ্যে শয়তানের সকল শ্রেণীর অনুচরেরই জটলা দেখতে পাবে।"

(**কালান্তর**—পৃঃ ৩০০)

গরীব কৃষককে 'কুলাকের' ভয় দেখিয়ে রবীন্দ্রনাথ জমিদারি প্রথা সমর্থন করছেন। টলস্টয় অন্তত কৃষক-গণতন্ত্র বা ইউটোপিয়ান সোশালিজম-এর ভক্ত ছিলেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সামাজিক গণতন্ত্রের বিরোধী।

কুলাকের শোষণের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের যদি সত্যসত্যই সৎ অভিযোগ থাকত, তবে তিনি সমাজবাদ প্রচার করতেন। অন্তত টলস্টয়ের মত ইউটোপিয়ান সোশালিজম-এর কথা বলতেন। কিন্তু উপনিষদের দার্শনিক সম্পূর্ণ ভিন্ন সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন—সে সিদ্ধান্ত হল এই :

"কিন্তু এসব গেল খুচরো কথা। আসল কথা, যে মানুষ নিজেকে বাঁচাতে জানে না কোন আইনই তাঁকে বাঁচাতে পারে না। নিজেকে এই-যে বাঁচাবার শক্তি তা জীবনযাত্রার সমগ্রতার মধ্যে, কোনো-একটা খাপছাড়া প্রণালীতে নয়। তা বিশেষ আইনে নয়, চরকায় নয়, খদ্দরে নয়, কন্‌গ্রেসে ভোট দেবার চার-আনা-ক্রীত অধিকারে নয়। পল্লীর মধ্যে সমগ্রভাবে প্রাণ সঞ্চার হলে তবেই সেই প্রাণের সম্পূর্ণতা নিজেকে প্রতিনিয়ত রক্ষা করবার শক্তি নিজের ভিতর থেকেই উদ্ভাবন করতে পারবে।"

(**কালান্তর**—পৃঃ ৩০৩)

রবীন্দ্রনাথ সারা জীবন ধরে যে সাহিত্য সৃষ্টি করে গেছেন তার মূল কথা হোল এই "**প্রাণের সম্পূর্ণতা**"। শোষিত জনগণের গণতান্ত্রিক সংগ্রামের বিরুদ্ধে এযে কত শক্তিশালী হাতিয়ার তা বোঝা যায় এই উজ্জ্বল দার্শনিক তত্ত্বকে

শ্রেণী সমস্যার সমাধানে যে কাজে তিনি লাগিয়েছেন তাই দেখে। রবীন্দ্র দর্শন এবং রবীন্দ্র সাহিত্যের ভিতরকার কথাই হোল এই—সংসারের দুঃখ কষ্ট জ্বালা যন্ত্রণা শোষণ অবিচার অত্যাচার এ সমস্তের বিরুদ্ধে নিষ্ফল প্রতিবাদ করে লাভ নেই, প্রাণের সম্পূর্ণতা ছাড়া শোষিত মানুষের মুক্তির কোন উপায় নেই, তাই কোন শোষণ ব্যবস্থা উচ্ছেদ করার প্রচেষ্টা অত্যন্ত অন্যায়। এই দার্শনিক মতই কাব্যরস আকারে তিনি বুদ্ধিজীবীদের কাছে পরিবেশন করেছেন। এই প্রতিক্রিয়াশীল মতবাদের সঙ্গে টলস্টয়ের মতবাদের তুলনা করা মস্ত ভুল।

প্রগতিশীল মতবাদের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক মতবাদ কি পরিমাণ ক্ষুরধার ছিল তা তাঁর নিম্নলিখিত উক্তি থেকে বোঝা যায়।

"রাশিয়ার জারতন্ত্র ও বলশেভিক-তন্ত্র একই দানবের পাশমোড়া দেওয়া। পূর্বে যে ফোড়াটা বাঁ হাতে ছিল আজ সেটাকে ডান হাতে চালান করে দিয়ে যদি তাণ্ডব নৃত্য করা যায়, তাহলে সেটাকে বলতেই হবে পাগলামি। যাদের রক্তের তেজ বেশী, এক-এক সময়ে মাথায় বিপরীত রক্ত চড়ে গিয়ে তাদের পাগলামি দেখা দেয়—কিন্তু সেই দেখাদেখি নকল পাগলামি চেপে বসে অন্য লোকের, যাদের রক্তের জোর কম। তাকেই বলে হিস্‌টিরিয়া। আজ তাই যখন শুনে এলুম সাহিত্যে ইশারা চলছে 'মহাজনকে লাগাও বাড়ি, জমিদারকে ফেলো পিষে,' তখনি বুঝতে পারলুম, এই লালমুখো বুলির উৎপত্তি এদের নিজের রক্ত থেকে নয়। এ হচ্ছে বাঙালীর অসাধারণ নকল নৈপুণ্যের নাট্য, ম্যাজেণ্টা রঙে ছোপানো, এর আছে উপরে হাত-পা ছোঁড়া, ভিতরে চিত্তহীনতা।" (**কালান্তর—পৃঃ ২৯৭**)

নেহরু-বিধান-সরকারের নিরাপত্তা আইনের পক্ষে এর চেয়ে শক্ত একাধারে দার্শনিক এবং আর্টিষ্টিক যুক্তি আর কেউ দিতে পারবে না।

বাংলার উদীয়মান প্রগতি সাহিত্য রবীন্দ্রনাথের কাছে "নকল নৈপুণ্যের নাট্য", গণতান্ত্রিক সংগ্রাম তাঁর কাছে "হিষ্টিরিয়া", সমাজতন্ত্রের সংগ্রাম একটা "পাগলামি"।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতায় লিখেছেন "ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ"—এই কথাটা অত্যন্ত প্রগতিশীল সংগ্রামের আহ্বান হিসেবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়ে থাকে। রবীন্দ্রনাথ নিজে এ কথাটা লিখেছেন সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থে:

"একথা তারা জানেই না যে, মানুষকে আপনার শক্তিকে অসাধ্য সাধন

করতে হবে, যা হয়েছে তার মধ্যে সে বদ্ধ থাকবে না, যা হয়নি তার দিকে সে এগোবে—তাল ঠুকে বুক ফুলিয়ে নয়, অন্তঃকরণের সাধনার বলে, আত্মশক্তির উদ্বোধনে।"

গণসংগ্রামের সমস্ত পদ্ধতিকেই তিনি এই এক বাক্যে উড়িয়ে দিয়েছেন—এমন কি নিয়মতান্ত্রিকদের শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকেও ব্যঙ্গ করে "অন্তঃকরণের সাধনা"ই প্রচার করেছেন। লড়াইকে ত আমলই দেন নি।

এ কথাটা রবীন্দ্রনাথ বাতায়নিকের পত্রে বেশ স্পষ্ট করেই বলেছেন :

"বিধাতা আমাদের একটা দিকে নিশ্চিন্ত করেছেন, ঐ বলের দিকটায় আমাদের রাস্তা একেবারে শেষ ফাঁকটুকু পর্যন্ত বন্ধ ; যে আশা রাস্তা না পেলেও উড়ে চলে সেই আশারও ডানা কাটা পড়েছে। আমাদের জন্যে কেবল একটা বড়ো পথ আছে, সে হচ্ছে দুঃখের উপরে যাবার পথ। রিপু আমাদের বাইরে থেকে আঘাত দিচ্ছে, তাকে আমরা অন্তরে আশ্রয় দেব না। যারা মারে তাদের চেয়ে আমরা যখন বড়ো হতে পারব তখন আমাদের মার-খাওয়া ধন্য হবে। সেই বড়ো হবার পথ না লড়াই করা, না দরখাস্ত লেখা।" (**কালান্তর**—পৃঃ ১৩৮)

অত্যাচারীর অত্যাচারে যারা নিপীড়িত তাদের উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথের আহ্বান হোল—মারের বিরুদ্ধে দরখাস্তও লিখো না, লড়াইও ক'র না, তোমার মার-খাওয়া যাতে ধন্য হয় তাই করো, অর্থাৎ তোমার অন্তরে রিপুকে আশ্রয় দিও না, অন্তরের রিপুকে তাড়িয়ে যে মারে তার চেয়ে বড়ো হও, তবেই তোমার মার-খাওয়া ধন্য হবে।

রবীন্দ্র রচনাবলী বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাবেন যে এই কথাটাই রবীন্দ্রনাথ প্রচার করেছেন সারাজীবন ধরে তাঁর গানে, কবিতায়, গল্পে, প্রবন্ধে এবং বক্তৃতায়। এটা প্রতিক্রিয়াশীল কিনা সে বিষয়ে যদি এখনও সন্দেহ থাকে তবে সংগ্রামী জনতার প্রতিরোধী সৈনিকদের কাছে এই কথাটা উপস্থিত করে দেখুন তারা কি বলে। তাদের রায়ই ইতিহাসের চিরস্থায়ী রায়।

টলস্টয়ের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের তুলনা করা হয়ে থাকে। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে টলস্টয়ের পার্থক্য সবচেয়ে ধরা পড়ে কৃষকের প্রতি লেখকের ব্যবহার নিয়ে। কৃষকের প্রতি টলস্টয়ের ছিল শ্রদ্ধা এবং ভালবাসা, কৃষকের প্রতি রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন শুধু তাচ্ছিল্য, 'রায়তের কথা'য় রবীন্দ্রনাথ কৃষকদের সম্পর্কে যে

মত ব্যক্ত করেছেন, 'রাজা ও রাণী'-তে কৃষকদের নিয়ে ঠিক সেই ছবিই এঁকেছেন। সেখানে দেবদত্ত বলছে—"পরিণামে এই সব মূর্খরা "ভ্রমদ-ভ্রমদ-ভ্রমৎ" হয়ে মরবে না?"

রবীন্দ্রনাথ শেষ জীবনে দেখে গেছেন ধনবাদের অন্তিম সংকট, সাম্রাজ্যবাদের বীভৎসতম রূপ এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে আর্ত জাতিসমূহের রক্ষাকল্পে সোভিয়েট ইউনিয়নের ঐতিহাসিক ভূমিকা। ১৯৪০-৪১ সালের যুগান্তকারী ঘটনাবলী এবং শক্তি সংঘাত রবীন্দ্রনাথের উপর প্রভাব বিস্তার না করে পারেনি—মহৎ আর্টিস্টের মত তিনি এ যুগে প্রগতিশীল শিবিরের প্রতি তাঁর অকুণ্ঠ সমর্থন ঘোষণা করেছিলেন—তার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর শেষ জীবনের কবিতায় এবং প্রবন্ধে।

সভ্যতার সংকট নামক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন:

"নিভৃতে সাহিত্যের রসসম্ভোগের উপকরণের বেষ্টন হতে একদিন আমাকে বেরিয়ে আসতে হয়েছিল। সে দিন ভারতবর্ষের জনসাধারণের যে নিদারুণ দারিদ্র্য আমার সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত হ'ল তা হৃদয়বিদারক।"

রবীন্দ্রনাথ এ প্রবন্ধে আর রাষ্ট্র এবং সমাজের মধ্যে পার্থক্য রচনা করেননি, আহ্বান করেননি ইংরেজ সরকারের সঙ্গে ভদ্র সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য। তিনি অসংকোচে ইংরেজ শাসনকেই দায়ী করেছেন ভারতের দুর্দশার জন্য; বলেছেন:

"অথচ এই দেশ ইংরেজকে দীর্ঘকাল ধরে তার ঐশ্বর্য জুগিয়ে এসেছে। যখন সভ্যজগতের মহিমা ধ্যানে একান্ত মনে নিবিষ্ট ছিলেম তখন কোনা দিন সভ্যনামধারী মানব আদর্শের এত বড়ো নিষ্ঠুর বিকৃত রূপ কল্পনাই করতে পারি নি; অবশেষে দেখছি, একদিন এই বিকারের ভিতর দিয়ে বহুকোটি জন-সাধারণের প্রতি সভ্যজাতির অপরিসীম অবজ্ঞাপূর্ণ ঔদাসীন্য।"

(**কালান্তর**—পৃঃ ৩৮৫)

এ শুধু ইংরেজ শাসনের সমালোচনা নয়, রবীন্দ্রনাথের নিজেরও আত্মসমালোচনা।

'রাশিয়ার চিঠি'তে রবীন্দ্রনাথ সোভিয়েটের গঠনকার্যের ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন, কিন্তু 'সভ্যতার সংকটে' তিনি ব্যক্ত করেছেন এই মূল্যবান সত্যটি যে, সোভিয়েট রুশিয়াই অনুন্নত জাতিসমূহের ঐকান্তিক বন্ধু।

"বহুসংখ্যক পরজাতের উপরে প্রভাব চালনা করে এমন রাষ্ট্রশক্তি আজ প্রধানতঃ দুটি জাতির হাতে আছে—এক ইংরেজ, আর এক সোভিয়েট রাশিয়া। ইংরেজ এই পরজাতীয়ের পৌরুষ দলিত করে দিয়ে তাকে চিরকালের মত নির্জীব করে রেখেছে। সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে রাষ্ট্রিক সম্বন্ধ আছে বহুসংখ্যক মরুচর মুসলমান জাতির—আমি নিজে সাক্ষ্য দিতে পারি, এই জাতিকে সকল দিকে শক্তিমান করে তোলবার জন্য অধ্যবসায় নিরন্তর। সকল বিষয়ে তাদের সহযোগী করে রাখবার জন্য সোভিয়েট গভর্নমেণ্টের প্রভাব কোনো অংশে অসম্মানকর নয় এবং তাতে মনুষ্যত্বের হানি করে না।" (**কালান্তর**—পৃঃ ৩৮৫, ৩৮৬)

মহৎ-আর্টিস্ট বলেই সারাজীবন প্রতিক্রিয়াশীল আদর্শ অনুসরণ করেও রবীন্দ্রনাথ সাহস করে এ কথা বলতে পেরেছিলেন যে, দুর্বল দেশের উপর "সোভিয়েট গভর্নমেণ্টের প্রভাব কোন অংশে অসম্মানকর নয় এবং তাতে মনুষ্যত্বের হানি করে না।" রবীন্দ্রনাথের এই সত্য ঘোষণার সঙ্গে তুলনা করুন তথাকথিত বামপন্থী দলসমূহের রটিত এই কুৎসাকে: 'সোভিয়েটও একটি সাম্রাজ্যবাদী শক্তি।'

ভারতে হিন্দু-মুসলমান দ্বন্দ্বের পিছনে যে সাম্রাজ্যবাদের ষড়যন্ত্র আছে এ কথা অতীতে তিনি স্বীকার করেননি, এবং দোষারোপ করেছেন হিন্দুর দুর্বলতাকে এবং মুসলমানের উগ্রতাকে। কিন্তু 'সভ্যতার সংকটে' রবীন্দ্রনাথ সে সিদ্ধান্ত পাল্টে দিয়েছেন। এই প্রবন্ধে হিন্দু-মুসলমান বিবাদের উল্লেখ করে তিনি লিখেছেন:

"আমাদের বিপদ এই যে, এই দুর্গতির জন্যে আমাদেরই সমাজকে একমাত্র দায়ী করা হবে। কিন্তু এই দুর্গতির রূপ যে প্রত্যহই ক্রমশ উৎকট হয়ে উঠেছে সে যদি ভারত শাসনযন্ত্রের উর্ধ্বস্তরে কোনো-এক গোপন কেন্দ্রে প্রশ্রয়ের দ্বারা পোষিত না হ'ত তা হ'লে কখনোই ভারত-ইতিহাসের এত বড়ো অপমানকর অসভ্য পরিণাম ঘটতে পারত না।"

(**কালান্তর**—পৃঃ ৩৮৭)

'আত্মশক্তি' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ইংরেজ সভ্যতার প্রতি শ্রদ্ধা দেখিয়েছেন, ভারতের দুর্ভাগ্যের জন্য দায়ী করেছেন ভারতবাসীকে, বারণ করেছেন ভিক্ষা এবং লড়াই দুই-ই। সে দিন রবীন্দ্রনাথ কবডেন এবং ব্রাইটের উদারনীতিক

বাক্যচ্ছটায় মুগ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু ৮০ বৎসর বয়সে রবীন্দ্রনাথ নিজেরই আত্মসমালোচনা করে গেছেন নির্ভীক ভাবে।

"জীবনের প্রথম আরম্ভে সমস্ত মন থেকে বিশ্বাস করেছিলুম য়ুরোপের অন্তরের সম্পদ এই সভ্যতার দানকে। আর আজ আমার বিদায়ের দিনে সে বিশ্বাস একেবারে দেউলিয়া হয়ে গেল। আজ আশা ক'রে আছি, পরিত্রাণ কর্তার জন্মদিন আস্‌ছে আমাদের এই দারিদ্র্য-লাঞ্ছিত কুটিরের মধ্যে; অপেক্ষা করে থাকব, সভ্যতার দৈববাণী সে নিয়ে আসবে, মানুষের চরম আশ্বাদের কথা মানুষকে এসে শোনাবে এই পূর্বদিগন্ত থেকেই। আজ পারের দিকে যাত্রা করেছি—পিছনের ঘাটে কী দেখে এলুম, কী রেখে এলুম, ইতিহাসের কী অকিঞ্চিৎকর উচ্ছিষ্ট সভ্যতাভিমানের পরিকীর্ণ ভগ্নস্তূপ! কিন্তু মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, সে বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত রক্ষা করব। আশা করব, মহাপ্রলয়ের পরে বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের একটি নির্মল আত্মপ্রকাশ হয়তো আরম্ভ হবে এই পূর্বাচলের সূর্যোদয়ের দিগন্ত থেকে। (**কালান্তর—পৃঃ ৩৮৯**)

রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনের এই ঘোষণা প্রগতিশীল শিবিরের শক্তিবৃদ্ধি করেছে নিঃসন্দেহে। এ ঘোষণা যে তাঁর অন্তর থেকেই এসেছিল তার প্রমাণ এই যে, এই ঘোষণার সারমর্মই ফুটে বেরিয়েছে তাঁর শেষ জীবনের কবিতায়।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে যখন সমগ্রভাবে বিচার করব তখন শুধু এই শেষ জীবনের শেষ কথা দিয়ে বিচার করলে ভুল হবে, কারণ সারাজীবন তিনি যা সৃষ্টি করে গেছেন তাও মানুষের সাধারণ সম্পত্তি হয়ে রয়েছে, সে সব অস্ত্র প্রতিক্রিয়াশীল শিবিরকেই সশস্ত্র রেখেছে। সে শিবিরকে নতুন করে নিরস্ত্র করার মত দান তিনি করে যেতে পারেননি। ৮০ বছর ধরে যা তিনি রেখে গেছেন, ৮০ বছর বয়সে তার সব কিছু ফিরিয়ে নেবার মত সময় ও শক্তি তাঁর ছিল না। গোর্কি তাঁর এক প্রবন্ধে ঈশ্বরের কথা প্রচার করেছিলেন। লেনিন সে জন্য তাঁকে ভৎ‍র্সনা করে বলেছিলেন:

"তুমি যে মুহূর্তে একথা লিখেছ সেই মুহূর্তে তা জনসাধারণের সম্পত্তি হয়ে গেছে, এখন আর তুমি কি মনে ভেবে লিখেছ তা দিয়ে তার তাৎপর্য বিচার হবে না, তার তাৎপর্য বিচার হবে বিভিন্ন সামাজিক শক্তির এবং বিভিন্ন শ্রেণীর বাস্তব সম্বন্ধ দিয়ে।" (**নির্বাচিত রচনাবলী**—১১শ খণ্ড, পৃঃ ৬৭৮)

রবীন্দ্রনাথকে বিচার করতে হবে লেনিনের এই কথা দিয়ে। সমগ্র জীবন ধরে রবীন্দ্রনাথ যা সৃষ্টি করে গেছেন, শ্রেণীসংগ্রামের ক্ষেত্রে তা প্রতিক্রিয়াশীল শিবিরের শক্তি, প্রগতিশিবিরকে এগোতে হবে রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকার করেই, তাঁর শেষ জীবনের নজিরটা শুধু তুলে ধরে রবীন্দ্রনাথকে সমগ্রভাবে এবং মূলত প্রগতিশীল বলে ঘোষণা করলে সেটা হবে নিছক সুবিধাবাদ।

কাজেই মার্কস্‌বাদী দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথকে বুঝতে হলে লেনিন টলস্টয় সম্বন্ধে কি সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন সে কথা স্মরণ করা প্রয়োজন। লেনিন বলেছিলেন:

"টলস্টয়ের শিক্ষা ছিল নিঃসন্দেহে 'ইউটোপিয়ান্‌'; এবং তার প্রকৃতি হোল প্রতিক্রিয়াশীল, প্রতিক্রিয়াশীল শব্দটার সুস্পষ্ট এবং সুগভীর অর্থেই এ বিশেষণ প্রয়োজ্য। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, টলস্টয়ের শিক্ষা সোশালিস্ট শিক্ষা নয় অথবা তার মধ্যে এমন কিছুই নেই যা অগ্রগামী শ্রেণীসমূহের জ্ঞানবৃদ্ধির জন্য মূল্যবান।"

এই সূত্রে লেনিন এটাও দেখিয়ে দিয়েছেন যে টলস্টয়ের সোশালিজম ছিল ফিউডাল সোশালিজম, যাকে মার্কস্‌ 'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো'-তে প্রতিক্রিয়াশীল সোশালিজম বলে বর্ননা করেছেন।

টলস্টয়ের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কোন কোন বিষয়ে মিল আছে কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মতবাদে টলস্টয়ের ফিউডাল সোশালিজম নেই, আছে ধনতন্ত্র ও জমিদারি প্রথার বা শ্রেণীবিভক্ত সমাজের সুস্পষ্ট সমর্থন। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাও প্রতিক্রিয়াশীল—কারণ শ্রেণীবিভক্ত ধনতান্ত্রিক সমাজে তিনি বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামের শিক্ষা না দিয়ে রাষ্ট্রে বিদেশী কর্তৃত্ব মেনে নিয়ে তার সঙ্গে "ভদ্র সম্বন্ধ" স্থাপনের শিক্ষা দিয়েছেন। তবে টলস্টয়ের মত রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধেও একথা বলা চলে যে, অগ্রগামীদের কাজে লাগবার মত মূল্যবান শিক্ষাও মাঝে মাঝে তিনি দিয়েছেন। ফাশিজমের বিরুদ্ধে, নোগুচির পত্রের জবাবে, 'সভ্যতার সংকট' নামক প্রবন্ধে তিনি ফাশিস্ট শক্তির বিরুদ্ধে গণমানবের জয়ের প্রতি যে আস্থা ঘোষণা করেছেন তা নিশ্চয়ই শ্রমিকশ্রেণীর নিকট একটি সম্পদ, এ সম্পদ শ্রমিকের অনেক কাজে লাগবে। কিন্তু সমগ্রভাবে বিচার করলে এ কথা নিঃসন্দেহ যে, রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাবলী প্রতিক্রিয়াশীল।

প্রগতি সাহিত্যিকদের কেউ কেউ প্রশ্ন করেছেন যে, লেনিন টলস্টয়কে বলেছেন "বিপ্লবের দর্পণ," আমরাই বা রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে সে কথা বলতে পারব

না কেন? কেন পারবেন না; নিশ্চয়ই পারেন, কিন্তু লেনিন যা বলেছিলেন তার মানেটাও বোঝা দরকার।

"টলস্টয় রুশ বিপ্লবের দর্পণ" একথা বলার সঙ্গে সঙ্গে লেনিন বুঝিয়ে দিয়েছেন যে টলস্টয়ের যুগে (১৮৬১-১৯০৫) ভূমিদাস প্রথা লুপ্ত হবার ঠিক পরে রুশীয় কৃষকের জীবনে যে আত্মবিরোধ ছিল সেই আত্মবিরোধ ফুটে উঠেছে টলস্টয়ের শিক্ষায়। কৃষকের মনে যতখানি স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে ও ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ আছে টলস্টয়ের শিক্ষাতেও তা আছে, আবার কৃষকের অজ্ঞতা, অসহায়তা ও অনুন্নত অবস্থা প্রতিফলিত হায়ছে টলস্টয়ের নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধে, ধর্ম প্রচার, ইউটোপিয়ান সোশালিজম-এ। টলস্টয় ঠিক ভূমিদাস প্রথা থেকে সত্যমুক্ত কৃষকের প্রতিনিধি। টলস্টয় তৎকালীন রুশ বিপ্লবের সমস্ত দুর্বলতার দর্পণ।

(লেনিন : **নির্বাচিত রচনাবলী**—১১শ খণ্ড, ৬৮১-৬৯৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য)

দর্পণের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যদি উপমা দিতে হয় তবে তার মানে দাঁড়ায় এই—

১৮৭৫ সালের পর থেকে ভারতে যে নবীন বুর্জোয়া শ্রেণীর উদয় হল, রবীন্দ্রনাথ তাদের প্রতিনিধি। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তাদের যতখানি দ্বেষ ছিল, রবীন্দ্রনাথের শিক্ষায় তা ফুটে বেরিয়েছে। কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে এই তরুণ বুর্জোয়া শ্রেণীর সমস্ত দুর্বলতাই প্রতিফলিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষায়। সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপসে অর্থনৈতিক সুবিধা লাভ, গণসংগ্রামের প্রতি বিমুখতা, সমাজের গণতান্ত্রিক পরিবর্তনে অক্ষমতা এমন কি জমিদারি প্রথা বাঁচিয়ে রেখে ফিউডালিজম-এর সঙ্গে আপস এবং সর্বোপরি হিন্দু-রিভাই-ভালিজম। "বাংলা সাহিত্যের কয়েকটি ধারা" এই প্রবন্ধে লিখিত আছে :

> "এদেশে বাংলা সংস্কৃতিতে রবীন্দ্র যুগ উদীয়মান ধনিক সভ্যতার যুগ থেকে আরম্ভ করে ধনিক সভ্যতার অন্তিম যুগ পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত। রবীন্দ্র সাহিত্যের ভিতর তাই আছে সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততান্ত্রিক প্রভুত্ববাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, সেই সঙ্গে ধনতন্ত্রের আভ্যন্তরীণ দৈন্যের আত্মসমালোচনা।"

(**মার্কসবাদী** ১নং, পৃঃ ৭৪)

কিন্তু তাঁর "বিদ্রোহ" শুধু "প্রভুত্ববাদের" (অথরিটেরিয়ানিজম-এর) বিরুদ্ধেই, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধেও নয়, ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধেও নয়; এমন কি সামন্ততন্ত্রের

বিরুদ্ধেও বিদ্রোহ নেই। তিনি প্রচার করেছেন বিদেশী প্রভুদের সঙ্গে সভ্যতার সম্বন্ধ, সামাজিক প্রভু ও দাসে মিত্রের সম্বন্ধ। কিন্তু প্রভু প্রভুই থাকবে, দাস দাসই থাকবে। তাই অনেক জায়গায় তাঁর অনেক উক্তি "তাঁকে অনেক সময় শ্রমিক স্বার্থের কাছাকাছি এনে" ফেললেও তাঁকে প্রগতিশীল বলে ঘোষণা করা একেবারেই ভুল। প্রতিক্রিয়াশীল এই কথাটার "সুস্পষ্ট ও সুগভীর" অর্থেই রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা প্রতিক্রিয়াশীল।

১নং মার্কসবাদীতে "বাংলা সাহিত্যের কয়েকটি ধারা" নামক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আমি যা বলেছি তা শুধু আংশিক সত্য, কাজেই তা সঠিক নয়।

একজন মহৎ শিল্পীকে বিচার করা যায় না মাত্র তার কয়েকটি সৃষ্টি দিয়ে, কারণ একজন মহৎ শিল্পীর সৃষ্টিতে সমাজের বিভিন্ন ধারা বিভিন্ন সময়ে অতি বিচিত্রভাবে প্রতিফলিত হয়। তেমনি রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিতে বিশেষ বিশেষ দিক থেকে প্রগতিশীল শক্তি প্রতিফলিত হয়েছে। কিন্তু তাঁর শিক্ষাগুলিকে বিচার করতে হবে তাঁর সমগ্র রাজনীতি, সমগ্র দর্শন এবং সমগ্র সৃষ্টির সম্পূর্ণ তাৎপর্য দিয়ে। সেদিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় যে, রবীন্দ্রনাথ যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তা প্রগতি-শিবিরের বিরুদ্ধ শক্তি। তাঁর যে দার্শনিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক মত প্রস্ফুটিত হয়েছে তাঁর গল্পে, গানে এবং কবিতায় তার মূল কথা ভারতের বর্তমানের সঙ্গে তার অতীতের সামঞ্জস্য সৃষ্টি করা, ধনবাদী সমাজের বিজ্ঞানের সঙ্গে যোগ করা উপনিষদের অবৈজ্ঞানিক আধ্যাত্মিকতাকে, এবং জীবনের সঙ্গে মরণের, যুক্তিতত্ত্বের সঙ্গে সংস্কারের, রাজনীতির সঙ্গে ধর্মের এমন মিশ খাওয়ানো যার মানে হচ্ছে সূক্ষ্মভাবে পরাধীন জাতির গণমানবকে নিষ্ক্রিয় আত্মসমর্পণ শেখানো।

কিন্তু মনে রাখতে হবে এই কথা যে, সচরাচর একজন প্রতিক্রিয়াশীল শিল্পীর প্রত্যেকটি সৃষ্টিই প্রতিক্রিয়াশীল হয় না, যেমন একজন প্রগতিশীল শিল্পীর প্রত্যেকটি সৃষ্টিই প্রগতিশীল হয় না। বিচার করে দেখতে হবে যে মোটের উপর তাঁর **সমগ্র** সৃষ্টির **সমগ্র** প্রভাবটা কি? এই সমগ্রের ভিতর এমন বিশেষ বিশেষ অংশ নিশ্চয়ই থাকা সম্ভব যা সমগ্রের বিরোধী। বুর্জোয়া এবং পেটি-বুর্জোয়া শিল্পীদের মধ্যে এই আত্মবিরোধ হামেশাই থাকে। রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও আছে। রবীন্দ্রনাথেরও এমন কয়েকটি বিশেষ বিশেষ সৃষ্টি আছে যা তাঁর সমগ্র সৃষ্টির মূল সুরের বিরোধী, এবং প্রগতিশীল। যেমন তাঁর 'বউ ঠাকুরাণীর হাট'।

এই উপন্যাসে প্রতাপাদিত্যকে তিনি যে ভাবে চিত্রিত করেছেন তা ঐতিহাসিক সত্য হোক বা না হোক তাতে কিছু এসে যায় না। রাজার অত্যাচার, প্রজার স্বার্থ এবং রাজ পরিবারের ট্রাজেডির ভিতর প্রজাশক্তির মহিমাকে বড় করে তোলা—এই উপন্যাসের বিশেষত্ব। এ রকম উপন্যাস রবীন্দ্রনাথ জীবনে আর কখনও লেখেন নি—কবি কালিদাসের মত রাজার মহিমা কীর্তনই তাঁর অন্যান্য উপন্যাসে এমন কি অনেক কবিতাতেও প্রধান স্থান অধিকার করেছে। রচনাবলী সংস্করণে 'বউ ঠাকরাণীর হাটে'র ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ মিনতি প্রকাশ করে বলেছেন যে, এই বইতে প্রতাপাদিত্যকে তিনি অত্যাচারী ও অপদার্থ রাজা বলে বর্ণনা করেছেন কারণ তখনকার ইতিহাসে তিনি প্রতাপাদিত্যের এই পরিচয়ই পেয়েছিলেন, স্বদেশী আন্দোলনের যুগে প্রতাপাদিত্যের যে মহৎ পরিচয় দেওয়া হয়েছে তা তার আগে জানা ছিল না। ভাগ্যিস তা ছিল না, তাই রবীন্দ্রনাথ অন্তত একখানি গণতান্ত্রিক উপন্যাস রচনা করেছিলেন। বউ ঠাকুরাণীর হাটেও প্রজাতন্ত্রকে তিনি সাহস করে বরণ করতে পারেন নি তবু এই উপন্যাসে রাজতন্ত্রের মুখোশ খুলে ধরে তিনি বাঙালীর চিন্তাধারাকে প্রগতির দিকেই ঠেলে দিতে সাহায্য করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তী কালে তাঁর অন্যান্য উপন্যাসে প্রাচীন রাজতন্ত্রের দিকেই তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ। "এবার ফিরাও মোরে" কবিতাটি নিঃসন্দেহে তরুণ বাঙালীর মনে বিপ্লবী প্রেরণা জাগিয়ে তোলে। কিন্তু এ কথাও সত্য যে, এ রকম ধরনের কয়েকটি কবিতাকে ছাপিয়ে ওঠে 'গীতাঞ্জলী', 'নৈবেদ্য' এবং 'সোনার তরী'। এই তিনখানি কাব্যে রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণবের মিনতি, বৌদ্ধের নির্বিকল্প সমাধি এবং উপনিষদের মায়াবাদ এই তিন অতীত যুগের তিন ভাবদর্শনকে ছত্রে ছত্রে ফুটিয়ে তুলেছেন নানা রসে নানা রঙে এমন মনোরম ভাবে যে তা সংসারের সংঘাত ও দ্বন্দ্ব থেকে মানুষের মনটাকে সরিয়ে নিয়ে যায় একেবারে উর্দ্ধলোকে। বলাকার আবেদনও তার মধ্যে থৈ পায় না। গভীর অন্ধকারে সে শুধু জোনাকির মত একটুখানি চমক জাগায়, পথ দেখায় না। রবীন্দ্র কাব্য মানুষকে মূলত এই কথাই শেখায়— সংসারে তুমি যে সোনার পসরা লাভ করবে, তাতেই তোমার পারের তরি ভরে যাবে, তোমাকে নেবার ঠাঁই হবে না। সংসারের দ্বন্দ্বে তুমি একা এবং অসহায়। সংসারের সংঘাত থেকে পালিয়ে যাবার এ মন্ত্র রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক এবং দার্শনিক মতেরই কাব্য মূর্তি। এ মন্ত্র প্রতিক্রিয়াকে শক্তিশালী

করে, প্রগতিকে নয়।

মার্কস্‌বাদী যদি এই সত্য গোপন না করেন তবে তিনি রবীন্দ্রনাথের কাব্য ভাণ্ডার থেকে এমন বিশেষ বিশেষ উপাদান আহরণ করতে পারেন, যা গণতান্ত্রিক সংগ্রামের শিবিরকে সমৃদ্ধ করবে, কিন্তু এ সত্য গোপন করে রাখলে প্রতিক্রিয়া তার চরম বিপদের সময় রাবীন্দ্রিক মোহের সাহায্যে যাদু বিস্তার করতে সক্ষম হবে। ভারতে মার্কস্‌বাদী শিবিরের সংকট এইখানে যে, মার্কস্‌বাদীগণ এ বিষয়ে সচেতন নন, তাঁরা প্রগতির শিবিরকে রাবীন্দ্রিক মোহে আচ্ছন্ন রেখে শত্রুপক্ষের যাদু বিস্তারে সাহায্য করছেন, তাঁর আদর্শকে আক্রমণ করতে পারছেন না, কারণ সে আঘাত নিতান্ত অনিবার্যভাবেই রবীন্দ্রনাথের গায়ে এসে লাগে। রবীন্দ্র দর্শনই ভারতীয় শাসকশ্রেণীর দর্শন। রবীন্দ্র দর্শনকে আক্রমণ করতে হবে শাসকশ্রেণীকে পরাস্ত করার জন্য। রবীন্দ্র সাহিত্যের সঙ্গে মার্কস্‌বাদের বিরোধ এত প্রচণ্ড যে প্রগতির শিবিরে তার স্থান হতে পারে না। রবীন্দ্র সাহিত্য হোল প্রগতির শিবির থেকে মানুষ ভুলিয়ে বের করে নিয়ে যাবার মোহিনী মায়া।

ভারতের ইতিহাসে রামমোহন-বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ যে ধারাকে পরিপুষ্ট করেছেন তা প্রগতিশীল ধারা নয় বরং তার উল্টো ধারা। ভারতের ইতিহাসে ইংরেজ-শাসন প্রগতির সূত্রপাত করেছিল একথা যদি সত্য হয় তবেই এদের ধারাকে প্রগতিশীল ধারা বলা যায়।

মার্কসের মতে ভারতে প্রগতিশীল সংস্কৃতির সূত্রপাত হয়েছিল ইংরেজ অধিকারের অনেক আগে, সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে। এই প্রগতির চিহ্ন হল হিন্দু মুসলমানের ঐক্য এবং সংস্কৃত ও পারসীর স্থানে আধুনিক ভাষার ক্রমবিকাশ। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক ভারত অধিকারের পূর্ব পর্যন্ত ভারতের বিভিন্ন দেশে প্রগতিশীল চিন্তাধারার যে ক্রমবিকাশ হচ্ছিল তার পরিচয় দিয়েছেন সোভিয়েটের জনৈক পণ্ডিত, যিনি তুলসীদাসের রামায়ণ রুশ ভাষায় তর্জমা করেছেন। ভারতের বুর্জোয়া ঐতিহাসিকেরা প্রচার করে থাকেন যে ভারতে ইংরেজ শাসনই প্রগতিশীল চিন্তাধারা নিয়ে এসেছে। প্রকৃতপক্ষে ইংরেজ শাসনের আগেই যে প্রগতিশীল চিন্তাধারার সূত্রপাত হয়েছিল তার স্বাধীন ক্রমবিকাশে বাধা দিয়েছে ইংরেজের ভারত অধিকার। মার্কস্ ঠিকই বলেছেন যে, ইংরেজ কর্তৃক ভারত অধিকারের আগে এদেশে যে, গ্রাম্য

পঞ্চায়েত ছিল সেগুলিই সামাজিক বর্বরতার কেন্দ্র এবং রাজতন্ত্রের ভিত্তি ছিল। ইংরেজ-শাসনে এই গ্রাম্য পঞ্চায়েত ধ্বংস হয় এবং সমাজে ধনতান্ত্রিক বিকাশের দ্বার খুলে যায়। কিন্তু মার্কস্ কখনও এ কথা বলেননি যে ভারতে ইংরেজ শাসন একটি প্রগতিশীল শক্তি। নবাব সিরাজউদ্দৌলা যখন প্রথম ইংরেজদের কলকাতা থেকে হটিয়ে দেন তখন মার্কস্ সে ঘটনাতে উচ্ছ্বসিতভাবে আনন্দ প্রকাশ করেছিলেন। সোভিয়েট ঐতিহাসিকেরা মার্কসের যে নোট-বই উদ্ধার করেছেন তাতে সে বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি এদেশে যখন রাজত্ব বিস্তার আরম্ভ করে তখন নবাব সিরাজউদ্দৌলার মত যে রাজন্যবর্গ তার প্রতিরোধ করেছিলেন তাঁরা প্রগতির বিরুদ্ধাচরণ করেননি, তা করেছিল মীরজাফরদের মত বিশ্বাসঘাতকেরা। প্রথম অবস্থায় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি এদেশে এক শ্রেণীর সমর্থক তৈরি করেছিল গ্রাম্য পঞ্চায়েতের জমাজমি কেড়ে নিয়ে তৎকালীন জমিদার নামধারী তহ্‌শীলদারদের তাড়িয়ে নূতন ইজারাদার এবং জমিদার স্থষ্টি করে। রামমোহন রায় ইংরেজ শাসনের নূতন স্তম্ভ এই ইজারাদার শ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত। রামমোহন রায় যে সব সমাজহিতকর কাজ করেছিলেন তার মধ্যে প্রধান হোল প্রেস-আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, সতীদাহ নিবারণের আন্দোলন, হিন্দু-পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধতা, জাতিভেদের বিরুদ্ধাচরণ এবং বিধবা-বিবাহ ও স্ত্রী-শিক্ষা। কিন্তু এই সমস্ত কাজের মূল্য যাচাই করতে হবে রামমোহনের রাজনীতি দিয়ে। যে যুগে এ দেশে ইংরেজ-শাসনের বিরুদ্ধে প্রায় সমগ্র দেশবাসী ঘোরতর সংঘর্ষে নিযুক্ত ছিল তখন রামমোহন রায় ছিলেন সেই মুষ্টিমেয় লোকদের মধ্যে, যারা তাকে সর্বতোভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। এ কথার প্রমাণস্বরূপ শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা রামমোহনের জীবন চরিত থেকে নিম্নলিখিত অংশ উদ্ধৃত করছি:

"কয়েক বৎসর পরে (ইং ১৮০৯) বড়লাটের নিকট একটি দরখাস্তে রামমোহন লেখেন যে, তাহার বংশ ও শিক্ষা সম্বন্ধে সকল সংবাদ সদর দেওয়ানী ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রধান কর্মচারীগণ ও কোম্পানির অন্যান্য কর্মচারীদের নিকট হইতে জানা যাইবে। তাঁহাকে রংপুরের দেওয়ানীর জন্য সুপারিশ করিবার সময়ে কলেক্টর ডিগ্‌বীও লেখেন (৩১শে জানুয়ারি ১৮১০) যে, সদর দেওয়ানী আদালতের প্রধান কাজী ও ফোর্ট

উইলিয়ম কলেজের প্রধান ফার্সী মুন্‌শী রামমোহন রায়ের চরিত্র ও কর্মদক্ষতা সম্বন্ধে সংবাদ দিতে পারিবেন। এই সকল উক্তি হইতে মনে হয়, রামমোহন সদর দেওয়ানী আদালতের ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সহিত কোন-না কোন প্রকারে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ইংরেজ কর্মচারীগণের ফার্সী ও মুসলমান আইন শিক্ষার প্রয়োজনের জন্য সে-যুগে কলিকাতায় মুসলমানী বিদ্যার খুব চর্চা ছিল। সুতরাং রামমোহন কলিকাতার উচ্চপদস্থ মুসলমান মৌলবীদের সাহায্যে আর্বী-ফার্সীর ব্যুৎপত্তি গভীরতর করেন, তাহাও অসম্ভব নয়। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে খুব সম্ভব কলিকাতাতেই তিনি জন্ ডিগ্‌বীর সহিত পরিচিত হন।" (**রামমোহন রায়**—পৃঃ ২০,২১)

এই বিবরণ অনুসারে রামমোহন রায় তৎকালীন ইংরেজ শাসনের একজন সহযোগী (কোলাবোরেটর) ছিলেন এবং সে এমন এক সময় যখন প্রায় সমগ্র দেশ ইংরেজদের সঙ্গতভাবেই বিদেশী আততায়ী মনে করত, যে সময় ইংরেজ শাসকেরা এদেশের লুণ্ঠন সম্ভারে নিজেদের ধনাগার পূর্ণ করছিল অত্যন্ত বেপরোয়াভাবে। এ সময় ভারত সবেমাত্র দুই শিবিরে বিভক্ত হতে আরম্ভ করেছে, এক শিবিরের লক্ষ্য ছিল স্বাধীনতা এবং অন্য শিবিরের লক্ষ্য ছিল ইংরেজ রাজত্ব মেনে নিয়ে ইংরেজের সাহায্যে সমাজের সংস্কার সাধন করা। রামমোহন রায় ছিলেন এই দ্বিতীয় শিবিরের নেতা। মীরজাফর ইংরেজ-বণিকের মানদণ্ডকে রাজদণ্ডে পরিণত করতে সাহায্য করেছিলেন আর রামমোহন রায় সেই রাজদণ্ডকে দীর্ঘস্থায়ী করবার জন্য বিদেশী বণিক-রাজের সঙ্গে কোলাবোরেশন করেছেন। ১৮৩২ সালে ভারতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসন সংস্কারের যে ব্যবস্থা হয়, রামমোহন সেই সংস্কারের পক্ষে মত প্রকাশ করেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে এ কথা যে, ভারতে তখন ইংরেজ শাসনের জন্য যোদ্ধার অভাব ছিল না। জাতীয় পরাধীনতার সাহায্যে সমাজ সংস্কার প্রগতির ধর্ম নয়। প্রগতির ধর্ম হল স্বাধীন জাতি গঠন। রামমোহন রায় আধুনিক সভ্যতার এবং জাতিগঠনের জন্য আন্দোলন করেছেন কিন্তু সে হোল "সভ্য" পন্থার দাসজাতিগঠন। যাদের সাহায্য ব্যতীত প্রতিক্রিয়ার অভ্রভেদী মিনার ইংরেজ রাজত্ব এদেশে টি'কতে পারত না তাদের মধ্যে রামমোহন রায় অন্যতম।

রামমোহন রায় যদি প্রগতিশীল হন তবে ইংরেজশাসনও প্রগতিশীল।

সংস্কৃতিক্ষেত্রে রামমোহনের প্রধান অবদান হোল বেদান্ত এবং উপনিষদের বাংলা সংস্করণ সৃষ্টি, যত বই তিনি লিখেছেন তার মধ্যে দু একটি ছাড়া আর সবই হোল উপনিষৎ। সংস্কৃতি ক্ষেত্রে রামমোহন যদি প্রগতিশীল হন তবে উপনিষৎও প্রগতিশীল দর্শন। রাজনীতিক্ষেত্রে যে শ্রেণীর তিনি প্রতিনিধিত্ব করেছেন সে-শ্রেণী হোল ইংরেজের সৃষ্ট নূতন জমিদার ও ইজারাদার শ্রেণী। রামমোহন যদি প্রগতিশীল হন তবে এই শ্রেণীও ছিল প্রগতিশীল। রামমোহন রায়কে প্রগতিশীল বলার অর্থ সমাজহিতকর কাজকে রাজনীতির ঊর্ধ্বে স্থান দেওয়া, সমাজহিতের শ্রেণী চরিত্র বিচার না করা।

ভারতে প্রগতির দুর্গ গড়ে তুলেছে সেই স্বদেশসেবকেরা যারা ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে লড়েছে কিংবা লড়াইয়ের প্রেরণা সৃষ্টি করেছে; বাংলা সাহিত্য এবং সংস্কৃতির প্রকৃতি সেই মনস্বীদের হাতেই প্রগতিশীল হয়েছে যাঁরা দাসজাতির অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিক নিগ্রহের ছবি এঁকেছেন আর খুলে ধরেছেন পরাধীনতার মুখোশ। গণতান্ত্রিক জাতীয় সংস্কৃতির সৃষ্টিকর্তারা বহন করে চলেছেন শুধু তাঁদেরই অমর ঐতিহ্য, আর কারও নয়।

রামমোহন রায়, বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ—এঁরা ভারতের বা বাঙলার ইতিহাসে কোন্ ভূমিকা অবলম্বন করেছেন এ প্রশ্নের উত্তর দেবার সময় মনে রাখতে হবে এই কথা যে, তাঁরা কখনও কখনও কোন কোন বিষয়ে যে প্রগতিশীল ভাব প্রকাশ করেছেন তা এদেশে শ্রেণীসংগ্রামের ক্রমোবিকাশের ইতিহাসে মূলত কোন্ শিবিরকে সবল করেছে আর কোন্ শিবিরকে দুর্বল করেছে। গণতান্ত্রিক সংগ্রামের প্রভাব এমনই যে প্রতিক্রিয়ার শিবিরের অনেককেই তা প্রভাবিত করতে পারে। গণতান্ত্রিক সংগ্রামের মূল স্লোগানের সঙ্গে এমন অনেক গৌণ স্লোগান থাকে যা তাঁরা গ্রহণ করেন প্রতিক্রিয়াশীল শিবিরের মূল স্লোগান হাসিল করবার জন্য। ভারতে ইংরেজ শাসনের অবসান হোল ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর ঐতিহাসিক কাজ, এই ঐতিহাসিক কাজ সম্পন্ন করার পথে প্রতিক্রিয়া বাধা সৃষ্টি করেছে রাজনীতির উপর ধর্ম এবং সমাজহিতকর কাজকে স্থান দিয়ে; যাঁরা রাজনীতিকে স্থান দিয়েছেন ধর্ম এবং সমাজহিতকর কাজের উপরে, যাঁদের রাজনীতি ইংরেজ-শাসনের গায়ে ফাটল ধরাতে সাহায্য করেছে—শুধু তাঁরাই এবং তাঁদের সংস্কৃতিই

প্রগতিশীল। এই প্রগতিশীলদের অনেকেই বিপ্লবী চেতনায় সম্পূর্ণ সমৃদ্ধ নন, তাঁদেরও ভিতর ধর্মগত সংস্কার তাঁদেরই মূল নীতিকে আঘাত করেছে—এ আত্মবিরোধ থাকা সত্ত্বেও তাঁরা মূলত প্রগতিশীল, কারণ তাঁদের মূল আক্রমণটা প্রতিক্রিয়াশীল শিবিরকে সজোরে আঘাত করেছে। রেনেসাঁ কিংবা প্রগতির সূত্র খুঁজতে হবে তাঁদেরই সাহিত্যে যাঁরা রাজনৈতিক স্বাধীনতার চেতনা সৃষ্টিতে সাহায্য করেছেন। যাঁরা ইংরেজ ও সমাজ প্রগতির সঙ্গে সামঞ্জস্য করার চেষ্টা করেছেন, ইংরেজ শাসনকেই সমাজ প্রগতির পক্ষে কল্যাণকর বলে ঘোষণা করেছেন অথবা জাতীয় স্বাধীনতার আদর্শকে গৌণ স্থানে ঠেলে দিয়েছেন ধর্মকে রাজনীতির উর্ধ্বে প্রতিষ্ঠিত করে, তাঁরা যে আন্দোলন সৃষ্টি করেছেন তা রেনেসাঁ বা প্রগতির সূত্রপাত নয়। যাঁরা লোকহিতকর কাজকে রাজনীতির উর্ধ্বে স্থান দেন, রাষ্ট্রের চেয়েও ধর্মকে উচ্চতর সংগ্রামক্ষেত্র বলে মনে করেন তাঁরাই রামমোহন-বিবেকানন্দ-রবীন্দ্রনাথকে প্রগতির নায়ক বলে ঘোষণা করেন। 'প্রগতি' সম্পর্কে তাঁদের যা ধারণা সেটা মার্কস্‌বাদ-বিরোধী।

মার্কস্‌বাদী শিবিরের ভিতরেই বুর্জোয়া সংস্কৃতির প্রভাব আছে, তাই প্রগতি সাহিত্যের শিবিরেও চলছে সংকট। গোপালদা যে অর্থেই বলে থাকুন না কেন যে, সংস্কৃতির সংকট নেই, সেই অর্থেই ও কথাটা ভুল।[১] সংকটের অস্তিত্ব অস্বীকার করার অর্থ বুর্জোয়া সংস্কৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রামের তীব্রতা কমিয়ে দেওয়া অথবা সংগ্রাম অস্বীকার করা।

দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের ভিতর যখন প্রথম মহাযুদ্ধের ধাক্কায় সুবিধাবাদের প্রাবল্য দেখা গেল তখন লেনিন সে অবস্থাটাকে সোশাল ডেমোক্রাসির সংকট বলেই ঘোষণা করেছিলেন আর যে 'বামপন্থী' সোশাল ডেমোক্রাটেরা বলেছিলেন সংকট নেই তাঁদেরই তিনি নিন্দা করেছিলেন সুবিধাবাদী বলে।

গোপালদার ব্যাখ্যা অনুসারে যদি এ কথা বলা সম্ভব হয় যে, "বাঙ্গালী সংস্কৃতির এ 'সংকট' আসলে সংকট নয়, বাঙ্গালী সংস্কৃতির রূপান্তরের দাবী" তা হলে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে শ্রেণীসংগ্রামের প্রশ্ন ওঠে না, কাবণ এ শুধু "রূপান্তরের দাবী", একটা সংস্কৃতিকে ধ্বংস ক'রে তার স্থানে অন্য সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার দাবি নয়।

---

১. গোপাল হালদার, 'সংস্কৃতির সংকট'; পরিচয়, কার্তিক ১৩৫৫ দ্রষ্টব্য।—সম্পাদক

নরহরিবাবুরা এটা শুধু কথার মারপ্যাঁচ বলে মনে করতে পারেন, কিন্তু এটাকে কথার মারপ্যাঁচ বলে উড়িয়ে দেওয়া হোল দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদের প্রতি কার্যত সমর্থন জ্ঞাপন।

এটা যে শুধু কথার মারপ্যাঁচ নয় তার প্রমাণ—গোপালদার 'সংস্কৃতি-সংকট' প্রবন্ধে এই আদর্শগত সংগ্রামের অমোঘ আহ্বান নেই; তা যে নেই একথা নরহরিবাবুরাও স্বীকার করেছেন। শুধু যে সংগ্রামের আহ্বান নেই তাই নয়, বুর্জোয়া সংস্কৃতির বিরুদ্ধে ক্ষুরধার আক্রমণও নেই। তার কারণ বুর্জোয়া সংস্কৃতিকে তিনি মনে প্রাণে শত্রুপক্ষের অস্ত্র বলে ধরতে পারেননি, তাকে ধরেছেন সংস্কৃতির মাত্র একটি ধারা হিসেবে। গোপালদা যে সংস্কৃতি ক্ষেত্রে দেশবিভাগ জনিত সংকট ছাড়া আর কিছু দেখেননি তা নরহরিবাবুরাও স্বীকার করেন; কিন্তু দেশবিভাগ ছাড়া আর কিছু না দেখার অর্থ কি সংস্কৃতি ক্ষেত্রে শ্রেণী সংগ্রাম অস্বীকার করা নয়? আর এই অস্বীকৃতিই কি তাঁর প্রবন্ধের মূল কথা হয়ে দাঁড়ায় না? এবং সেই জন্যই কি শত্রু শিবিরের সংস্কৃতির বিরুদ্ধে ক্ষুরধার আক্রমণ করতে অক্ষম হননি? আসল কথা সংস্কৃতিক্ষেত্রে "ডেমোক্রাটিক ফ্রন্ট" বলতে গোপালদা বোঝেন বুর্জোয়া সংস্কৃতির সঙ্গে রফা করে চলা। মার্কস্‌বাদের সঙ্গে মার্কস্‌বাদ-বিরোধিতার ঐক্যস্থাপন করা। এরই নাম সুবিধাবাদ। প্রগতি সাহিত্যের শিবিরে সুবিধাবাদের যে আধিপত্য এখনও আছে তার বিরুদ্ধে মার্কস্‌বাদী প্রকাশ্যভাবেই লড়বে এবং প্রগতির শক্তি আজ প্রতিক্রিয়ার চেয়ে ঢের বেশি প্রবল, তাই তা বিজয়ীও হবে। কিন্তু সংগ্রাম তাকে চালাতে হবে অনমনীয়ভাবে, যাতে সংস্কৃতি মুক্তিলাভ করতে পারে সুবিধাবাদের কবল থেকে। এই আদর্শগত সংগ্রামই সংস্কৃতিক্ষেত্রে ডেমোক্রাটিক ফ্রন্টের ভিত্তি। এই ফ্রন্টে যাঁরা সমবেত হবেন তাঁদের সবারই হবে এক লক্ষ্য যাতে গণতান্ত্রিক মতাদর্শ সংস্কৃতিক্ষেত্রে বিজয়ী হয়, যাতে অবৈজ্ঞানিক বুর্জোয়া মতবাদের বিরুদ্ধে আপসবিহীন সংগ্রাম চলে। বুর্জোয়া মতাদর্শের সঙ্গে আপস নিন্দনীয়। সংস্কৃতিক্ষেত্রে 'ডেমোক্রাটিক ফ্রন্ট' কি প্রকৃতির হবে সে কথা স্পষ্ট করেই বলা হয়েছে, ১নং 'মার্কস্‌বাদীতে' 'বাংলা সাহিত্যের কয়েকটি ধারা' নামক প্রবন্ধের উপসংহারে। সেখানে এ কথা স্পষ্ট করেই বলা হয়েছে যে, আদর্শগত সংগ্রামের ভিতর দিয়ে মার্কস্‌বাদের হাতিয়ার নিয়েই এ ফ্রন্ট গড়তে হবে। মার্কস্‌বাদই একমাত্র বৈজ্ঞানিক এবং গণতান্ত্রিক

মতাদর্শ। গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের যোগদানকারীরা সবাই মার্কস্‌বাদের সবটা না বুঝতে পারেন কিন্তু মার্কস্‌বাদী মতাদর্শের হাতিয়ার মার্কসবাদীর হাত থেকে কেড়ে নিতে পারেন না।

মার্কস্‌বাদীরা রাজনীতি ক্ষেত্রে যে জোশীবাদ বর্জন করেছেন, বাংলার সংস্কৃতিক্ষেত্রেও সেই জোশীবাদ এখনও মাথা জাগিয়ে আছে। 'পরিচয়'-এর সম্পাদকমণ্ডলী এবং খ্যাতনামা লেখকগণ যে রামমোহন, বঙ্কিম এবং বিবেকানন্দের "প্রগতিশীল" ভূমিকার ধারণা পোষণ করেন তা মার্কস্‌বাদীদের মধ্যে প্রথম আমদানি করেন পি. সি. জোশী। তাঁরই ছক নিয়ে এবং তাঁরই নির্দেশ অনুসারে ১৯৪৬ সালে 'বাংলার নবযুগ' (রেনেসাঁ) সম্পর্কে ইংরেজিতে একটা নোট ছাপা হয়েছিল;[১] তার ভিতর রামমোহন-বঙ্কিম-বিবেকানন্দ সম্পর্কে যে মূল প্রতিপাদ্য বিষয় লিপিবদ্ধ হয়েছে 'পরিচয় গোষ্ঠী' এখনও তাই অনুসরণ করছেন। কাজেই উল্লিখিত পুস্তিকায় 'বাংলার নবযুগ' সম্বন্ধে যা কিছু বলা হয়েছে তা বিশ্লেষণ করলে সংস্কৃতিক্ষেত্রে জোশীবাদের পরিচয় পাওয়া যাবে। ঐ পুস্তিকার প্রতি ছত্রে জোশীর কথাই প্রতিধ্বনিত হয়েছে।

রামমোহন রায়কে প্রগতিশীল প্রমাণ করতে গিয়ে 'বাংলার রেনেসাঁ' নামক পুস্তিকায় বলা হয়েছে:

> "জীবনের নূতন আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে রামমোহন রায় সামন্তবাদী যুগ-সুলভ নিষ্ক্রিয়তা কেটে বেরিয়ে আসছিলেন। তিনি বলতেন যে, জনসাধারণের স্বাচ্ছন্দ্য এবং সমাজের বিভিন্ন বিক্ষিপ্ত অংশকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্যই তিনি বেদান্তের প্রতি সমাজের দৃষ্টি ফিরিয়ে আনছিলেন।"[২]

রাজনীতিক্ষেত্রে রামমোহনের প্রগতিশীল অবদান প্রমাণ করা হয়েছে এই দেখিয়ে —"আমাদের দেশে রামমোহন রায় সর্বপ্রথম নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন আরম্ভ করেন।" এই উপলক্ষে দেখানো হয়েছে যে, তিনি ১৮২৩ সালে প্রেস অর্ডিনান্সের বিরুদ্ধে বৃটিশ সম্রাটের নিকট দরখাস্ত করেছিলেন, ১৮২৭ সালের

১. ইতিহাসের প্রখ্যাত অধ্যাপক সুশোভন সরকার মহাশয় অমিত সেন ছদ্মনামে **'Notes On The Bengal Renaissance'** নামে যে পুস্তিকা রচনা করেন এখানে সেই প্রসঙ্গটি উল্লিখিত হয়েছে।—সম্পাদক

২. দ্র. **Amit Sen : Notes On The Bengal Renaissance, p. 10, Second Edition, 1957.**—সম্পাদক

জুরি-এক্ট এবং ১৮৩০ সালে নিষ্কর সম্পত্তিতে খাজনা বসাবার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিলেন। ব্যবসায়ে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়ার বিরুদ্ধেও তিনি আন্দোলন করেছিলেন।৩

এই সমস্ত দার্শনিক এবং রাজনৈতিক আন্দোলোনের প্রকৃতি কি ছিল তা এ থেকেই বোঝা যায় যে, এই ভাবধারায় দীক্ষিত বাঙলার উদীয়মান শিক্ষিত সমাজ—তা তিনি ব্রাহ্মই হউন আর হিন্দুই হউন—সকলেই ছিলেন সিপাহী বিদ্রোহের বিরোধী। এ ভাবধারা ভারতের প্রথম জাতীয় বিপ্লবের বিরোধিতা সৃষ্টি করল কেন? তার কারণ রামমোহনের মূল শিক্ষা ছিল—ইংরেজ শাসনের আশ্রয়েই আমাদের দেশের সভ্যতা বিস্তার করতে হবে। সভ্যতার উন্নতির জন্য ইংরেজ শাসনের সঙ্গে সহযোগিতাই ছিল তাঁর মূলমন্ত্র।

আসল কথা, বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধাচরণের চেয়েও সমাজ সংস্কারকে এই পুস্তিকায় সে যুগের অধিকতর প্রগতিশীল কাজ বলে বর্ণনা করা হয়েছে, মেনে নেওয়া হয়েছে বৃটিশ শাসনের ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা। এই পুস্তকার ৩০ পৃষ্ঠায় সিপাহী বিদ্রোহের আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, হিন্দু পেট্রিয়ট কাগজে লর্ড ক্যানিংয়ের মধ্যপন্থা বলিষ্ঠ ভাবে সমর্থন করা হয়েছিল, এই পত্রিকার আদর্শই ছিল তৎকালীন বাঙালী মধ্যবিত্তের আদর্শ।৪ বাঙালী মধ্যবিত্ত যে সিপাহী বিদ্রোহের বিরুদ্ধাচরণ ক'রে জাতীয়তা বিরোধী কাজই করেছিল সে কথা লেখক ঘোষণা করতে পারেননি। কারণ জোশী এই শিক্ষাই দিয়েছিলেন যে, বুর্জোয়াশ্রেণী যা করেছে তাই প্রগতিশীল, অতএব বুর্জোয়াশ্রেণী যখন স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরুদ্ধাচরণ করেছে, তখন সিপাহী বিদ্রোহের চেয়ে তাদের দমননীতির বিরোধিতাই অধিকতর প্রগতিশীল।

এই পুস্তিকার ৫২ পৃষ্ঠায় স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে বলা হয়েছে: 'বিবেকানন্দ ছিলেন একজন উত্তপ্ত স্বদেশপ্রেমিক, যদিও রাজনীতি তাঁর কর্মক্ষেত্র ছিল না।"৫ রাজনীতি ছাড়া স্বদেশভক্তির অর্থ ইংরেজ শাসনের অধীনেই স্বদেশের মঙ্গল সাধনা করা।

৩. ঐ, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃঃ ১১ দ্রষ্টব্য।—সম্পাদক

৪. ঐ, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃঃ ৩৭ দ্রষ্টব্য।—সম্পাদক

৫. ঐ, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃঃ ৬৫ দ্রষ্টব্য।—সম্পাদক

এই পুস্তিকার ৫৩ পৃষ্ঠায় সৈয়দ আহ্মেদকে একজন স্বদেশভক্ত বলে বর্ণনা করা হয়েছে,৬ অথচ মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে সৈয়দ আহ্মেদই সর্বপ্রথম ইংরেজ শাসনের অধীনে মুসলমানদের মধ্যে সভ্যতা বিস্তার করতে হবে—এই আদর্শ নিয়ে আসেন। সৈয়দ আহ্মেদের পূর্ব পর্যন্ত বৃটিশ বিরোধী ওয়াহাবীদের প্রভাব মুসলিম সমাজে অপ্রতিহত ছিল।

এই ঐতিহাসিক মূল্যবোধের মধ্যে যে নীতিটি আছে সে নীতি হোল এই—উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজ শাসনের বিরোধিতা করা বা না করার উপর প্রগতিশীলতা নির্ভর করে না, প্রগতিশীলতা নির্ভর করে সমাজসংস্কারের উপর। উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতে ইংরেজ শাসনের ঐতিহাসিক মূল্য এখানে স্বীকার ক'রে নেওয়া হয়েছে। এটা হোল ভারতীয় ইতিহাসের প্রতিক্রিয়াশীল ব্যাখ্যা।

কারণ, বুর্জোয়াশ্রেণীর লেজে লেজে চলা জোশীবাদের বিশেষত্ব, তাই উনবিংশ শতাব্দীতে উদীয়মান বুর্জোয়াশ্রেণী ইংরেজ শাসনের কুক্ষিতে জন্ম গ্রহণ ক'রে, তার শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে যখন ধর্মসংস্কার ও লোকহিতকর কাজে যোগ দিল তখন তাকেই ঘোষণা করা হোল প্রগতিশীল কাজ বলে।

ঐ উনবিংশ শতাব্দীতেই ভারতের তথা বাঙলার কৃষক ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে লড়েছে, ধর্মগত এবং সমাজগত কুসংস্কার থাকা সত্ত্বেও তাদের ঐতিহাসিক অবদানই হোল প্রগতিশীল, কারণ ইংরেজ শাসনের উচ্ছেদই ভারতে ধনতান্ত্রিক প্রগতিরও প্রথম সোপান হত। তাতে যে প্রগতি হত তার তুলনায় শিক্ষিত মধ্যবিত্তের ধর্মসংস্কার ও সমাজ সেবা অত্যন্ত নিম্নস্তরের। কাজেই উনবিংশ শতাব্দীতে যারা ইংরেজ শাসন উচ্ছেদ করার জন্য লড়েছিল তারাই করেছিল অন্য সমস্ত "প্রগতিশীল" কাজের চেয়েও অধিকতর প্রগতিশীল কাজ।

কিন্তু জোশীবাদের শিক্ষা হোল মার্কস্‌বাদ সংস্কৃত করার শিক্ষা। মার্কস্ লিখেছেন যে, ইংরেজ শাসনে ভারতের গ্রাম্য পঞ্চায়েতের বর্বর প্রথা উঠে যাচ্ছে, ধনতান্ত্রিক প্রগতির রাস্তা সাফ হচ্ছে; তা থেকে রিফর্মিস্টদের এই সিদ্ধান্ত হোল যে, ইংরেজের পরাধীনতাই ভারতের পক্ষে তখন একটা প্রগতিশীল দৌড়। সুবিধাবাদ এমন করেই যে মার্কসের এক একটা বাস্তব বিশ্লেষণ বুর্জোয়াশ্রেণীর অনুকূলে প্রয়োগ করে থাকে এ কথা লেনিন খুব স্পষ্ট ভাবেই দেখিয়ে গেছেন। যে প্রবন্ধে মার্কস্ বলেছেন যে, ইংরেজ শাসনে পণ্য

৬. দ্র. ঐ, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃঃ ৬৫।—সম্পাদক

বিনিময় এবং রেলরাস্তা বিস্তারের ভিতর দিয়ে ভারতে এক বিপ্লব সংঘঠিত হচ্ছে, সেই প্রবন্ধেই মার্কস্ উলঙ্গ করে ধরেছেন ইংরেজ শাসনের জঘন্য বর্বরতা। 'ভারতে বৃটিশ শাসন' এই প্রবন্ধে মার্কস্ তাঁর অসামান্য প্রতিভা এবং ডায়ালেক্টিক্স বস্তুবাদের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগ করে দেখিয়েছেন—একদিকে বৃটিশ শাসনে পণ্য বিনিময়ের ভিতর দিয়ে পুরাতন সমাজের ভাঙন এবং সমাজ বিপ্লবের উদ্বোধন, অন্যদিকে ইংরেজ শাসনের ধ্বংসকার্য অথচ নতুন সমাজ গঠনের অক্ষমতা। সুবিধাবাদী শাস্ত্রে মার্কসের প্রথম উক্তিটা গৃহীত হয়েছে কিন্তু দ্বিতীয়টা বর্হিত। এই প্রবন্ধে মার্কস্ বলেছেন :

> "ইংল্যাণ্ড ভারতীয় সমাজের সমস্ত কাঠামোটা ভেঙে দিয়েছে অথচ নতুন সমাজ গড়বার কোন চিহ্ন এখনও দেখা যাচ্ছে না।"

এই প্রবন্ধে মার্কস্ আরও বলেছেন যে, ইংল্যাণ্ড হোল ভারতে "ইতিহাসের অচেতন যন্ত্র"। কাজেই ইংরেজ শাসন মেনে নিয়ে ভারতে সমাজ বিপ্লব হতে পারে সে কথা মার্কস্ কোথাও বলেননি। বরং ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতবাসীর বিদ্রোহের ঐতিহাসিক সম্ভাবনা কি ভাবে সৃষ্ট হচ্ছে তাই তিনি দেখিয়েছেন। ভারতে বৃটিশ শাসনের মুখোশ খুলে ধরে 'ভারতে বৃটিশ শাসনের ফলাফল' নামক প্রবন্ধে মার্কস্ বলেছেন :

> "বুর্জোয়া সভ্যতার গভীর ভণ্ডামি এবং অন্তর্নিহিত বর্বরতা আমাদের চোখের সামনে ধরা পড়ে যখন আমরা উপনিবেশের দিকে দৃষ্টি ফিরাই। নিজ ঘরে তাদের ভণ্ডামি ও বর্বরতা ভদ্র বেশ ধারণ করে, কিন্তু উপনিবেশে তা একেবারে নগ্ন।"

কাজেই যে মার্কস্ ১৮৫৩ সালে ইংরেজ শাসনে ভারতে সমাজ-বিপ্লব হচ্ছে বলে ঘোষণা করেছিলেন, সেই মার্কস্ই সিপাহী বিদ্রোহকে বরণ করেছিলেন "মহান জাতীয় বিপ্লব" বলে আর ইংরেজ শাসনের উচ্ছেদকে তিনি ঘোষণা করেছিলেন প্রগতির মাপকাঠি ব'লে।

জোশীবাদ মার্কস্বাদের একটি অংশকে তার অপর অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে নিয়ে ভারতীয় ইতিহাসের এই প্রতিক্রিয়াশীল ব্যাখ্যা দিয়েছিল যে, যারা ইংরেজ শাসনের বশ্যতা স্বীকার ক'রে সমাজের উন্নতিসাধন করেছেন তাঁরাই প্রগতিশীল অথচ সিপাহী বিদ্রোহ বিপ্লবী অভ্যুত্থান নয়। মার্কস্ এই সিদ্ধান্তে পৌছেছিলেন যে, ইংরেজ শাসনে যে ধনবাদের আমদানি হয়েছে তাই ভারতকে উন্নত করবে,

কিন্তু ভারতকে যারা উন্নত করবে তাদের সামনে ঐতিহাসিক কর্তব্য হোল বলপূর্বক ইংরেজ শাসনের উচ্ছেদ।

মার্কস্‌বাদের এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে যখন বিচার করি তখনই দেখি যে 'বাংলার নবযুগ' নামক পুস্তিকায় জোশীবাদ যে বিবরণ দিয়েছে তা অনৈতিহাসিক এবং মার্কস্‌বাদ বিরোধী। তাই রামমোহন ইংরেজ শাসন উচ্ছেদের জন্য দেশবাসীর সংগ্রামকে দুর্বল করে ইংরেজ শাসন সংস্কৃত ও উন্নত করার চেষ্টা করেই প্রগতিশীল বলে বর্ণিত হয়েছেন, রাজনীতি বর্জন করেও বিবেকানন্দ হয়েছেন "উত্তপ্ত স্বদেশপ্রেমিক"। উনবিংশ শতাব্দীতে বেদান্ত দর্শনেরও প্রগতিশীল ভূমিকা আবিষ্কৃত হয়েছে ; অথচ এই বেদান্ত দর্শনই একদা এমন একটা সমাজ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করেছিল যার বর্ণনা দিতে গিয়ে মার্কস্‌ বলেছিলেন :

"আমরা যেন ভুলে না যাই যে, এই অবমাননাকর, স্থবির এবং ভোজনসর্বস্ব জীবন, এই নিষ্ক্রিয় জীবনধারণ—এরই পাশাপাশি ঠেলে উঠেছিল তার উল্টো দিকে বন্য, লক্ষ্যশূন্য এবং সীমাহীন ধ্বংস এবং হিন্দুস্থানে নরহত্যাকেও ধর্মানুষ্ঠানে পরিণত করেছিল।"

অর্থাৎ উপনিষদ বা বেদান্ত দর্শন যে যুগে সৃষ্ট হয়েছিল সে যুগে ভারতীয় সমাজ ছিল বর্বর সমাজ। মার্কস্‌ তাঁর প্রবন্ধে আর একটা তাৎপর্যপূর্ণ কথা বলেছিলেন—"ভারত ইতালি নয়, আয়ারল্যাণ্ড"। মার্কসের শুধু এই কথা থেকেই তাঁর মূল বক্তব্যটা বোঝা যায়। সে বক্তব্যটা হচ্ছে এই যে, ভারতে যে শাসকশ্রেণীর অধীনে সমাজে প্রগতি হচ্ছে তাকে উচ্ছেদ করার সংগ্রাম দ্বারাই প্রগতিকে এগোতে হবে। অথচ মার্কসের এইসব লেখা পড়ে এ কথা আমাদের মাথায় আসেনি যে, যাঁরা বেদান্ত দর্শন নিয়ে ধর্মসংস্কার করে গেছেন, তাঁরা আসলে ঝালিয়ে গেছেন এক বর্বর সমাজের দর্শনকে, এবং ইংরেজ শাসনকে সমর্থন দিয়ে তাঁরা প্রগতির গতিই রোধ করেছেন। রামমোহন রায়ের ফরাসী বিপ্লবপ্রীতির উদাহরণ দেওয়া হয়েছিল তাঁর প্রগতিশীলতা প্রমাণ করার জন্য ; কিন্তু ফরাসী বিপ্লবীরা অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী বস্তুবাদ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, আর ভারতে তথাকথিত নবযুগ সৃষ্টিকারীদের দর্শন ছিল বস্তুবাদের ঠিক বিপরীত। ফরাসী বিপ্লবীরাই সর্বপ্রথম ধর্মের উপরে রাষ্ট্রের স্থান দিয়েছিলেন, আর ভারতের তথাকথিত নবযুগ সৃষ্টিকারীরা দিয়েছিলেন রাষ্ট্রের উপরে ধর্মের স্থান। মার্কস্‌বাদের চুম্বকটুকু বাদ

দিয়ে তার খোলসটা নিয়ে ঘোষণা করা হয় যে, বাঙলার ইতিহাসে রামমোহন-বঙ্কিম-বিবেকানন্দ সৃষ্টি করে গেছেন প্রগতিশীল ঐতিহ্য। অথচ এই ঐতিহ্যকে অস্বীকার করে এবং তার সমস্ত শিক্ষার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেই গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহকে আজ এগোতে হচ্ছে, কারণ ভারতে বর্তমান প্রতিক্রিয়াশীল আন্দোলনের ভিত্তিই হোল রামমোহন-বঙ্কিম-বিবেকানন্দের রাজনৈতিক এবং দার্শনিক মতাদর্শ। মার্কস্‌বাদী শিবির উনবিংশ শতাব্দীর যাঁদের ঐতিহ্য বহন করছে, তাঁদের সংস্কৃতিতে পাওয়া যাবে সংস্কৃতি-ক্ষেত্রে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি, শ্রেণী-সংগ্রামে জনতার পক্ষাবলম্বন এবং বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধাচরণ।*

* মার্কস্‌বাদী, পঞ্চম সংকলন, সেপ্টেম্বর ১৯৪৯, পৃঃ ১২৫-১৭২ ; রবীন্দ্র গুপ্ত প্রয়াত কমিউনিস্ট নেতা ভবানী সেন-এর আর একটি ছদ্মনাম। এই ছদ্মনামেই কমিউনিস্ট পার্টির বেআইনী যুগে তিনি সুপরিচিত হয়ে উঠেছিলেন।—সম্পাদক

উনবিংশ শতকের বাঙলায় বঙ্কিম সাহিত্যের ভূমিকা / নবগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়*

উনবিংশ শতাব্দীতে বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলী কোন্ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল সেটা যে আজও তর্ক-বিতর্কের বিষয়বস্তু হতে পারে একথা ভাবলেই প্রথমত আশ্চর্য বোধ করতে হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের হিন্দুয়ানির গোঁড়ামি, পুরনো জরাজীর্ণ সামন্ত প্রথার প্রতি মমতা, সামন্ততন্ত্রের নীতিবোধ আর আদর্শের উপর অগাধ স্নেহ আর নিষ্ঠা, সমাজ বিপ্লবের সম্বন্ধে মারাত্মক ভীতি এমনই স্পষ্ট যে, সে যুগের শ্রেণীসংগ্রামে, সে যুগের প্রগতির আন্দোলনে বঙ্কিম সাহিত্যের ভূমিকা সম্বন্ধে দ্বিমত হবার অবকাশ বিশেষ ছিল না। কিন্তু তবু এ নিয়ে আজ তর্ক-বিতর্ক উঠেছে এবং যাঁরা নিজেদের মার্কসবাদী বলে মনে করেন এমন অনেকে দাবি তুলেছেন যে, বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যেই বাঙলা প্রগতি সাহিত্যের উৎসের সন্ধান নিতে হবে; এমন কি বঙ্কিমচন্দ্রের শিক্ষার মধ্যে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জাতীয়তাবোধের অঙ্কুর আবিষ্কার করতেও তাঁরা ছাড়েননি।

আপাতদৃষ্টিতে এ ব্যাপারটা যতই বিস্ময়কর বোধ হোক না কেন, বাস্তবিক পক্ষে এর কারণ খুব দুর্বোধ্য নয়। সংস্কারবাদ এমন একটা দূষিত প্রভাব বিস্তার করে থাকে যাতে অনেক স্পষ্ট জিনিসকেও ঘোলাটে বলে মনে হয়। বুর্জোয়াদের ভূমিকা অত্যন্ত প্রতিক্রিয়াশীল হলেও তাকেই প্রগতিশীল বলে প্রচার করে তার লেজুড় হয়ে চলার প্রবৃত্তিই মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। এ দেশেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। বঙ্কিম সাহিত্যের ভূমিকাকে প্রগতিশীল বলে চালাবার, বাঙলার নব-যুগের পথ প্রদর্শক বলে জাহির করার যে ঝোঁক আজও দেখা যাচ্ছে তা মার্কসবাদীদের মধ্যে তার এতদিনকার সংস্কারবাদেরই অভিব্যক্তি। সংস্কৃতি আন্দোলনের পেটি-বুর্জোয়া নেতাদের মধ্যে সংস্কারবাদ এমনই শিকড় গেড়ে বসেছিল যে, আজ তার জের সহজে মিটতে চাইছে না।

আর ঠিক সেই জন্যই উনবিংশ শতকে বঙ্কিম সাহিত্যের ভূমিকা সম্বন্ধে আবার নতুন করে আজ আলোচনা করা দরকার হয়ে পড়েছে। কিন্তু

---

* নামের পূর্বে 'শ্রী' ছিল। অন্য নামের পূর্বে 'শ্রী' না থাকায় এটি বর্জন করা হল।—সম্পাদক

এ আলোচনায় প্রবৃত্ত হবার আগে সে সময়কার সামাজিক-রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে ধারণাটা পরিষ্কার করে নেওয়া প্রয়োজন। যাঁরা আজ বড় গলায় প্রচার করতে চাইছেন যে, উনবিংশ শতকে সংস্কারপন্থী বুর্জোয়া নেতারা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলে ভারত তথা বাঙলার নবজাগরণের পথ প্রশস্ত করেছেন, দেশের স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষাকে উদ্বুদ্ধ করেছেন, সামাজিক 'অন্যায় অবিচারের' অবসান ঘটাবার প্রেরণা জুগিয়েছেন—তাঁরা জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে একথাই ধরে নেন যে, বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তখন কোন সত্যিকারের লড়াই চলছিল না, সাম্রাজ্যবাদ আর তার আশ্রয়পুষ্ট সামন্ত-সমাজের উচ্ছেদ সাধনের কোন বাস্তব ভিত্তি ছিল না।

কিন্তু ইতিহাসের পাতার দিকে একবার তাকালেই এই ধারণা যে কত বড় মিথ্যা তা বুঝতে বাকি থাকে না। সত্যিকথা বলতে কি, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ এদেশ ছলে বলে কৌশলে দখল করলেও একেবারে নিরাপদে নিশ্চিন্ত মনে রাজ্যশাসন করার সৌভাগ্য তাদের কোন দিনই হয়নি। সমাজের উপরতলা থেকে সহযোগী আর তাঁবেদার তারা বরাবরই পেয়েছিল ; কিন্তু সমাজের নিচের তলার নির্যাতিত, শোষিত মানুষেরা কোনদিনই বৃটিশের গোলামিকে প্রসন্ন মনে নেয় নি ; শুধু মেনে নেয়নি নয়, এই বৃটিশ শাসন আর সেই শাসনের পদাশ্রিত দেশী শোষকদের উচ্ছেদ করার জন্যও লড়াই চালিয়েছিল নির্ভীক ভাবে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকেই এই লড়াই সশস্ত্র গণ-বিদ্রোহের আকারে দানা বেঁধে উঠছিল। ১৭৭২ সালে বাঙলার বিভিন্ন জায়গায় ক্ষুধিত, নিঃস্ব কৃষকদের উভ্যুত্থান ঘটে সামন্ত নবাব আর বৃটিশ লুণ্ঠনকারীদের বিরুদ্ধে। এই বিদ্রোহ-ই সন্ন্যাসী-বিদ্রোহ নামে খ্যাতিলাভ করেছিল। এ ছাড়াও অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত ছোট খাট সংঘাত আর সংকট তো চলছিলই। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এসে এই সংগ্রামে আবার নতুন করে এল প্রচণ্ড জোয়ার। ১৮৫৫ সালে যে সাঁওতাল অভ্যুত্থান ঘটল তা ছিল বাঙালী মহাজনদের নির্মম শোষণের বিরুদ্ধে, মহাজন আর জমিদারদের আশ্রয়দাতা বৃটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে এক মরণ-পণ শ্রেণীসংগ্রাম। এই সংগ্রামে শ্রেণী-চেতনা ছিল এমনই প্রখর যে, বাঙালী মহাজনদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত প্রতিশোধ নিলেও বাঙালী গরীব কৃষকদের কোন অনিষ্টই সাঁওতাল

কৃষকেরা করেনি। এমন কি কিছু কিছু বাঙালী কৃষকও যোগ দিয়েছিল এই বিরাট শ্রেণী-সংগ্রামে। কেমন করে অর্থনৈতিক সংগ্রাম দ্রুতগতিতে রাজনৈতিক সংগ্রামে পরিণত হতে পারে, এই সাঁওতাল অভ্যুত্থানই হয়ে রয়েছে তার জাজ্বল্যমান নিদর্শন। এই অভ্যুত্থানের দু বছর যেতে না যেতেই সারা ভারতে জ্বলে উঠল সশস্ত্র বিদ্রোহের আগুন! ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ শুধু যে বাঙলা থেকেই শুরু হয়েছিল তাই নয়, "বাঙলা সরকারের শাসনাধীন এমন একটিও জেলা ছিল না যেখানে সত্যিকারের বিপদ দেখা দেয় নি।" (সি-ই বাকল্যাণ্ড: **বেঙ্গল আণ্ডার দি লেফটেনাণ্ট গভর্ণরস**)। এই বিদ্রোহের দু বছর পরেই ১৮৫৯ সালে বাঙলায় শুরু হয় নীল ধর্মঘট। এ ধর্মঘট এমনই ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল যে, প্রায় ৫০ লক্ষ গরীব চাষী এই ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করেছিল। সারা বাঙলা দেশে, বিশেষ করে নদীয়া, যশোহর আর পাবনায় কৃষক সমাজের মধ্যে বিদেশী নীলকরদের শোষণ যে কি বিরাট আলোড়ন তুলেছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় বাঙলার তৎকালীন লেফটেনাণ্ট গভর্নর সার জন পিটার গ্রাণ্টের বিবরণে। কুমার আর কালীগঙ্গার ৬০।৭০ মাইল জলপথে যাবার সময় তিনি লিখেছিলেন:

"নদীর দু'তীরে সত্য সত্যই লাইন দিয়ে দাঁড়িয়েছিল গ্রাম্য লোকের বিপুল জনতা—তারা চাইছিল ন্যায় বিচার। এমন কি গ্রামের স্ত্রীলোকেরা এসে হাজির হয়েছিল।"

ব্যাপার দেখে এই ঝানু বৃটিশ শাসকটি লিখেছিল:

"দেশের এই বিরাট অঞ্চলে লক্ষ লক্ষ লোকের—নর-নারী-শিশুর এ ধরনের শক্তি সমাবেশের মধ্যে গভীর তাৎপর্য নেই মনে করলে নিতান্ত বোকামি হবে তাতে সন্দেহ নেই।" (ঐ—পৃঃ ১৯২)।

ঊনবিংশ শতাব্দীর এই বিরাট গণ-বিদ্রোহকে কখনও সামান্য সুবিধা দিয়ে এবং অধিকাংশ সময়েই অকথ্য অত্যাচার আর দমননীতির মারফত বৃটিশ শাসনকর্তারা চেয়েছিল পিষে মারতে। সাঁওতাল বিদ্রোহ, সিপাহী বিদ্রোহ প্রভৃতি প্রত্যেকটি গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে পিষে মারার কাজে তারা সাহায্য পেয়েছিল দেশী নবাব-রাজা-মহারাজা আর জমিদারদের কাছ থেকে। কিন্তু তবু দেশের কৃষক, কারিগর প্রভৃতি মেহনতকারী মানুষের অদম্য স্বাধীনতা-স্পৃহাকে, তাঁদের বিপ্লবী চেতনাকে নিশ্চিহ্ন করার সাধ্য বৃটিশের হয়নি।

সিপাহী বিদ্রোহের কুড়ি-একুশ বছর পরের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়েও তাই বৃটিশ ঐতিহাসিককে বলতে হয়েছে যে, একদিকে অভাব-অনটন-দারিদ্র্য আর অন্যদিকে বৃটিশ শাসন কর্তাদের দমননীতির ফলে,

'লর্ড লিটনের আমলে ভারতবর্ষ প্রায় **বিপ্লবী অভ্যুত্থানের দ্বারপ্রান্তে এসে পৌঁছেছিল**।" (সার উইলিয়ম ওয়েডবার্ন—ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের জন্মদাতা অ্যালান অকটোভিয়ান হিউম)।

(বড় হরফ আমার লেখক)।

হিউম সাহেব নিজে দেশের অবস্থা দেখে ভীত ত্রস্ত হয়ে লিখেছিলেন :

"দেশের নানাদিক থেকে যে সব খবরাখবর পাচ্ছিলাম তাতে সে সময়—যতদূর মনে পড়ে লর্ড লিটন চলে যাবার মাস পনের আগে—আমার এই ধারণাই বদ্ধমূল হয়েছিল যে, আমরা একটা প্রলয়ংকর বিপ্লবী অভ্যুত্থানের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছি।···এই সব খবরের অনেকগুলিই ছিল দেশের নিম্নতম শ্রেণীর লোকের মধ্যেকার কথাবার্তা ; এ থেকে দেখা যাচ্ছিল যে, এই সব গরীব লোকেরা প্রচলিত ব্যবস্থা সম্বন্ধে একেবারে হতাশ হয়ে পড়েছে ; তারা বেশ বুঝতে পারছিল যে, তাদের অনাহারে মারা পড়তে হবে। এই অবস্থার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য তারা **একটা কিছু** করতে উদগ্রীব হয়ে উঠেছিল। তারা এক জোট হয়ে একটা কিছু করতে চাইছিল এবং **সেই একটা কিছুর অর্থ হল সশস্ত্র অভ্যুত্থান**।" (ঐ)।

দেশের চতুর্দিক থেকেই তলোয়ার, বর্শা, গাদা বন্দুক সংগ্রহ করার সংবাদ আসছিল, চতুর্দিকে শোষিতশ্রেণীর ছোট ছোট সশস্ত্র দল গড়ে উঠছিল। অনাহারক্লিষ্ট, নির্যাতিত সাধারণ মানুষ বেশ বুঝতে পারছিল যে, প্রচলিত সমাজব্যবস্থা আর চলতে পারে না, বিদেশী শাসনকে উচ্ছেদ না করলে বাঁচবার কোন উপায়ই নেই। বৃটিশ শাসকদের নির্মম অত্যাচার সত্ত্বেও তাই সিপাহী বিদ্রোহের ২০ বছর যেতে না যেতেই ভারতে আর একটা গণতান্ত্রিক কৃষি-বিপ্লব হয়ে উঠেছিল আসন্ন। দেশের সাধারণ মানুষ ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল তারই উদ্যোগ আয়োজনে।

উনবিংশ শতাব্দীর ভারতের এই ছিল রাজনৈতিক-সামাজিক অবস্থা।

বঙ্কিমচন্দ্র বাঙলা তথা ভারতের ইতিহাসে কোন্ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন

তা বিচার করার সময় দেশের এই অবস্থার পটভূমিতেই তা বিচার করতে হবে। সোজাসুজি আমাদের প্রশ্ন করতে হবে, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সাহিত্যিক অবদান নিয়ে কোন্ শিবিরকে শক্তিশালী করেছিলেন, সমর্থন করেছিলেন? তিনি কি বিদেশী শাসন-বিরোধী, কৃষি-বিপ্লবের আয়োজনকারী সাধারণ মানুষের পক্ষ নিয়েছিলেন, না বিদেশী শাসনের সঙ্গে সহযোগিতায় ব্যস্ত সংস্কারপন্থী বুর্জোয়াদের, ইংরেজ শাসকদের পদলেহী সামন্ততন্ত্রের পক্ষ নিয়েছিলেন? তাঁর রচনাবলী কাদের প্রেরণা জুগিয়েছিল, উৎসাহিত করেছিল? যদি দেখা যেত যে, বঙ্কিমচন্দ্র অন্তত মোটামুটিভাবে দেশের জনসাধারণের এই মনোভাবের বাস্তবমুখী বর্ণনা দিয়েছেন, তাঁর সাহিত্যে জনসাধারণের জীবন-মরণের স্বাধীনতার লড়াইকে করেছেন সমর্থন, সামন্ততান্ত্রিক অবিচার-অন্যায়কে, নীতিবোধকে করেছেন আঘাত, সাম্রাজ্যবাদের নাগপাশ ছিন্ন করার চেষ্টাকে জুগিয়েছেন প্রেরণা—তবে তাঁকে অকুণ্ঠচিত্তে প্রগতিশীল বুর্জোয়া সাহিত্যিক বলে অভিনন্দিত করতে নিশ্চয় কারও আপত্তি ঘটত না। কিন্তু বঙ্কিমমচন্দ্রের লেখা উপন্যাস আর প্রবন্ধ, গল্প আর নক্সায় এই ধরনের কোন ভুল ধারণা হবার অবকাশই তিনি রাখেননি।

প্রথমেই বিচার করে দেখা যাক বঙ্কিমের রাজনৈতিক মতামত—কারণ তাঁকে জাতীয়তার অন্যতম উদ্বোধক বলে, স্বাধীনতা লাভের লড়াইয়ের প্রেরণাদাতা বলে অহোরাত্র প্রচারকার্য চলে থাকে বাঙলার বুর্জোয়া মহলে। কিন্তু এ দাবি কি সত্যই তিনি করতে পারেন? যে **আনন্দমঠ** নিয়ে এত হৈ চৈ হয়ে থাকে তাতে বঙ্কিমচন্দ্র দেশকে বৃটিশের কবল থেকে মুক্ত করার শিক্ষা দেননি—শিক্ষা দিয়েছেন বৃটিশ প্রভুদের সঙ্গে সহযোগিতার প্রয়োজনের। "আনন্দমঠ" এক-দিকে হিন্দু "রিভাইভালিজমের" (পুনর্জাগরণের) আর অন্যদিকে বৃটিশের সঙ্গে সহযোগিতা প্রচারের নিদর্শন; এবং এ থেকেই স্পষ্ট করে বোঝা সম্ভব যে, রিভাইভালিজমটা (পুনর্জাগরণটা) আসলে গণ-আন্দোলনের প্রতি বিরোধিতার মতাদর্শ ছাড়া কিছু নয়।

অথচ যে-ঐতিহাসিক সন্ন্যাসী-বিদ্রোহের পটভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্র এই "আনন্দমঠ" রচনা করেছিলেন তা ছিল সম্পূর্ণ অন্য ধরনের জিনিস। এই সন্ন্যাসী-বিদ্রোহ যে প্রকৃতপক্ষে নিঃস্ব, বুভুক্ষু কৃষকদের শ্রেণী-সংগ্রামেরই একটা রূপ এবং এই বিদ্রোহী কৃষকদের হাতে পড়ে বৃটিশ শাসকদের কিরকম নাস্তানাবুদ হতে

হয়েছিল তার আভাস পাওয়া যায় হাণ্টারের বিবরণে। তিনি লিখেছেন :

"ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পরবর্তী বছরগুলিতে তাদের (অর্থাৎ সন্ন্যাসীদের) দল ভারী হয়ে উঠল অনশনক্লিষ্ট কৃষকদের যোগদানের ফলে; এদের চাষবাস করার মত না ছিল বীজ, না ছিল কোন যন্ত্রপাতি। ১৭৭২ সালের শীতকালে তারা ঝাপিয়ে পড়ল নিম্নবঙ্গের ফসল ভরা ক্ষেতের উপর, পঞ্চাশ থেকে হাজার লোকের এক এক দল আগুন জ্বালাতে লাগল, লুটপাট করতে লাগল। কালেক্টররা ফৌজ ডেকে পাঠাল—কিন্তু সাময়িক কিছু সাফল্যের পর আমাদের সেপাইরা শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ পরাস্ত হল; তাদের নেতা কাপ্তেন টমাস তার দলবল সমেত বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল।...১৭৭৪ সালের ৩১শে মার্চ তারিখে ওয়ারেন হেষ্টিংস সোজাসুজি স্বীকার করেছেন যে, কাপ্তেন টমাসের বদলে যে কমাণ্ডার এসেছেন তাঁরও ঐ একই রকম দুর্ভোগ হয়েছে। এই সব গুণ্ডামির (!) বিরুদ্ধে চার ব্যাটালিয়ন সৈন্য সক্রিয়ভাবে লাগান হয়েছে, জমিদারদের কাছ থেকে সাহায্য আদায় করা হয়েছে; কিন্তু তবু এই সম্মিলিত চেষ্টাও হয়েছে ব্যর্থ! খাজনা আদায় করা যেত না, **দেশের অধিবাসীরা** এই খুনেদের **সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল এবং সমস্ত গ্রাম্য শাসন ব্যবস্থাটাই হয়ে গিয়েছিল বিপর্যস্ত**।"—(হাণ্টার : **এ্যানালস অব রুরাল বেঙ্গল**।

(বড় হরফ আমার—লেখক)।

জনসাধারণের সমর্থনপুষ্ট এই বিরাট অভ্যুত্থানকে বঙ্কিমচন্দ্র বাস্তব অভিমুখী করে বর্ণনার কোন চেষ্টাই করলেন না—একে উপলক্ষ করে প্রচার করলেও আধ্যাত্মিক ভক্তিতত্ত্ব। ইংরেজের গোলাম মীরজাফরের বিরুদ্ধে নির্যাতিত জনসাধারণের সংগ্রামকে তিনি এমনভাবে আঁকলেন যে, সেটা মনে হল মুসলমানের বিরুদ্ধে হিন্দুর সংগ্রাম, তার বেশি কিছু নয়; দেখান হল মুসলমান শাসনের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যই দরকার বৃটিশ পরাধীনতাকে অভিনন্দিত করা। বিদ্রোহী কৃষক-সন্তানেরা জয়ী হল কিন্তু তারা নিজেরা রাজ্য-স্থাপন করল না—চলল তীর্থ দর্শন করতে আর রাজ্যভার ছেড়ে দিল ইংরেজের হাতে। দেশ শেষকালে ইংরাজের হাতে যাবে শুনে বিদ্রোহী সন্ন্যাসীদের নেতা সত্যানন্দ যখন আক্ষেপ করছিলেন, তখন চিকিৎসকের মুখ দিয়ে বঙ্কিম বোঝালেন :

"সত্যানন্দ কাতর হইও না। তুমি বুদ্ধির ভ্রমক্রমে দস্যুবৃত্তির দ্বারা ধন সংগ্রহ করিয়া রণজয় করিয়াছে। পাপের কখনও পবিত্র ফল হয় না। অতএব তোমরা দেশ উদ্ধার করিতে পারিবে না। আর যাহা হইবে ভালই হইবে, ইংরাজ রাজা না হইলে সনাতন ধর্মের পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা নাই।"[১]

সামন্ততান্ত্রিক অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগ, শোষকদের বিরুদ্ধে সংগ্রামটা গুণ্ডামি আর দস্যুতা মাত্র। এভাবে সশস্ত্র সংগ্রাম করে শোষকদের উচ্ছেদ করা যায় না, শোষিত জনসাধারণের রাজত্ব কায়েম করা যায় না, কারণ এটা হল পাপের পথ। তা ছাড়া দেশ বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের পদানত হবার ফল ভালই হবে—কারণ, বৃটিশ না এলে সনাতন ধর্মের আবার জয় জয়কার হবার সম্ভাবনা নেই। "ইংরেজ বহির্বিষয়ক জ্ঞানে অতি সুপণ্ডিত, লোক শিক্ষায় বড় সুপটু। সুতরাং ইংরেজকে রাজা করিব।"

কিন্তু বৃটিশদের হাতে দেশকে তুলে দেওয়াই যদি উদ্দেশ্য হয়, তবে বিদ্রোহী কৃষকদের এই সশস্ত্র সংগ্রামের, এত আত্মত্যাগের কি প্রয়োজন ছিল?

"ইংরেজ এক্ষণে বণিক—অর্থ সংগ্রহেই মন দিয়াছে, রাজ্য শাসন ভার লইতে চাহে না। এই সন্তান বিদ্রোহের কারণে তাহারা রাজ্যশাসন ভার লইতে বাধ্য হইবে; ...ইংজের রাজ্যে অভিষিক্ত হইবে বলিয়াই সন্তান-বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছে।"

বিদেশী শাসন আর সেই শাসনের আশ্রয়পুষ্ট সামন্ত-ভূস্বামীদের উচ্ছেদ করার জন্য যে আন্দোলন আরম্ভ হয়েছিল, বঙ্কিম তার ব্যাখ্যা দিলেন সম্পূর্ণ উল্টোভাবে। কৃষক আর সন্ন্যাসীরা বিদ্রোহ করেছিল যাতে বৃটিশরা বাঙলার গদীতে এসে বসতে পারে! বুর্জোয়াদের শ্রেণী-স্বার্থের খাতিরে ইতিহাস আর ঐতিহ্যকে বিকৃত করার যে দৃষ্টান্ত বঙ্কিম রেখে গেলেন, তা সত্যই অপূর্ব! কিন্তু শোষকদের বিরুদ্ধে যে সশস্ত্র কৃষক জান দিয়ে লড়েছে, নিজের শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হয়েছে, সে তো সহজে নিজের অধিকার ছাড়তে চাইবে না।

"সত্যানন্দের চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইল। তিনি বলিলেন,

'শত্রু-শোণিত সিক্ত করিয়া মাতাকে শস্যশালিনী করিব।'

মহাপুরুষ। শত্রু কে? শত্রু আর নাই। ইংরেজ মিত্র রাজা।"

এই বলে মহাপুরুষ সত্যানন্দের হাত ধরলেন এবং বঙ্কিমচন্দ্র সমস্যার সমাধান করে দিয়ে বললেন: "কে কাহার হাত ধরিয়াছে? জ্ঞান আসিয়া ভক্তিকে ধরিয়াছে, ধর্ম আসিয়া কর্মকে ধরিয়াছে।"

মোটামুটি বঙ্কিমচন্দ্র সকলকে বুঝিয়ে দিলেন, ইংরেজের সঙ্গে সহযোগিতা করাই এখন জ্ঞানের লক্ষণ, ধর্মের লক্ষণ। অতএব সকলে এখন ইংরেজ শাসকদের সঙ্গে সহযোগিতা কর, তাদের গুণগান কর; কারণ, "ইংরেজ বাঙলা দেশকে অরাজকতার হাত হইতে উদ্ধার করিয়াছে।" এর পরও যখন কোন "মার্কসপন্থী" বলেন, বঙ্কিমের শিক্ষার "ফর্ম (আকৃতি) হিন্দু রিভাইভালিজম হওয়া সত্ত্বেও কনটেন্ট (প্রকৃতি) বৃটিশ-বিরোধী বুর্জোয়া জাতীয়তাবোধের দ্বারা উদ্দীপিত" তখন সেটা নিছক প্রহসন হয়ে দাড়ায় না কি? বস্তুতপক্ষে বঙ্কিমের আন্দোলনের আকৃতি আর প্রকৃতিতে কোন বিরোধই ছিল না। তাঁর কাছে সনাতন ধর্মের পুনরভ্যুত্থান আর বৃটিশের সঙ্গে সহযোগিতা একই জিনিস।

অনেককে এ কথায় আপত্তি করে বলতে শুনেছি যে, "আনন্দমঠের" শেষাংশে যা আছে সেটা বঙ্কিমের সত্যকার মত নয়—সেটা বৃটিশ কর্তাদের রাজরোষ এড়াবার জন্য পরে তিনি জুড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু বঙ্কিমকে রক্ষার এই ধরনের চেষ্টা যে ছেলেমানুষী ও হাস্যকর তা বিশেষ বোঝাবার প্রয়োজন নেই। আত্ম-নিরাপত্তার খাতিরে যদি কেউ গণ-আন্দোলনের পক্ষে সর্বনাশা এ ধরনের কোন কথা লেখেন, তবে আর যাই হোক সে লেখকের ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী বলে জনসাধারণ গৌরব বোধ করতে পারে না। শোনা যায়, লঙ্-কে দিয়ে "নীলদর্পণ" অনুবাদ করানর জন্য মধুসূদন দত্তের নাকি চাকুরি গিয়েছিল; কিন্তু তা বলে তিনি কখনও নাকে খৎ দিয়েছিলেন এমন শোনা যায়নি।

আসল কথা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সহযোগিতায় বঙ্কিম ছিলেন বিশ্বাসী এবং অন্যত্রও তিনি সে কথা স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করে গেছেন। সাম্রাজ্যবাদের প্রগতিশীলতার উপর তাঁর ছিল গভীর আস্থা।

"ইংরেজ ভারতবর্ষের পরমোপকারী। ইংরেজ আর্যদিগকে অনেক নূতন কথা শিখাইতেছে; যাহা আমরা জানিতাম না, তাহা জানাইতেছে; যাহা কখনো দেখি নাই, শুনি নাই, বুঝি নাই তাহা দেখাইতেছে,

শুধু তাই নয়। যারা জমিদারী অত্যাচার আর শোষণ অস্বীকার করবার চেষ্টা করে তাদের বিদ্রূপ করে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন :

"অনেকেই রাগ করিয়া এই সকল কথা অস্বীকার করিবেন। তাঁহারা বলিবেন আইন আছে, নিরিখ আছে, জমীদারের দয়াধর্ম আছে। আইন—সে একটা তামাসা মাত্র—বড় মানুষই খরচ করিয়া সে তামাসা দেখিয়া থাকে। নিরিখ পূর্ববর্ণিত প্রণালীতে বাড়িয়া গিয়াছে। আর জমীদারের দয়াধর্ম—তাহার আর একটি নাম স্বার্থপরতা। যতদূর স্ক্রু ফিরে, ততদূর ফেরান। যখন আর ফিরে না, তখন দয়াধর্মের আবির্ভাব হয়।" (ঐ)।

এই থেকে মনে হতে পারে কি ভীষণ প্রগতিশীল বঙ্কিম। জমিদারী অত্যাচারের মুখোশ তিনি একেবারে খুলে দিয়েছেন, জমিদারদের দয়াধর্মের ভণ্ডামি প্রকাশ করে দিয়েছেন। এই শোষণ আর অত্যাচারে বীতশ্রদ্ধ বঙ্কিম নিশ্চয় ফরাসী বিপ্লবের রথীদের মত সামন্ততান্ত্রিক জমিদারী ব্যবস্থাকে খতম করে দেবার পরামর্শই দেবেন। কিন্তু সে রকম দুরভিসন্ধি বৃটিশ শাসনের অনুরাগী বঙ্কিমের মোটেই ছিল না।

"চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ধ্বংসে বঙ্গ-সমাজে ঘোরতর বিশৃংখলা উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা। **আমরা সামাজিক বিপ্লবের অনুমোদক নহি।** বিশেষ যে বন্দোবস্ত ইংরেজ সত্য প্রতিজ্ঞা করিয়া চিরস্থায়ী করিয়াছেন—তাহার ধ্বংস করিয়া তাঁহারা ভারতমণ্ডলে মিথ্যাবাদী বলিয়া পরিচিত হয়েন, প্রজাগণের চিরকালীন অবিশ্বাসভাজন হয়েন এমত কুপরামর্শ আমরা ইংরেজদিগকে দিই না।" (ঐ)।

বৃটিশরা বিশ্বাসঘাতকদের পুরস্কৃত করার জন্য যে ব্যবস্থার পত্তন করেছিল, নিজেদের স্তম্ভ সৃষ্টি করেছিল যে ব্যবস্থার মারফত, তাকে বৃটিশের সহযোগী বঙ্কিম ধ্বংস করতে বলবেন কেমন করে? বৃটিশ-সৃষ্ট এই ব্যবস্থা ধ্বংস করে, নিঃস্ব, উৎপীড়িত দরিদ্র কৃষকদের অধিকার স্থাপনের চেষ্টাটা "ঘোরতর বিশৃংখলা" ছাড়া কিছু নয়। তিনি তাই "সামাজিক বিপ্লবের অনুমোদক" নন। বঙ্কিম সাহিত্যের অবদানকে যাঁরা ফরাসী বিপ্লবীদের অবদানের সঙ্গে তুলনা করেন তাঁরা হয় বাতুল, আর নয়ত বঙ্কিমের মতামতের কোন খবরই রাখেন না।

কিন্তু সামন্তপ্রথার যদি বঙ্কিম এমনই পৃষ্ঠপোষক তবে তিনি কৃষকদের উপর

এই শোষণের নিন্দা করতে গেলেন কেন? এ প্রশ্নের উত্তর খুবই সহজ এবং তৎকালীন দেশের অবস্থার দিকে নজর দিলেই এ উত্তর পরিষ্কার হয়ে উঠবে। এক দিকে বিদেশী শাসনের জুলুম আর অন্য দিকে দেশী জমিদারদের অত্যাচারের ফলে সাধারণ লোকের অবস্থা যে অসহনীয় হয়ে উঠেছিল সে কথা আমরা গোড়াতেই বলেছি। এই অসহনীয় অবস্থার হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য সামন্তপ্রথার বিরুদ্ধে কৃষি-বিপ্লবের দিকে সাধারণ লোকের মন ঝুঁকে পড়ছিল। এই অসহনীয় অবস্থাকে কিঞ্চিৎ সহনীয় করাই ছিল বঙ্কিমের উদ্দেশ্য যাতে জনসাধারণ উগ্রপন্থার দিকে আর তত না ঝোঁকে। জমিদারী অত্যাচারের কিঞ্চিৎ সংস্কারের আবশ্যকতার পক্ষে যুক্তি দিতে গিয়ে তিনি তাই বলেছিলেন :

"সকল কৃষিজীবী ক্ষেপিলে কে কোথায় থাকিবে? কি না হইবে?" (**ঐ**)।

জমিদারী-প্রথা সংস্কার করতে গিয়ে আজকের দিনে যুক্ত প্রদেশের কংগ্রেসী জমিদারী-উচ্ছেদ কমিটি যে-যুক্তি দেখিয়েছে (**মার্কসবাদী** দ্রষ্টব্য)[১] তার সঙ্গে এ যুক্তির মূলত কোন তফাৎ নেই। আজকের দিনের সাম্রাজ্যবাদের পদলেহী আপসপন্থী কংগ্রেসী বুর্জোয়ারা এদিক দিয়ে সেদিনের সংস্কারপন্থী বঙ্কিমের প্রতিক্রিয়াশীল ঐতিহ্যেরই উত্তরাধিকারী। আজকের বুর্জোয়াদের মত বঙ্কিমও সেদিন জমিদারদের বলেছিলেন, জমিদারী অত্যাচার আর শোষণের রকম ফেরাও, নইলে বিপ্লবের বন্যায় সব ভেসে যাবে।

> "বুর্জোয়া রাজত্বে সংস্কারপন্থী কৌশল অনুসরণ করার ফলে, সংস্কারটা নিশ্চিতভাবে ঐ রাজত্বকে আরও শক্তিশালী করার হাতিয়ারে রূপান্তরিত হয়, বিপ্লবকে বানচাল করার হাতিয়ারে পরিণত হয়।"
>
> (স্টালিন : **লেনিনবাদের ভিত্তি**)।

বঙ্কিমচন্দ্রের শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল বৃটিশ-বিরোধী গণতান্ত্রিক কৃষি-বিপ্লবকে বানচাল করা ; তাঁর শিক্ষার ফলে তাই বৃটিশ শাসনের বনিয়াদটাই হয়েছিল শক্তিশালী। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়ে যাবার পর তাই কৃষকদের জন্য আর দরদ দেখাবার কোন প্রয়োজন রইল না। 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত 'বঙ্গদেশের কৃষক' বিশ বছর পরে বই হিসাবে ছাপাবার সময় কৈফিয়ত দিতে গিয়ে বঙ্কিম ঘোষণা করলেন যে, এতদিন তিনি বইটি ছাপাননি কারণ এটা একেবারেই ছাপান

১. 'যুক্তপ্রদেশের জমিদারী উচ্ছেদ পরিকল্পনার সমালোচনা', মার্কসবাদী, তৃতীয় সংকলন, মে ১৯৪৯, পৃঃ ১৩২-১৯৭ দ্রষ্টব্য।—সম্পাদক

উচিত কিনা তাই তিনি চিন্তা করছিলেন—কেননা 'এখন আর সে অবস্থা নেই।'

"অনেক স্থলে দেখা যায় **প্রজাই অত্যাচারী, জমিদার দুর্বল**।"

(**বঙ্গদেশের কৃষকের** ভূমিকা। বড় হরফ আমার—লেখক)।

কিন্তু এই অত্যাচারী প্রজাদের বিরুদ্ধে দুর্বল জমিদারদের পক্ষ অবলম্বন করতে বঙ্কিমচন্দ্রের যে অনেক কাল বিলম্ব হয়েছিল এমন নয়। তিনি বরাবরই ছিলেন জনসাধারণের বিরোধী পক্ষের শিবিরের একজন। ১২৭৯ সালে 'বঙ্গদর্শনে' 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রকাশিত হয়েছিল। এর পরের বছর অর্থাৎ ১২৮০ সালে পাবনাতে জমিদারী অত্যাচারে জর্জরিত কিষাণদের সঙ্গে জমিদারদের এক সংঘর্ষ হয় এবং কিষাণরা অত্যাচারের কিছুটা প্রতিশোধ নেবারও চেষ্টা করে। ঐ সময় মীর মশারফ হোসেন নামে জনৈক লেখকের লেখা **জমিদার দর্পণ** নামে একটি নাটক প্রকাশিত হয়েছিল কলকাতা থেকে। "জমীদারদিগের অত্যাচার উদাহরণের দ্বারা বর্ণিত করাই ইহার উদ্দেশ্য। নীলকরদের সম্বন্ধে বিখ্যাত নীলদর্পণের যে উদ্দেশ্য ছিল, সাধারণ জমীদার সম্বন্ধে ইহারও সেই উদ্দেশ্য।" নাটকখানি লেখার দিক দিয়ে যে ভালই হয়েছে 'বঙ্গদর্শন' সে কথা স্বীকার করল বটে, কিন্তু লেখককে উপদেশ দেওয়া হল—নাটকটি বিক্রি বন্ধ করতে। কারণ কি?

"বঙ্গদর্শনের জন্মাবধি এই পত্র প্রজার হিতৈষী। এবং প্রজার হিত কামনা আমরা কখনো ত্যাগ করিব না। কিন্তু আমরা পাবনা জেলার প্রজাদিগের আচরণ শুনিয়া বিরক্ত এবং বিষাদযুক্ত হইয়াছি। **জলন্ত অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দেওয়া নিষ্প্রয়োজন**। আমরা পরামর্শ দিই যে, এসময়ে এ গ্রন্থ বিক্রয় ও বিতরণ বন্ধ করা কর্তব্য।"

(**বঙ্গদর্শন**—ভাদ্র, ১২৮০। বড হরফ আমার—লেখক)।

কৃষি-বিক্ষোভের জলন্ত অগ্নিতে আর ঘৃতাহুতি দিও না, অতএব নাটক প্রচার বন্ধ কর। প্রজার হিত চাই বটে কিন্তু তাই বলে একেবারে খোদ জমিদার-মহাজনদের গায়ে হাত! কৃষি-বিপ্লবের ভয়ে ভীত সংস্কারপন্থী বুর্জোয়া মনোভাব যে এখানে চমৎকার ভাবে ফুটে উঠেছে তাতে আর সন্দেহ কি!

বঙ্কিমের এই গণতন্ত্র-বিরোধী মনোভাব, গণ-বিপ্লবের ভীতি, সামন্ততান্ত্রিক কায়েমীস্বার্থের প্রতি পক্ষপাতিত্ব নতুন কিছু নয়। অন্যত্র তিনি আরও স্পষ্ট

করে বলেছেন :

"সমাজবিপ্লব অনেক সময়েই আত্মপীড়ন মাত্র। বিদ্রোহীরা আত্মঘাতী।"

(**আনন্দমঠ**—প্রথমবারের বিজ্ঞাপন)।

বঙ্কিম সাহিত্যের প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিকার মূলসূত্র এইখানেই মূর্তিমান হয়ে উঠেছে।

অনেকে হয় ত বলবেন, কেন বঙ্কিমচন্দ্র কি প্রশ্ন তোলেন নি—"দেশের ধনবৃদ্ধির অর্থ ধনীর ধনবৃদ্ধি, ধনীর ধনবৃদ্ধি হইলে তাহাতে দরিদ্রের কি?" (**কমলাকান্তের দপ্তর,** বিড়াল)। বলেছিলেন বটে কিন্তু বঙ্কিমের এ উক্তিকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখা চলে না ; তাঁর অন্যান্য লেখার সঙ্গে একে মিলিয়ে দেখতে হয়। এই মানদণ্ড দিয়ে বঙ্কিম সাহিত্যকে বিচার করলে দু একটা মুখরোচক উক্তির বিশেষ কোন প্রগতিশীল তাৎপর্যই থাকে না।

প্রকৃতপক্ষে বঙ্কিমচন্দ্র মাত্র একখানি পুস্তক প্রণয়ন করেছিলেন, যার মধ্যে কিছুটা ইউটোপিয়ান প্রগতিশীল ভাবধারা ছিল—তা হল **সাম্য**। সামাজিক শ্রেণী-বৈষম্য এবং আর্থিক বৈষম্যের কোন কারণ স্পষ্ট করে দেখাতে না পারলেও 'সাম্যের' মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র এই বৈষম্যের বিরুদ্ধে জানিয়েছিলেন প্রতিবাদ, ফরাসী বিপ্লবের বিরাট দানকে জানিয়েছিলেন অভিনন্দন, রবার্ট ওয়েন, স্যাঁ সিমঁ, ফুরিয়ে প্রভৃতির ইউটোপিয়ান কমিউনিজমের প্রতিও সহানুভূতি জানাতে ত্রুটি করেননি। বস্তুতপক্ষে সমাজের ধনবৈষম্যের প্রতিবাদ করতে গিয়ে এতে বঙ্কিম লিখেছিলেন :

"সর্বাপেক্ষা অর্থগত বৈষম্য গুরুতর। তাহার ফলে কোথাও কোথাও কখনও দুই একজন লোকে টাকার খরচ খুঁজিয়া পান না ; কিন্তু লক্ষ লক্ষ লোক অন্নাভাবে উৎকট রোগগ্রস্ত হইতেছে।" (**সাম্য**)।

এই বইয়ের মধ্যে বঙ্কিম স্ত্রী-পুরুষের সমান অধিকারের দাবিও তুলেছিলেন বলিষ্ঠ কণ্ঠে। সমাজে আর্থিক বৈষম্য থাকা যেমন অন্যায়-অবিচার, তেমনি স্ত্রী আর পুরুষের মধ্যে কৃত্রিম বিভেদ, স্ত্রীলোকের উপর পুরুষের অন্যায় প্রাধান্যও তেমনি অসঙ্গত ও অসমর্থনীয়—এই মতই সেখানে প্রচার করেছিলেন বঙ্কিম। তাঁর মতে—

"মনুষ্যে মনুষ্যে সমান অধিকার বিশিষ্ট। স্ত্রীগণও মনুষ্যজাতি, অতএব স্ত্রীগণও পুরুষের তুল্য অধিকারশালিনী। যে যে কার্যে পুরুষের অধিকার

আছে সেই সেই কার্যে স্ত্রীগণেরও অধিকার থাকা ন্যায়সঙ্গত।” (ঐ)।

“পশুগণকে কেহ প্রহার না করে এজন্য একটি সভা আছে ; কিন্তু বাঙ্গালীর অর্ধেক অধিবাসী স্ত্রীজাতি—তাহাদের উপকারার্থ কেহ নাই।” (ঐ)

সামন্ততান্ত্রিক অবিচার-অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষার ব্যবস্থা না হওয়ার জন্য অভিজাত-সমাজকে ব্যঙ্গ করে এতে লেখা হয়েছিল—এবিষয়ে কিছু করা

“যায় না, কেননা তাহাতে রঙ-তামাসা নাই। কিছু করা যায় না, কেননা তাহাতে রায় বাহাদুর, রাজা বাহাদুর, স্টার অব ইণ্ডিয়া প্রভৃতি কিছু নাই আছে কেবল মূর্খের করতালি। কে অগ্রসর হইবে?” (ঐ)

মোটকথা ‘সাম্যের’ নানাবিধ অসম্পূর্ণতা সত্বেও এর মধ্যে একটা গণতান্ত্রিক সুর, অভিজাত সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে একটা বিদ্রূপের ধ্বনি ফুটে উঠেছিল। কিন্তু এ সুর ছিল বঙ্কিম সাহিত্যের মূল সুরের সম্পূর্ণ পরিপন্থী এবং বঙ্কিম নিজেই তা জানতেন বিশেষ ভাল করে। বঙ্কিমের প্রতিক্রিয়াশীল, রক্ষণশীল, গণতন্ত্রবিরোধী চেতনা ছিল এমনই প্রবল যে, তিনি শেষ পর্যন্ত নিজেই ‘সাম্যের’ বিক্রি আর প্রচার বন্ধ করে দিয়েছিলেন। নিজের রচনার মধ্যে, এমন এতটুকু প্রগতিশীল ভাবধারা থাকবে যাকে অভিজাত সমাজের বিরুদ্ধে জনসাধারণ কাজে লাগাতে পারে—এটুকু সম্ভাবনাও তিনি সহ্য করতে পারেননি।

স্ত্রী-পুরুষের সমান অধিকার সম্বন্ধে ‘সাম্যের’ মতামতকে মুছে ফেলে দিয়ে তাই তিনি রেখে দিলেন **ধর্ম্মতত্ত্ব**-এর অতি গোঁড়া মতবাদ। গুরুর মুখ দিয়ে তিনি বুঝিয়ে দিলেন—

“গুরু। নারী আত্মপালন ও রক্ষণে অক্ষম···অথচ যদি পুনশ্চ তাহাদিগের সে শক্তি পুনরভ্যাস পুরুষ পরম্পরা উপস্থিত হইতে পারে, এমন কথা বল, তবে বিবাহ প্রথার বিলোপ এবং সমাজও বিনষ্ট না হইলে তাহার সম্ভাবনা নাই।

“শিষ্য। তবে পাশ্চাত্যেরা যে স্ত্রী-পুরুষের সাম্য স্থাপন করিতে চাহেন, সেটা সামাজিক বিড়ম্বনা মাত্র?

“গুরু। সাম্য কি সম্ভবে? পুরুষ কি প্রসব করিতে পারে, না শিশুকে স্তন্যপান করাইতে পারে? পক্ষান্তরে স্ত্রীলোকের পল্টন লইয়া লড়াই চলে কি?” (**ধর্ম্মতত্ত্ব**)।

সাম্যের গণতান্ত্রিক আহ্বানকে এইভাবে জবাই করলেন বঙ্কিম। স্ত্রী-পুরুষের

সমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত হলে সামন্তসমাজ আর তার বিবাহ প্রথাটা রসাতলে যাবে এই চিন্তাই বঙ্কিমকে অস্থির করে তুলেছিল, তাই সামন্ত সমাজ ব্যবস্থার যূপকাষ্ঠে তিনি বলি দিলেন স্ত্রী-পুরুষের সমান অধিকারকে।

এই প্রতিক্রিয়াশীল মতবাদই নানাভাবে, নানা ভঙ্গিতে বঙ্কিম ব্যক্ত করে গেছেন তাঁর উপন্যাসের মধ্য দিয়ে। বঙ্কিমের উপন্যাসের মধ্যে তাই কোথাও অভিজাত সমাজের বিরুদ্ধে, তাদের ধ্যান-ধারণা, নীতিবোধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ নেই। বরং গোঁড়া রক্ষণশীলতার চশমা চোখে দিয়েই বঙ্কিম বিচার করে গেছেন সমাজের মানুষকে, তাদের দোষ-গুণকে। 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' একদিকে দেখান হল, ভ্রমর অভিমান ভরে দাম্পত্যের ক্ষেত্রে স্বামীর সঙ্গে সমান অধিকারে ক্ষণেকের জন্য দাঁড়াতে চেয়েছিল বলেই পারিবারিক জীবনে ঘটে গেল এক বিরাট ট্রাজেডি। মনের মধ্যে একটা ধারণা সৃষ্টি হয় যে, পুরুষ মোহান্ধ হয়ে ব্যভিচারী হয়ে উঠলেও নারী যদি তা নিয়ে বিক্ষুব্ধ না হয় তা হলে সম্ভবত সংসারে ট্রাজেডি এড়ান অসম্ভব না হতেও পারে। শুধু যে এই শিক্ষাই দেওয়া হল তা নয়—দেখিয়ে দেওয়া হল, বিধবার পক্ষে মনে কামনা-বাসনাকে স্থান দেওয়া কি সাংঘাতিক অপরাধজনক। রোহিণী ছিল সামন্ততান্ত্রিক সমাজের নীতিবোধের বিরুদ্ধে একটা প্রচণ্ড চ্যালেঞ্জ স্বরূপ। হিন্দুসমাজ বিধবার জন্য যে কঠোর বিধি-নিষেধের বেড়াজাল তৈরী করে পুরুষ-প্রাধান্যের চরম করে ছেড়েছে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের প্রশ্রয় পেলে সামন্ত সমাজই যে চুরমার হয়ে যাবে! বঙ্কিম তাই শেষ পর্যন্ত গোবিন্দলালকে ক্ষমা করলেও রোহিণীকে ক্ষমা করতে পারেননি। গোবিন্দলালের জন্য শেষ অবধি সহানুভূতি জাগে কিন্তু রোহিণীকে যে ভাবে চিত্রিত করা হল, তাতে তার জন্য এক ফোঁটা সহানুভূতি সৃষ্টিরও পথ রইল না। (সামন্ত) সমাজরক্ষক বঙ্কিম একেবারে "ন্যায়দণ্ড" হাতে এখানে আবির্ভূত হলেন নগ্ন মূর্তিতে।

'চন্দ্রশেখরে' অনুরাগ প্রণয় ইত্যাদিকে অভিজাত সমাজের নীতিবোধের স্বার্থের কাছে বলি দেওয়া হল। শৈবলিনী আর প্রতাপের প্রেম যে সার্থক হতে পারল না, তার কারণ সামন্ত সমাজের বিবাহ-রীতি। এ রীতিকে অমান্য করার কোন প্রশ্ন উঠল না—শিক্ষা দেওয়া হল কামনা-বাসনা ইত্যাদিকে দমন কর, ইন্দ্রিয় সংযম কর। প্রতাপের প্রেমকে স্বার্থক করতে হলে প্রাচীন সমাজের নীতিবোধ আর ধ্যান-ধারণাকে করতে হত আঘাত, দূর সম্পর্কের

আত্মীয়ের মধ্যে প্রণয়জনিত বিবাহে যে কোন দোষ থাকতে পারে না—তাই প্রচার করতে হত। কিন্তু বঙ্কিম সে পথে যেতে নারাজ। তিনি প্রাচীন কুসংস্কারকেই সমর্থন জানিয়ে প্রতাপের জন্য শুধু "পরলোকে অনন্ত অক্ষয় স্বর্গ ভোগের" আশ্বাস দিলেন আর বললেন—"তবে যাও প্রতাপ অনন্ত ধামে! যাও যেখানে ইন্দ্রিয়জয়ে কষ্ট নাই, রূপে মোহ নাই, প্রণয়ে পাপ নাই, সেইখানে যাও।" ইহলোক থাক সামন্ততান্ত্রিক কুসংস্কারের একচ্ছত্র কবলে।

'দেবী চৌধুরাণীতে' একদিকে জয়ঢাক বাজিয়ে প্রচার করা হল সনতান নিষ্কাম ধর্মের আর অন্যদিকে দেখিয়ে দেওয়া হল সাংসারিক সুখের জন্য এক বিবাহই যে একমাত্র পথ এমন নয়। বহু বিবাহের মধ্য দিয়েও আসতে পারে সুখ, আসতে পরে শান্তি। ব্রজেশ্বর তাই তার তিন স্ত্রীকে নিয়ে নতুন করে আবার পাতল সংসার। এক বিবাহের আদর্শ ভেসে গেল সামন্ততান্ত্রিক আভিজাতশ্রেণীর অভ্যাসের প্রয়োজনের স্রোতে। 'দুর্গেশনন্দিনী'তেও এই সুরটাই ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়েছে আগাগোড়া এবং 'সীতারামের' মধ্যে এই সুরেরই রেশ কানে বাজে শেষ পর্যন্ত। এর সঙ্গে কি পরিষ্কার পার্থক্য ফুটে উঠেছে দীনবন্ধু মিত্রের 'জামাই বারিকে'র। বহু বিবাহ প্রথার ফল যে কি বিষময় হতে পারে 'জামাই বারিক' তারই একখানি বাস্তবমুখী ছবি। 'জামাই বারিকে' যেমন প্রাচীন কু-প্রথার বিরুদ্ধে আছে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ আর বিদ্রূপ—বঙ্কিমের উপন্যাসে তেমনি আছে সেই সব প্রথার খোলাখুলি সমর্থন।

'সীতারামে' শুধু এইভাবে যে গণতান্ত্রিক চেতনার বিরোধিতা করা হয়েছে তাই নয়--সাধারণ জনগণের বিরুদ্ধে প্রচ্ছন্ন কুৎসা প্রচারও বাদ দেওয়া হয়নি। 'সীতারামে' রামচাঁদ আর শ্যামচাঁদ নাম দিয়ে সাধারণ লোকের দুজন প্রতিনিধি খাড়া করে দেখান হয়েছে যে, জনসাধারণ দেশের ভাগ্য সম্বন্ধে নির্বিকার, রাষ্ট্রের ওলট-পালটে তারা এতটুকু মাথা ঘামায় না। সীতারামের রাজত্ব গেল, মুসলমান রাজত্ব কায়েম হল তখন বঙ্কিম শ্যামচাঁদের মুখ দিয়ে বলালেন :

"আমরা আদার ব্যাপারী জাহাজের খবর নিয়ে কাজ কি? আপনার প্রাণ নিয়ে যে বেঁচে এসেছি এই ঢের। এখন তামাকটা সাজ দেখি।"

অর্থাৎ সাধারণ লোক হল নিতান্ত স্বার্থপর, আত্মকেন্দ্রিক জীব। সমাজের ইষ্টানিষ্ট নিয়ে তারা এতটুকু ব্যস্ত নয়। বঙ্কিম যদি রিয়ালিষ্টিক ঔপন্যাসিক হতেন তবে জনসাধারণকে এইভাবে চিত্রিত করার একটা অনুকূল ব্যাখ্যা হয়ত দেওয়া

যেত'। বলা চলত যে, বৃটিশরা এদেশ জয় করার আগ পর্যন্ত যে সব শাসকেরা এসেছে তারা শুধু রাষ্ট্রক্ষমতাই দখল করেছে—গ্রাম্য সমাজের গায়ে বিশেষ হাত দেয়নি। গ্রাম্য সমাজ তাই রাজ্য কার হাতে গেল-না-গেল তা নিয়ে মাথা ঘামাত না। বঙ্কিম সীতারামের আমলের সেই ধরনের নির্বিকার গ্রাম্য লোকের একটা বাস্তবমুখী বর্ণনা দিয়েছেন। এক্ষেত্রে কিন্তু সে ব্যাখ্যা অচল। কারণ, বঙ্কিম সাহিত্যে রিয়ালিজমের ধার দিয়েও যাননি, তিনি বিশুদ্ধ রোমান্টিসিজমের পথই অনুসরণ করে এসেছেন। তাঁর কোন ঐতিহাসিক উপন্যাসই ইতিহাস-অনুগ নয—ইতিহাসকে শিখণ্ডী খাড়া করে তিনি বিভিন্ন সমস্যা আর শ্রেণী সম্বন্ধে নিজের সংস্কারপন্থী বুর্জোয়া মতামতই ব্যক্ত করে গেছেন। এক্ষেত্রে তাই জনসাধারণকে এইভাবে চিত্রিত করা বঙ্কিমের ইতিহাস নিষ্ঠার পরিচয় নয়, জনসাধারণ সম্বন্ধে কুৎসা প্রচার মাত্র। বঙ্কিমের যুগে অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীতে দেশের জনসাধারণ যে মোটেই রাষ্ট্রের ভবিষ্যত আর দেশের অবস্থা সম্বন্ধে নির্বিকার 'unthinking crowd' ছিল না, তার পরিচয় রয়েছে ইতিহাসেই। জনসাধারণই তখন একমাত্র লড়ছিল দেশের জন্য, স্বাধীনতার জন্য; আর সংস্কারপন্থী বুর্জোয়ারা দেশের স্বাধীনতার কথা ভুলে গিয়ে বিদেশী শোষকদের সঙ্গে পাতিয়ে ছিল মিতালি। কিন্তু এ সত্য রূঢ় সত্য বলেই অপ্রিয় এবং বুর্জোয়াদের পক্ষে অপ্রীতিকর। তাই এই সত্যকে, এই ঐতিহ্যকে বিকৃত করার জন্য বুর্জোয়া ঔপন্যাসিককে নিতে হয়েছে অপভাষণের আশ্রয়। জনসাধারণের স্বার্থের এমন প্রচণ্ড বিরোধী বলে, স্ত্রী-স্বাধীনতা, স্ত্রী-পুরুষের সমান অধিকারের এমন বিরোধী বলে, বহু বিবাহের প্রচ্ছন্ন ও সূক্ষ্ম সমর্থক বলে, সামন্ত প্রথার সমস্ত রক্ষণশীল কুসংস্কারের এমন ঘোরতর সমর্থক বলেই বঙ্কিম সাহিত্য এতখানি আদরণীয় হয়ে উঠেছিল এদেশের সমাজের গোঁড়া হিন্দুদের কাছে, উচ্চশ্রেণীর কাছে। বঙ্কিমের উপন্যাসে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল আন্দোলনের কোন সমর্থন নেই, সামন্ত অভিজাত সমাজের রাজনীতির বিরুদ্ধে সংগ্রামের কোন আহ্বান নেই। বঙ্কিমের আবেদন শুধু প্রগতির পথরোধ-কারীদের কাছেই। বঙ্কিম সাহিত্য হল সেই সংস্কারপন্থী বুর্জোয়া সমাজের মুখপত্র, যাদের মৃত্যু ঘটেছে জন্মের আগেই। তাই এঁদের আপস করে চলতে হয় বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে, সামন্ত প্রথার সঙ্গে। ফরাসী বিপ্লবের রথীদের লক্ষ্য ছিল সামনের দিকে, আর এঁদের লক্ষ্য ছিল পিছনের দিকে।

বস্তুত পক্ষে উনবিংশ শতকে সমাজের বাস্তব শ্রেণী-সংঘাত, সমাজের রিয়ালিটি ছিল সংস্কারপন্থী বুর্জোয়াদের স্বার্থের এমনই পরিপন্থী যে, সেই সমাজের মুখপাত্র বঙ্কিমকে সহিত্যে রিয়ালিজমের পথ পরিহার করে চলতে হয়েছিল। বাস্তব-অভিমুখী সাহিত্য সামাজিক সম্পর্ককে মানুষের ভাষায় রূপান্তরিত করে। শ্রেণী-সমাজে মানুষের অবস্থা, তার ধ্যান-ধারণার ছবি ফুটে ওঠে এর মধ্য দিয়ে। সাহিত্য হয়ে ওঠে সমাজের অন্তর্দ্বন্দ্ব বোঝবার, সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর সামাজিক মনস্তত্ত্ব বোঝবার উপায়স্বরূপ। কিন্তু এই জিনিসটাই তো ছিল সংস্কারপন্থী বুর্জোয়াদের অপছন্দ; নিজেদের বিশ্বাসঘাতকতাকে কারা দর্পণের মধ্যে প্রতিফলিত দেখতে চায়? বঙ্কিমচন্দ্র তাই সাহিত্যে রিয়ালিজমের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছিলেন—তিনি লিখেছিলেন:

> "নীলদর্পণকার প্রভৃতি যাঁহারা সামাজিক কু-প্রথার সংশোধনার্থ নাটক প্রণয়ন করেন আমাদিগের বিবেচনায় তাঁহারা নাটকের অবমাননা করেন। নাটকের উদ্দেশ্য গুরুতর—যে সকল নাটক এইরূপ উদ্দেশ্যে প্রণীত হয়, সে সকলকে আমরা নাটক বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। কাব্যের উদ্দেশ্য সৌন্দর্য্য সৃষ্টি—সমাজসংস্কার নহে। মুখ্য উদ্দেশ্য পরিত্যক্ত হইয়া সমাজ সংস্কারণাভিপ্রায়ে নাটক প্রণীত হইলে নাটকের নাটকত্ব থাকে না।"

(**বঙ্গদর্শন**—ভাদ্র, ১২৮০)।

অর্থাৎ আর্টের জন্য আর্ট, সৌন্দর্য সৃষ্টির জন্যই আর্ট ইত্যাদি সনাতন প্রতিক্রিয়াশীল আওয়াজই এখানে বঙ্কিম তুলেছেন প্রগতিপন্থীদের বিরুদ্ধে আঘাত হানবার জন্য। তিনি যা বলতে চেয়েছেন, তার অর্থ হল—নাটক-সাহিত্য-কাব্য ইত্যাদি উদ্দেশ্যমূলক হলেই তাদের জাতিচ্যুতি ঘটবে; আর্টকে হতে হবে নিরপেক্ষ, নির্বিকার চিত্ত; নিছক সৌন্দর্য সৃষ্টিই হবে তার একমাত্র লক্ষ্য—সত্যম্ শিবম্ সুন্দরমেরই সে হবে পূজারী।

এসব কথার প্রকৃত তাৎপর্য, এর প্রতিক্রিয়াশীল স্বরূপ বুঝতে মোটেই কষ্ট হয় না। আর্টের পক্ষপাতিত্ব স্বীকার করলেই বঙ্কিমচন্দ্রকে স্বীকার করতে হত যে, তিনি যে সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন তা নিরপেক্ষ নয়—তা মুষ্টিমেয় উচ্চশ্রেণীর হাতেই হাতিয়ার। এই সত্যকে অস্বীকার করার জন্যই সে যুগের যে সব প্রগতিশীল লেখক আর্টকে গণতান্ত্রিক সংগ্রামের হাতিয়ারে পরিণত করতে চেয়েছিলেন, বঙ্কিম তাঁদের উপর হয়েছিলেন খড়্গহস্ত। তাঁদের সাহিত্যকে

বলেছিলেন সাহিত্যের অবমাননা। অর্থনীতি আর রাজনীতিক্ষেত্রে যিনি প্রগতি সংহারকেই ব্রত করেছিলেন, শিল্পতত্ত্বের ক্ষেত্রেও তিনি যে চরম প্রতিক্রিয়াশীল মতবাদ প্রচার করবেন, তাতে আর আশ্চর্য হবার কি আছে !

কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র নিজে যে সাহিত্য সৃষ্টি করেছিলেন তাতে কি "বিশুদ্ধ সৌন্দর্য সৃষ্টিই" তিনি করেছেন ? 'বিষবৃক্ষ', 'চন্দ্রশেখর', 'দেবী চৌধুরাণী', 'কৃষ্ণকান্তের উইল', 'আনন্দমঠ'—পাঠ করলে কোন সন্দেহই থাকে না যে বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যরাজ্যে "নিরপেক্ষ" মোটেই ছিলেন না। তাঁর পক্ষপাতিত্ব ছিল অভিজাত সামন্ত সমাজের ভাবাদর্শের প্রতি, তাঁর সৃষ্ট সৌন্দর্য শুধু তাদেরই নয়ন সার্থক করেছে। বঙ্কিম সাহিত্যের শিক্ষা গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে করেছে পঙ্গু, বাস্তবকে প্রতিফলিত করেছে বিকৃতভাবে। বঙ্কিমের রক্ষণশীল প্রতিক্রিয়াশীল দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে তাঁর আর্টের জন্যই আর্টের ধ্বনির সংযোগ তাই এত ঘনিষ্ঠ। বঙ্কিমের সংজ্ঞা অনুসারে কায়েমীস্বার্থের সেবায় ব্যবহৃত হলেই আর্ট হয়ে ওঠে—সৌন্দর্যের অভিব্যক্তি, আর জনস্বার্থের সমর্থনে তা ব্যবহৃত হলেই হয়—উদ্দেশ্যমূলক।

অর্থনীতি, রাজনীতি আর সমাজনীতিতে যিনি প্রাচীন সমাজের উচ্চশ্রেণীর হাতে হাতিয়ার জুগিয়েছিলেন, দর্শন আর ধর্মের ক্ষেত্রেও যে তিনি তাদের হাতে নতুন করে হাতিয়ার সরবরাহ করতে ত্রুটি করেননি—এতে বোধ হয় আশ্চর্য হবার কিছু নেই। বাস্তব জীবনে সামন্তসমাজ যেমন জনসাধারণকে বেঁধে রাখে নানাবিধ সামাজিক ব্যবস্থার শৃংখলে—তেমনি ধ্যান-ধারণার ক্ষেত্রেও সামন্ত সমাজ সৃষ্টি করে অসংখ্য বন্ধন। শাস্ত্রের নামে, ধর্মের নামে মানুষের মনকে এমনভাবে এইসব বন্ধনে বেঁধে রাখা হয়, এমনভাবে কুসংস্কারাচ্ছন্ন করে রাখা হয় যাতে সমাজের শ্রেণী-শাসনটা, শ্রেণীগত অবিচার-অত্যাচারটা মনে হয় স্বাভাবিক, চিরন্তন, অপরিবর্তনীয়। সামাজিক নিপীড়নে জর্জরিত মানুষকে একটা কল্পনার স্বর্গরাজ্যে নিয়ে গিয়ে ফেলে ধর্ম—তাই মার্কস একে বলেছেন জনসাধারণের পক্ষে আফিম স্বরূপ। মধ্যযুগীয় এই ধর্মের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের মধ্য দিয়েই সূত্রপাত হয় সমাজের অবিচার-অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের।

অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী বস্তুবাদীরা ধ্যান-ধারণার ক্ষেত্রে এই ধর্মের গোলামির বিরুদ্ধে বিদ্রোহের মধ্য দিয়েই সূত্রপাত করেছিলেন সামন্ততন্ত্রের

উচ্ছেদের সংগ্রাম। ফরাসী বিপ্লবের অনুপ্রেরণা ছিল এই বস্তুবাদেরই মধ্যে। ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতে বিপ্লবের ভয়ে ভীত সংস্কারপন্থী বঙ্কিম নতুন করে অধ্যাত্মবাদ আর ধর্মের কুসংস্কার প্রচারে করলেন মনোনিবেশ। পাশ্চাত্যের ভাবধারা আর বিজ্ঞানের ধাক্কায় তখন প্রাচীন ভারতের শাস্ত্রের অনুশাসন আর ধর্মের গোঁড়ামির বিরুদ্ধে জাগতে শুরু করেছিল অবিশ্বাস আর সন্দেহ। 'ধর্মতত্ত্ব', 'কৃষ্ণচরিত্র', 'ধর্ম ও সাহিত্য' এবং 'শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা'র মারফত এই সন্দেহ দূর করে ধর্মবিশ্বাস পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করায় মনোযোগ দিলেন বঙ্কিম। বঙ্কিম বোঝাতে চাইলেন যে, ধর্মের আসল তত্ত্ব মোটেই ক্ষতিকর নয়—ধর্মের মাঝে মাঝে অপব্যবহার হয়েছে মাত্র। আসল, সাচ্চা ধর্ম ব্যক্ত করার নাম করে 'ধর্মতত্ত্বে'র মধ্য দিয়ে বঙ্কিম নতুন যুক্তিতর্কের মারফত সামন্ত সমাজের ধ্যান-ধারণাকেই প্রকৃত ধর্ম বলে প্রচার করলেন, নতুন প্রগতিশীল ভাবধারাকে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করলেন, অ-ধর্মোচিত বলে করলেন আঘাত। প্রাচীন হিন্দু সমাজের রক্ষণশীলতা আর গোঁড়ামিতে আবার প্রাণ-সঞ্চার করার চেষ্টা হল, আর সেই গোঁড়ামিকেই কাজে লাগান হল সামন্তশ্রেণীর শোষণ আর অত্যাচারকে সুদৃঢ় করার উদ্দেশ্যে। এমন কি 'ধর্মতত্ত্বে'র এক জায়গায় বঙ্কিম এমন কথাও বললেন যে, মহারাণীর উচিত তাঁর এদেশের প্রজাদের হাতে অস্ত্র দেওয়া, কারণ আমরা হলাম মহারাণীর একান্ত অনুগত এবং মহারাণীর সাম্রাজ্য রক্ষা তো আমাদেরই কাজ! ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতের সংস্কারপন্থী বুর্জোয়াদের মতে এইটাই ছিল সাচ্চা, আসল ধর্ম।

'শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা'র মধ্য দিয়ে বঙ্কিম প্রচ্ছন্নভাবে বৈজ্ঞানিক ভাবধারার বিরুদ্ধে এবং প্রকাশ্যভাবে বস্তুবাদের বিরুদ্ধে করলেন যুদ্ধঘোষণা। আত্মার অমরত্ব, পুনর্জন্মবাদ ইত্যাদিকে তিনি নানাবিধ টিকা টিপন্নী সহযোগে করলেন সমর্থন, দাসত্ব প্রথার আমলের এই দর্শনের পুনরুজ্জীবনের মারফত ঊনবিংশ শতাব্দীর জনসাধারণের গোলামির জীবনের ভিৎকে তিনি করতে চাইলেন সুদৃঢ়। মানুষের মন থেকে কুসংস্কার, জড়তা দূর করে তাদের অগ্রগতির পথ মুক্ত করে না দিয়ে তিনি জনসাধারণকে নতুন করে আফিম খাওয়াবার ব্যবস্থাই করলেন। 'ধর্মতত্ত্ব' আর 'শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা'র মধ্যে জাতিভেদ আর বর্ণের আভিজাত্য মূর্ত হয়ে উঠেছে ছত্রে ছত্রে। অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী বস্তুবাদীরা সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে ঘোষণা করেছিলেন জেহাদ। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বঙ্কিম

তাঁর সাহিত্যে পুরাতন কুসংস্কারেরই বনিয়াদ শক্ত করেছিলেন। বঙ্কিম সাহিত্যের প্রতিক্রিয়াশীলতার এটা ছিল অন্যতম প্রধান স্তম্ভ।

বঙ্কিমের সমগ্র সাহিত্য পর্যালোচনা করার পর তাই কোন সন্দেহই থাকে না যে, উনবিংশ শতকের বাঙলার ইতিহাসে সে সাহিত্য কোন্ ভূমিকা অভিনয় করেছিল। প্রগতিসাহিত্য বলতে সেই সাহিত্যকেই বোঝায়, যে সাহিত্য সমাজের অগ্রগতির পথকে প্রশস্ত করে, সমাজের নবোদ্ভূত শক্তিকে সাহায্য করে পুরাতন প্রাচীন মৃতপ্রায় শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে, সমাজের প্রগতিশীল শ্রেণীর হাতে যে সাহিত্য হয়ে ওঠে সংগ্রামের হাতিয়ার। বঙ্কিম সাহিত্য উনবিংশ শতাব্দীর বিপ্লবী শ্রেণীর সংগ্রামকে শুধু যে সহায়তা করেনি, ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালনে যে অক্ষম হয়েছে তাই নয়—রাজনীতি, অর্থনীতি, শিল্পতত্ত্ব, দর্শন—সর্ববিষয়ে এ সাহিত্য পথরোধ করে দাঁড়িয়েছিল প্রগতির, বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের। অত্যন্ত সচেতনভাবে এই সাহিত্য বিজ্ঞানবাদের র‍্যাশনালিজম-এর বিরুদ্ধে হাত মিলিয়েছিল, সামাজিক কুসংস্কারের সঙ্গে রাজনীতির উপর স্থান দিয়েছিল ধর্মতত্ত্বকে, স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরুদ্ধাচরণ করে বলশালী করেছিল বিদেশী শাসনের সঙ্গে আপস নীতিকে, কৃষক জনসাধারণের বিপ্লবী-সংগ্রামের উপর স্থান দিয়েছিল সংস্কারবাদী কর্মনীতিকে। বঙ্কিম সাহিত্যের ঐতিহ্য তাই নিতান্ত প্রতিক্রিয়াশীল ঐতিহ্য; হিন্দুয়ানির গোঁড়ামির ফলে এই ঐতিহ্যই বিংশ শতাব্দীতে সংগ্রামী জনসাধারণকে ধর্মের ভিত্তিতে বিভক্ত করায় এবং তার ফলে কায়েমীস্বার্থের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে দুর্বল ও পঙ্গু করায় সাহায্য করেছিল অনেকখানি।

বঙ্কিমের এই স্বরূপ সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করতে মার্কসপন্থীদের বিলম্ব হলেও প্রতিক্রিয়াশীলদের বিলম্ব হয়নি। তারা তাই বঙ্কিমের মতবাদের অস্ত্রাগার থেকে অস্ত্র সংগ্রহ করে চিরদিন প্রগতির বিরুদ্ধে লড়েছে, আজও লড়ে। বঙ্কিম সাহিত্যের ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে মতবাদগত লড়াইয়ের মারফত, বঙ্কিমচন্দ্রের শিক্ষার শ্রেণীগত তাৎপর্যের মুখোশ খুলে দেওয়ার মারফতই তাই আজকের দিনের প্রগতি সাহিত্যকে এগিয়ে যেতে হবে। এ দেশের বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে মতবাদগত লড়াইয়ে এই কাজের গুরুত্ব অনস্বীকার্য।*

* মার্কসবাদী, ষষ্ঠ সংকলন, ডিসেম্বর ১৯৪৯, পৃঃ ১৭২-১৯৪; নবগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় 'দৈনিক বসুমতী' পত্রিকার প্রাক্তন সহযোগী সম্পাদক গণেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছদ্মনাম।—সম্পাদক

পরিশিষ্ট ১

সম্পাদকের ভূমিকা / মতবাদের সংগ্রাম

মার্কসবাদী ভাবসম্পন্ন শ্রমিকশ্রেণীর হাতিয়ার, তাই এঙ্গেল্‌স্ বলেছিলেন যে, "বিপ্লবী মতবাদ ছাড়া বিপ্লবী কাজ হয় না।" মতবাদের সংগ্রাম অনমনীয়-ভাবে চালিয়ে যেতে হবে ধনিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে সমাজতন্ত্রের সুপ্তশক্তিকে জাগিয়ে তুলবার জন্য। নিউইয়র্ক, লণ্ডন, প্যারিস, দিল্লী এবং কলিকাতা প্রত্যেক রাজধানীতেই ধনিকের ভাড়াটিয়া পণ্ডিতেরা দর্শনে, সাহিত্যে, অর্থনীতিতে ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানে মার্কসবাদের বিরুদ্ধে সমরসজ্জায় সজ্জিত হচ্ছেন, কারণ তাঁরা জানেন যে, নব নব কৌশলে মার্কসবাদের বনিয়াদকে আক্রমণ না করলে মার্কসবাদের সৃষ্টিশক্তি ধনিকসভ্যতার ভিত্তিমূল পুড়িয়ে ছারখার করে দেবে। তাঁদের দর্শন, সাহিত্য, অর্থনীতি এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান ধনিক সভ্যতার শেষ রক্ষার জন্য যোদ্ধা ও কর্মী তৈরী করছে মার্কসবাদবিরোধী মতবাদের সাহায্যে।

কিন্তু ধনিক সভ্যতার ভিত্তিমূলে আগুন লেগেছে। মার্কসবাদের অস্ত্রাগারে যে শক্তিশালী বিজ্ঞান আছে, মার্কস্, এঙ্গেল্‌স্, লেনিন এবং ষ্টালিন যে বিজ্ঞানকে অসংখ্য শ্রমিকের শক্তিশালী হাতিয়ার স্বরূপ নিপীড়িত গণমানবের হাতে তুলে দিয়েছেন, তাকে পরাস্ত করার শক্তি ধনিকশ্রেণী কোথায় পাবে? কিন্তু যারা জনগণের অগ্রণী যোদ্ধা তাদের নিকট সেই বিজ্ঞানের দ্বার যদি রুদ্ধ থাকে, তারা যদি সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগ্রামের প্রতিটি সমস্যায় সেই বিজ্ঞানকে হাতিয়ার স্বরূপ ব্যবহার না করেন, তাহলে ধনিকশ্রেণী জনসাধারণের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে অনেক খণ্ড যুদ্ধে সাময়িকভাবে জয়ী হবে, শ্রমিকের যন্ত্রণা ও দুঃখভোগের দিন দিবে বাড়িয়ে। তাই মার্কস্‌বাদী পত্রিকার কাজ হবে ধনিকের ক্রীতদাস পণ্ডিতসমাজের ভণ্ডামি ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভ্রান্ত মতবাদসমূহের বিরুদ্ধে আপোষবিহীন সংগ্রাম।

বুর্জোয়া দর্শনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম এই প্রবন্ধে কমরেড জ্‌দানভ্ সংগ্রাম ঘোষণা করেছেন বুর্জোয়া দর্শনের ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গীর বিরুদ্ধে। সোভিয়েট

দার্শনিক বুর্জোয়া ঐতিহাসিকের প্রভাবে কলুষিত দৃষ্টি নিয়ে প্রচার করেছিলেন যে, দর্শনের ইতিহাস সত্য আবিষ্কারের এক ধারাবাহিক ইতিহাস, এই ইতিহাসের ক্রমবিকাশ সূত্রে মার্কস্‌বাদের উৎপত্তি। এই কলুষিত ও ভ্রান্ত ধারণাকে আক্রমণ করে সোভিয়েটের দার্শনিক, যোদ্ধা ও নেতা কমরেড জ্‌দানভ্‌ দেখিয়েছেন যে, দর্শনের ইতিহাস সত্য আবিষ্কারের এক ধারাবাহিক ইতিহাস নয়, দর্শনের ইতিহাস রাজনীতির মত শ্রেণী সংগ্রামেরই ইতিহাস, ভাববাদী দর্শনের বিরুদ্ধে বস্তুবাদের সংগ্রামের ইতিহাস। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে শ্রেণী নিরপেক্ষ সত্য বলে কোন মতবাদ নাই, মার্কস্‌বাদী দর্শন শ্রমিক শ্রেণীরই যুদ্ধের হাতিয়ার, যেমন ভাববাদী দর্শন ধনিকশ্রেণীর হাতিয়ার

অর্থনীতি ক্ষেত্রে যাঁরা শ্রমিক একং মালিকের শান্তি রক্ষার নামে শ্রমিকের বিরুদ্ধে সংগঠিত শাণিত হিংসার অগ্নিকাণ্ড বাধিয়েছেন তাঁদের পতাকাবাহীদের বিবেকবুদ্ধি সতেজ রাখবার জন্য ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরুর 'ভারত আবিষ্কার' পড়ানো হচ্ছে, শোনানো হচ্ছে যে, প্রাচীন ভারতের বেদ-বেদান্তে এবং রামরাজত্বে পৃথিবীর সমস্ত সমস্যার সমাধান ছিল, ভারতীয় দর্শন ও রাষ্ট্রযন্ত্রের অতীত ইতিহাস এক মহৎ সত্য আবিষ্কারের ধারাবাহিক ইতিহাস— প্যাটেল, নেহরু এই ইতিহাসেরই উত্তরাধিকারী। **প্রাচীন যুগে ভারতীয় দর্শন ও বস্তুবাদ** প্রবন্ধে তার জবাব দিয়েছেন রবীন্দ্র গুপ্ত। তিনি দেখিয়েছেন যে ভারতীয় দর্শনের অতীত ইতিহাস বস্তুবাদের বিরুদ্ধে ভাববাদের প্রতিরোধের ইতিহাস ; অতীত যুগের সামাজিক অবস্থা থেকে উদ্ভূত বস্তুবাদের অসম্পূর্ণতা এবং দুর্বলতার জন্য তখন তার পরাজয় ঘটেছিল, মার্কস্‌ এবং এঙ্গেলস্‌ দিয়েছেন সম্পূর্ণ নূতন শক্তিশালী বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদ। বর্বর স্বেচ্ছাতন্ত্রের উত্তরাধিকারী নেহরু-প্যাটেলের ভাড়াটিয়া পণ্ডিত সমাজের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে অতীত ভারতের কোন অধ্যায়েরই সত্য অর্থ বোঝা যায় না। বোঝা যায় ঐতিহাসিক বস্তুবাদের সাহায্যে অভ্রান্তভাবে। তথাকথিত রামরাজত্ব এবং বেদ-বেদান্ত উপনিষদের ভিত্তি ছিল প্রকৃতির নিকট এবং অভিজাত শ্রেণীর নিকট সাধারণ মানুষের বর্বর দাসত্ব। মার্কসবাদ তৈরী করেছে সমস্ত রকম দাসত্বের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলিত মানুষের বিজয় তোরণ।

ভারতীয় সমাজতান্ত্রিক দল ইতিহাসবিখ্যাত প্রতিক্রিয়াশীলদের পদাংক অনুসরণ করে তারস্বরে প্রচার করছে যে সর্বজনীন ভোটের অধিকার পেলেই

গণতন্ত্র পাওয়া হল, রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য দেখিয়ে এই গণতন্ত্র লাভ করাই শ্রমিকের শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য। এই জগদ্বিখ্যাত মিথ্যুকেরা রাষ্ট্রের আসল স্বরূপটাই যে গোপন করছে তা দেখিয়েছেন ব্রজেন রায় তাঁর **মার্কসবাদী দৃষ্টিতে রাষ্ট্র** নামক প্রবন্ধে। তিনি লেনিনের রাষ্ট্রতত্ত্ব থেকে বের করে ধরেছেন এই মূল সত্যটা যে রাষ্ট্র শ্রেণীসংগ্রামেরই যন্ত্র, সংগঠিত হিংসার অস্ত্র, শ্রমিকশ্রেণীকে এমনি এক যন্ত্র তৈরী করতে হবে বিজয়ী সংগ্রামের ভিতর দিয়ে। রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যের প্রশ্ন উঠলেই জিজ্ঞাসা করতে হবে কোন্ শ্রেণীর রাষ্ট্র, কোন্ শ্রেণীর বিরুদ্ধে কোন্ শ্রেণীর হিংসার যন্ত্র? সর্বজনীন ভোটাধিকারের কীর্তন শুনলেই মোহিত না হয়ে অনুসন্ধান করতে হবে পর্দার আড়ালে কোন্ শ্রেণীর স্বেচ্ছাচারী শাসন আত্মগোপন করছে?

কিন্তু শ্রমিকের সন্ধানী দৃষ্টিতে ছানি পড়াবার জন্য কোমর বেঁধে লেগেছেন কবি এবং সাহিত্যিকেরা। গল্পে, কবিতায় ও উপন্যাসে তাঁরা শোনাচ্ছেন ব্যক্তিগত সম্পত্তির সনাতনী ধর্ম-কাহিনী, শ্রেণীনিরপেক্ষ ব্যক্তিবাদের মিথ্যাপাঁচালী, এবং সাপ খেলাবার মত সাঁপুড়ের বাঁশী। বীরেন পাল তাই **বাংলা সাহিত্যের কয়েকটি ধারা** বিশ্লেষণ করে প্রতিক্রিয়াশীলদের চোরাগোপ্তা আক্রমণ থেকে হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন এবং নির্ভীক ভাবে সাহিত্য পথের পথিকদের শ্রেণী সংগ্রামের পথ ধরতে আহ্বান জানিয়েছেন।

শ্রমিকের অস্ত্র হিসাবে সাহিত্যকে ভোঁতা করে দেবার জন্য যাঁরা "পবিত্র আর্টের" ধুয়ো তুলে বলছেন আর্টের ক্ষেত্রে মার্কস্‌বাদের নিয়ম-কানুন খাটে না উর্মিলা গুহ তাঁদের জবাব দিয়েছেন **সাহিত্য বিচারের মার্ক্সীয় পদ্ধতি** নামক প্রবন্ধে খুব সংক্ষিপ্তভাবে। তথাকথিত "পবিত্র আর্ট"-এর উদ্দেশ্যটা অপবিত্র।

ধনিকের রাষ্ট্র, দর্শন এবং সাহিত্য কিছুই কিছু নয় যদি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ধনতন্ত্রকে ঠিক রাখা না যায়, তাই ধনিকের অর্থনীতিবিদ্ আবিষ্কার করেছেন 'মিশ্রিত অর্থনীতি', প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে, ধনতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্রের মাঝামাঝি একটা রাস্তা আছে। এ কথাটা যে আদৌ মিথ্যা তা ঘোষণা করেছেন যোগানন্দ বসু তাঁর **মিশ্র অর্থনীতি** প্রবন্ধে। ধনতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্রের মাঝামাঝি কোন রাস্তা নাই।

রাষ্ট্রনীতি, দর্শন, সাহিত্য ও অর্থনীতি সর্বক্ষেত্রেই বুর্জোয়া পণ্ডিতেরা মিথ্যার মিনারের উপর দাঁড়িয়ে জমিনের ওপরকার নির্যাতিত নরনারীর মাথার ওপরে থুতু ফেলছেন আর তাদের আহ্বান করছেন অস্ত্র সংবরণ করতে, তাঁদের এই দুষ্কর্মকেই তাঁরা দাবী করছেন সত্য, শিব এবং সুন্দরের প্রতি অর্ঘ নিবেদন বলে। মার্কসবাদের কাজ হল তাঁদের ঘৃণিত স্বরূপ নগ্ন করে ধরা। প্রথম সংখ্যা সামান্যভাবে তার যৎকিঞ্চিৎ আরম্ভ মাত্র।

মতবাদের সংগে মতবাদের সংঘাত স্বার্থের সংগে স্বার্থের এবং শ্রেণীর সংগে শ্রেণীর সীমাহীন সংঘাত। এই সংঘাতে যাঁরা শ্রমিক শ্রেণীর পক্ষভুক্ত তাঁরাই হবেন মার্কসবাদের লেখক এবং পাঠক, তাঁদের সকলেরই লক্ষ্য শ্রমিক এবং দরিদ্র কৃষকের শিবির শক্তিশালী করা।*

অক্টোবর, ১৯৪৮

* মার্কসবাদী, প্রথম সংকলন, অক্টোবর ১৯৪৮, পৃঃ ১-৪ (অচিহ্নিত)।—সম্পাদক

প্রকাশকের বক্তব্য

'মার্কসবাদী' অষ্টম সংকলন প্রকাশিত হল। সপ্তম সংকলন প্রকাশিত হয়েছে আট মাস আগে। সাধারণত তিন মাস অন্তর 'মার্কস্‌বাদী' প্রকাশিত হয়। এবার বের হল সুদীর্ঘ আট মাস পর। 'মার্কসবাদী' প্রগতিশীল বাঙালী পাঠক মহলে অত্যন্ত জনপ্রিয়। বাঙালী পাঠকরা এই ধরনের একখানি তাত্ত্বিক পত্রিকার জন্য অত্যন্ত আগ্রহান্বিত। তাই এতদিন 'মার্কসবাদী'র প্রকাশ বন্ধ থাকাতে আমরা পাঠক ও অন্যান্য অনেকের কাছ থেকে বহু অভিযোগ পেয়েছি। এটা 'মার্কসবাদী'র প্রয়োজনীয়তা ও জনপ্রিয়তারই স্বীকৃতি।

যে উদ্দেশ্য ও দায়িত্ব নিয়ে 'মার্কসবাদী' আত্মপ্রকাশ করেছিল সম্পাদক-মণ্ডলী সেই উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ পালন করতে পারেননি। 'মার্কসবাদী'তে বহু মার্কসবাদ-লেনিনবাদ বিরোধী লেখা প্রকাশিত হয়েছে, বহু অ-মার্কসীয় লেখা বের হয়েছে। সম্পাদকমণ্ডলীর অনুসৃত ও প্রচারিত ভুল, মার্কসবাদ-লেনিনবাদ বিরোধী রাজনীতিই এর জন্য দায়ী।

আদর্শগত সংগ্রামের ক্ষেত্রে, 'মার্কসবাদ' অনুসৃত ভুল দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে সংগ্রামে 'মার্কসবাদী' প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা আরও বহুগুণে বেড়ে গেছে। মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বৈজ্ঞানিক বিশ্বদৃষ্টিতে প্রত্যেকটি সমস্যার বিচার এবং নির্ভুল মতবাদ প্রতিষ্ঠা করবার জন্য 'মার্কসবাদী'কে আরও কঠোর ও নিরলস সংগ্রাম চালাতে হবে। এ দায়িত্ব 'মার্কসবাদী'কে পালন করতেই হবে।

'মার্কসবাদী' মনে করে সমালোচনা ও আত্মসমালোচনাই হল মতবাদের ক্ষেত্রে সঠিক ও নির্ভুল নীতি নির্ধারণের শ্রেষ্ঠ উপায়। 'মার্কসবাদী' সেই পথই অকুণ্ঠিত চিত্তে গ্রহণ করবে; সমালোচনা এবং আত্মসমালোচনার উপযুক্ত গুরুত্ব দিতে চেষ্টা করবে। এই পথেই 'মার্কসবাদী' নতুন যাত্রা শুরু করবে।

পূর্ববর্তী সংকলনগুলিতে প্রকাশিত নিম্নোক্ত মার্কসবাদ লেনিনবাদ বিরোধী প্রবন্ধগুলি আমরা বিনাশর্তে প্রত্যাহার করছি:

১। ভারতের নয়া গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র (২য়)

২। কৃষক সমস্যার নূতন ধারা (২য়)

৩। দেশব্যাপী অর্থনৈতিক সংকটের তীব্রতা ও গণসংগ্রামের জোয়ার (৩য়)

৪। বিপ্লবী সংগ্রামের রণনীতি ও রণকৌশলের লেনিনবাদী ব্যাখ্যা (৩য়)

৫। বুর্জোয়া গণতন্ত্র বনাম সমাজতন্ত্র (৩য়)

৬। যুক্তপ্রদেশের জমিদারী উচ্ছেদ পরিকল্পনার সমালোচনা (৩য়)

৭। আটলান্টিক চুক্তি ও বৃটিশ কমনওয়েলথ (৪র্থ)

৮। যুদ্ধের বিপদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কৌশল (৫ম)

৯। নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের ২৩ তম অধিবেশন (৫ম)

১০। ভারতের ছাত্র আন্দোলন (৬ষ্ঠ)

১১। সারা ভারত শান্তি সম্মেলন (৭ম)

১২। "স্বাধীন" ভারতে বিদেশী পুঁজি (৭ম)

সাহিত্য ও দর্শন সম্পর্কে বিভিন্ন সংকলনে যে সমস্ত প্রবন্ধ বেরিয়েছে (বিদেশী লেখার অনুবাদ বাদে) সে সম্পর্কে এখনো আলোচনা ও বিতর্কের অবকাশ আছে। তাই এই অবস্থায় সেগুলির উপর কোন সুস্পষ্ট মতামত দেওয়া সম্ভব নয়।

মতবাদের ক্ষেত্রে আলোচনা, সমালোচনা একটা তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। নতুন উৎসাহ ও উদ্দীপনার বন্যা বইয়েছে। গঠনমূলক সমালোচনা ও ব্যাপকতম গণসংযোগ, মতাদর্শের ক্ষেত্রে নতুন সৃষ্টিশীল নির্ভুল নীতি গড়ে তুলতে যথেষ্ট সাহায্য করবে বলেই 'মার্কসবাদী'র বিশ্বাস।

আগামী সংকলন কবে প্রকাশিত হবে, তার প্রতিশ্রুতি প্রকাশকের পক্ষে এনে দেওয়া সম্ভব নয়। তবে আগামী সংকলনে 'মার্কসবাদী'র পূর্ববর্তী সংকলনগুলির একটা বিস্তৃত সমালোচনা থাকবে।

নতুন পথে যাত্রার মুহূর্তে 'মার্কসবাদী' তার পাঠক, সহানুভূতিশীল ও অন্যান্যদের কাছ থেকে অকুণ্ঠ সহযোগিতা ও সমর্থন কামনা করে—কারণ হাজার দোষত্রুটি অথবা ভুলভ্রান্তি সত্ত্বেও 'মার্কসবাদী' তাঁদেরই নিজস্ব।

এই দৃঢ় বিশ্বাস নিয়েই 'মার্কসবাদী' ব্যাপক জনতার মাঝখানে এসে দাঁড়াচ্ছে।*

১৪ ১০. ৫০

* মার্কসবাদী, অষ্টম সংকলন, অক্টোবর ১৯৫০, পৃঃ ১-২ (অচিহ্নিত)।—সম্পাদক

পরিশিষ্ট ২

একজন মনস্বী ও একটি শতাব্দী / ভবানী সেন

সামাজিক পটভূমিকা

রবীন্দ্রনাথের জন্মের পর পুরো একটি শতাব্দী কেটে গেল, পূর্ণ হয়ে গেল ভারতের জাতীয় জীবনের একটি সম্পূর্ণ মহাযুগ। কবিগুরুর জন্মকালটি ছিল ভারতীয় ইতিহাসের একটি মহাসন্ধিক্ষণ। ১৮৫৭ সালের জনবিদ্রোহ যে আগুন জেলেছিল তা তখন নির্বাপিত, কিন্তু তার স্মৃতি তখনও জাগরূক। জাতীয় জাগরণের জন্য ভারতীয় জনমনের মর্মস্থলে তখন যে অস্পষ্ট রূপরেখা রচিত হচ্ছিল, নূতন সৃষ্টির সম্ভাবনায় তা ভরপুর, পুরাতনের সঙ্গে নূতনের বোঝাপড়া তখন প্রত্যাসন্ন। ভারতের সামাজিক এবং নৈতিক প্রগতি কোন পথ ধরে চলবে, কোন পথে হবে নূতন জাতি-সৃষ্টি এই আত্মচিন্তা তখন ধীরে ধীরে জেগে উঠছে। তারপর একশো বছর পরে আজ দেখা গিয়েছে নূতন আত্মচিন্তা,—স্বাধীন ভারত কোন্ পথ ধরে এগোবে। মাঝখানে পড়ে রইল যে একশো বছরের ইতিহাস তার প্রতিটি অধ্যায় কবিগুরুর বিচিত্র সৃষ্টিতে সমৃদ্ধ। পৃথিবীর এই প্রাচীনতম সমাজের নবীনতম মহাজাতিরূপে উদয়ের পথে সুখে-দুঃখে জয়ে-পরাজয়ে মহাকবির গীতিকাব্য তাকে সর্বদা সজীব করে রেখেছে।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-জীবন যখন শুরু হয়, বাংলায় তখন নূতন চেতনা, নূতন মূল্যবোধ, নূতন রসোপলব্ধি এবং নূতন গণঅভিযান ধীরে ধীরে জন্মগ্রহণ করছে। ইতিহাস শুরু করে 'আধুনিক' যুগের সৃষ্টির কাজ।

মধুসূদন ও বিদ্যাসাগর, দীনবন্ধু ও কালীপ্রসন্ন, টেকচাঁদ ও অক্ষয়কুমার ইতিপূর্বেই বাংলার সাহিত্যে ও সংস্কৃতিতে নবযুগের নূতন মূল্যবোধ সৃষ্টি করেছেন, সমাজ-সংস্কারকেরা উদ্যমে ও কর্মপ্রবাহে মধ্যযুগীয় সামাজিকতাকে আঘাত করেছেন, তুলে ধরেছেন নূতন সমাজের প্রগতিশীল লক্ষ্যকে; তারই পাশাপাশি উপর্যুপরি কৃষকবিদ্রোহ থেকেও তখন জন্ম নিয়েছিল নূতন সমাজের

নূতন ভাবজগত। সে যুগের নীল বিদ্রোহ এবং একাধিক প্রজাবিদ্রোহ প্রতীক ওই ভাবসম্পদ হয়ে পড়তো বন্ধ্যা।[১]

১৮৫৭ সাল থেকে ১৮৮৭ সাল পর্যন্ত, এই ত্রিশ বছর ধরে ভারতে পুরাতনের সঙ্গে নূতনের যে তীব্র সংগ্রাম চলে তারই ভেতর দিয়ে তখন জন্মগ্রহণ করছিল এক সৃষ্টিশীল সংস্কৃতি, ভারতের আধুনিক জাতীয় আন্দোলন হলো তারই সহজাত শক্তি; তারই পুরোভাগে আবির্ভূত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র সৃষ্টির সম্পূর্ণ ও অখণ্ড এক ইতিহাস। এই আবির্ভাব আকস্মিক নয়, অলৌকিক নয়; প্রচণ্ড দ্বন্দ্ব-সমাকুল এক ঐতিহাসিক মহাযানে রবীন্দ্রসৃষ্টির এই সমারোহময় উদ্বোধন যেমন প্রত্যাশিত তেমনই স্বাভাবিক। শুধু ভারতে নয়, বিশ্বের ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথ সমগ্র একটি যুগ।

রবীন্দ্রযুগ হলো বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের উত্থান এবং অবসান,—এই দুইটি যুগের সমষ্টি, তাঁর সৃষ্টিশীল সাধনা ছিল ইতিহাসের একটি নয় দুইটি বিশিষ্ট যুগে পরিব্যাপ্ত। বিশ্বের মানুষ তখন যুগ থেকে যুগান্তরে চলেছে ইতিহাসের অনিবার্য নিয়মে মহাকালের যাত্রাপথ অনুসরণ করে। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন মহান শিল্পী। সৃষ্টিশীল মহৎ শিল্পের বৈশিষ্ট্যই হলো যুগের সমগ্র সত্তাকে প্রতিফলিত করা। তাই সেই যুগের সমস্ত সত্তা, সমস্ত দ্বন্দ্ব এবং সমস্ত ধারা তাঁর বিপুল এবং ব্যাপক সৃষ্টির মধ্যে বর্তমান। বিজ্ঞানের বিকাশে প্রকৃতির উপর মানুষের জয়যাত্রা যখন শুরু হয়ে গেছে, অথচ সমগ্র এশিয়া এবং আফ্রিকায় সাম্রাজ্যবাদের উন্মত্ত বিজয়োল্লাসে বহু জাতির স্বতন্ত্র সত্তা যখন বিলুপ্ত, রবীন্দ্রনাথ তখন তার সৃষ্টির কাজ শুরু করেন, আর যেদিন এই মহান শিল্পীর সৃষ্টির উপর যবনিকা পড়লো সেদিন সেই সাম্রাজ্যবাদের শেষ সংকট সমুপস্থিত।

রবীন্দ্রনাথ সভ্যতার ইতিহাসের দুটো যুগ দেখে গেছেন। সামন্তবাদের অবসান ঘটিয়ে ধনিক সভ্যতা যখন সাম্রাজ্যবাদে রূপান্তরিত হচ্ছে, আবার ধনিক সভ্যতার অবসান ঘটিয়ে সমাজতন্ত্রের প্রথম ভিত্তি যখন প্রতিষ্ঠা হচ্ছে—এই দুটো যুগ ধরেই রবীন্দ্রনাথ নিরবচ্ছিন্নভাবে শিল্পসৃষ্টি করেছেন এবং যথাসম্ভব অংশ গ্রহণ করেছেন জাতীয় জীবনের নানাবিধ প্রগতিশীল আয়োজনে। তিনি দেখেছেন বৃটেনে ধনতন্ত্রের উদীয়মান সৃষ্টিশীল অবদান, তিনি দেখেছেন দেশে

[১] অনুচ্ছেদের শেষ বাক্যটি গ্রন্থে এই ভাবেই মুদ্রিত হয়েছে। সম্ভবত এখানে কোনো গুরুতর মুদ্রণ-প্রমাদ ঘটেছে।—সম্পাদক

দেশে সাম্রাজ্যবাদের হিংস্র অভিযান, তিনি দেখেছেন এই সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে পরাধীন জাতির বহু অভ্যুত্থান; দুই দুটো সাম্রাজ্যবাদী মহাযুদ্ধ, সোভিয়েত রাশিয়ার সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা এবং বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের অন্তিম সংকট—এ সবই ছিল তাঁর সৃষ্টির উপাদান। ইতিহাসের এই দ্বন্দ্ব-সমাকুল আবর্তন দেখাবার মত দৃষ্টি তাঁর ছিল, ছিল অনুভব করার মত প্রাণ এবং সেই অনুভূতি প্রকাশ করার শক্তি। তাই তাঁর সৃষ্টি হয়েছে অভূতপূর্ব যার মূল্য ও সৌন্দর্য কখনও ম্লান হবার নয়, ইতিহাসের রথচক্রতলে যা কখনও পিষ্ট হবে না, চির অম্লান যার মাধুর্য যুগযুগান্ত ধ'রে মানুষের অন্তরাত্মাকে বলদীপ্ত করতে সক্ষম।

ধনিক সভ্যতার সৃষ্টিশীল পর্বের প্রদোষকালে রবীন্দ্রনাথের শিল্পসৃষ্টি শুরু হয় এবং তা সমাপ্ত হয় সমাজতান্ত্রিক সভ্যতার ব্রাহ্মমুহূর্তে; তাই তাঁর সংস্কৃতিতে পাই দুই সভ্যতারই ঐতিহাসিক মর্মবাণী, তাই তাঁর সংস্কৃতি সর্বদা সৃষ্টিশীল, সর্বদা বৈচিত্র্যময় এবং সর্বদা যুগসীমা অতিক্রান্ত। মহান শিল্পীর সৃষ্টিতে এই দুই যুগের নৈতিক বাণীই শুধু নয়, দ্বন্দ্ব সমূহও প্রতিফলিত হয়েছে। তাই রবীন্দ্রনাথের অবদান সম্পর্কে কিছু লেখা কিম্বা কিছু বলা অত্যন্ত কঠিন, সমস্যাটি অত্যন্ত জটিল। একদিকে নিছক স্তোকবাক্যে তাঁর সৃষ্টিশীলতার অবমাননা এবং অপরদিকে অপরিণত সমালোচনাদ্বারা তাঁর মূল্য উপলব্ধির অক্ষমতা—প্রতিপদে এই দুই রকম ভুলেরই সম্ভাবনা আছে।

রবীন্দ্র সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য

রবীন্দ্রনাথ যে বস্তুবাদী ছিলেন না, ছিলেন ভাববাদী সে বিষয় বিতর্কে কোন অবকাশ নেই। কিন্তু ভাববাদী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর সৃষ্ট সাহিত্য বহুলাংশে বাস্তবতাময়। গীতালি, মহুয়া এবং পূরবীতে পাই ভাববাদী চিন্তাধারার চরমোৎকর্ষ বাস্তবধর্মবর্জিত নিষ্কম্পিত প্রেমের গীতিকাব্য। ভাববাদী কবিদের মধ্যে এমন একটি সুর থাকে যা মানুষকে বাস্তব সংগ্রামে বিমুখ করে তোলে, পলায়নের মনোবৃত্তি যোগায়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ভাবাবেগ সে জাতের নয়। মানুষকে মানুষ হিসেবে উন্নত করবার জন্য যে আদর্শবাদের প্রয়োজন হয়, তা কোন বস্তুবাদী অস্বীকার করে না, বা বস্তুবাদের সঙ্গে সেই আদর্শবাদের কোন বিরোধিতা নেই। রবীন্দ্রনাথ ভাববাদের দিক থেকে হলেও সেই আদর্শ-পরায়ণতার জয়ধ্বনি করেছেন। বস্তুবাদী না হলেও তাঁর মন ছিল বাস্তবতায়

স্পর্শকাতর, তাই 'নৈবেদ্য'র মধ্যে তিনি তাঁর সমস্ত শক্তি দিয়ে আদর্শবাদকে ভাববাদের দৈন্য থেকে মুক্ত করে সুস্থ সামাজিক আদর্শের অনুকূলে রূপায়িত করেছেন। 'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়,' 'ক্ষমা যেথা ক্ষীণ দুর্বলতা, হে রুদ্র নিষ্ঠুর যেন হতে পারি তথা,' 'যাদের করেছ অপমান, অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান'—এই সমস্ত ঘোষণাই কবির ভাবাদর্শের বাস্তবানুগত দিক, যা নূতন জাতীয় চরিত্র সৃষ্টির উপাদান। ভাববাদের সঙ্গে বিজ্ঞানের এবং প্রগতির যে বিরোধ, রবীন্দ্রনাথ তাকে কখনও প্রশ্রয় দেন নি। বলাকার মত মহাকাশে বিচরণ করতে করতে মাটির টানে মর্তে নেমে এসেছেন বারংবার, আবার মর্তের পঙ্কিলতায় অতিষ্ঠ হয়ে আকাশে উড়ে গেছেন কতবার। 'ভাববাদ' মানুষকে জীবন সংগ্রামে নির্লিপ্ত ও নৈরাশ্যবাদী করে দেয়, কিন্তু তাঁর শ্রেষ্ঠ-সৃষ্টি গীতাঞ্জলি ও গীতিমাল্য সেই অবসাদের সুর থেকে মুক্ত। প্রেম ও সৌন্দর্যকে তিনি বাস্তব জগৎ থেকে অবিচ্ছিন্ন করে নিয়ে তার নিষ্কষিত রূপ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু তাঁর এই আধ্যাত্মিক সঙ্গীতের মধ্যে জীবনবাদের বিরোধী কোন সুর নেই, যদিও ভাববাদের সঙ্গে জীবন্ত সত্যের বিরোধিতাই চিরন্তন।

স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগে—ভাববাদ যদি জীবন্ত সত্যের বিরোধীই হবে তা হলে রবীন্দ্রনাথ কেমন করে ভাববাদের আশ্রয় থেকে জীবনের মহাসত্যকেই রূপ দিতে পারলেন, কেমন করে তাঁর পক্ষে সম্ভব হলো ভাববাদের উর্ধ্বে উঠে, যে সত্য বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদের একান্ত নিজস্ব, তাকে উজ্জীবিত করা? এ প্রশ্নের একমাত্র উত্তর এই যে তিনি ছিলেন মহান শিল্পী এবং মহান শিল্পীর সৃষ্টি-প্রতিভার বৈশিষ্ট্যই এই যে সত্য তাঁর মধ্যে প্রতিফলিত হয়। তাই তাঁর মনের মধ্যে ছিল এমন একটি সত্যানুসন্ধানী আবেগ যা তাঁকে তাঁর দার্শনিক বিশ্বাসের উর্ধ্বে তুলে ধরেছে, অতিক্রম করে নিয়ে গেছে তাঁকে সেই ভাববাদী দর্শনের সীমা থেকে—যা রূপকে মনে করে ভাবের ছায়া মাত্র, ভাবকেই মনে করে আসল সত্তা। উপনিষদের প্রতি কবির আস্থা তাঁকে সেই ভাববাদের আকাশে বিচরণ করালেও, শিল্পসৃষ্টির মাধ্যমে কবির অবচেতন মন আবিষ্কার করেছে—"ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ, রূপ পেতে চায় ভাবের মাঝারে ছাড়া।" বলাবাহুল্য, এই অনুভূতি, ভাবের সঙ্গে এই আত্মীয়তাই রবীন্দ্রনাথের শিল্পী-মনটিকে জীবন্ত সত্যের সংস্পর্শে রেখে দিত। বস্তুবাদ না হলেও ঠিক ভাববাদও

নয়, এ দর্শন হলো সর্বাস্তিবাদ তথা বৌদ্ধ বাস্তবতার অনুরূপ। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন—"আমি স্বভাবতই সর্বাস্তিবাদী—অর্থাৎ আমাকে ডাকে সকলে মিলে—আমি সমগ্রকেই মানি, গাছ যেমন আকাশের আলো থেকে আরম্ভ ক'রে মাটির তলা পর্যন্ত সমস্ত কিছু থেকে ঋতু-পর্যায়ের বিচিত্র প্রেরণা দ্বারা রস ও তেজ গ্রহণ ক'রে তবেই সফল হয়ে ওঠে—আমি মনে করি আমারও ধর্ম তেমনি—সমস্তের মধ্যে সহজে সঞ্চরণ ক'রে সমস্তের ভিতর থেকে আমার আত্মা সত্যের স্পর্শ লাভ ক'রে সার্থক হতে পারবে।"

—রবীন্দ্রজীবনী, তৃতীয় খণ্ড, প্রভাত মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ২১৪

এই ছিল রবীন্দ্রনাথের জীবন দর্শন এবং এই দর্শনই তাঁকে পরিচালনা করেছে শিল্পসৃষ্টির কাজে। তাঁর এই জীবন দর্শনের ভিতরই ভাববাদ ও বস্তুবাদের দ্বন্দ্ব বর্তমান। এই দ্বন্দ্বই রাবীন্দ্রিক শিল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য। তাঁর সৃজনশীলতার প্রধান উপাদান। এই জীবন দর্শন অনুসরণ করেই তিনি তার সুদীর্ঘ জীবন ধরে যুগ থেকে যুগান্তরে অতিক্রম করার সময় নিত্য নবযুগের উপযোগী প্রগতিশীল ভাবধারাকেই অভিনন্দন জানিয়ে গেছেন। দ্বন্দ্ব-সমাকুল এই ভাবধারাই আবার তাঁর সত্যসন্ধানে সমস্যা সৃষ্টি করেছে ইতিহাসের জটিল রাজপথের মোড়ে মোড়ে। শুধু তত্ত্বের সাহায্যে যখনই সত্যাসত্য নির্ধারণ করতে গেছেন তখনই ভুল করেছেন, ভুল শুধরেছেন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সাহায্যে। ভুলের এই সংশোধনই তাঁর মহত্ত্ব।

সামন্তবাদের বিরুদ্ধে উদীয়মান ধনিক সভ্যতাকে তিনি অভিনন্দন জানিয়েছেন কিন্তু ধনিক সভ্যতার অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বও তাকে প্রপীড়িত করেছে, এ দ্বন্দ্বের সমাধান ছিল তাঁর অজ্ঞাত। সামন্ত সমাজের কুসংস্কার ও ব্যক্তি-পীড়নের বিরুদ্ধে ধনতন্ত্রের বিজ্ঞানানুগতা ও ব্যক্তিত্ববাদ তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল, কিন্তু ধনতান্ত্রিক সমাজের অর্থগৃধ্নুতা ও যন্ত্রসর্বস্বতা ছিল তাঁর চক্ষুশূল। এই সমাজেরও সমস্ত ভড়ং তিনি ধরে ফেলেছেন, দেখতে পেয়েছেন মানুষের প্রতি মানুষের নির্যাতন এবং ব্যক্তিমনের নিষ্পেষণ, 'মুক্তধারা'র বাঁধ ভেঙ্গে দিতে চেয়েছেন নিষ্ফল আক্রোশে। কিন্তু তিনি সমাধান খুঁজেছেন অতীত সমাজের অতীত ব্যবস্থার মধ্যে। সোভিয়েত রাশিয়ায় ভ্রমণ করে সর্বপ্রথম সমাজতন্ত্রের নূতন সৃষ্টিশীলতা তাঁর চোখে ধরা পড়ে, কবি উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন সমাজ-তান্ত্রিক সমাজের। শেষ জীবনে তিনি নিজেই আবিষ্কার করেন নিজের সৃষ্টির

মধ্যে কোথায় ছিল ফাঁক, ধরে ফেলেন যে শুধু 'এ পাড়ায়' ঘুরেছেন, 'ও পাড়ার' সঙ্গে আত্মীয়তা করা হয় নি। তাই আহ্বান জানালেন নূতন যুগের কবিকে —"যে আছে মাটির কাছাকাছি, সে কবির বাণী লাগি কান পেতে আছি।" দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় রোগ শয্যায় শুয়ে সোভিয়েত রাশিয়ার জয় কামনা করেছেন। "সভ্যতার সংকটে" ঘোষণা করেছেন নূতন যুগের নূতন সমাজের অভ্যুদয় সম্পর্কে তাঁর অবিচলিত আস্থার কথা, কারণ "মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ" এই বিশ্বাস ছিল তাঁর মনে।

বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ পুরাতনের বিরুদ্ধে নূতনের সংগ্রাম এবং "আধুনিক" সমাজের অন্তর্দ্বন্দ্ব রূপায়িত করার কাজে হাত দেন। কাব্যের ভিতর তাঁর জীবন দর্শনের অধ্যাত্মবাদী দিক মূর্ত হযে উঠলেও, উপন্যাসে তিনি অনেক বেশি বাস্তব। 'চোখের বালি'তে বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত পরিবারের যে ছবি আঁকলেন, বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষকে' তা সফলতার সঙ্গে অতিক্রম করে গেল। প্রকৃতির সঙ্গে প্রকৃতির ঘাত প্রতিঘাতে ঘটনার যে আবর্ত সৃষ্ট হয় তার ঘূর্ণিপাকে এক মানুষ অন্য হযে যায়, সংসারের নৈতিক ভিত্তি ভেঙ্গে যায় চুরমার হয়ে। প্রেমের সঙ্গে বিবাহের যে বিরোধ প্রকট হয়ে ওঠে, সামাজিক রীতি-নীতির মধ্যে তার সমাধান নেই। সমাজ ভেঙ্গে যায়, কিন্তু তবু সেই সমাজ ছাড়া নূতন কোন সমাজের অভ্যুদয়ের চিহ্নমাত্র দেখা যায় নি, তাই রবীন্দ্রনাথ সমাধান খোঁজেন এই প্রতিষ্ঠিত সমাজের মধ্যেই আদর্শনীতির আশ্রয়ে। অথচ সে আদর্শ ফানুসের মত হাওয়ায় ভরা নয়, তার মধ্যে আছে বাংলার সামাজিক জীবনের সম্ভাব্য বাস্তব।

'যোগাযোগে' কবির দৃষ্টি আরও স্বচ্ছ হয়ে উঠেছে। ব্যক্তিগত সম্পত্তির নিয়মে পরিচালিত পিতৃতান্ত্রিক পরিবারের কঠোর বাস্তবে কুমুর আদর্শিকতা ছত্রছান হয়ে গেল, চূড়ান্ত পরাজয় ঘটলো তার। বিবাহের অধিকার ছেড়ে তাকে চলে যেতে হলো স্বামীর সংসার ছেড়ে, এই হলো তার প্রথম বিদ্রোহ। কিন্তু আবার তাকে যেচে ফিরে আসতে হলো সেই সংসারে অপমানের পসরা মাথায় করে। রবীন্দ্রনাথ অনুভব করেন যে সামাজিক নীতিবোধ চিরস্থায়ী নয়, যুগে যুগে তার পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু তবু বর্তমান অন্তর্দ্বন্দ্বের সমাধান কি?

সমাজের ব্যক্তিসত্তার এই যে বিরোধ তার যে কোন সমাধান নেই প্রচলিত সমাজের মধ্যে কবি তা বুঝলেন, কিন্তু নূতন সমাজের ইংগিত এই সমাজেরই

গর্ভে যতক্ষণ না জন্মগ্রহণ করে ততক্ষণ কবির কাছে প্রশ্নটি থেকে যায় সমাধানের অসাধ্য। তাই তিনি প্রতিভার খেলা খেলতে বসলেন 'শেষের কবিতা'য়। প্রেমের সঙ্গে বিবাহের যে বিরোধ তার সামঞ্জস্য ঘটালেন এমন এক উচ্চাঙ্গের আদর্শ দিয়ে যা সুন্দর হলেও অবাস্তব, অথচ শিল্পসৃষ্টির প্রতিভায় সমুজ্জ্বল। সামাজিক সমস্যার যে সমাধানটি তিনি দিলেন তা একটি অলীক কল্পনা। এ থেকেই বোঝা যায় যে এ যুগের একজন শ্রেষ্ঠ শিল্পীর শ্রেষ্ঠ প্রতিভাও বাস্তবকে অতিক্রম করে যেতে পারে না; রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসই তার এক অকাট্য প্রমাণ। রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিশীল প্রতিভার মহত্ত্ব এই যে এই সীমাবদ্ধতার মধ্যেও নূতনের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন বারংবার। উদাত্ত সুরে ঘোষণা করেছেন—"নব লেখা আসি দর্পভরে······উন্মুক্ত করুক পথ, স্থাবরের সীমা করি জয়, নবীনের রথযাত্রা লাগি।"

সমাজতত্ত্বে রবীন্দ্রনাথ

বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদের একটি সত্যকে তিনি মর্মে মর্মে গ্রহণ করেছিলেন, তা হচ্ছে ইতিহাসের গতিশীলতা, পুরাতনের গর্ভে নূতনের অভ্যুদয় এবং সমাজ ব্যবস্থার অনিত্যতা। তাঁর সমগ্র সৃষ্টি এই নীতির দ্বারা প্রভাবিত। এই দৃষ্টি ছিল বলেই ধনতান্ত্রিক সমাজের আত্মবিরোধ তাঁর চোখে ধরা পড়েছিল। রোমাঁ রলাঁর ষষ্ঠিতম জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে লিখিত রচনায় কবি লিখলেন—

"আমেরিকায় অবস্থানকালে যন্ত্রসংঘসমূহ (organisation) ব্যক্তিগত (personal) মানুষকে একেবারে নির্বাসন দিয়া যন্ত্রগত মানুষকে (mechanical) প্রকাণ্ড পদ্ধতি-পিণ্ডের মধ্যে সংহত করিয়া প্রচণ্ড শক্তি অর্জন করিয়া দ্রুত ও বিপুল প্রসার লাভ করিতেছে দেখিয়া আমার মন পীড়িত হইয়াছিল···যে ধর্ম প্রেম ও করুণায় কমনীয় সেই ধর্মের নামে কী কদর্য রক্ত লোলুপ ধর্মমত গড়িয়া উঠে তাহা আমরা দেখিয়াছি—ব্যবসায়ের দোহাই দিয়া কী বিরাট প্রবঞ্চনা চলিতেছে! অথচ এই সকল প্রতিষ্ঠানের পরিচালক যাহারা তাহাদের সম্মান অক্ষুণ্ণ! নিরীহ প্রজাকে লাঞ্ছিত করিবার জন্য রাজতন্ত্রের নামে কী বীভৎস মিথ্যাবাদ প্রচারিত হইতেছে দেখিতেছি, অথচ যাহারা এই রাজতন্ত্রের কর্ণধার তাঁহারা সকলেই আচার আচরণ ও বংশ গরিমায় ভদ্র।"

—রবীন্দ্রজীবনী, ৩য় খণ্ড, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ১৬৯-৭০ পৃষ্ঠা।

আমেরিকা ঘুরে এসে ধনতান্ত্রিক সমাজের অন্তঃসারশূন্যতা তাঁর চোখে ধরা পড়লেও এর কারণস্বরূপ শ্রেণীগত শোষণ-পদ্ধতির তত্ত্ব তখনও তাঁর অপরিজ্ঞাত ছিল; তাই তিনি মনে করেছিলেন যে এর কারণ হলো "জড় পৌত্তলিকতার প্রভাব।" কিন্তু এ ভুল তাঁর ভেঙ্গে গিয়েছিল সোভিয়েট রাশিয়ায় গিয়ে। সেখানে দেখতে পেয়েছিলেন ঐ একই যন্ত্রের নূতন ভূমিকা; যন্ত্রের হাতে মানুষ নয়, মানুষের হাতে যন্ত্র। এখানে এসে তিনি বুঝতে পারেন যে আমেরিকায় "যন্ত্র পৌত্তলিকতার" মূলে আছে এক শ্রেণী কর্তৃক অপর শ্রেণীর শোষণ। রাশিয়ার চিঠিতে তিনি লিখলেন—

"এখানে এসে যেটা সবচেয়ে আমার চোখে ভাল লেগেছে সে হচ্ছে এই ধনগরিমার ইতরতার সম্পূর্ণ তিরোভাব।...কেবলমাত্র এই কারণেই এদেশে জনসাধারণের আত্মমর্যাদা এক মুহূর্তে অবারিত হয়েছে।" এর আগে কমিউনিস্ট মতবাদ বা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে তাঁর মনে কোন স্পষ্ট ধারণা ছিল না। ভারতে বসে বলশেভিক মতবাদ সম্পর্কে ধনিকদের কাগজে অনেক অপপ্রচার তিনি পড়েছেন, তাঁর মন তা দ্বারা প্রভাবিতও হয়েছে। কিন্তু তাঁর মুক্তমন সোভিয়েট রাশিয়ার "ঐতিহাসিক যজ্ঞ" স্বচক্ষে দেখে লিখেছিলেন—সোভিয়েট রাশিয়ায় না এলে "এ জন্মের তীর্থদর্শন অত্যন্ত অসমাপ্ত থাকত।"

সোভিয়েট সমাজের মর্মস্থল লক্ষ্য করে কবি রাশিয়ার চিঠিতে লিখেছিলেন—

"আজ পৃথিবীতে অন্তত এই একটা দেশের লোক স্বজাতির স্বার্থের উপরেও সমস্ত মানুষের স্বার্থের কথা চিন্তা করছে।...স্বজাতির সমস্যা সমস্ত মানুষের সমস্যার অন্তর্গত এই কথাটা বর্তমান যুগের অন্তর্নিহিত কথা। একে স্বীকার করতেই হবে।"

যে মহাকবি তাঁর সৃষ্টিশীল জীবন আরম্ভ করেছিলেন সামন্তবাদের বিরুদ্ধে বুর্জোয়া ভাবাদর্শের প্রতিষ্ঠা নিয়ে, তিনি যে এইভাবে সমাজতান্ত্রিক আন্তর্জাতিকতায় এসে পৌছতে পেরেছিলেন কুণ্ঠাহীন মনে, তার কারণ তাঁর জীবন দর্শনের মানবতাবাদ। এই মানবতাবাদই ছিল তাঁর ভাববাদ ও বস্তুবাদের, ব্যক্তিবাদ ও সমাজবাদের এবং ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের সমস্ত দ্বন্দ্বের সেতুস্বরূপ। তাই 'এ পাড়ায়' অবাধে বিচরণ করেও যখনই 'ও পাড়ার' সংস্পর্শে এসেছেন তখনই তাকে চিনতে তাঁর কষ্ট হয় নি একটুও।

রাশিয়ায় গিয়ে রবীন্দ্রনাথ শুধু রাশিয়ার সমাজতন্ত্রের মহিমাই উপলব্ধি

করেন নি, আবিষ্কার করেছিলেন ঐতিহাসিক বস্তুবাদের মহাসত্য। তিনি লিখলেন—

"এই যে বিপ্লবটা ঘটলো এটা রাশিয়াতে ঘটবে বলেই অনেক কাল থেকে অপেক্ষা করছিল। আয়োজন কতদিন থেকেই চলছে। খ্যাত অখ্যাত কত লোক কত কাল থেকেই প্রাণ দিয়েছে, অসহ্য দুঃখ স্বীকার করেছে। পৃথিবীতে বিপ্লবের কারণ বহুদূর পর্যন্ত ব্যাপক হয়ে থাকে, কিন্তু এক একটা জায়গায় ঘনীভূত হয়ে ওঠে। যাদের হাতে ধন, যাদের হাতে ক্ষমতা, তাদের হাত থেকে নির্ধন ও অক্ষমেরা এই রাশিয়াতেই অসহ্য যন্ত্রণা বহন করেছে। দুই পক্ষের মধ্যে একান্ত অসাম্য অবশেষে প্রলয়ের মধ্য দিয়ে এই রাশিয়াতেই প্রতিকার সাধনের চেষ্টায় প্রবৃত্ত।

"একদিন ফরাসী-বিদ্রোহ ঘটেছিল এই অসাম্যর তাড়নায়। সেদিন সেখানকার পীড়িতেরা বুঝেছিল এই অসাম্যের অপমান ও দুঃখ বিশ্বব্যাপী। তাই সেদিনকার বিপ্লবে সাম্য সৌভ্রাত্র ও স্বাতন্ত্র্যের বাণী স্বদেশের গণ্ডী পেরিয়ে উঠে ধ্বনিত হয়েছিল। কিন্তু টি'কলো না। এদের এখানকার বিপ্লবের বাণীও বিশ্ববাণী।"—রাশিয়ার চিঠি, পৃঃ ৯

এই মহাসত্য রবীন্দ্রনাথ যখন উপলব্ধি করেছিলেন, ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের নেতারা তখনও তাঁর অনেক পিছনে পড়ে। আজও ঐ মহাসত্য স্বীকার করতে তাঁদের সর্বাপেক্ষা অগ্রগামী নেতাদেরও সংস্কারে বাধে। রবীন্দ্রনাথকে সংস্কারমুক্ত করেছিল তাঁর মানবতাবাদ।

স্বাধীনতা সংগ্রামে রবীন্দ্রনাথ

এই মানবতাবাদের তাগিদেই তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামের বিশেষ বিশেষ অধ্যায়ে প্রত্যক্ষভাবে নেমে পড়েছেন। অথচ প্রকৃতিগতভাবে তিনি ছিলেন রাজনীতি চর্চার প্রতি বিমুখ। হিজলী বন্দীশালায় গুলিচালনার প্রতিবাদে ১৯৩১ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর কলিকাতায় এক জনসভা হয়। রবীন্দ্রনাথ হয়েছিলেন এই সভার সভাপতি। রাজনীতির প্রতি তাঁর মনোভাব এই সভায় নিজেই তিনি ব্যক্ত করে বলেন—

"প্রথমে বলে রাখা ভাল আমি রাষ্ট্রনেতা নই, আমার কর্মক্ষেত্র রাষ্ট্র-আন্দোলনের বাহিরে। কর্তৃপক্ষের কৃত কোন অন্যায় বা ত্রুটি নিয়ে সেটাকে

আমাদের খাতায় জমা করতে আমি বিশেষ আনন্দ পাই নে। এই যে হিজলীর গুলিচালনা ব্যাপারটি আজ আমাদের আলোচ্য বিষয় তার শোচনীয় কাপুরষতা ও পশুত্ব যা কিছু আমার বলবার, সে কেবল অবমানিত মনুষ্যত্বের দিকে তাকিয়ে।"

—রবীন্দ্রজীবনী, ৩য় খণ্ড, পৃঃ. ৩০৫

সাম্রাজ্যবাদী শাসন তার স্ব-ভাবসিদ্ধ "মনুষ্যত্বের অবমাননা" দ্বারা বারবার কবিগুরুকে রাজনীতির মধ্যে টেনে নামিয়েছে। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে তিনি প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন তাঁর প্রথম যৌবনে। সেদিনকার দরখাস্ত-সর্বস্ব রাজনীতিকে তিনি তীব্রভাবে ব্যঙ্গ করেছেন, স্বদেশী-মেলার মারফৎ শহুরে রাজনীতিগুলিকে গ্রাম্য জনতার সংস্পর্শে জীবন্ত করে তুলতে চেয়েছেন। গঠনমূলক কাজের ভিতর দিয়ে জাতিগঠনই ছিল তাঁর কামনা। এদিকে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন মহাত্মা গান্ধীর পূর্বগামী।

তিনি তখন জানতেন যে রাষ্ট্রের মালিক যেই হোক না কেন, সমাজের মধ্যে আমরা লাভ করতে পারি আত্মকর্তৃত্ব। প্রাচীন ভারতের রাষ্ট্র ছিল গ্রাম্য সমাজ সম্পর্কে নির্লিপ্ত; আধুনিক যুগে ধনতন্ত্রের মাধ্যমে রাষ্ট্রের সেই নিরপেক্ষ ভূমিকা যে অবাস্তব এবং অসম্ভব তা তত্ত্বের দিক দিয়ে তিনি মেনে নিতে পারতেন না। কিন্তু তবু তার নিজস্ব আদর্শের বাস্তব সুফল হয়েছিল এই যে দেশের মধ্যে জাতি গঠনের জন্য গঠনমূলক কাজের নীতি জাতীয় গণজাগরণের উপাদান হয়ে দাঁড়ালো। জাতীয় গণজাগরণের কোন আভাস দেখলেই মন নেচে উঠতো, বেরিয়ে আসতেন তিনি তাঁর কাব্য-সাধনার মন্দির থেকে, রাজনীতির কলরবের মধ্যে। বঙ্গভঙ্গের যুগে তিনি তাঁর সমস্ত সৃষ্টিশক্তি প্রয়োগ করেছিলেন জাতীয় গণজাগরণের কাজে,—জাতীয়তা যাতে জনমনের একটি সত্তা হয়ে দাঁড়ায় সেই প্রচেষ্টায়। রাখী-বন্ধনের গান গেয়ে তিনি সৃষ্টি করলেন নূতন উদ্দীপনা, স্বদেশভক্তির নূতন চেতনা এলো জনমনের গানের মাধ্যমে।

এই স্রোতের জোয়ারে ভেসে এলো বিদেশী দ্রব্য বয়কট আন্দোলন এবং সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী দল। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন এই দুটোরই বিরোধী। সরকারী জুলুমের প্রতিবাদে স্বদেশী জবরদস্তিও তিনি পছন্দ করতেন না। ভাববাদ সুলভ দৃষ্টি নিয়ে তিনি জবরদস্তিকে অবিচ্ছিন্নভাবে দেখতেন, কার বিরুদ্ধে কার জবরদস্তি সে প্রশ্ন তুলতেন না।

ভারতের স্বাধীনতা কোন পথে আসবে এ তত্ত্ব নিয়ে তিনি কখনও মাথা ঘামান নি এবং এবিষয়ে তাঁর মতামত ছিল প্রধানতঃ নেতিবাচক। স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্যে যেখানেই ফাঁকি দেখেছেন অথবা দেখেছেন বিকৃতি, তারস্বরে তার প্রতিবাদ করেছেন। নব জাতীয়তার শক্তি যাতেই অনুভব করেছেন, তাকে অভিনন্দন জানাতে কখনও দ্বিধাবোধ করেন নি। সন্ত্রাসবাদ যে নিস্ফল সে সত্য সহজেই তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, কারণ তা ছিল গণআন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন। কিন্তু জাগ্রত জনতা তার শক্তি প্রয়োগ করবে কি ভাবে—এ বিষয়ে তাঁর ধারণা ছিল সম্পূর্ণভাবে আধ্যাত্মিক। তাই ১৯১৯-২০ সালে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে যে জাতীয় আন্দোলন জেগে উঠলো, তাকে তিনি অভিনন্দন জানিয়েছিলেন দু-হাত বাড়িয়ে—যেন তিনি এরই জন্য অপেক্ষা করছিলেন। কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ নীতি, বিলাতি বস্ত্রে অগ্নিসংযোগ এবং রাজ-দ্রোহমূলক কোন আন্দোলনই তাঁর সমর্থন পায় নি। ১৯৩১ সালে ২রা অক্টোবর শান্তিনিকেতনে গান্ধীজীর ৬৫তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ বলেন—

"কেবলমাত্র রাষ্ট্রনৈতিক প্রয়োজন সিদ্ধির মূল্য আরোপ করে তাঁকে আমরা দেখব না। যে দৃঢ় শক্তির বলে তিনি আজ সমগ্র ভারতবর্ষকে প্রবলভাবে সচেতন করেছেন, সেই শক্তির মহিমাকে আমরা উপলব্ধি করব। প্রচণ্ড এই শক্তি সমস্ত দেশের বুকজোড়া জড়ত্বের জগদ্দল পাথরকে আজ নাড়িয়ে দিয়েছে। কয়েক বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষের যেন রূপান্তর, জন্মান্তর ঘটে গেল। দেশ ভয়ে আচ্ছন্ন, সংকোচে অভিভূত ছিল।...আমাদের আত্মকৃত পরাভব থেকে মুক্তি দিলেন মহাত্মাজি। এখন শাসন কর্তারা উদ্যত হয়েছেন আমাদের সঙ্গে রফা নিষ্পত্তি করতে। কেননা তাঁদের পরশাসনতন্ত্রের গভীরতর ভিত্তি টলছে, যে-ভিত্তি আমাদের বীর্যহীনতায়। আমরা অনায়াসে আজ জগৎ সমাজে আমাদের স্থান দাবি করছি।"

—'প্রবাসী', অগ্রহায়ণ, ১৩৩৮

এই উক্তির মধ্যেই প্রকাশ পায় বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের তিক্ত মনোভাব ও জাতীয় স্বাধীনতার অদম্য আকাঙ্ক্ষা এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে জনগণের সম্মিলিত কর্মশক্তিকে তিনি কত বড় স্থান দিতেন তারও আভাষ এতে পাওয়া যায়। জনশক্তিই যে ইতিহাসের চালনী শক্তি এ বিশ্বাস তাঁর ছিল, যদিও পথের সন্ধান তিনি রাজনীতি নেতাদের ওপর ছেড়ে দিয়েছিলেন।

রবীন্দ্র যুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে গণ অভ্যুত্থান, সমাজতন্ত্রের অভ্যুদয় এবং সাম্রাজ্যবাদের অন্তিম সংকট। প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকেই সাম্রাজ্যবাদীরা বুর্জোয়া গণতন্ত্র পরিত্যাগ করে ফাসিজম্‌-এর রাস্তা ধরে এবং পৃথিবীর দেশে দেশে জেগে ওঠে ফাসিষ্টদের সঙ্গে জনতার সংঘর্ষ। মানব-সভ্যতার এই সন্ধিক্ষণে রবীন্দ্রনাথ প্রগতির শিবিরেই তাঁর নিজস্থান নির্বাচিত করেছিলেন। এদিক থেকে ভারতের রাজনৈতিক নেতাদের পিছনে ফেলে তিনি এগিয়ে যান। তখন মুসোলিনি তাঁকে দিয়ে ফাসিষ্ট মতবাদের স্বপক্ষে আনবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করেন। তত্ত্বের দিক থেকে অবচ্ছিন্ন ভাববাদের সাহায্যে তিনি প্রথমটা ফাসিজমের স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারেন নি, তাই তিনি ইতালির জনসভায় ফাসিষ্টদের সাজানো গোছানো জনসমাবেশ দেখে মুগ্ধ হন, প্রশংসা করেন ইতালির বৈষয়িক উন্নতির। ফাসিষ্ট বর্বরতার স্বরূপ তখনও তাঁর অপরিব্যক্ত ছিল। মহর্ষি রোমাঁ রলাঁ এ বিষয়ে তাঁকে সচেতন করে দেন। রোমাঁ রলাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের ফলে তিনি তাঁর মতামত স্থির করে ফেলেন এবং ফাসিষ্ট বিরোধী শিবিরকে সমর্থন জানান অকুণ্ঠিত মনে। মানবতাবাদই তাঁকে সাহায্য করে আধুনিক বিশ্বের এই বৃহত্তম সংকটে সঠিক শিবির নির্বাচনে। ১৯২৬ সালের ২০শে জুলাই এণ্ড্রুজের নিকট লিখিত এক পত্রে মানবতার প্রতি তাঁর স্পর্শকাতর মনের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে ফাসিজমকে তিনি প্রচণ্ড ধিক্কারে ধিক্কৃত করেন। ইংলণ্ডের ম্যানচেষ্টার গার্ডিয়ানে এ পত্র প্রকাশিত হয়েছিল।[১] এর পর থেকে তাঁর সত্য সাধনার অন্যতম লক্ষ্যও হয়ে দাঁড়িয়েছিল সাম্রাজ্যবাদ, ফাসিজম ও উগ্র জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে সর্বশক্তি প্রয়োগ।

জাপানের বিখ্যাত কবি নোগুচি চীনের বিরুদ্ধে জাপানী সাম্রাজ্যবাদের হামলার প্রতি রবীন্দ্রনাথের সমর্থন লাভের জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন। তার উত্তরে নোগুচি পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের তীব্র তিরস্কার। নোগুচির প্রতি রবীন্দ্রনাথের এ পত্র প্রগতি শিবিরে একটি অবিস্মরণীয় দলিল। এমনি তাঁর একখানি দলিল হল মিস র‍্যাথবোনের নিকট লিখিত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে কবির ধিক্কারবাণী।

১. পত্রখানি ১৯২৬ সালের ৫ই আগস্ট 'ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।—সম্পাদক

১৯৩০ সাল থেকে কবির মনে জাগছিল সাম্রাজ্যবাদী শাসনের বিরুদ্ধে এক অপরাজেয় গণসংগ্রামের স্বপ্ন। রাষ্ট্র সম্পর্কে তাঁর দার্শনিক নির্লিপ্ততা তখন থেকেই কেটে গেছে। তাঁর এই নূতন ধ্যান ধারণার পরিচয় পাওয়া যায় রাশিয়ার চিঠিতে। ১৯৩০ সালে তিনি রাশিয়া সফরের শেষে ভারত থেকে চিঠি পান আইন অমান্য আন্দোলন এবং পুলিশী নির্যাতনের। জবাবে তিনি লেখেন—

"যে বাঁধনে দেশকে জড়িয়েছে টান মেরে সেটা ছিঁড়তে হয়। প্রত্যেক টানে চোখের তারা উল্টে যায় কিন্তু এ ছাড়া বন্ধনমুক্তির অন্য উপায় নেই। ব্রিটিশরাজ নিজের বাঁধন নিজের হাতেই ছিঁড়ছে, তাতে আমাদের তরফে বেদনা যথেষ্ট, কিন্তু তার তরফে লোকসান কম নয়। সকলের চেয়ে বড় লোকসান এই যে, ব্রিটিশরাজ আপন মান খুইয়েছে। ভীষণের দুর্বৃত্ততাকে আমরা ভয় করি, এই ভয়ের মধ্যেও সম্মান আছে। কিন্তু কাপুরুষের দুর্বৃত্ততাকে আমরা ঘৃণা করি। ব্রিটিশসাম্রাজ্য আজ আমাদের ঘৃণার দ্বারা ধিক্কৃত। এই ঘৃণায় আমাদের জোর দেবে, এই ঘৃণার জোরেই আমরা জিতবো।

"সম্প্রতি রাশিয়া থেকে এসেই দেশের গৌরবের পথ যে কত দুর্গম তা অনেকটা স্পষ্ট করে দেখলুম। যে অসহ্য দুঃখ পেয়েছে সেখানকার সাধকেরা, পুলিশের মার তার তুলনায় পুষ্পবৃষ্টি। দেশের ছেলেদের বলো এখনও অনেক বাকি আছে—তার কিছুই বাদ যাবে না। অতএব তারা যেন এখনই বলতে শুরু না করে যে বড়ো লাগছে—সে কথা বললেই লাঠিকে অর্ঘ্য দেওয়া হয়।"

—রাশিয়ার চিঠি, পৃঃ ৮৫

কবিগুরুর এই ঐতিহাসিক ঘোষণার সঙ্গে তুলনা করুন 'ঘরে বাইরেতে' তাঁর যে ইংগিত আছে স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্যে বিপ্লবী মনোভাবের বিরুদ্ধে নিছক সংস্কারপন্থী গঠনমূলক কাজের প্রতি পক্ষপাতিত্বের। কবি বদলেছেন বিস্ময়করভাবে, ইতিহাসের পটপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃত গণবিপ্লবের সঠিক মূর্তি স্বচক্ষে দেখে। বয়স যত বেড়েছে কবির মন ততই তরুণ হয়ে উঠেছে।

মৃত্যুশয্যায় শুয়েও তাই তিনি কামনা করেছেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সোভিয়েতের জয়। হিটলারের বর্বর অভিযান যে পরাস্ত হবেই এবং সোভিয়েতের জয়ই যে আনবে বিশ্বের কল্যাণ সে কথা তিনি বুঝে গেছেন এবং বলে গেছেন জীবনের শেষ মুহূর্তে। তাঁর আকাঙ্ক্ষা আজ মহাসত্যে পরিণত হয়েছে, তিনি

তা দেখে যেতে পারেন নি। মৃত্যু পর্যন্ত তিনি বিশ্ব প্রগতির সঙ্গে যে এগিয়ে চলেছিলেন—এইখানেই তাঁর মহত্ত্ব। এই অভিনবত্বের জন্যই তাঁর জীবন-চরিত অধ্যয়ন করলে একটি সমগ্র যুগের ইতিহাস অধ্যয়ন করা হয়।*

* "গ্রন্থের সব শেষের প্রবন্ধটি লিখেছেন মার্কসবাদী সুপণ্ডিত ভবানী সেন। একদা 'রবীন্দ্র গুপ্ত' ছদ্মনামে রবীন্দ্রমানসের মার্কসবাদী বিশ্লেষণের দ্বারা তিনি পাঠক সমাজকে চমক লাগিয়ে দিয়েছিলেন। চিন্তার প্রবীণতায় দুটি দশক পেরিয়ে এসে আজ তিনি আরও নূতনভাবে মূল্যায়ন করেছেন। 'একজন মনস্বী ও একটি শতাব্দী' রবীন্দ্র-প্রতিভার মার্কসবাদী বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ মূল্যবান সংযোজন রূপে স্বীকৃত হবে বলেই আশা রাখি।"

১৩৬৮ সালে, রবীন্দ্র-জন্মশতবর্ষে, এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি, কলিকাতা-১২ থেকে 'রবীন্দ্র-বীক্ষা' নামে ডঃ নীলরতন সেন-এর সম্পাদনায় যে সংকলন-গ্রন্থ প্রকাশিত হয় তাতে 'সম্পাদকের নিবেদন'-এ উপর্যুক্ত কথাগুলি লেখা হয়। প্রয়াত কমিউনিস্ট নেতা ভবানী সেন-এর রবীন্দ্র-মূল্যায়ন সম্পর্কে এটিই সম্ভবত সর্বশেষ রচনা। দ্র. 'রবীন্দ্র-বীক্ষা', পৃঃ ২২০-২৩২।—সম্পাদক

শুদ্ধিপত্র

[সংকলিত রচনাগুলি পুনর্মুদ্রণের সময় আমি প্রথম মুদ্রণের পাঠ যথাযথ অনুসরণের চেষ্টা করেছি। ফলে, প্রথম মুদ্রণের ভুল বানান কিংবা মুদ্রণ-প্রমাদগুলিও অবিকৃত অবস্থায় এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। সেই সব ভুল বানান এবং মুদ্রণ-প্রমাদের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা কর্তব্য মনে করে এই শুদ্ধিপত্র সংযোজন করলাম।—সম্পাদক]

পৃষ্ঠা	অনুচ্ছেদ/পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২	তৃতীয়/৪	আভ্যন্তরীণ	অভ্যন্তরীণ
৪, ৫	দ্বিতীয়, ষষ্ঠ, প্রথম/ ৬, ১১, ৩, ১	কৃপমণ্ডুক/কুপমণ্ডুক	কূপমণ্ডূক
৫	চতুর্থ/৪	গ্রাসাচ্ছদন	গ্রাসাচ্ছাদন
১৭, ১৮	প্রথম/৫,২	সর্বাঙ্গীন	সর্বাঙ্গীণ
১৮	ঐ/৪	এগুতো হবে	এগুতে হবে
২০, ২৩	চতুর্থ/৫, ৪	অধ্যাত্মিক	আধ্যাত্মিক
২২	ঐ/৪	পাঁপড়ি	পাপড়ি
২২	ঐ/৫	"মুহ্যমান"	"মুহ্যমান"/মোহ্যমান
২৩	প্রথম/২	ইসারা	ইশারা
২৪	প্রথম/৭	নির্যাতীতদের	নির্যাতিতদের
২৭	প্রথম/৩	রাসস্থলভ	রাসভস্থলভ
২৯	পঞ্চম/৩	লুসিকর	লুসিফর
২৯	ঐ/৪	লাইনে	লাইমে
৩১	ঐ/৩	ভাওতা	ভাঁওতা
৩২	দ্বিতীয়/২	tendenzorman	tendenzroman
৩৩	তৃতীয়/১১	Cloitre Saint meony	Cloitre Saint Me´ry
৩৬	পঞ্চম/২	শিশু সাহিত্যের	শিল্প-সাহিত্যের
৩৯	তৃতীয়/১-২	…values of idiology which sour…art…	…realms of ideology which soar.. air…

৪০	চতুর্থ/৪	Lassez fare	Laissez faire
৪৩	দ্বিতীয়/৫	অমলাতান্ত্রিক	আমলাতান্ত্রিক
৪৮	তৃতীয়/৩	ঘূর্ণীঝড়	ঘূর্ণিঝড়
৫৫	পঞ্চম/৪	সমুজ্বল	সমুজ্জ্বল
৫৮	প্রথম/৫	আছন্ন	আচ্ছন্ন
৬০	দ্বিতীয়-তৃতীয়/২	দীপপুঞ্জ	দ্বীপপুঞ্জ
৬২	প্রথম/১০	বীরপণা	বীরপনা
৬৫	চতুর্থ/২	অবিলতা	আবিলতা
৬৭	প্রথম/৩	আনবিক	আণবিক
৬৭	ঐ/৭	পরমার্থিক	পারমার্থিক
৬৮	প্রথম/২	উজ্বল	উজ্জ্বল
৬৮	দ্বিতীয়/১	অনিমেশ রায়ের	অনিমেষ রাযের
৬৮	ঐ/৪	ব্যাঙ্গে	ব্যঙ্গে
৭৫	ঐ/১	পুংখানুপুংখ	পুঙ্খানুপুঙ্খ
৭৭	দ্বিতীয়/৩	ঈস্পাত	ইস্পাত
৭৮	ঐ/১১	খুটিনাটি	খুঁটিনাটি
৮২	ঐ/১২	চূণকাম	চুনকাম
৮৩	প্রথম/১	মহানুভূতি	সহানুভূতি
৮৯	ঐ/৩	স্মরণাপন্ন	শরণাপন্ন
৯৯	ঐ/১০	ব্যাভিচার	ব্যভিচার
১১১	পঞ্চম/৪	আভ্যান্তরীণ	অভ্যন্তরীণ
১২৩	প্রথম/৮	বর্হিত	বর্জিত
১২৯	চতুর্থ/৩	নির্যাচিত	নির্যাতিত
১৩১	তৃতীয়/২	করলেও	করলেন
১৩২	দ্বিতীয়/২	করিয়াছে	করিয়াছ
১৩৯	চতুর্থ/৪	বিছিন্ন	বিচ্ছিন্ন
১৪৬	দ্বিতীয়/৩	টিকা টিপন্নী	টীকা টিপ্পনী